সিগমা ফোর্স

দ্য ডেমন ক্রাউন

জেমস রলিন্স

রূপান্তর : আদনান আহমেদ রিজন

ব্রাজিলের উপকূলীয় এক দ্বীপে অবিশ্বাস্য বিপদ আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞানীদের একটা দল। আগ্রাসী কোন কিছুর আক্রমণে নিভে আসছে সব ধরণের প্রাণীর জীবন-প্রদীপ। আবিষ্কারটার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করার আগেই হামলা করা হলো তাদের উপর। মেরে ফেলা হলো সবাইকে। প্রাণে বাঁচল শুধুমাত্র একজন-করনেল ইউনিভার্সিটির পতঙ্গবিশারদ এবং বিষাক্ত জীব বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কিন মাতসুই।

এই বিপদের জড় লুকিয়ে আছে শত শত বছর আগে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলের নিচে প্রোথিত, অ্যাম্বারের পরত দেয়া কিছু হাড়ের ভেতর। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের গোপনীয়তার সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলো মাটির গভীরে লুকিয়ে রেখেছিল তৎকালীন বিজ্ঞানীদের একটা সংগঠন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং টেলিফোনের আবিষ্কারক-আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল!

সত্য কখনও মাটিচাপা থাকে না। হাড়গুলোর মজ্জায় সুপ্ত ভীতিকর উপাদানটা আবিষ্কার করা হলো আরও একবার। তৈরি হলো এমন এক অস্ত্র, পৃথিবীকে ধুলিস্যাত করা যার কাছে ছেলেখেলা। এই বিপদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সকে আগে নিজে বাঁচতে হবে মাউই দ্বীপের আক্রমণ থেকে। তারপর সমাধান করতে হবে স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতার রেখে যাওয়া শতাব্দী পুরনো ধাঁধা। সিগমা ফোর্স কি সফল হতে পারবে?

প্রতি পদে উন্মোচিত হচ্ছে অদ্ভুত সত্যি, চোখের পলকে শিকারি নিজেই পরিণত হচ্ছে শিকারে, প্রতি মুহূর্তে আরও শক্তিশালী হচ্ছে আদিম বিভীষিকা। ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। সীমিত সুযোগ আরও সীমিত হচ্ছে। কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সকে নিতে হবে মারাত্মক এক সিদ্ধান্ত। আসন্ন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে, নিজেদের কাউকে বিসর্জন দিয়ে হলেও, জোট বাঁধতে হবে নতুনভাবে উত্থিত সেই পুরনো শত্রু গিল্ডের সাথে। কী হবে অবশেষে?

ISBN 978 984 92441 4 1

জেমস রোলিন্স

বর্তমান সময়ের একজন বিশ্ববিখ্যাত জনপ্রিয় লেখক। মূলত অ্যাডভেঞ্চার ও থ্রিলারধর্মী বই লেখার জন্য তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। লেখালেখি শুরু করার আগে তিনি পেশায় পশু চিকিৎসক ছিলেন। প্রায় ১০ বছর চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার পর লেখালেখির জন্য সেখান থেকে অবসর নেন।

অ্যাডভেঞ্চার বই লেখার পাশাপাশি বাস্তব জীবনেও তিনি বেশ অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী। রোলিন্স একজন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্কুবা ডাইভার; বিভিন্ন উপন্যাসে পানির নিচের বর্ণনা তিনি নেহাত কল্পনা থেকে উপস্থাপন করেন না। এব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশ হিসেবে বিভিন্ন গুহায় অভিযান চালিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান করে তিনি তাঁর উপন্যাসের জন্য বাস্তবধর্মী স্থান নির্বাচন করে থাকেন। যার ফলে রোলিন্সের উপন্যাসগুলোতে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়।

তাঁর লেখা *সিগমা ফোর্স* সিরিজ পুরো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৪০টির বেশি ভাষায় তাঁর বই অনূদিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বাস করছেন।

সিগমা ফোর্স সিরিজের ত্রয়োদশ বই

দ্য ডেমন ক্রাউন

Σ

জেমস রলিন্স

রূপান্তর: আদনান আহমেদ রিজন

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোনঃ ০১৬২৬২৮২৮২৭
প্রকাশকালঃ বইমেলা ২০১৮

প্রচ্ছদঃ আদনান আহমেদ রিজন
অনলাইন পরিবেশকঃ www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৪৪০ টাকা

The Demon Crown by James Rollins
Published by Adee Prokashon
Islami Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 440 Tk. U.S. 8 $ only
ISBN 978 984 92441 4 1

ভূমিকাঃ

প্রকাশিত হলো আমার সপ্তম অনূদিত গ্রন্থ। পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা জানা নেই। আশার কথা হচ্ছে, উনি সব বোঝেন।

জেমস রলিন্সের লেখার সাথে নতুন করে পরিচয় করানোর কিছু নেই। সিগমা ফোর্স সিরিজের ত্রয়োদশ বই 'দ্য ডেমন ক্রাউন'। বরাবরের মতোই ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চারের এক রুদ্ধশ্বাস যাত্রা। এই বইতে লেখক আমাদের নিয়ে গিয়েছেন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এমন এক বিভীষিকার সাথে, যা সত্যি হলে হয়তো আজ আর আমরা আমরা হতাম না। বিশ্বে অস্তিত্ব থাকত না মানুষের।

অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য ধন্যবাদের দাবীদার মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধবসহ সব কাছের মানুষগুলো। ধন্যবাদ ফেসবুকের সব বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের। আর সেই সাথে আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ আদী প্রকাশনের প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা বইটি হাতে তুলে নেয়া পাঠকদের প্রতি। দোয়া করবেন। আপনাদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণাই আমাকে প্রতিনিয়ত বলিয়ান করে।

ইতিহাস এবং বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাসম্ভব সাবলীল রাখতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু পেরেছি তা বিচারের দায়িত্ব পাঠকের হাতে। গল্পের ধারাবর্ণনার প্রয়োজনে কিছু যন্ত্রপাতি এবং বিষয়ের নাম ইংরেজিতে রাখতে হয়েছে, আশা করি এই ব্যাপারটা কোনও সমস্যা করবে না। আরেকটা বিষয় আগেই বলে দেয়া উচিত। এই বইটাতে বোলতাদের বিশেষ একটা প্রজাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলাফলস্বরূপ লেখক প্রজাতিটার গোটা জীবনচক্রই তুলে এনেছেন কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে। কাজটা করতে গিয়ে বোলতার দেহের বিভিন্ন অংশের খটমটে নাম ব্যবহার করতে হয়েছে বেচারাকে। নিজে প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় ব্যাপারটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলেও, সাধারণ পাঠকদের তা না-ও লাগতে পারে। অংশটুকু ধৈর্য ধরে পড়ার অনুরোধ রইল।

অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এই কামনা করছি। যে কোনও ধরনের গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে গ্রহণযোগ্য।

আদনান আহমেদ রিজন
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮; ঢাকা

সূত্রলিপিঃ

'আমার বিশ্বাস হয় না, পরম করুণাময় এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অণুজীবদের দিয়ে জীবিত শুঁয়োপোকার দেহ ভক্ষণ করান।'

-চার্লস ডারউইন

২২ মে, ১৮৬০ সালে উদ্ভিদবিদ আসা গ্রে-কে লেখা এক চিঠিতে।

'জীবগুলো আসলেই আমাদের কল্পনার অতীত।'

-জে. কে. রাউলিং

হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অফ ফায়ার।

মানচিত্রঃ

PACIFIC OCEAN
Kure
Midway
Northwestern (Leeward) Islands
Laysan
French Frigate Shoals
Southeastern (Windward) Islands
Kaua'i
O'ahu
Maui
Hawai'i
0 500 Kilometers
0 300 Miles
Kapalua
Lahaina
Kahului
Makawao
Maui
Kihei
Hana
Mount Haleakalā
Wailea-Makena

ইতিহাসের পাতা থেকে:
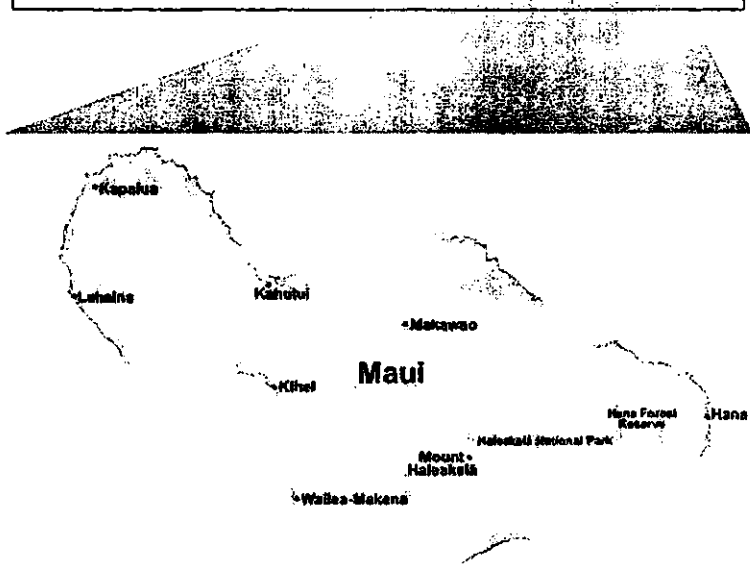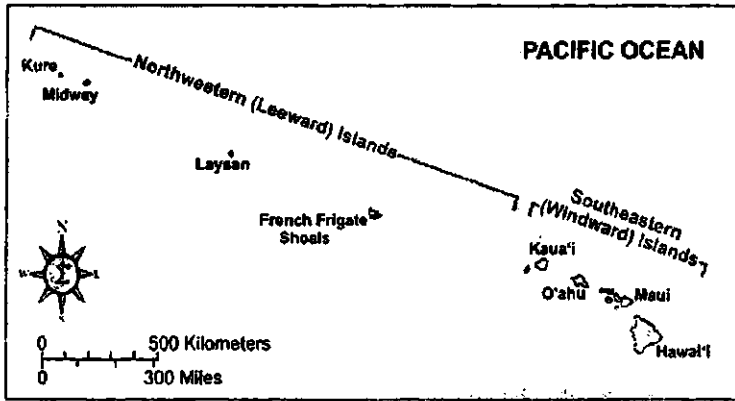
সিগমা ফোর্সের শেকড় গাঁথা আছে ন্যাশনাল মলের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা, ১৮৪৯ সালে নির্মিত, লাল বেলেপাথরে তৈরি বিশালাকায় ভবন স্মিথসনিয়ান ক্যাসলের গভীরে। এই স্থাপনাকে ঘিরেই পরবর্তীতে গড়ে ওঠে স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউশনের একাধিক জাদুঘর, গবেষণাগার প্রভৃতি। তার আগে অবশ্য গৃহযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, স্মিথসনিয়ান সংগ্রহশালার প্রায় সবকিছু এই একটা ভবনেই সংরক্ষিত ছিল।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিল কোথায়?

অদ্ভুত হলেও সত্যি, ইনস্টিটিউশনের উদ্যোক্তা জেমস স্মিথসন জাতিগতভাবে আমেরিকান ছিলেন না। ১৮২৯ সালে মারা যাওয়ার পূর্বে, মানুষের মাঝে জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে, ইউনাইটেড স্টেটসকে তৎকালীন অর্ধ-মিলিয়ন ডলার দান করে যান এই খামখেয়ালী ব্রিটিশ রসায়নবিদ এবং খনিজবিশারদ। বর্তমান হিসেবে যার পরিমাণ প্রায় বারো মিলিয়ন ডলারের সমতুল্য। আরেক অর্থে বলা যায়, পরিমাণটা ফেডারেল বাজেটের ছেষট্টি ভাগের এক ভাগ।

আজও এই মহান ব্যক্তিত্বের এমন ব্যবহারের কারণ রহস্যের চাদরে মোড়া। কারণ জেমস স্মিথসন তার জীবদ্দশায় কোনদিন আমেরিকার মাটিতে পা পর্যন্ত রাখেননি, কাউকে বলেনওনি এমন কোন ইচ্ছার কথা। তাহলে কেন নিজের সঞ্চিত সম্পদ, সেই সাথে বিশাল খনিজ সংগ্রহ নতুন গঠিত এই জাতিকে দান করে গেলেন তিনি?

১৮৬৫ সালে, গৃহযুদ্ধের শেষের দিকে, ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের শিকার হয় স্মিথসনিয়ান ক্যাসল। হাতে লেখা ডায়েরি এবং রিসার্চ পেপারসহ চিরতরে হারিয়ে যায় জেমস স্মিথসনের জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন।

মৃত্যুর পর, স্মিথসনের মৃতদেহ ইংল্যান্ডের পরিবর্তে ইতালির জেনোয়ায় দাফন করে তার ভ্রাতুষ্পুত্র। তবে মৃত্যুর সাথে সাথে ভদ্রলোকের দেহাবশেষ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবসান কিন্তু ঘটেনি। ১৯০৩ সালের শীতে, স্মিথসনিয়ান বোর্ড অফ রিজেন্টসদের ইচ্ছায়, জেনোয়ায় স্মিথসনের কবর পুন:খনন করেন বিশিষ্ট আমেরিকান আবিষ্কারক

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। দেহাবশেষের হাড়গোড় একটা দস্তার কফিনে ভরে, বাষ্পচালিত জাহাজে করে ফিরিয়ে আনেন আমেরিকায়। তারপর সমাহিত করেন ক্যাসলের নিচে। আজ পর্যন্ত হাড়গুলো ওখানেই আছে।

তো কেন বোর্ড সদস্যদের ইচ্ছায় তড়িঘড়ি করে দেহাবশেষ সংরক্ষণের কাজটা সারেন টেলিফোনের প্রখ্যাত এই আবিষ্কারক? শুধু কি কবরটা একটা ইতালিয়ান খনির গ্রাসে চলে যাচ্ছিল বলে? নাকি অদ্ভুত দান, ক্যাসলে অগ্নিকান্ড এবং হাড়গুলো রক্ষায় গ্রাহাম বেলের অস্থিরতা ছাড়াও জেমস স্মিথসনকে নিয়ে আরও কোন রহস্য আছে?

আমেরিকার ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে লুকানো এক আশ্চর্য সত্যি জানতে চাইলে... পড়তে থাকুন।

বৈজ্ঞানিক নথি থেকেঃ

(*প্যালিওভেসপা ফ্লোরিসানটিয়া*, ৩৪ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে বিচরণকারী বোলতার একটা প্রজাতি।)

পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণী কোনটা?

চলুন, হিসাব করে দেখা যাক। হাঙরের আক্রমণে প্রতি বছর গড়ে ছয় জন মানুষ মারা যায়। সিংহের থাবা এক্ষেত্রে আরেকটু এগিয়ে, বাইশ জনের মৃত্যুর কারণ। অদ্ভুত ব্যাপার, সিংহের চেয়ে বেশি মানুষ মারে হাতি। প্রতি বছর প্রায় পাঁচশো। সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা দ্বিগুণ-এক হাজার। লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে আমরা, মানুষরা প্রতি বছর পৃথিবীব্যাপী খুন করি এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে। কী ভাবছেন, মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু?

ভুল... মানুষের চাইতে আকারে অনেক অনেক গুণ ছোট, তবে ভয়ানক আততায়ীর নাম হচ্ছে মশা। ম্যালেরিয়া, ইয়েলো ফিভার, ওয়েস্ট নাইলের পর এখন আবার জাইকা ভাইরাস... প্রতি বছর রক্তচোষা এই ক্ষুদে প্রাণীর মৃত্যুচুম্বনে মারা যায় দশ লক্ষেরও বেশি লোক। পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুদের মৃত্যুর প্রধান কারণও কিন্তু মশার কামড়।

মশার পাশাপাশি আরও অনেকে আছে। আফ্রিকার কুখ্যাত টেটসি মাছি প্রতি বছর দশ হাজার মৃত্যুর কারণ। অ্যাসাসিন বাগ অর্থাৎ খুনি পতঙ্গ নামে পরিচিত, রেডুভিডি গোত্রের এক ধরণের ক্ষুদে পোকার কামড়ে মারা যায় গড়ে বারো হাজার মানুষ। সর্বোপরি হিসাবে বলা যায়, প্রতি বছর ষাট জনের মধ্যে এক জনের মৃত্যুর কারণ হয় কীটপতঙ্গ।

এই হিসাবটা পাত্তা দিতে হবে কেন? কারণ এতে ধরা পড়ে, আমরা আসলে মানুষের যুগে না... বরং পোকামাকড়ের যুগে বসবাস করছি। তাও ৪০০ মিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে। বিশ্বাস হচ্ছে না?

না হওয়ারই কথা। মানুষরা পৃথিবীতে আছে আজ প্রায় তিন লক্ষ্য বছর। কিন্তু কীটপতঙ্গ? এদের বিচরণ সৃষ্টির সেই আদি থেকে। ডাইনোসর আমলেরও যোজন যোজন পূর্বে। মানা হয়ে থাকে, প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাণীদের বিলুপ্তিতে কীটপতঙ্গও দায়ী ছিল। কীভাবে?

আধুনিক দেহাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে: মেসোজয়িক যুগের শেষ দিকে আবহাওয়া পরিবর্তন, রোগবালাই ইত্যাদির কবলে জর্জরিত ডাইনোসরদের খাদ্যের উৎস গ্রাস করে নেয় পঙ্গপালের মিছিল, প্রাগৈতিহাসিক এই জীবদের কফিনে ঠুকে দেয় শেষ পেরেক।

বর্তমানে খাদ্যের উৎসের ব্যাপারে এদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলাম আমরা। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, তবে কি এবার কীটপতঙ্গের পরবর্তী হামলার শিকার মানুষ?

প্রারম্ভ

$\sum$

সকাল ১১:০৭
৩১ ডিসেম্বর, ১৯০৩
জেনোয়া, ইতালি

জেনোয়ার তুষার-ঢাকা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়িটা। সরু রাস্তায় তীক্ষ্ম বাঁক নিতে গিয়ে একদিকের চাকায় ভর করে বেশ খানিকটা কাত হতে হলো। নড়েচড়ে বসলেন ভেতরের দুই যাত্রী। মাথার উপর ঝুলতে থাকা সময়ের খাঁড়া ধীরে ধীরে নিচে নামছে।

গুঙিয়ে উঠলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। জ্বরে ভোগা শরীরের পক্ষে ধকল সামলানো মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। নিতান্ত বাধ্য হয়েই স্ত্রীকে নিয়ে তার এই যাত্রা। দু'সপ্তাহ আগে, ইতালিতে পা রাখার পর থেকে ক্রমে ঘোলাটে হয়ে আসছে পরিস্থিতি। প্রতি পলে ফুরিয়ে আসছে স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটের উদ্যোক্তা জেমস স্মিথসনের দেহাবশেষ উদ্ধার করার উপায়। কবর চুরি ঠেকাতে গুপ্তচর আর রাষ্ট্রদূত, দুই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতে হয়েছে গ্রাহাম বেলকে। পঞ্চাশের ঘরের বয়সী কারও পক্ষে কাজটা বেশ কঠিন। চাপ যেন একেবারে বেড় পাকিয়ে ধরেছে তাকে।

কব্জি আঁকড়ে ধরলেন তার স্ত্রী। 'অ্যালেক, কোচোয়ানকে কি আস্তে চালাতে বলব?'

স্ত্রীর হাতটা নিজের হাতে নিলেন তিনি। 'না, ম্যাবেল, আবহাওয়া দ্রুত পাল্টাচ্ছে। একই সাথে ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে ফ্রেঞ্চরা। কাজটা এখন না হলে আর কখনও হবে না।'

তিন দিন আগে দাপ্তরিক কাজকর্ম সারার সময় খবর আসেঃ স্মিথসনের দূর সম্পর্কের কোন ফ্রেঞ্চ আত্মীয় যেন তার দেহাবশেষের উপর নিজের অধিকার দাবী করেছে। অথচ লোকটা নাকি আদতে গোটা ব্যাপারটার বিষয়বস্তু কিছু জানেই না। তাই ফ্রেঞ্চদের তরফ থেকে বাধা আসার আগেই, গ্রাহাম বেল ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়েছেন: যখন স্মিথসন তার সব সহায়-সম্পত্তি ইউনাইটেড স্টেটসের নাম করে গেছেন, তখন থেকেই তার দেহ বা দেহাবশেষের উপর হক জন্মেছে আমেরিকার। সঠিক সময় সঠিক হাতে পৌঁছে দেয়া মুঠো মুঠো টাকাপয়সা যুক্তিটাকে আরও পাকাপোক্ত বানিয়েছে। সেই সাথে ছড়ানো হয়েছে মিথ্যা গুজব-এই অভিযান সমর্থন করেছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট।

তাই সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তখন সময়ের সদ্ব্যবহার করাই উত্তম। নিজের বুক পকেটে হাত বুললেন গ্রাহাম বেল। ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো রাখা ওতে।

নড়াচড়াটা লক্ষ্য করলেন তার স্ত্রী। 'তুমি কি নিশ্চিত, জিনিসটা কবরে এখনও তার সাথেই সমাহিত আছে?'

'নিশ্চিত হতে হবে, ম্যাবেল। অর্ধ-শতাব্দী আগে, কেউ একজন এই লুকানো সত্যিটা ধ্বংস করার খুব কাছে চলে এসেছিল। ইতালিয়ানদের কাজটা সমাপ্ত করতে দেয়া যাবে না।'

আঠারোশো উনত্রিশ সালে, জেমস স্মিথসনের মৃতদেহ তার ভাতিজা জেনোয়ার একটা ছোট কবরস্থানে সমাহিত করে। তখন অবশ্য জায়গাটা ব্রিটিশদের মালিকানায় ছিল, কিন্তু জমির নিচের মাটির দখলদার আবার ইতালি। বিগত বছরগুলোতে পার্শ্ববর্তী একটা খনি আশেপাশের পাহাড়ের সমস্ত মাটি খুঁড়ে এদিকেই এগিয়েছে। এখন কোম্পানি চায় গোরস্থানটাও নিজেদের কব্জায় নিতে।

স্মিথসনিয়াল ক্যাসলের প্রতিষ্ঠাতার হাড়গোড়ের এমন দুর্গতি লক্ষ্য করে, মিউজিয়ামের রিজেন্ট বোর্ডের হর্তাকর্তারা একমত হয়-খনির হাতুড়ি বাটালির আঘাতে গুঁড়ো হয়ে সাগরে পড়ার আগেই এই দেহাবশেষ উদ্ধার করতে হবে। সেই প্রেক্ষিতে একটা পুরনো চিঠি আসে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের কাছে। চিঠিটার লেখক স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউশনের প্রথম সেক্রেটারি জোসেফ হেনরি। ক্যাসলের নির্মাণকাজ তদারকির পর এই ভদ্রলোক মারাও যান ক্যাসলের চির দেয়ালের ভেতর।

'হেনরি বোকা ছিল না,' আপন মনে বিড়বিড় করলেন গ্রাহাম বেল।

'আমি জানি তুমি তাকে কতটা কদর করতে,' সায় দিলেন তার স্ত্রী-ম্যাবেল। 'আর কতখানি মূল্য দিতে তোমাদের এই বন্ধুত্বের।'

মাথা ঝাঁকালেন গ্রাহাম বেল।

ইতালির এই পুরনো কবরস্থানে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো গুরুত্ব।

মৃত্যুর আগে জোসেফ হেনরি চিঠিতে গৃহযুদ্ধের আগের এক গল্প লিখে গিয়েছিলেন। সময়ের স্রোত তখন ছিল দক্ষিণের প্রতিকূলে। স্মিথসনের পুরনো ডায়রিতে পাওয়া একটা নোটের কথা বলেন হেনরি। তিনি ভেবে অবাক হতেন, কেন একজন বিজাতীয় লোক কখনও পা রাখেননি-এমন একটা দেশের প্রতি এত মোহগ্রস্থ হবেন! কেনই বা সেই দেশটাকে দান করে যাবেন নিজের জীবনের সমস্ত অর্জন, সহায়-সম্পত্তি, খনিজ সংগ্রহ... সব! যাই হোক, একটা জিনিসের ব্যাপারে অবশ্য নিজের ভাতিজাকে আদেশ করে যান স্মিথসন। বলেন, এটাকে তার মৃতদেহের সাথে কবর দিতে।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটাই হেনরির মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলাফল হিসেবে ঘেঁটে দেখতে শুরু করেন ভদ্রলোকের সব জার্নাল আর ডায়রি। অবশেষে খোঁজ মেলে সেই মহার্ঘ্য বস্তুর, স্মিথসন যাকে সম্বোধন করেছেন 'দ্য ডেমন ক্রাউন' বলে।

বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি এক লবণ খনি থেকে জিনিসটা উদ্ধার করার জন্য খুব আফসোস করে গেছেন স্মিথসন। বলেছেন, এটার সাথে নাকি ভয়ঙ্কর কিছু একটা ব্যাপার জড়িত।

"...দলবল নিয়ে পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নরক..." আলেকজান্ডার বিড়বিড় করে বললেন। বাক্যটা স্মিথসনের ডায়রি থেকে উদ্ধৃত।

অথবা হেনরির ধারণা আর কি...

স্মিথসনের এই সত্যি আবিষ্কারের পর, হেনরি কয়েকজন বোর্ড সদস্যের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের অনুমান ছিল, আর্টিফ্যাক্টটা হয়তো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তার তিন দিন পরই ক্যাসলে আগুন আগে। ধ্বংস হয়ে যায় স্মিথসনের খনিজ সংগ্রহশালা-সহ সব কাগজপত্র।

হেনরি আন্দাজ করেন, স্মিথসনিয়ানের কেউ ঐক্যজোটের কাছে চালবাজি করেছে। ভাগ্যবশত সেই জার্নালটা নিজের অফিসে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন তিনি। আগুনের শিখা থেকে বাঁচলেও জিনিসটার প্রচ্ছদ আর কিছু অধ্যায় কিন্তু শেষরক্ষা পায়নি। তবুও ব্যাপারটা বিশ্বস্ত কয়েকজন সঙ্গী ছাড়া কারও কাছে প্রকাশ করেননি হেনরি। এই বিশ্বস্ত কয়েকজনকে নিয়ে মিউজিয়ামের ভেতর তৈরি হয় একটা গোপন সঙ্ঘ। সময়ের সাথে সাথে স্মিথসনিয়ানের কালো এবং লুকানো অধ্যায়গুলো নিজেদের আয়ত্তে করে নিয়েছেন তারা... এমন সব তথ্য, যার ব্যাপারে স্বয়ং প্রেসিডেন্টও জানেন না।

উদাহরণ হিসেবে এক বিশ্বাসঘাতকের কব্জিতে আঁকা উল্কির কথা উল্লেখ করা যায়-যাকে হেনরি পরবর্তীতে অগ্নিকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত বলে ধরতে পারেন। লোকটা অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদের আগেই ছুরি দিয়ে নিজের গলা চিরে আত্মহত্যা করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে চিঠিতে উল্কিটার একটা স্কেচ আঁকেন হেনরি।

আকারটা দেখতে অনেকটা মেসনিক চিহ্নের মতো, তবে এর আসল উৎস আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। অনেক বছর পর এখন স্মিথসনের কবর হুমকির মুখে পড়ার সময়, সেই সঙ্ঘের লোকেরা আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে সেই চিঠিটা দেখায়। কাজটা করার জন্য তাকেই চূড়ান্ত করা হয়েছে, কারণ ইতালির মাটিতে এমন একটা অভিযান পরিচালনা করার মতো মনোবল এবং নামডাক একমাত্র টেলিফোনের এই আবিষ্কারকেরই আছে।

গ্রাহাম বেল অবশ্য নিশ্চিত ছিলেন না, স্মিথসনের কবরে আদৌ কোন কিছু কপালে জুটবে কি না। তারপরেও প্রয়াত বন্ধুর চিঠি দেখার পর কাজটা করার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেন। এমনকি সকল খরচও নিজে বহন করার ঘোষণা দেন।

অন্তরীপের চূড়ার দিকে এগোচ্ছে গাড়ি। জানালা দিয়ে জেনোয়ার বন্দর চোখে পড়ল। জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। সাদা দেয়ালে ঘেরা গোরস্থানটা আর অল্প একটু দূরে।

'দেরি করে ফেললাম না তো?' প্রশ্ন করলেন ম্যাবেল।

স্ত্রীর উদ্বেগের কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাহাম বেল। গোরস্থানের একটা অংশ ইতিমধ্যে গায়েব হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে ভালো করে উঁকি দিতে, ধ্বসে পড়া মাটিতে ভাঙা কফিনের টুকরো চোখে পড়ল।

কেঁপে উঠলেন গ্রাহাম বেল, তবে এই কাঁপুনির কারণ ঠাণ্ডা আবহাওয়া নয়। 'তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

সামনে পুরু কোট পরা কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে। স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন গ্রাহাম বেল। ছোট্ট দলটায় কয়েকজন সরকারী লোক থাকার কথা। একটা কবর ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। তড়িঘড়ি করে আগে বাড়লেন তারা।

উপস্থিত আমেরিকান দূতকে চিনতে পারলেন আলেকজান্ডার, উইলিয়াম বিশপ। তাকে দেখে কাছে ঘেঁষে এল লোকটা। হাতঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করল তারপর। 'শুনেছিলাম প্যারিস থেকে ফ্রেঞ্চ উকিল নাকি ট্রেনে চেপেছে। ব্যাটা আসার আগেই কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে হবে।'

সায় দিলেন গ্রাহাম বেল। 'যত তাড়াতাড়ি হাড়গুলো নিয়ে দেশে ফেরা যায়, তত ভালো।'

তুষার-পাত শুরু হয়েছে। আবহাওয়া উপেক্ষা করে কবরটার দিকে এগোলেন তিনি। ধূসরের ফলকে অল্প কয়েকটা শব্দ লেখা:

জেমস স্মিথসনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে,
লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য,
মৃত্যুবরণ করেন জেনোয়াতে,

২৬ জুন, ১৮২৯ সালে,
পঁচাত্তর বছর বয়সে।

বিশপের আদেশে কাজে নামল দুই ইতালিয়ান। ক্রোবার ব্যবহার করে ভেঙে ফেলল কবরের মার্বেল পাথরের ঢাকনা। বাকিরা ততক্ষণে দস্তার একটা বাক্স নিয়ে তৈরি। স্মিথসনের দেহাবশেষ ঢুকিয়ে বাক্সটা ঝালাই করে আটকে দেয়া হবে। আমেরিকায় লম্বা সফরের জন্য প্রস্তুতি আর কি।

লোকগুলো কাজ করতে করতে, আলেকজান্ডার ফলকে লেখা লেখাগুলো পড়ে ভ্রূকুটি করলেন। 'অদ্ভুত!'

'কী হলো?' জানতে চাইলেন ম্যাবেল।

'এখানে লেখা-মৃত্যুর সময় স্মিথসনের বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর।'

'তো?'

মাথা নাড়লেন আলেকজান্ডার। 'স্মিথসনের জন্ম সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালের পাঁচই জুন। আমার হিসাবে বয়সটা হবে চৌষট্টি। কিন্তু এখানে এগারো বছর বেশি দেখাচ্ছে।'

'ব্যাপারটা কি কোন গুরুত্ব বহন করে?'

শ্রাগ করলেন আলেকজান্ডার। 'বুঝতে পারছি না, তবে সম্ভবত স্মিথসনের ভাতিজা তার চাচার আসল বয়স জানে। এখানকার স্মৃতিফলক তো তারই স্থাপন করা।'

কবরের ঢাকনা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিশপের ডাকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি। ভেতরের কাঠের বাক্সটা অনেক আগেই পচে গেছে। রেখে গেছে একসারি হাড়ের উপর শুধু কিছু টুকরো টাকরা। সাবধানে মাথার খুলিটা হাতে তুলে নিলেন আলেকজান্ডার।

স্মিথসনিয়ানের প্রতিষ্ঠাতার শূন্য কোটর দুটো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

পাশাপাশি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সম্মানিত সদস্যও ছিলেন ভদ্রলোক। বিশ্বের অন্যতম প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্ঘ ওটা। কলেজ থেকে পাশ করে বেরোনোর বছরই তাকে ওই সোসাইটিতে যুক্ত করা হয়। ওই বয়সেই প্রতিভার মাত্রায় অনেক সমসাময়িককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে রসায়নবিদ এবং খনিজবিশারদ হিসেবে জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটে ইউরোপে খনিজ সংগ্রহের বিভিন্ন অভিযানে।

এখনও মহান এই ব্যক্তিত্বের অনেক কিছুই ধোঁয়াশায় ঘেরা।

এরকমই একটা: কেন সমস্ত প্রতিপত্তি এবং সংগ্রহ তিনি আমেরিকার নাম করে গেলেন?

যাই হোক, একটা কথা অনস্বীকার্য।

'আমরা আপনার কাছে প্রচণ্ড মাত্রায় ঋণী,' বিড়বিড় করে বললেন আলেকজান্ডার। 'আপনার বদান্যতাই আমাদের নবীন দেশটাকে অলীক আকাঙ্ক্ষা দূরে সরিয়ে, সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।'

'ভালো বলেছেন,' বিশপ সায় দিল। কথা বলার ফাঁকে দুই হাত মুখের সামনে এনে ঘষছে। আবহাওয়া খারাপ, তাই চাইছে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

কথা না বাড়িয়ে খুলিটা দস্তার কফিনে ভরার জন্য ফিরিয়ে দিলেন আলেকজান্ডার। পরমুহূর্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন কবরের দিকে। এক কোনার একটা জিনিস তার নজর কেড়েছে।

ধুলো আর পঁচা কাঠের টুকরো সরাতেই ছোট একটা ধাতব সিন্দুক নজরে পড়ল।

এই জিনিসটাই কি এত হাঙ্গামার কারণ?

বাক্সটা কবর থেকে বের করতে শরীরের সব শক্তি খরচ করতে হলো তাকে। জিনিসটা বেশ ভারী। সোজা হয়ে বাক্সটা পাশের কবরের রেলিং-এ রাখলেন আলেকজান্ডার। কর্মীদের কাজ শেষ করার আদেশ দিয়ে এদিকে এগোলো বিশপ।

ম্যাবেলও সরে এসেছেন। 'এটাই কি ওই জিনিস?'

জবাব না দিয়ে বিশপের দিকে ফিরলেন আলেকজান্ডার। 'আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি-অফিশিয়াল বা আনঅফিশিয়াল, কোনভাবেই এই বাক্সটার ব্যাপারে কোথাও কিছু উল্লেখ করা যাবে না। ঠিক আছে?'

সায় দিয়ে কাজ করতে থাকা কর্মীদের দিকে তাকাল লোকটা। 'মুখ বন্ধ রাখার জন্য ওদের পকেট যথেষ্ট পরিমাণে ভরা হয়েছে।'

সন্তুষ্ট হয়ে সিন্দুকের ডালা খুললেন আলেকজান্ডার। ভেতরে বালুর স্তরের উপর কুমড়া আকৃতির একটা জিনিস রাখা, রঙের দিক দিয়েও একই মানের। এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

'এটা কী?' ম্যাবেল জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা... এটা তো অ্যাম্বারের দলা বলে মনে হচ্ছে।'

'অ্যাম্বার?' বিশপের কণ্ঠে বিতৃষ্ণা। 'দামী নাকি?'

'কোন এক ভাবে তো অবশ্যই। যদিও জিনিসটা জমাট বাঁধা গাছের রেজিন ছাড়া কিছু না।' বলে সামনের দিকে ঝুঁকলেন আলেকজান্ডার। 'বিশপ, কর্মীদের একজনকে ওর লণ্ঠনটা আনতে বলবেন কি?'

'কেন?'

'যা বলছি তাই করুন। আমাদের হাতে গোটা দিন নেই।'

তড়িঘড়ি করে আগে বাড়ল বিশপ।

ম্যাবেল স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন। 'তোমার কী মনে হচ্ছে, অ্যালেক?'

'সম্ভবত অ্যাম্বারের ভেতরে আবছা কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি!'

লণ্ঠন হাতে ফিরে এসেছে বিশপ। আলেকজান্ডার আগুনটা আরও দিলেন। তারপর অ্যাম্বারের টুকরোটা আরও কাছে আনতেই পরিষ্কার দেখা গেল ভেতরে লুকানো জিনিসগুলো।

হাঁ হয়ে গেলেন ম্যাবেল। 'ওগুলো কি হাড় নাকি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

দেখা যাচ্ছে, স্মিথসনের কবরে তার নিজের হাড়গোড় ছাড়াও আরও কিছু ছিল।

'কিন্তু জিনিসগুলো কীসের?' জানতে চাইল বিশপ।

'কোন ধারণা নেই। তবে প্রাগৈতিহাসিক, এটা নিশ্চিত।'

অ্যাম্বারের দলাটা আলোর আরও কাছে আনলেন আলেকজান্ডার। শুকিয়ে যাওয়া গাছের রেজিনের একেবারে মধ্যিখানে, প্রায় হাতের মুঠো আকারের তেকোনা একটা খুলি। ধারালো দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। সরিসৃপ বা ছোট কোন ডাইনোসোর হতে পারে। গোড়ায় আবার ছোট ছোট হাড়ের টুকরোয় তৈরি একটা বলয়। মনে মনে কল্পনা করলেন-বহুকাল আগে কোন এক সময়ে, প্রাণীটার দেহবিশেষের উপর ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়ছে প্রাচীন কোন গাছের রস। তারপর জমাট বেঁধে সবকিছুকে একটা কাঠামোতে আটকে দিয়েছে চিরকালের মতো।

ছোট হাড়ের টুকরোগুলো খুলির চারপাশে এমনভাবে প্যাঁক খেয়ে আছে যেন...

...যেন একটা মুকুট।

আলেকজান্ডার তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। আকৃতিটা ম্যাবেলও চিনতে পেরেছেন। এটার কথাই লিখে গিয়েছিলেন স্মিথসন-দ্য ডেমন ক্রাউন।

'অসম্ভব!' ম্যাবেল বিড়বিড় করে বললেন।

জবাবে আলতো করে মাথা ঝাঁকালেন আলেকজান্ডার। তার পকেটে স্মিথসনের আধপোড়া ডায়রির একটা পৃষ্ঠা আছে। ওটাতে এই জিনিসটার ব্যাপারে বিশেষ কিছু কথা লেখা।

আসলেই অসম্ভব, তিনি নিজেও সম্মত হলেন। আবারও মনের চোখে পড়লেন স্মিথসনের লেখা বাক্যটা:

সাবধান! ডেমন ক্রাউনের ভেতর সংরক্ষিত জিনিসটা কিন্তু জীবিত...

ভয়ের শীতল স্রোত নেমে গেল আলেকজান্ডারের শিরদাঁড়া বেয়ে।

...আর যে কোন সময় পৃথিবীতে নরক নামিয়ে আনার জন্য সদা প্রস্তুত!

রাত ৮:৩৪
৩ নভেম্বর, ১৯৪৪
ওয়াশিংটন ডি.সি.

'ইঁদুর থেকে সাবধান কিন্তু,' টানেলের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে সতর্ক করলেন জেমস রিয়ারডন। 'বাবাজিরা অন্ধকারে ওঁত পেতে থাকে একেবারে। গত মাসে একটা কামড়ে এক শ্রমিকের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছে।'

দরজার পাশের হ্যাঙ্গারে জ্যাকেট ঝুলিয়ে রাখার ফাঁকে কাঁধ ঝাঁকালেন আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ। মাটির নিচে অভিযান চালানোর মতো উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ আনা হয়নি। কিন্তু যেতে হবে। উপায় নেই। লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের মিটিং বলে কথা।

স্মিথসনিয়ান ক্যাসলের সাথে নতুন ন্যাচারাল হিস্টোরি বিল্ডিংকে যুক্ত করা টানেলের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। পাঁচ ধাপের একটা সিঁড়ি। নতুন ভবনটার কাজ শেষ হয় উনিশশো দশ সালে। তারপর ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে দশ হাজার জিনিসপত্র ক্যাসল থেকে এখানে এনে রাখা হয়। কাজকর্ম শেষ হওয়ার পর থেকে এই টানেলটা ব্যবহৃত হত শুধু মেইনটেনেন্স ক্রুদের চলাচলের পথ হিসেবে।

তারপর আর্চিবাল্ড পথটাকে ভিন্ন কাজে ব্যবহারের কথা ভাবলেন। কংগ্রেসের সাম্প্রতিক লাইব্রেরিয়ান এবং কালচারাল রিসোর্স কনভার্সেশন কমিটির হেড হিসেবে তার উপর দায়িত্ব পড়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাতির সম্পদগুলো সুরক্ষিত রাখার। বোমা হামলার ভয় বুকে নিয়ে অমূল্য নিদর্শনগুলো যেমন- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, সংবিধান, এমনকি গুটেনবার্গ বাইবেলের একটা কপি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফোর্ট নক্সে পাঠান আর্চিবাল্ড।

ন্যাশনাল গ্যালারি অফ আর্ট তাদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শিল্পকর্মগুলো স্থানান্তরিত করে নর্থ ক্যারোলিনার বিল্টমোর হাউজে। আর সেই প্রখ্যাত তারকা-ছাপা ব্যানারটা পুঁতে রাখা হয় শেনানডোয়া ন্যাশনাল পার্কে।

তবে আর্চিবাল্ডের এসব লুকোছাপা, আনা-নেয়া ইত্যাদি পছন্দ ছিল না। উনিশশো চল্লিশে তিনি ন্যাশনাল মলের নিচে একটা বোমাপ্রতিরোধী স্থাপনা নির্মাণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বাড়তি খরচের কথা ভেবে কংগ্রেস তার এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়।

কিন্তু আর্চিবাল্ড এই পরিকল্পনা মনে পুষে রাখেন। স্মিথসনিয়ান ক্যাসলের গভীরে সাময়িকভাবে মিউজিয়াম কর্মীদের জন্য বোমাপ্রতিরোধী একটা চেম্বার তৈরি করা ছিল। তিন সপ্তাহ আগে, একজোড়া প্রকৌশলীকে কাজে লাগান তিনি। উদ্দেশ্য-এই টানেলের সাথে গোপনে ওরকম একটা স্থাপনা নির্মাণ করা। তারপর দুই দিন আগে,

মাপজোখের সময় টানেলে পুরনো একটা দরজা আবিষ্কার করে লোক দুটো। মলের প্রায় মাঝামাঝি অংশে পাইপ আর ইটের দঙ্গলের ভেতর লুকানো ছিল জিনিসটা।

সাথে সাথে স্মিথসনিয়ানের বর্তমান আন্ডারসেক্রেটারি-জেমস রিয়ারডনকে ব্যাপারটা জানান আর্চিবাল্ড। দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসেবে জেমস, আর্চিবাল্ডের বোমাপ্রতিরোধী ভল্ট তৈরির পরিকল্পনা সমর্থন করতেন। দুই বন্ধুর ধারণা হয়-লুকানো এই দরজা গোটা ব্যাপারটাকে বেশ পাকাপোক্ত করবে। ইটের তাল সরানোর পর দরজায় সাঁটা নাম দেখে আগুনে যেন আরও ঘি পড়ল।

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।

সাথে অবশ্য একটা সতর্কবার্তাও আছেঃ

এই দরজার পেছনে যা-ই লুকানো থাকুক, জিনিসটা গোটা পৃথিবীর জন্য বিস্ময়ের পাশাপাশি প্রচণ্ড বিপজ্জনক। এর যেমন মানবজাতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর ক্ষমতা আছে, তেমনি ভুল হাতে পড়লে ঘটতে পারে সম্পূর্ণ উল্টো। জিনিসটা লোকচক্ষুর সামনে আনতে পারিনি আমরা, পারিনি ধ্বংস করতেও, কারণ এর বুকে লুকানো আছে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সম্ভাব্য চাবিকাঠি।

লেখাগুলোর নিচে স্মিথসনিয়ান বোর্ডের পাঁচজন সদস্যের নাম সাক্ষর করা আছে। সবগুলো নাম নিজে যাচাই করে দেখেছেন আর্চিবাল্ড। প্রত্যেকেই মৃত, এবং বেল ও এই পাঁচজনের ন্যাশনাল মলের নিচে কিছু লুকিয়ে রাখার কোন রেকর্ড নেই।

ব্যাপারটার গোপনীয়তার মাত্রা অনুধাবন করে, শুধুমাত্র একজনকে নিজের সাথে নিয়েছেন আর্চবাল্ড। তার পুরনো বন্ধু জেমস। প্রকৌশলী দু'জন নিচে অপেক্ষা করছে। ইশারা পেলেই তালা ভেঙে বের করে আনবে চার দশক আগে লুকিয়ে রাখা সেই মহার্ঘ্য।

'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের,' পকেটঘড়িতে চোখ বুলিয়ে জেমস বললেন।

সায় দিলেন আর্চিবাল্ড। 'পথ দেখান।'

ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নামা শুরু করলেন জেমস। পেছন পেছন শ্লথ গতির আর্চিবাল্ড। কি আর করা, বন্ধুর চেয়ে তার বয়স যে পনেরো বছর বেশি। সেই সাথে জেমস ভূ-তত্ত্ববিদ হিসেবে মাঠপর্যায়ের কাজে সময়ও কাটিয়েছেন প্রচুর। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক ডেস্ক-জবে বাধ্য করা কবি আর্চিবাল্ডের বয়স পঞ্চান্ন।

কিছুদূর পর পর মাথার উপর ঝুলতে থাকা খাঁচায় আবদ্ধ বাল্বের মৃদু আলো যেন ঘোর কালো টানেলের আঁধার আরও জমিয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে কিছু আবার হয়

ভাঙা, নয়তো জায়গা থেকে উধাও। জেমসের হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট বেরিয়ে এল। পিছু পিছু আসছেন আর্চিবাল্ড।

কয়েক মিনিট নীরবে পথ চলার পর জেমস হঠাৎ থামলেন।

বন্ধুর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে নিজেকে সামলালেন আর্চিবাল্ড। 'ক...কী হয়ে...?

সামনের প্যাসেজ থেকে আসা আওয়াজ কথার বাকি অংশটুকু উড়িয়ে নিল।

পেছন ফিরে তাকালেন জেমস। 'গুলির শব্দ!'

সাথে সাথে আলো নিভিয়ে, জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে এনেছেন একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। আর্চিবাল্ড জানতেন, জেমস সশস্ত্র। কিন্তু পিস্তলটা টানেলে বসবাসকারী ইঁদুরের চেয়েও ছোট।

'পিছিয়ে যান,' বলে লাইটটা আর্চিবাল্ডের হাতে তুলে দিলেন জেমস। তারপর দুই হাতে আঁকড়ে ধরলেন অস্ত্রের হাতল। 'সাহায্য নিয়ে আসুন।'

'কোত্থেকে? ক্যাসল এতক্ষণে খালি হয়ে গেছে। অ্যালার্ম বাজাতে বাজাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' বলে লম্বা হাতলের ফ্ল্যাশলাইটটা মুগুরের মতো ধরলেন আর্চিবাল্ড। 'একসাথেই যাই বরং।'

আবারও বিস্ফোরণের আওয়াজ।

দেয়াল ঘেঁষে আগে বাড়লেন জেমস, চাইছেন যতটা সম্ভব ছায়ায় থাকতে। অনুসরণ করলেন আর্চিবাল্ড। চার-পাঁচ কদম এগোনোর সাথে সাথে ধুলোর মেঘ দু'জনকে ঘিরে ধরল। কয়েক সেকেন্ড আগে শোনা বিস্ফোরণের ফলাফল। একটু পর আবার পরিষ্কার হয়ে গেল বাতাস।

কিন্তু টানেলের ক্ষেত্রে একই কথা খাটে না। মেঝে আর পাইপ বেয়ে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো কালচে অবয়ব... *শত শত ইঁদুর!*

আঁতকে উঠে দেয়ালে গা মিশিয়ে দিলেন আর্চিবাল্ড। সাথে সাথে সিলিং থেকে কাঁধে পড়ল একটা ইঁদুর। পরমুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। এদিকে আগুয়ান স্রোতটাও চলে এসেছে। কয়েকটা আবার উঠে এল শরীরে, যেন নদীর বহমান জলরাশির মধ্যে তার শরীরটাই একমাত্র বটবৃক্ষ। বাকিগুলো কিচকিচ করতে করতে পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল।

ধেড়ে ইঁদুরের দলটাকে পায়ের নিচে পিষতে পিষতে আগে বাড়ছেন জেমস। আর্চিবাল্ডও তাই করলেন। নিস্তেজ হয়ে আসা বাল্বের আলোয় সামনে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা মানুষ দেখা গেল।

প্রকৌশলীদের একজন।

বাম দিক থেকে উদয় হলো আরও তিনজন। প্রত্যেকের মুখে মাস্ক লাগানো। হাঁটু গেড়ে বসে ট্রিগাল টিপলেন জেমস। বদ্ধ জায়গায় আওয়াজটা যেন আর্চিবাল্ডের কান ফাটিয়ে দিয়েছে। মুখ থুবড়ে দেয়ালে বাড়ি খেল এক অনুপ্রবেশকারী।

সামনে এগোতে এগোতে আবারও গুলি করলেন জেমস। ধাওয়া শুরু হলো। স্তিমিত আলোয় আর্চিবাল্ড দেখলেন, এক মুখোশধারী আঘাতপ্রাপ্ত সঙ্গীকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। কিন্তু জেমসের এলোপাতাড়ি গুলির মুখে সুবিধা করতে পারল না। বিকট আওয়াজে দেয়াল আর পাইপে মাথা কুটছে একের পর এক বুলেট।

তৃতীয় মুখোশধারীর এক হাতে একটা ভারী ব্যাগ, অন্য হাতে অন্ধের মতো পেছনে পিস্তল তাক করে গুলি ছুঁড়ছে। তবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেয়ে লোকটার মনোযোগ পালানোর দিকেই বেশি। জেমসের গুলির মুখে অবশেষে সঙ্গীকে ফেলেই পিছু হটল অন্যজন।

দূরত্ব বেশ অনেকটা কমিয়ে এনেছেন জেমস আর আর্চিবাল্ড। কিন্তু আচমকা আরও একটা বিস্ফোরণের আওয়াজে পিছিয়ে পড়তে হলো। বামদিকের একটা খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে লকলকে আগুন।

হাত উঁচু করে মুখ ঢাকলেন আর্চিবাল্ড। আগুনের আঁচ কমে আসতেই জেমস আগে বাড়লেন। আগে দেখা প্রকৌশলীকে মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছিল। তার সঙ্গীকে পাওয়া গেল এবার। বিস্ফোরণে গায়ের কাপড়ে আগুন লেগে গেছে... সম্ভবত আগে থেকেই মৃত।

ছোট্ট কংক্রিটের চেম্বারটায় থাকা বুকশেলফ ভর্তি মোটা মোটা বইগুলোতে এখনও আগুন জ্বলছে। হাওয়ায় উড়ছে আধপোড়া কাগজ। ধোঁয়ায় অন্ধকার চারদিক।

পড়ে থাকা মুখোশধারীর দেহ তল্লাশি শুরু করলেন জেমস। আর্চিবাল্ডের নজর অবশ্য পাশের ঘরে। ঘরটার একেবারে মাঝখানে কোমর-সমান উঁচু মার্বেল পাথরের বেদী। পাশে মেঝেতে গড়াচ্ছে একটা খোলা সিন্দুক। সম্ভবত বিস্ফোরণের সময় উল্টে পড়েছে বেদী থেকে। সিন্দুকটার আশেপাশে মুঠো মুঠো বালি ছড়ানো, তবে ভেতরটা সম্পূর্ণ খালি।

পলায়নরত মুখোশধারীর হাতে থাকা ব্যাগটার কথা ভাবলেন আর্চিবাল্ড। বেল ও তার সঙ্গীদের লুকিয়ে রাখা জিনিসটা চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু বালির ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে আরেকটা কি যেন!

এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। পুরনো একটা জার্নাল মনে হচ্ছে। চামড়ার প্রচ্ছদ ঝলসে গেছে বহু বছর আগের কোন এক অগ্নিকাণ্ডে। পাতা ওল্টাতে দেখা গেল-ভেতরের অধিকাংশ পৃষ্ঠা গায়েব, তবে কিছু এখনও বাকি।

আর্চিবাল্ড বুঝতে পারলেন, চোরদের মাথায় খেলেনি-বালির ভেতর আরও কিছু লুকানো থাকতে পারে। জার্নালটা নিয়ে টানেলে ফিরে এলেন তিনি। 'এটা দেখুন।'

জেমস এখনও মেঝেতে বসে আছেন। খুলে ফেলেছেন নিহত চোরের মুখোশ। চেহারাটা দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন আর্চিবাল্ড। 'হে ঈশ্বর... এ তো দেখছি এক মহিলা!'

কিন্তু চমক এখনও শেষ হয়নি। মহিলার চুলগুলো কালো। প্রশস্ত চোয়াল এবং কুঁচকানো চোখ দেখে বৈশিষ্টের ব্যাপারে সন্দেহ নেই কারও।

'জাপানি...' বিড়বিড় করে বললেন আর্চিবাল্ড।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন জেমস। 'জাপানি গুপ্তচর সম্ভবত। তবে আপনাকে অন্য আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই।' বলে লাশের এক হাত তুলে, কব্জির ভেতরের দিকে আঁকা উল্কির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ছবিটা দেখে ভ্রূকুটি করলেন আর্চিবাল্ড।

'কোন ধারণা আছে, এটা কী?' জেমস প্রশ্ন করলেন।

জ্বলতে থাকা ঘরটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন আর্চিবাল্ড। বিস্ফোরণে দরজাটা কব্জা থেকে খুলে এসেছে। পাল্লায় সাঁটা ধাতব পাতে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুনের শিখা। যেন পাতে খোদাই করা লেখাগুলোর মতোই সতর্ক করছে এখানে লুকিয়ে রাখা জিনিসটার ব্যাপারে।

এই দরজার পেছনে যা-ই লুকানো থাকুক, জিনিসটা গোটা পৃথিবীর জন্য বিস্ময়ের পাশাপাশি প্রচণ্ড বিপজ্জনক।

'না,' আর্চিবাল্ড জবাব দিলেন। 'তবে দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য... সম্ভবত গোটা পৃথিবীর জন্যই... আমাদের উত্তরটা খুঁজে বের করতে হবে।'

প্রথম পর্ব

উপনিবেশ স্থাপন

$\sum$

অধ্যায় এক

বর্তমান সময়
৮ মার্চ, বিকেল ৩:৪৫
এলহা দা কুইমাডা গ্রান্ডে, ব্রাজিল

মুখ থুবড়ে পড়ে আছে লাশটা। অর্ধেক শরীর বালুতে... ঘাসে বাকি অর্ধেক।

'শুয়োরের বাচ্চা তো নৌকায় প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিল,' প্রফেসর কিন মাতসুই বললেন। তারপর দলের তরুণী ডাক্তার-আনা লুইয শাভোসকে জায়গা ছেড়ে দিলেন এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করার জন্য। ব্রাজিলের উপকূল থেকে বিশ মাইল দূরবর্তী এই দ্বীপে আসতে হলে সাথে ডাক্তার এবং ব্রাজিলিয়ান নেভির একজন কর্মকর্তা অবশ্যই সাথে থাকা চাই।

ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট র‍্যামন ডিয়াজ ইতিমধ্যে কয়েক গজ দূরে লুকিয়ে রাখা নৌকাটা চিহ্নিত করতে পেরেছে। নাক দিয়ে ঘোঁত-জাতীয় আওয়াজ করল সে। 'কাক্যাদোর ফুরতিভো...ইডিয়োটা।'

'উনি বলছেন, লোকটা পোচার ছিল,' পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্রের কাছে বাক্যটা ব্যাখ্যা করলেন কিন। করনেল ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রাজিলের প্রত্যন্ত এই দ্বীপে একসাথেই এসেছেন তারা দু'জন।

অস্কার হফ-এর বয়স সাতাশ। কামানো মাথা, বাম হাত ভর্তি উল্কি। এই জিনিসগুলো ওকে বেশ গাট্টাগোট্টা হিসেবে জাহির করে। তবে প্রচ্ছদ দেখে যেমন বইয়ের ভেতরের অবস্থা বোঝা যায় না, অস্কারের অবস্থা এখন ঠিক তেমন। বিধ্বস্ত অঙ্গভঙ্গি আর বাঁকা ঠোঁট দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে-এটা ওর জীবনে প্রথম দেখা অপঘাতে মরা লাশ। অবশ্য ওকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। পরিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ঙ্কর। মরাখেকো পাখি আর কাঁকড়ারা ইতিমধ্যে লাশটার দফারফা শুরু করে দিয়েছে। খানিক তফাতে বিশাল জায়গা জুড়ে শুকনো রক্তের স্তর।

ডাক্তার শাভোসের অবশ্য এসব দেখে কোন বিকার নেই। একে একে লাশের হাত দুটো পরীক্ষা করল ও, তারপর বসল হাঁটু গেড়ে। সব শেষে আকাশের দিকে

ইঙ্গিত করে ডিয়াজকে পর্তুগিজ ভাষায় বলল কিছু একটা। সূর্যাস্তের আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি।

'কমপক্ষে তিন দিন,আগের মরা,' লাশের বাম হাতের দিকে ইশারা করে বলল আনা। কনুই থেকে কবজি অবধি মাংস কালো হয়ে পঁচে গেছে। গলে যাওয়া পেশীর ভেতর থেকে উঁকি মারছে সাদা হাড়। 'সাপের কামড়ে মৃত্যু।'

'বোথ্রপ্স ইনসুলারিস,' দ্বীপের মাঝখানে থাকা পাহাড় আর গাছের সারির দিকে তাকালেন কিন। 'গোল্ডেন ল্যান্সহেড পিট ভাইপার।'

'এজন্যই একে "স্নেক আইল্যান্ড" অর্থাৎ সর্প-দ্বীপ নামে ডাকি আমরা,' ডিয়াজ সায় দিল। 'এটা এই প্রাণীগুলোরই এলাকা। এখানে চলতে গেলে ওদের সমীহ না করে উপায় নেই।'

ব্রাজিলিয়ান নেভি কর্তৃক জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত এই দ্বীপে শুধু পিট ভাইপারদের রাজত্ব। প্রতি দুই মাস অন্তর লোক এসে বাতিঘরের টুকটাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সেরে আবার ফিরে যায়। বাতিঘরটার প্রথম রক্ষকের সপরিবারে মৃত্যুর পর থেকে স্বয়ংক্রিয় আলো ব্যবহার করা হয় এখানে। সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল সবাই। জানালা গলে ঢুকে পড়া সাপ থেকে বাঁচতে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। কিন্তু পালানোর সময় গাছের ডালে ঝুলতে থাকা মৃত্যুদূতদের নাগাল থেকে বাঁচতে পারেনি।

তারপর থেকে এখানে পর্যটক আসা নিষিদ্ধ। মাঝেমধ্যে গবেষকদের অনুমতি দেয়া হয়, কিন্তু সাথে থাকে উপযুক্ত বিষ-প্রতিষেধকসহ ডাক্তার এবং মিলিটারি এসকর্ট।

আজও ব্যতিক্রম হয়নি।

আগামীকাল একটা ঝড় এই এলাকায় আঘাত হানবে। জাপানি ফাইন্যান্সারের ক্রমাগত চাপের মুখে আজকের অভিযানের পরিকল্পনা করতে হয়েছে কিনকে। তড়িঘড়ি করে হোটেল ছেড়ে রওনা হতে হয়েছে ইটানহ্যাম গ্রামের উদ্দেশ্যে।

উঠে দাঁড়াল আনা। ওদের যোডিয়াক পন্টুন বোটটা পাশের একটা খাঁড়িতে নোঙর করে রাখা। 'আলো কমে আসার আগেই নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে যাওয়া উচিত আমাদের। অন্ধকারে এখানে থাকা বিপজ্জনক।'

'তাড়াতাড়িই করব,' কিন কথা দিলেন। 'ল্যান্সহেডের এখানে অবাধ বিচরণ। কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগার কথা না।'

অস্কারের দিকে হুকওয়ালা লম্বা একটা লাঠি এগিয়ে দিলেন তিনি। 'এই দ্বীপে গড়ে প্রতি বর্গ গজে একটা করে সাপ আছে। অতএব আমার পেছনে থাকো। আর মাথায় রাখবে, যে কোন সময় পাথরের আড়াল বা গাছের ডাল থেকে নাজিল হতে পারে মৃত্যুদূত।'

পরে থাকা লাশটার দিকে তাকাল অস্কার। বাড়তি সতর্কবার্তার কোন দরকার ছিল না তার জন্য। 'ক... কেন এখানে আসে মানুষজন?'

উত্তরটা আনার মুখ থেকে বেরোল। 'কালোবাজারে একটা ল্যান্সহেড পিট ভাইপারের দাম প্রায় বিশ হাজার ডলার। ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি।'

'বন্যপ্রাণী চোরাচালান করা বেশ লাভের ব্যবসা,' কিন ব্যাখ্যা করলেন। 'বিশ্বের প্রতিটা কোনায় এর চল আছে।'

পোস্টগ্র্যাজুয়েট ছাত্রের চেয়ে বয়সে মাত্র দশ বছরের বড় হয়েও, নিজের কাজের ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ লোক কিন মাতসুই। ঘুরে এসেছেন বেশ কিছু দেশ। আছে পতঙ্গ এবং বিষবিদ্যায় দুটো পিএইচডি ডিগ্রী। দুই বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এখন মেতে আছেন ভেনোমিক্স নিয়ে, বিষধর প্রাণীতে পাওয়া বিষ বিষয়ক গবেষণায়।

মিশ্রণ ব্যাপারটা আসলে তার রক্তে আছে। বাবা ছিলেন জাপানি, মা জার্মান। দু'বছর আগে, এক মাসের ব্যবধানে মারা গেছেন দু'জনেই। নিজেদের জাতিগত ছাপ রেখে গেছেন কিনের ফরসা চামড়া, ঘন কালো চুল আর তীর্যক চোখে।

অবশ্য এই মিশ্র বৈশিষ্ট -জাপানিরা যাকে বলে 'হাফু'- তার বর্তমান কাজটা পেতে বেশ সহায়তা করেছে। কুইমাডা গ্রান্ডে দ্বীপে এই ভ্রমণের খরচ যোগাচ্ছে জাপানের তানাকা ফার্মাসিটিক্যালস। উদ্দেশ্য-দ্বীপ অধিবাসীদের বিষ থেকে নতুন ধরণের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কার।

'কাজে নামা যাক তাহলে,' কিন বললেন।

মাথা নেড়ে সায় দিল অস্কার। হাতে সাপ ধরায় ব্যবহৃত আঙটা। এই জিনিস দিয়ে সরিসৃপ জাতীয় প্রাণীদের সহজেই আটকে ফেলা যায়, কিন্তু কিনের ব্যক্তিগত পছন্দ কেবল সাধারণ হুক। আঙটার জোর ব্যবহারে প্রাণীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। হুকের ক্ষেত্রে সাধারণত ওরকম কিছু হয় না।

সৈকত থেকে যাত্রা শুরু করল চারজনের ছোট দলটা। প্রত্যেকের পায়ে হাঁটু সমান উচ্চতার চামড়ার বুট। খানিক দূরে বালু পাথরের চাঙরে রূপ নিয়েছে। জায়গায় জায়গায় আবার ছোটখাটো ঝোপ। ঢাল বেয়ে পঞ্চাশ কদম সামনে রেইন-ফরেস্টের সীমারেখা শুরু।

'ঝোপের ভেতর দেখো,' সামনে বাড়ার ফাঁকে কিন বললেন। 'কিন্তু সাপ পেলে ওখানেই চেপে ধরো না আবার, আগে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার সুযোগ দেবে।'

শিক্ষকের আদেশ অনুযায়ী একটা ঝোপে খোঁজা শুরু কর অস্কার।

'বড় করে শ্বাস নাও,' আবারও বললেন কিন। 'তুমি খুব ভালো করেই জান, কীভাবে করতে হবে কাজটা। চিড়িয়াখানায় যেভাবে অনুশীলন করেছি, ঠিক সেভাবে।'

সায় দিয়ে ঝোপের ভেতর লাঠি ঢোকাল অস্কার। 'ঠ... ঠিক আছে।'

'হুম। আস্তে আস্তে... সাবধানে।'

ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছে দলটা। সবার সামনে কিন। মৃদু গলায় কথা বলে বলে অস্কারের ভয়টা কাটানোর চেষ্টা করছেন তিনি। 'কথিত আছে, নিজেদের সঞ্চিত গুপ্তধন পাহারা দেয়ার জন্য এখানে সর্বপ্রথম ল্যান্সহেড ভাইপার নিয়ে আসে জলদস্যুরা।'

হেসে ফেলল আনা। তবে ডিয়াজের চেহারায় ভ্রূকুটি ছাড়া আর কোন অভিব্যক্তি ফোটেনি।

'আসল কারণ সম্ভবত জলদস্যু না,' অস্কার বলল।

'না। আসলে বিশেষ জাতের সাপগুলো এই দ্বীপে আটকে যায় আজ থেকে এগারো হাজার বছর আগে, সাগরের পানির স্তর বেড়ে মূল ভূখণ্ড থেকে দ্বীপটাকে আলাদা করে দেয়ার সময়। এখানে বলতে গেলে ওদের প্রাণের প্রতি কোন হুমকিই ছিল না। তাই সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দ্রুত বংশবিস্তার করতে থাকে সাপগুলো। কিন্তু খাদ্যের একমাত্র উৎস থাকে গাছের ওই উপরে।'

'পাখি।'

'জায়গাটা পাখিদের শীতকালীন স্থানান্তরের পথে পড়েছে। এই সাপেদের খাবারের চাহিদা প্রতি বছর পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু ডাঙার অন্যান্য শিকারের তুলনায় পাখি অনেক বেশি ক্ষিপ্র। দংশনের পরও দেহে পালানোর মতো জীবনীশক্তি বজায় থাকে। তাই এক্ষেত্রে প্রকৃতিই সমস্যার সমাধান বের করে দিল। বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের বিষকে আরও শক্তিশালী করে তুলল সাপগুলো, স্বাভাবিকের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি।'

'যাতে আরও তাড়াতাড়ি শিকার করা পাখিদের মৃত্যু ঘটে।'

'ঠিক তাই। ল্যান্সহেড ভাইপারদের বিষ এমনিতেও স্বতন্ত্র... মাংসপেশি পঁচিয়ে দেয়ার পাশাপাশি কিডনির ক্ষতি, হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা হ্রাস, মস্তিষ্কের ক্ষমতা বিনষ্ট এবং অন্ত্রে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণ। মজুদ থাকে যথেষ্ট পরিমাণে হেমোটক্সিক উপাদান, যা হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে নিরাময় ঘটাতে সক্ষম।'

'এজন্যই আমরা আজ এখানে,' অস্কার বলল। 'ক্যাপ্টোপ্রিলের মতো কোন ওষুধ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে।'

কিন হাসলেন। 'অন্তত তানাকা ফার্মাসিটিক্যালসের এটাই আশা।'

আসলে আশা রাখা ভুল সিদ্ধান্ত বলা যায় না। ক্যাপ্টোপ্রিল, ব্রিস্টল-মায়ারস স্কুইবের সর্বাধিক বিক্রিত হৃৎপিণ্ডের ওষুধটা 'বোথ্রপ্স জারারাকা' নামক পিট ভাইপার সাপের বিষ থেকে উদ্ভাবিত। সম্পর্কে এরা গোল্ডেন ল্যান্সহেডের জ্ঞাতি ভাই।

'আর কে জানে, এই দ্বীপে থাকা বিষের উৎস্যের মধ্যে হয়তো বিশেষ কিছু পেয়ে যেতেও পারি।' যোগ করলেন কিন। 'এলান ফারমাসিটিক্যালসের শক্তিশালী ব্যথানাশক 'প্রায়াল্ট' নামের ওষুধটা এক ধরণের বিষাক্ত ঝিনুক থেকে সংগৃহীত। গিলা মনস্টার নামের সরীসৃপের বিষে থাকে উন্নত মানের প্রোটিন, যা কিনা আবার অ্যালঝেইমার রোগের মহৌষধ। বিশ্বজুড়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো এখন বিষ-ভিত্তিক ওষুধপত্র আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে।'

'মনে হচ্ছে বিষবিদ্যা আর বিষাক্ত প্রাণীদের নিয়ে গবেষণায় এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ,' অস্কার হেসে বলল। 'আমরা নিজেরাই বরং একটা কোম্পানি খুলে ফেলি, কেমন হবে?'

মজার ছলে লাঠি দিয়ে ছাত্রের পেটে গুঁতো মারলেন কিন। 'আগে মাঠপর্যায়ে প্রথম নমুনাখানা সংগ্রহ করে দেখাও, তারপর না পার্টনারশিপের প্রসঙ্গ।'

হাসতে হাসতে পরবর্তী ঝোপের দিকে এগোল অস্কার। ডালপালাগুলো ধরে মৃদু ঝাঁকি দিতেই ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল দড়ির মতো সরু একটা অবয়ব। প্রস্তুত না থাকায় আঁতকে উঠল ছেলেটা। তাল সামলাতে না পেরে লাফ দিয়ে পড়ল আনার গায়ে, তারপর দু'জনেই পপাত ধরণীতল।

উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট দুটো মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে সরাসরি ওদের দিকে রওয়ানা হলো সাপটা। কিন্তু মাঝপথে হুক নিয়ে কিন তৈরি। হুকের সাহায্যে দু'ফুট লম্বা সাপটাকে হাতে তুলে নিলেন এক মুহূর্তে। আঙুলের ফাঁদে পড়ে শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে জিহ্বা বের করে হিসহিস আওয়াজ শুরু করল শীতল রক্তের প্রাণীটা।

'চিন্তা নেই,' কিন বললেন। 'এটা কুইমাডা গ্রান্ডে দ্বীপের আরেক অধিবাসী। ডিপসিস ইন্ডিকা... পুরোপুরি নির্বিষ। স্থানীয়ভাবে শামুকখেকো নামে পরিচিত।' বলে হুক থেকে ছাড়িয়ে হাতবদল করলেন সাপটা।

'আ... আমি ভেবেছিলাম এটা আমাকে কামড়াতে আসছে,' তোতলাতে তোতলাতে অস্কার বলল।

'সাধারণত এই জাতের সাপ একটু ভীতু প্রকৃতির। তবে তোমার প্রতি কেন আকৃষ্ট হলো, বুঝতে পারছি না।' বলে পেছনদিকে ইঙ্গিত করলেন কিন। 'সম্ভবত সৈকতের দিকে যাচ্ছিল।'

মৃত সেই পোচারের মতো...

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাপটাকে একটা পাথরের উপর নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর। সাথে সাথে প্রাণীটা বালুতে শরীর মুচড়ে সৈকতের দিকে এগোল। তার ধারণাই ঠিক।

'অদ্ভুত তো,' ভ্রূকুটি করলেন কিন। 'চলো, এগোনো যাক।'

ঢালের শেষ মাথার বালুতে বড় একটা গামলার মতো অংশ আছে। ওদিকে চোখ পড়ার সাথে সাথে আঁতকে উঠলেন তিনি। সোনালি-হলুদ রঙের সাপে জায়গাটা ভর্তি। শত শত গোল্ডেন ল্যান্সহেড পিট ভাইপার। এই দ্বীপের স্বঘোষিত রাজা।

'হে ঈশ্বর...' কেঁপে উঠল অস্কারও।

ডিয়াজ হাতের শটগান উঁচু করল, আনা চলে এল তার পেছনে। তবে সতর্কতার দরকার নেই। পড়ে থাকা সাপগুলোর একটাও নড়াচড়া করছে না।

'মনে তো হচ্ছে, মারা গেছে সবগুলো,' কিন বললেন।

কিন্তু মারল কে?

সাপগুলোর সাথে আরও একটা মৃতদেহ দেখা গেল। মুখ বালুতে গোঁজা। পিঠ উপরের দিকে। পর্তুগিজ ভাষায় আনাকে কিছু একটা বলল ডিয়াজ। ভাষাটা কিনের টুকটাক জানা আছে। বুঝতে পারলেন, বলা হয়েছে-লোকটা সম্ভবত আগে দেখা মৃত পোচারের সঙ্গী। দু'জনের পরনের পোশাকে মিল রয়েছে যেহেতু।

'লোকটা কি শ্বাস নিচ্ছে নাকি?' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল অস্কার।

ভ্রূকুটি করলেন কিন। দেখা গেল, তার ছাত্রের কথাই সত্যি। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা লোকটার বুকের দিকটা অল্প অল্প নড়ছে।

গামলাকৃতি ঢালের দিকে এক পা এগোল আনা। সাথে সাথে মেয়েটাকে সতর্ক করলেন কিন। 'দাঁড়ান, আমি আগে যাচ্ছি। একটা-দুটো ল্যান্সহেড এখনও জীবিত থাকতে পারে। তাছাড়া মৃত সাপেও বিষ থাকে।'

পেছন ফিরল ডাক্তার। চোখে অবিশ্বাস।

কিন ব্যাখ্যা করলেন। 'মৃত র‍্যাটলস্নেক আর গোখরোর কামড়ে মানুষের মৃত্যুর অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। প্রাণ চলে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরও সচল থাকে শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের মাংসপেশী। তখনও আঘাত বা নড়াচড়ায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে সক্ষম।'

হাতের হুকওয়ালা লাঠি দিয়ে একটা একটা করে সাপ সরাতে সরাতে আগে বাড়লেন প্রফেসর। একটাও কোন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। বোঝা গেল-প্রকৃত অর্থেই মৃত এরা। কিন্তু ব্যাপারটা এই প্রজাতির উগ্রতার সাথে ঠিক খাপ খায় না। গোটা জায়গায় কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ, পচতে শুরু করা লাশের দুর্গন্ধের সাথে ফুলের সুগন্ধের মিশ্রণের মতো।

গন্ধটা নাকে যেতেই কিনের মনে হলো, তার হৃৎস্পন্দন বাড়ছে। যেন বিপদের আগাম আভাস। সেই সাথে লক্ষ্য করলেন, পার্শ্ববর্তী জঙ্গলটা একেবারে নীরব। রেইন-ফরেস্টে সাধারণত এমনটা হয় না। হাঁটা থামিয়ে হাত তুলে ইশারা করলেন তিনি।

'কী হয়েছে?' আনা জিজ্ঞেস করল।

'পেছান।'

'কিন্তু কেন...?'

মেয়েটাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করলেন প্রফেসর, তারপর এক পা এক পা করে পেছাতে শুরু করলেন। বালুতে পড়ে থাকা দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এখন। চোখের জায়গা দুটো পুরোপুরি ফাঁকা। নাকের ফুটো বেয়ে রক্ত গড়িয়ে নেমেছে, রেখে গেছে শুকনো দাগ।

লোকটা মৃত। কিন্তু তবুও নড়ছে লাশটা। এই নড়াচড়ার কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস না।

লাশের ভেতর কিছু একটা আছে, জীবিত কিছু...

গতি বাড়ালেন প্রফেসর। মৃতদেহ থেকে চোখ না সরালেও টের পেলেন, পেছনের ঢালে উঠে পড়েছে বাকিরা। রেইন-ফরেস্ট থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। যেন গাছের ডাল পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে। কিন্তু আশেপাশে বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

ঢালের শেষ কয়েক কদম প্রায় ছুটে পার হলেন কিন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নেয়ার ফাঁকে বললেন, 'আমাদের এখুনি এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যে...'

বিস্ফোরণের আওয়াজে বাকি কথাটুকু চাপা পড়ে গেল। তাদের যোডিয়াকটা যেখানে নোঙর করা ছিল, ওখানে শুধু এখন একটা আগুনের পিণ্ড। ধোঁয়ার সমান্তরালে হাওয়ায় ভাসছে একটা হেলিকপ্টার। পরমুহূর্তে টানা গুলির আওয়াজ কানে এল।

ক্যাট... ক্যাট... ক্যাট... ক্যাট...

বালুতে মুখ গুঁজতে গুঁজতে সবার আগে অস্কারকে খুঁজে পেল শক্তিশালী বুলেটের সারি। ছেলেটার গলা ফেটে রক্তের ধারা নামল।

ডিয়াজ শটগান তুলে পাল্টা গুলি করতে চাইছিল, গুলির তোড়ে যেন পেছনদিকে উড়ে গেল লোকটা।

ঘুরে দৌড় দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে আনা, কিন্তু পিঠে গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল কয়েক কদম এগিয়েই।

কিন গামলার ঢালে শরীর গড়িয়ে দিলেন। তবে দেরি হয়ে গেছে। পতনের আগমুহূর্তে টের পেলেন, কাঁধে যেন আগুন জ্বলছে। গড়াতে গড়াতেই পৌঁছালেন মৃত ল্যান্সহেডের ডেরায়। স্থির হয়ে টের পেলেন, অর্ধেক ডুবে গেছেন মরা সাপের দঙ্গলের ভেতর।

বৃত্ত রচনা করে আবার ফিরে এল হেলিকপ্টারটা। সৈকত ঘিরে আরেকটা চক্কর খেয়ে ফিরতি পথ ধরল। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রোটরের শব্দ।

দম আটকে শুয়ে আছেন কিন। হামলাকারীরা ফিরে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু ভাবনার অবকাশ নেই। এক মুহূর্ত পর জঙ্গলের ভেতর থেকে আবার আওয়াজ এল। এবার

আগেরবারের থেকে জোরে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন, ছায়ার চাইতেও কালো কিছু যেন ছুটে আসছে গাছের সারির ভেতর থেকে...অনেকটা কালচে কুয়াশার মতো।

এক সেকেন্ড পর নরক নেমে এল পৃথিবীতে!

জঙ্গলের ঠিক মাঝখান থেকে আগুনের গোলক লাফিয়ে উঠল আকাশে। মাটির দলা আর গাছের কান্ডের টুকরো টাকরা উপর থেকে ঝড়ছে বৃষ্টির মতো। কয়েকটা প্রফেসরের গায়ে লাগতে লাগতে লাগল না। জঙ্গলের বাইরের পাথুরে সৈকত ঢেকে ফেলল কালো ধোঁয়ার স্রোত।

কাশতে কাশতে হামাগুড়ি দিয়ে আগে বাড়লেন কিন। বাতাসে ভাসতে থাকা কেমিক্যালের তিক্ত স্বাদ পাচ্ছেন জিহ্বায়। সম্ভবত নাপাম বোমা বা এই ধরণের কিছুর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

ধোঁয়ায় ফুসফুস জ্বলছে। ঢাল পেরিয়ে সৈকতে উঠে এসেছেন প্রফেসর। লক্ষ্য-পোচারদের ছোট নৌকাটা। আশা করছেন, ধোঁয়া তার পালানোর এই প্রয়াস গোপন রাখবে। ঝাঁঝে প্রায় বন্ধ হয়ে আসা চোখ দিয়ে ভালোমতো কিছু দেখার উপায় নেই। হাতে পানির স্পর্শ পেয়ে বুঝলেন, পানির কিনারে পৌঁছে গেছেন।

পেছনের জঙ্গলে আগুন ক্রমাগত ছড়াচ্ছে। নৌকায় উঠে চিত হলেন কিন। খোলা সাগরে বের হওয়ার জন্য সূর্য ডোবার অপেক্ষা করতে হবে। ধোঁয়ার সারি আর অন্ধকারে আশা করা যায়-তার পালানো আকাশ থেকে কারো চোখে পড়বে না।

কাঁধে চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে। বুকে আটকানো ব্যাগটাতে হাত বুলালেন প্রফেসর। নৌকায় ওঠার আগে, একটা ল্যান্সহেডের মৃতদেহ ঢুকিয়ে নিয়েছেন ওটায়।

পেছনের জঙ্গলের মতোই দাউদাউ করে মনে জ্বলছে আকাঙ্ক্ষার আগুন..ঙ্কক

এখানে কী হয়েছে, তা আমাকে জানতেই হবে।

অধ্যায় দুই

৪ মে, সকাল ৮:৩৮
টোকিও, জাপান

মন্দিরের বাগানে হাঁটু গেড়ে বসলেন বৃদ্ধ। পিঠ সোজা, পাথুরে পথে ভাঁজ করা পা... ঐতিহ্যবাহী 'সেইযা' আসন বলা হয় ভঙ্গিটাকে। বসার সময় সর্বশক্তিতে প্রতিবাদ জানাল নব্বই বছর বয়সী হাঁটু দুটো। তিনি অগ্রাহ্য করলেন। পেছনে শতাব্দী পুরনো কান'এই-জি প্যাগোডা ছেয়ে আছে বসন্তের শেষ চেরি ফুলের দঙ্গলে। তিন সপ্তাহ আগে ঋতু ফুরিয়েছে, সেই সাথে পাল্লা দিয়ে কমে এসেছে টোকিওর পথে-ঘাটে পর্যটকদের ভিড়।

তাকাশি ইতোর প্রতি ঋতুর শেষ দিনগুলো বেশ পছন্দ। এসময় তার হৃদয়ে বাজতে থাকা বেদনার সুর যেন বাতাসেও ভর করে। বসার পর ফুঁ দিয়ে, সামনে থাকা কোমর সমান পাথর থেকে ঝরা পাতা সরালেন তিনি।

পাথরের গোড়ায় রাখা ধুপের পাত্র থেকে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। জ্বলছে কিয়ারা আর কোবোকুর মিশ্রণ। কিয়ারা হচ্ছে এক ধরণের সুগন্ধি আগর গাছের কাঠ আর কোবোকু ম্যাগনোলিয়া গাছের বাকল। নাক দিয়ে বুক ভরে গন্ধ টেনে নিলেন বৃদ্ধ। ওতাগাকি রেঙেতসু নামক উনিশ শতকের এক বৌদ্ধ নানের একটা কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে:

ধুপকাঠি বেয়ে ওঠা
একসারি ধোঁয়া,
কোথায় হারিয়ে যায়?
যায় না কো ছোঁয়া।

সার বেঁধে উঠতে থাকা ধোঁয়ার উপর নিবদ্ধ হলো বৃদ্ধর দৃষ্টি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত এর স্থায়িত্ব, কিন্তু রেখে যাচ্ছে মিষ্টি সুবাস। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

অনেক বছর আগে ঠিক তুমি যেমনটা করেছিলে, প্রিয়তমা মিয়ু।

প্রার্থনার উদ্দেশ্যে চোখ বন্ধ করলেন বৃদ্ধ। প্রতি বছর নিজের বিবাহবার্ষিকীর দিন এখানে আসেন তিনি। এই দিনে গোপনে তার সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিল মিয়ু। দু'জনের বয়সই তখন আঠারো। বুক ভর্তি আগামী দিনের আকাঙ্ক্ষা, আর মনে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা। দশ বছর যাবত একসাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তারা। অর্জন করেছেন প্রয়োজনের যথেষ্ট দক্ষতা। সন্তুষ্ট করেছেন পাহাড়ের মতো অটল একের পর এক শিক্ষাগুরুকে। নিজেদের প্রতিভার জন্যই আসলে দু'জনকে একসাথে জুটি বাঁধানো হয়েছিল। ইতো কঠিন পাথর হলে মিয়ু ছিল বহমান স্রোতধারা। ইতোকে যদি ধরা হয় বজ্র আর শক্তির প্রতীক, মিয়ু তাহলে ছায়ার মতো নীরব।

একসাথে তারা যেমন অজেয়, তেমনি অলঙ্ঘনীয়।

তরুণ বয়সের বোকামির কথা ভেবে শক্ত হয়ে এল বৃদ্ধর ঠোঁটজোড়া। চোখ খুলে শেষবারের মতো ফুসফুসে কিয়ারার সুগন্ধ টেনে নিলেন তিনি। জিনিসটা পুড়তে পুড়তে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দামের দিক দিয়ে কিয়ারা সমপরিমাণ সোনার চেয়ে মুল্যবান। এমনকি প্রাচীন জাপানি ভাষায় নামটার অর্থও হচ্ছে 'বহুমূল্য'।

প্রতি বছর মিয়ুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিয়ারা জ্বালান বৃদ্ধ। তবে এই বছরটা বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। মিকা নামক বাটিতে পুড়তে থাকা কোবোকুর দিকে তাকালেন তিনি। যুদ্ধে নামার আগে এই জিনিস পোড়ানো সামুরাই যোদ্ধাদের শত বছরের ঐতিহ্য। দেহ আর মন দুটোই শুদ্ধ হয়। আজ কিয়ারার সাথে কোবোকু যুক্ত করে বৃদ্ধ মিয়ুর নামে করা পুরনো প্রতিজ্ঞাটার কথা স্মরণ করেছেন।

ভালবাসার মানুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

সামনের পাথরে খোদাই করা প্রাচীন লিপির দিকে তাকালেন তাকাশি। এটা অবশ্য তার স্ত্রীর কবরফলক নয়। মিয়ুর লাশ মৃত্যুর পরপরই হারিয়ে গেছে। রয়ে গেছে ফিরিয়ে আনার অযোগ্য এক জায়গায়। এই পাথরটাকে মিয়ুর স্মৃতিফলক হিসেবে মান্য করার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।

এখানে খোদাই করা বাক্যগুলো আঠারোশো একুশ সালে মিয়ুর পরদাদা-সেসাই মাতসুয়ামার লেখা। বিজ্ঞানের প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন ভদ্রলোক। রচনা করেছেন গবেষণামূলক অনেক প্রাচীন পুঁথি। *চুচি-জো* নামক কীটপতঙ্গের শারীরিক কার্যাবলি নিয়ে লেখা বইটা বর্তমানে জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। প্রজাপতি, ঝিঁঝিঁপোকা, ঘাসফড়িং, মাছি ইত্যাদির দেহ ব্যবচ্ছেদ করে সেসাই দেখানোর চেষ্টা করেন-সৃষ্টির সবচেয়ে ছোট জীবেও সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এ কাজে অগুনতি কীটপতঙ্গের প্রাণ নিতে হয়েছে ভদ্রলোককে। তাই নিজের হাতে মারা যাওয়া ক্ষুদে প্রাণীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পাথরটা স্থাপন করেন সেসাই মাতসুয়ামা।

মিয়ু অনেক বার তাকাশিকে নিয়ে এখানে এসেছে। পাথরটা দেখার সাথে সাথে গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠত মেয়েটার মুখ। ইচ্ছা পোষণ করত-সে নিজেও পরদাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কিন্তু এক পশলা গুলির আঘাতে স্বপ্নটা কোবোকুর ধোঁয়ার মতোই উড়ে গেছে।

শার্টের হাতা গুটিয়ে কব্জির ভেতরদিকে তাকালেন বৃদ্ধ। কাগজের মতো পাতলা হয়ে এসেছে গায়ের চামড়া। প্রায় মুছে গেছে কব্জিতে আঁকা চারকোণা কাঠামোর ভেতর আঁকা চাঁদ আর তারার উল্কি। একই উল্কি ছিল মিয়ুর হাতেও। জিনিসটা প্রমাণ করত-তারা 'কেইজ'-এর জাঁদরেল সব শিক্ষাগুরুকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন।

উল্কি আঁকার সাথে সাথে স্ত্রীর হাতে চুমু খেয়েছিলেন তাকাশি। আর আজ সেই শেষ চিহ্নটাও মুছে আসছে। হাতা নামিয়ে ধূপের ধোঁয়ার দিকে তাকালেন তিনি। জ্বালানি ফুরিয়ে গেছে। আগুন যে কোন সময় নিভবে। শেষ এক সারি ধোঁয়া মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

কোথায় যায় এগুলো?

উত্তরটা তাকাশির জানা নেই। শুধু জানেন, মিয়ু তার কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। তাও একেবারে প্রথম মিশনেই। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল, শত্রুর নাকের ডগা থেকে বিশেষ একটা জিনিস চুরি করে আনা। সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে অন্ধকার টানেলে, শত্রুদের গুলির মুখে মিয়ুর লাশ ফেলে পালাতে হয়েছিল তাকাশিকে। চাননি স্ত্রীর আত্মত্যাগ বৃথা যাক। পরবর্তীতে চুরি করে আনা জিনিসের প্রকৃতি জানতে পেরে, সযত্নে ওটা সংরক্ষণ করে রাখেন তিনি।

প্রাচীন পাথরে খোদাই করা লাইনগুলো বৃদ্ধের মনোযোগ কাড়ল। মিউ তার পূর্বপুরুষের দেখানো পথে হাঁটে পারেনি। তাই তাকাশি কাজটার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

ছোট করে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সাহায্য করার উদ্দেশ্যে দু'জন কর্মচারী এগিয়ে এলেও হাতের ইশারায় সরিয়ে দিলেন তাদের। এই বয়সে একা একা ওঠা-বসার ব্যাপারটা তার কাছে গর্বের। লাঠিটাও হাতে নিলেন একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর। সোনালি রঙের হাতলে চেপে বসল সরু হয়ে আসা আঙুলগুলো।

বহু বছর অপেক্ষা, গবেষণা আর টাকা-পয়সা ঢালার পর অবশেষে তাকাশি তৈরি। নিজের প্রতিশোধ গ্রহণের পাশাপাশি জাপানকেও সুদিন ফিরিয়ে দেবেন তিনি। কাজটা করার জন্য ব্যবহার করবেন মিয়ুর প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত সেই বিশেষ জিনিস।

সন্তুষ্ট মনে প্যাগোডার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন বৃদ্ধ। লাঠির ঠকঠক আওয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। কান'এই-জির এই মন্দিরের গোড়াপত্তন হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। স্বর্ণযুগে পার্শ্ববর্তী ইউনো পার্ক আর ন্যাশনাল মিউজিয়ামের পুরো এলাকা জুড়ে ছিল মন্দিরের বিস্তৃতি। আঠারোশো উনসত্তর সালে, জাপানি সম্রাট কর্তৃক শেষ সামরিক জান্তা আক্রমণের সময় থেকে কান'এই-জির পতনের শুরু। আক্রমণের মুখে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল জান্তাবাহিনী। পুরনো কাঠের দেয়ালে এখনও গুলির দাগ রয়ে গেছে।

প্রায় শূন্য মন্দিরটা দেখার জন্য এখন কেউ আসে না বললেই চলে। সবাই ভুলে যেতে বসেছে কান'এই-জির সোনালি আমল।

কিন্তু আমি আবার সেই সুদিন ফিরিয়ে আনব...

প্যাগোডা অতিক্রম করে রাস্তায় চলে এলেন তাকাশি। চেরি গাছ থেকে ঝড়ে পড়া ফুলে ছেয়ে আছে চারপাশ। যেন মিয়ুই তার জন্য এগুলো পাঠিয়েছে। মুচকি হেসে রাস্তা পার হলেন বৃদ্ধ, গন্তব্য-পার্ক করা লিমোজিন। গাড়িতে ওঠার আগে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘসলেন উল্কি আঁকা হাতের কব্জিটা।

আর বেশি সময় বাকি নেই...

শীঘ্রই ওপারে মিয়ুর সাথে যোগ দেবেন তিনি। কিন্তু তার আগে প্রতিশোধ গ্রহণের পাশাপাশি জাপানকে ফিরিয়ে দেবেন হারানো সোনালি অতীত। গোটা বিশ্ব শাসন করবে তার এই দেশ।

লিমোজিনে উঠতে উঠতে যেন অতীতে ফিরে গেলেন তাকাশি। তিনি এবং মিয়ু, দু'জনেই ছিলেন অভিজাত পরিবারের জারজ সন্তান। জন্মদাতার পাপের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে, সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় তাকে। মিয়ুকে অবশ্য বেচে দেয়া হয়েছিল। অবশেষে দু'জনেরই আশ্রয়স্থল হয় ছায়াঘেরা সংগঠন 'কেইজ'।

কেইজ শব্দটার আভিধানিক অর্থ ছায়া। নামের মতোই রহস্যময় ছিল দলটা। খুব বেশি মানুষ এদের ব্যাপারে জানত না। একের পর এক গুজবের প্রেক্ষিতে কেউ বলত-ওরা হচ্ছে নিনজাদের একটা গোষ্ঠী, কেউ বলত ভুতের আখড়া। কিন্তু তাকাশি সত্যটা জানেন। এই সংগঠনের শেকড় ছড়িয়ে আছে সময়ের অনেক গভীরে। বিশ্বজুড়ে অনেক নামে এদের পরিচিতি। দলটার লক্ষ্য-প্রতিটা জাতির ভেতরে নিজেদের ডালপালা ছড়ানো, উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ... এ কাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রয়োজনে নিষিদ্ধ অ্যালকেমির প্রয়োগ। এক কথায় বলতে গেলে, কেইজ যেন শক্তিরই অন্য রূপ।

জাপানে যুদ্ধ লাগার পর খোলস ছেড়ে বের হয় কেইজ। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভেতর নিজেদের আখের গোছানোর লক্ষ্যে নামে। উত্তর চীনে একের পর এক গোপন

রিসার্চ ফ্যাসিলিটি স্থাপন করে ইম্পেরিয়াল আর্মি। প্রথমে ঝংমা দুর্গে, তারপর পিংফ্যাঙে। উদ্দেশ্য ছিল জৈব রাসায়নিক অস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

এই প্রজেক্টে কাজে লাগানোর জন্য, ধরা পড়া রাশিয়ানসহ চাইনিজ গ্রাম থেকে প্রচুর লোকজন ধরে আনে সেনাবাহিনী। জাপানি বিজ্ঞানীরা শুরু করে একের পর এক অমানুষিক এক্সপেরিমেন্ট। ধরে আনা হতভাগাদের প্রথমে অ্যানথ্রাক্স আর বিউবোনিক প্লেগ জীবাণু দিয়ে সংক্রমিত করা হত, তারপর চেতনানাশক ছাড়াই ব্যবচ্ছেদ করা হত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ফ্রস্টবাইট পরীক্ষার উদ্দেশ্যে জীবিত অবস্থায় বরফে জমিয়ে ফেলত মানুষ। মহিলাদের ধর্ষণের পর আক্রান্ত করা হত সিফিলিসে। আর পুরুষদের জ্যান্ত ঝলসানো হয় খুঁটিতে বেঁধে।

এই ধরণের ফ্যাসিলিটিতে ছায়ার মতো মিশে থাকত কেইজ। শুষে নিত নারকীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে অর্জিত সমস্ত তথ্য।

এমন সময় পুরনো একটা সত্যি আবিষ্কারের খবর কেইজের হর্তাকর্তাদের কানে পৌঁছায়। এর আগে সবার ধারণা ছিল, জিনিসটা তাদের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। এক শতাব্দী আগে ওটা বাগে পাওয়ার চেষ্টা করলেও বিফল হতে হয়েছিল। তাই উনিশশো চুয়াল্লিশ সালের শেষের দিকে, আমেরিকার কাছে জিনিসটা আছে জানার পর আর দেরি করতে চায়নি কেইজ। ইংরেজিতে দক্ষ ছোট একটা দলকে এই মিশনে পাঠানো হয়।

মিশন সফল হলেও... চলে যায় মিয়ুর প্রাণ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে দুটো বোমা ফেলার কিছু সময় পর শেষ হয় বিশ্বযুদ্ধ। তাকাশি বরাবর ভেবে আসছেন, নিজেদের রাজধানীর অভ্যন্তরীণ টানেল থেকে এমন একটা জিনিস চুরি হয়েছে প্রকাশ পেলে, আমেরিকানরা এই ধরণের কাজের সাহস কীভাবে করত!

যাই হোক, এসব এখন চিন্তার বিষয় না।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জিনিসটা যত্নসহকারে সামলে রেকেছেন তাকাশি। এক খণ্ড অ্যাম্বার... তবে এর ভেতর লুকানো ব্যাপারটা নিয়ে তৎকালীন সময়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা বিপজ্জনক হত। পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমে আধুনিক হয়েছে বিজ্ঞান। অর্জন করেছে জিনিসটা নিয়ে কাজ করার সক্ষমতা। তবে ততদিনে নিজের শেষ দিন দেখে ফেলেছে কেইজও।

কয়েক বছর আগে, আমেরিকানরা সংগঠনটাকে টেনেহিঁচড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। ওরা অবশ্য দলটাকে চিনত ভিন্ন নামে।

দ্য গিল্ড!

এক এক করে ছেঁটে ফেলা হয়েছে কেইজের প্রতিটা শেকড়। তবে কয়েকটা সুতো তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। উচ্চপদে আসীন তাকাশির মতো...

নব্বই বছরের এই বুড়োকে হুমকি হিসেবে কেউ গণ্যই করেনি। দেরি না করে গা ঢাকা দেয় বেঁচে যাওয়া সবাই।

সেই থেকে আবারও কেইজের বীজ ছড়াচ্ছেন তাকাশি। মরণ আঘাত হানার জন্য নাতিকে সাথে নিয়ে তৈরি করেছেন নিজেদের সামুরাই দল। অপেক্ষা করছেন সঠিক সময়ের।

আর এখন, অবশেষে ল্যাব আর মাঠপর্যায়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, তারা সম্পূর্ণ তৈরি। বানানো হয়েছে তাণ্ডবলীলা চালানোর জন্য অবিনাশী এক অস্ত্র।

আঘাত হানার জন্য স্থির করা হয়েছে প্রথম লক্ষ্য। পৃথিবীকে নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর পাশাপাশি, গিল্ড ধ্বংসের জন্য দায়ী সংস্থাটাতেও প্রথম ছোবল মারা হবে... এক ঢিলে দুই পাখি আর কি।

বিশেষ ভাবে বলতে গেলে, মূল লক্ষ্য ওদের দুই এজেন্ট।

পথের গাড়িঘোড়ার সাথে তাল মিলিয়ে বাঁক নিচ্ছে লিমোজিন। তাকাশি মৃদু হাসলেন। এই দু'জন এখন যেখানে আছে, জাপান এক সময় ওখানেই এক ঘুমন্ত দানবের মুখে প্রথম আঘাত হেনেছিল। তিনি নিজেও তাই করতে চলেছেন।

তবে এবারের আঘাতের প্রতিক্রিয়া হবে পূর্বের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। এক ঘায়েই গুঁড়িয়ে যাবে বৈশ্বিক ক্ষমতায়নের পাল্লা। তারপর, পৃথিবীতে ছড়ি ঘোরাবে এক ও অদ্বিতীয় জাপান... তাও অনন্তকাল।

দুই টার্গেটের কথা ভাবলেন তাকাশি।

কপোত-কপোতি, ঠিক আমার আর মিয়ু-র মতো।

অধ্যায় তিন

৬ মে, বিকাল ৫:০৮
হানা, মাউই দ্বীপ

এই তো জীবন...

কাইহালুলু উপসাগরের লালচে বালুর সৈকতে গা এলিয়ে আছে কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স। হাওয়াইতে এখন অফ সীজন চলছে। দিনেরও প্রায় অন্তিম লগ্ন উপস্থিত। তাই সূর্যের আলো বুক পেতে নেয়া এক চিলতে সৈকতটা আপাতত শুধু তার একার দখলে। তবে বিশেষ এই জায়গাটার অবস্থান স্থানীয় কিছু লোক ছাড়া অন্য কেউ খুব একটা জানে না। আসার পথটাও খুব একটা মসৃণ না।

পেছনে এক দঙ্গল লোহা-গাছকে নিজের গায়ে আশ্রয় দিয়ে, খাড়া উপরে উঠে গেছে মোচাকৃতি টিলা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লৌহসমৃদ্ধ টিলার চূড়া, ক্ষয় হতে হতে কালের বিবর্তনে পরিণত হয়েছে লালচে বালুতে। সাগরে আত্মবিসর্জন দেয়ার আগে তৈরি করেছে সুন্দর এই সৈকত। তীরের অল্প একটু সামনে, প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা লেগে ফেনা তুলছে কালো সাগরের পানি। তবে প্রাচীরের এপাশে শান্ত জলরাশি।

মৃদু ঢেউ খেলতে থাকা সেই পানির রাজ্য থেকে আচমকা মাথা জাগাল এক জলকন্যা। মুখ সোজা আকাশের দিকে তাক করা, যেন পড়ন্ত বিকেলের সবটুকু সূর্যের আলো শুষে নেবে। উদোম পিঠে ছড়িয়ে আছে ভেজা চুলের রাশি। উন্নত খোলা বুক আর মসৃণ পেট বেয়ে টপটপ করে ঝড়ছে সাগরের নোনা জল। নাভিতে পরা পান্নার ছোট রিং রোদ লেগে জ্বলজ্বল করছে, ঠিক যেন এইমাত্র গ্রে-র উপর স্থির হওয়া উজ্জ্বল চোখ দুটোর মতো।

মুখে কোন হাসি নেই। শীতল চাউনি। তবে মাথা সামান্য কাত হওয়া লক্ষ্য করল সিগমা কমান্ডার। ডান চোখের ভ্রূতে মৃদু কাঁপন। একের পর এক পা ফেলে, পানি ছেড়ে সৈকতে উঠে আসা... যেন শিকারের দিকে এগোচ্ছে ক্ষিপ্র সিংহী।

দৃশ্যটা ভালো করে দেখার উদ্দেশ্যে কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হলো গ্রে। পা এখনও রোদে, তবে বাকি শরীরটা সূর্য থেকে আড়াল করেছে টিলার খাড়া বাঁধ। সূর্য ডুববে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

এগিয়ে এসে সিগমা কমান্ডারের উপর ঝুঁকে পড়ল শেইচান। মতলব বুঝতে পেরে আপত্তি করল গ্রে। 'না!'

পাত্তা দিল না শেইচান, প্রেমিকের গায়ের উপর উঠে ঝাড়া দিল নিজের ভেজা চুল। 'কী? খুব ঠাণ্ডা?' বলতে বলতে গ্রে-র উপর শুয়ে, সূর্যের তাপে ট্যান হওয়া শরীরটা জড়িয়ে ধরল ক্ষিপ্র হাতে। 'তাহলে চলো, খানিকটা গরম করে দেয়া যাক।'

মুচকি হেসে সোজা হলো গ্রে। পাল্টা আলিঙ্গন ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রেমিকাকে। 'তাই নাকি?'

এক ঘণ্টা পর, ছায়ায় ঢাকা পড়েছে দু'জনের শরীর। পুরো সৈকতেই অবশ্য অন্ধকার নেমে আসছে। তবে টিলার আওতার বাইরে, প্রবাল প্রাচীরের উপর কুয়াশায় এখনও খেলা করছে রঙধনু।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে শেইচান আর গ্রে। পাতলা কম্বলের নিচে দু'জনেই পুরোপুরি নগ্ন। ভালোবাসার উষ্ণতার রেশ কাটতে চাইছে না। এভাবেই গোটা জীবনটা কেটে গেলে মন্দ হত না, তবে আগমন বার্তা জানান দিচ্ছে অন্ধকার রাত।

টিলার ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার। 'ট্রেইলটা আঁধারে ঢাকা পড়ার আগেই রওয়ানা হতে হবে।' তারপর তাকাল বালুতে মেলে রাখা দুটো ওয়েটস্যুট আর স্কুবা ইকুইপমেন্টের দিকে। এগুলোর সাহায্যে একটু আগে ঘুরে দেখেছে 'কাউইকি হেড' পাহাড় ঘিরে রাখা প্রবাল প্রাচীরের নিচটা। 'যদি না সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে নিতে চাই আর কি।'

নাক দিয়ে ঘোঁত-জাতীয় আওয়াজ করল শেইচান। এখনই উঠতে চাইছে না।

মাউই দ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছোট্ট শহর হানায় একটা কটেজ ভাড়া করেছে ওরা। রেইন-ফরেস্ট, জলপ্রপাত আর খণ্ড খন্ড সৈকতে ভরা এলাকাটা দেখতে ছবির মতো সুন্দর। পরিকল্পনা ছিল কয়েক সপ্তাহ থাকার। তবে কোন দিক দিয়ে তিনটে মাস পেরিয়ে গেছে, কেউ লক্ষ্যই করেনি।

এর আগের ছয় মাস পুরো পৃথিবী চষে বেরিয়েছে দু'জন। ওয়াশিংটন ছাড়ার পর প্রথমে গেছে ফ্রান্সের এক মধ্যযুগীয় গ্রামে। তারপরের কিছুদিন কেটেছে কেনিয়ার বুনো প্রান্তরে, তাঁবুতে। ভারতের মুম্বাই, অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, নিউজিল্যান্ডের পাহাড়ি রিসোর্ট হয়ে প্যাসিফিক সাগর ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে থিতু হয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এই স্বর্গপুরী মাউইতে।

ওয়াশিংটনে বন্ধু মঙ্ক কক্কালিসকে নিয়মিত পোস্টকার্ড পাঠায় গ্রে। যাতে কারও মনে সন্দেহ উদ্রেক না হয়-ও আদৌ মারা যায়নি কিংবা কোন উগ্রপন্থী সংগঠনের হাতে বন্দী হয়নি। বিশেষ করে যখন উপরওয়ালাদের নির্দেশ ছাড়া এভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

এক দশকের বেশি সময় ধরে সিগমা-ডারপার সাথে সম্পর্কিত গোপন একটা দলের সাথে আছে গ্রে। এই সংস্থার সদস্যরা প্রত্যেকে সাবেক স্পেশাল ফোর্স সদস্য এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষ। তাদের দায়িত্বঃ আমেরিকা তথা বৈশ্বিক নিরাপত্তায় মাঠপর্যায়ে কাজ করা।

পুঁথিগত ক্ষেত্রে গ্রে-র দক্ষতা জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিদ্যায়। তবে তার আসল প্রশিক্ষণকাল ছিল এক নেপালি মঙ্কের সাথে কাটানো সময়গুলো। অবশ্য ছোটবেলা থেকেই বৈপারিত্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছে গ্রে। মা ছিলেন ক্যাথলিক স্কুলশিক্ষিকা, ছেলের মনে আধ্যাত্মিকতা জন্মাতে ভোলেননি। একই সাথে ছিলেন আধুনিক জীববিশারদ, প্রকৃতির খেয়ালের পেছনে কারণ খোঁজা শেখাতেও দ্বিধা করেননি।

বাবা কাজ করতেন টেক্সাসের তেল খনিতে। দুর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর, যার কাছে রাগ আর অভিমান ছাড়া করার মতো কিছু ছিল না। ছেলের মধ্যেও খানিক মাত্রায় সংক্রমিত হয়েছে এই মনোভাব।

অবশেষে সময়ের সাথে সাথে, সিগমা ফোর্স ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো-র সহায়তায়, বৈপারিত্যের মধ্যে একটা সন্ধিস্থল অনুধাবন করতে পেরেছে গ্রে। কোন হেলাফেলার বিষয় নয় এটা; অতীত, বর্তমান... সবকিছুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই পথ।

কয়েক বছর আগে, বোমা বিস্ফোরণে মারা যায় তার মা। সিগমার সাথে শত্রু সংগঠন গিল্ডের রেশারেশির বলি হতে হয় তাঁকে। এখনও গ্রে অনুশোচনার রেশ কাটাতে পারেনি। তবে বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা আলাদা। এক্ষেত্রে ঘটনাটার পেছনে গ্রে-র প্রত্যক্ষ হাত আছে। অ্যালঝেইমারে ভুগে ভুগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। অবশেষে বাবাকে অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে মাত্রাতিরিক্ত মরফিন পুশ করে গ্রে। এজন্য অবশ্য তার মনে কোন অনুশোচনা নেই।

তারপর আঁধারে আলো হিসেবে দৃশ্যপটে উদয় হয় শেইচান। দায়িত্ব-কর্তব্য একপাশে সরিয়ে রেখে, আহ্বান জানায় জীবনটাকে উপভোগ করতে। ঠিক তাই করে গ্রে। মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে পালায় সবকিছু ছেড়ে।

শেইচানের নিজেরও অদৃশ্য হওয়ার পেছনে উপযুক্ত কারণ আছে। গিল্ডের সাবেক আততায়ী ছিল সে। ছোটবেলা থেকে ওরাই ওকে নিজেদের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে বড় করেছে। সিগমার সাথে কয়েকবার সংঘর্ষে জড়ানোর পর, অবশেষে দলবদল করে কুখ্যাত শেইচান। আনঅফিশিয়ালি ওকে

সিগমায় ঢুকিয়ে নেন পেইন্টার ক্রো। গিল্ড ধ্বংসের পেছনে মেয়েটার বেশ বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু অতীতের পাপ এতে স্খলন হয়নি। এখনও ও অনেক দেশের মোস্ট-ওয়ান্টেড তালিকার প্রথম সারিতে। দেখা-মাত্র খুন করার নির্দেশও রয়েছে মোসাদের তরফ থেকে।

তাই একসাথে নিরুদ্দেশ হয়েছে ওরা। নিজেদের ক্ষত পূরণ হওয়ার সময় দিচ্ছে, চিনছে-জানছে একে অন্যকে। কেউ খোঁজ করেনি... এমনকি গ্রে নিজের বাবার শেষকৃত্যে অনুপস্থিত থাকার পরও না। তার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছে সবাই।

গত নয় মাস ধরে ভুয়া নাম আর পাসপোর্টে ভ্রমণ করছে দু'জন। কিন্তু গ্রে জানে, কর্তব্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে সিগমা অবশ্যই তার খোঁজ রাখছে। এই সংস্থাটা অনেকটাই পরিবারের মতো।

কিন্তু মনের গহীনে গ্রে জানে-এই ঘোরাফেরা, সময় কাটানো আসলে একটা বিরতি ছাড়া কিছুই না। আবারও পৃথিবীকে বাঁচাতে তার ডাক পড়বে। হয়তো খুব শীঘ্রই। বেশ কিছুদিন ধরে মনটা কেমন খচখচ করছে। আগাম সতর্কবার্তা। কোথাও যেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বুঝতে পারছে, শেইচানেরও একই অনুভূতি। এমনিতে শান্ত দেখালেও মেয়েটার অবস্থা এখন খাঁচায় পায়চারিরত সিংহীর মত। জানে, যে কোনও সময় ডাক আসবে। উন্মুখ হয়ে আছে সেই আহ্বানের জন্য।

আমিও... মনে মনে ভাবল গ্রে।

কে জানত, ডাক আসার আর দেরি নেই!

গুড়গুড় আওয়াজে হঠাৎ সৈকতের নীরবতা ভঙ্গ হলো।

সোজা হয়ে বসল গ্রে। আর্মি রেঞ্জারে থাকার সময় থেকে এমন অভ্যাস। অনাগত বিপদে শরীরে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সাড়া জাগে। হাড়ের মজ্জায় মজ্জায় প্রবাহিত হচ্ছে সতর্ক-সঙ্কেত। শক্ত হয়ে এসেছে মাংসপেশি। দৃস্টিসীমা প্রসারিত। এক মুহূর্তের নোটিশে কাজে নামার জন্য প্রস্তুত।

কাইহালুলু উপসাগর ধরে এগিয়ে আসছে তিনটা প্রপেলার-চালিত বিমানের ছোট্ট একটা গ্রুপ। দূর থেকে দেখে 'সেসনা' বলে মনে হলো। দ্বীপে এই ধরণের বিমান ওড়া অস্বাভাবিক কিছু না। তবে পরস্পরের মাঝে মাপা ফাঁক রেখে এগোচ্ছে বাহনগুলো, যেন চালকদের সামরিক প্রশিক্ষণ আছে।

'দর্শনার্থীদের দল নয় এটা,' গ্রে-র দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলল শেইচান। 'তোমার কী মনে হয়?'

দ্বীপের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে দু'দিকের দুটো বিমান ডানে আর বামে সরে গেল। মাঝেরটা অবশ্য নিজের লক্ষ্য ধরে রেখেছে-সরাসরি ওদের টিলার দিকে। এক নজরে বেশ কয়েকটা বিষয় খেয়াল করল গ্রে: বিমানগুলো সেসনা নয়,

গঠন আর পাইপ দিয়ে বেরোনো ধোঁয়ার প্রকৃতি দেখে বোঝা গেল সেসনারই এক জ্ঞাতিভাই এরা-টিটিএক্স। মূল কাঠামোর নিচে প্রত্যেকটা বিমান অতিরিক্ত বিশাল ব্যারেল বহন করছে।

কি হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল, ব্যারেলগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে কালচে-ধূসর কুয়াশার মতো কিছু। পানির উপর নেমে ঝুলতে লাগল উচ্চচাপে নির্গত ধোঁয়ার মতো পদার্থটা। সন্ধ্যার ভারী বাতাসে ভর করে আস্তে আস্তে দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে।

নিজের কাজ শেষ করে মাঝের বিমানটা কিন্তু থেমে নেই... ক্রমে এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকে। কমিয়ে আনছে উচ্চতা। তবে গতি বিন্দুমাত্র কমায়নি। গ্রে ধারণা করল, কাউইকি হেড আর দ্বীপের গাছগাছালির মাথা ঘেঁষে উড়ে যাবে।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিল বিমানটা, উচ্চতা আরও কমিয়ে এনে একপাশের টিলার ঢালে নাক গুঁজল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠেছে চারপাশ। আকাশে ডানা মেলেছে বিশালাকৃতি আগুনের কুণ্ড। সেই সাথে আছে কালচে ধোঁয়া। শেইচানকে বুকে জড়িয়ে বালুতে গা মিশিয়ে দিল গ্রে। গায়ের উপর থাকা কম্বলটা ব্যবহার করছে ছিটকে ওঠা ডালপালা আর বালুর বিরুদ্ধে পলকা ঢাল হিসেবে।

এক মুহূর্ত পর আরও দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল। তার মানে বাকি দুটো বিমানও জাতভাইয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।

তবে মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি গ্রে। তার নজর নিবদ্ধ খোলা সাগরের দিকে। বিমানের ট্যাঙ্ক থেকে নির্গত কালচে কুয়াশা বাতাসে ভর করে এগিয়ে আসছে।

ডানদিকের জঙ্গল থেকে ডানা মেলেছে একটা সাদা বক। আগুন আর ধোঁয়ার কবল থেকে রক্ষা পেতে এগোচ্ছে খোলা বাতাসের উদ্দেশ্যে। সাগরের কাছাকাছি পৌঁছে কুয়াশার আগমন টের পেল পাখিটা। বাড়িয়ে দিল ডানা ঝাপটানোর গতি, যাতে নির্বিঘ্নে বাধাটা পেরিয়ে যেতে পারে।

চালাক পাখি, গ্রে ভাবল।

নিরাপদেই কুয়াশার সারি পেরিয়ে গেল বকটা। তবে খানিক দূর এগোনোর পরই, শিকারির মতো কুয়াশার একটা রেখা পাখিটার পিছু নিল। ধোঁয়াশার সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে কমে এল পাখিটার গতি। যেন খেই হারিয়েছে। মাতালের মতো কয়েকবার ডানা ঝাপটে অবশেষে আছড়ে পড়ল সাগরের বুকে ঝুলতে থাকা উন্মত্ত কালো কুয়াশায়।

'বিষ!' আঁতকে উঠল শেইচান।

গ্রে অবশ্য প্রেমিকার কথার সাথে একমত না। কুয়াশার সারিকে পাখিটার পিছু নিতে লক্ষ্য করেছে ও। তবে যাই হোক... আসল কথা, ওরা ঝামেলায় আছে।

পর্যায়ক্রমে ডানে-বামে চোখ ফেরালো সিগমা কমান্ডার। বিধ্বস্ত হওয়ার আগে বিমান তিনটা প্রায় এক মাইল জায়গা জুড়ে কালচে মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। আর ওরা দু'জন আছে কুয়াশার গতিপথের একেবারে মাঝখানে।

প্রতি মুহূর্তে দ্বীপে সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনছে কালো মেঘ। কয়েক সেকেন্ড পর ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে কানে এল বোঁ-বোঁ শব্দ।

ভ্রূকুটি করল গ্রে।

হচ্ছেটা কী এসব!

আরও কাছে আসার পর দেখা গেল, কুয়াশা মেঘটা আসলে জীবিত। বাতাসে ভর করে না, বরং ওরা আসছে নিজেদের ডানায় ভর করে।

পতঙ্গের একটা ঝাঁক, গ্রে উপলব্ধি করল।

বিপদের স্বরূপ ধরতে পেরে এখন সম্ভাবনার দিকে মনোযোগ দিল সিগমা কমান্ডার। টিলার ট্রেইল ধরে এগোনো যাবে না। ওদিকে এগোলে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানোর আগেই ঝাঁকটা হামলা করে বসবে। হতভাগ্য বকের মতো পরিণতি বরণ করতে হবে ওদের।

স্বীকার না করে উপায় নেই...

ফাঁদে পড়ে গেছে দুই কপোত-কপোতী।

পথ-প্রদর্শক

অন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে উপকূলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে গতির জন্য তৈরি মসৃণ শরীরটা। বাতাসে বিরতিহীনভাবে ঝাপটে চলেছে ক্ষুদে ক্ষুদে ডানা। তবে সামনে এগোনোর ক্ষেত্রে ডানার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে আদিম প্রবৃত্তি। রাখবে না-ই বা কেন? ব্যাপারটা যে জিনের ভেতর হাজার বছর আগে কোড করে লিখে রাখা।

লক্ষ্য পুরণের উদ্দেশ্যে পথ-প্রদর্শকের শরীর বিশেষভাবে গঠিত। জাতভাইদের তুলনায় অ্যান্টেনাগুলো আকারে বড়। শেষ মাথায় ভঙ্গুর কিছু পশম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কম্পন চিহ্নিত করতে সক্ষম ওগুলো। মাথার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে চোখ, লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে বিরতিহীনভাবে। ডানাগুলো ছোট হলেও বুকের অংশটা আকারে বড়, পেশীবহুল... বাতাসে দৈহিক স্থিরসাম্য রক্ষায় একেবারে নিখুঁত। ধরের শেষে ফেরোমন গ্রন্থিযুক্ত সরু পেট। তবে কোন হুল নেই। কারণ, এই পথ-প্রদর্শকের কাজ যুদ্ধ করা না।

ক্ষুদ্র জীবনে এর একটাই লক্ষ্য-সংবেদনশীলতা শোষণ করা। সারা গায়ে ছড়িয়ে আছে চুলের মতো দেখতে সেনসিলাই। জিনিসগুলোর কাজ হচ্ছে আশেপাশে সূক্ষ্ম রাসায়নিক কিংবা তাপমাত্রাজনিত পরিবর্তন চিহ্নিত করা। পশমগুলো অবশ্য আওয়াজ শোনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, তবে এই কাজের জন্য মাথার দু'পাশে পর্দা দিয়ে ঘেরা আলাদা ফাঁপা প্রকোষ্ঠ আছে। মুখের সেনসিলাইগুলো বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করতে সক্ষম। ধরতে পারে খাবার, পানি কিংবা আশেপাশের সঙ্গীদের দেহনিঃসৃত ফেরোমনের গন্ধ।

এই গন্ধের মাধ্যমেই পাশাপাশি উড়তে থাকা জাতভাইদের অবস্থান মগজে গেঁথে নিচ্ছে প্রাণীটা।

পুরো তথ্য নিজে আয়ত্ত করে নেয়ার পর শুরু হলো পরিবহন। ফেরোমন নি:সরণের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো প্রয়োজনীয় নির্দেশ। যোগাযোগের সহায়ক হিসেবে পাশাপাশি ডানা আর পেছনের পায়ের নড়াচড়া তো আছেই।
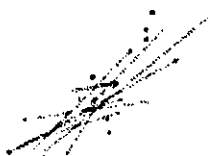
একে একে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তথ্যগুলো।

এভাবেই এদের একজনের জ্ঞান মুহূর্তের মধ্যে সবার কাছে সঞ্চারিত হয়। সময়ের সাথে সাথে পথপ্রদর্শকের শোষণক্ষমতা পৌঁছে গেছে সর্বোচ্চ সীমায়, এবং একই সাথে সম্প্রচার করছে শোষণের সমপরিমাণ তথ্য।

এবার স্বতন্ত্রতা হারাতে শুরু করল পথ-প্রদর্শক প্রাণীটা।

সামনে এগোনোর সাথে সাথে বাড়ছে তথ্য স্থানান্তরের গতি। পুরো ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে একটা উদ্দেশ্য।

দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে পাল্লা দিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে সেই লক্ষ্য। কমে আসছে তথ্যের মাঝে থাকা ফাঁকা জায়গাগুলো। অবশেষে এক সময় হাজারো চোখে ধরা পড়ল সাগরের বুকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা দ্বীপটা।
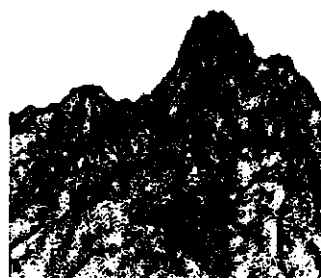
ঝাঁকটা নতুন আবাসস্থলে এসে পড়েছে। ক্রমে তীব্র হচ্ছে পাতা আর জীবজন্তুর গায়ের ঘ্রাণ। এরা হাজির... যার অর্থ, বাকি কারও আর এখানে থাকা চলবে না। ঝাঁকটার নিঃশ্বাস, ডানার আওয়াজই বাকিদের জন্য মৃত্যুঘণ্টাস্বরূপ। হাজার বছর ধরে তাই হয়ে আসছে।

নিজের দায়িত্ব শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে গতি কমিয়ে আনল পথ-প্রদর্শক। একই কাজ করছে এই দলের বাকিরা। ঝাঁক ছেড়ে সবগুলো শরীর এক সময় লুটিয়ে পড়ল সাগরের নোনা পানিতে।

এদের কাজ শেষ!

এবার আগে বাড়ল অন্য আরেকটা দল। এদের জীবনের লক্ষ্য-ঝাঁকটার জন্য পথ পরিষ্কার করা এবং কোন হুমকি দেখলে তার প্রতিকার করা।

ঝাঁকের আগে আগে চলেছে নতুন দলের একজন। আকারে বাকিদের তুলনায় সামান্য বড় এটা। ইতিমধ্যে পেট কুঁকড়ে নিয়েছে, বের করে এনেছে বিষগ্রন্থি সমেত সূঁচালো হুল।

দলের নিরাপত্তা এখন তার কাঁধে...

সে যে যোদ্ধা!

অধ্যায় চার

৬ মে, সন্ধ্যা ৬:৩৪
হানা, মাউই দ্বীপ

শেইচান বুঝতে পারল, সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

'ওয়েটস্যুটের কথা ভুলে যাও,' বিকিনির ফিতা বাঁধতে বাঁধতে প্রেমিককে সতর্ক করল ও। দৃষ্টি ক্রমাগত এগিয়ে আসতে থাকা ঝাঁকটার উপর নিবদ্ধ।

শর্টস পরে স্যুটের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল গ্রে, শেইচানের কথায় থামল। গত কয়েক সপ্তাহ সূর্যের আলো মাখায় উজ্জ্বল তামাটে রঙ ধারণ করেছে তার শরীর। চুলের বাদামী রঙও আরেকটু হালকা হয়েছে, লম্বায় ছুঁয়েছে ঘাড়। গালে কয়েকদিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। নীল চোখের মণিতে সতর্কতা।

ব্যস্ত হাতে বালু থেকে একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক তুলে নিল সিগমা কমান্ডার। বয়্যান্সি ভেস্ট আটকানোই আছে, কাঁধ গলিয়ে ফিতা আটকে নিতেই পানিতে নামার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

শেইচান এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে বালু থেকে তুলে মাথায় আটকে নিয়েছে মাস্ক। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটা পরে নিল নিজে।

ওদিকে একেবারে পানি ছুঁই ছুঁই করছে এগিয়ে আসা ঝাঁকটা। উপরদিকেও বিস্তৃতি প্রায় টিলার সমান উচ্চতায়। মৃদু গুঞ্জনের আওয়াজ এখন যেন গর্জনে পরিণত হয়েছে। বাতাসে অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ, অনেকটা ময়লা পাঁকের উপর ফুটে থাকা ল্যাভেন্ডারের মতো।

গন্ধটা নাকে আসার সাথে সাথে কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি পেল শেইচান। তবে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই। হাতের উপরের অংশে ধাক্কা খেয়েছে কিছু একটা, এবং তারপর আটকে আছে ওখানেই। আঘাতটা অনেকটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাড়ি দেয়ার মতো। মাথা নিচু করল সাবেক আততায়ী। বোলতার মতো একটা পতঙ্গ আটকে আছে হাতের বাইসেপে। আকারে বিশাল, প্রায় হাতের বুড়ো আঙুলের সমান। পাখা বাতাসে ঝাপটাচ্ছে। কালো, চকচকে পেটে লালচে ডোরাকাটা দাগ।

পতঙ্গটার আকার দেখে ঘাবড়ে গেছে শেইচান। তাই প্রতিক্রিয়া দেখাতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু প্রাণীটা নিজের খেল দেখাতে দেরি করেনি। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে হুল ঢুকিয়ে দিয়েছে শিকারের গায়ে।

ব্যাথার ধাক্কাটা এল তাৎক্ষণিকভাবে। যেন কাটা ক্ষতস্থানে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি দিয়্যে ছ্যাকা দিচ্ছে কেউ।

খাবি খেতে খেতে বালুতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেয়েটা। আগুনের আঁচ সারা হাতে ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যথার তীব্রতায় মনে হলো, হাড় থেকে আলাদা হয়ে খসে পড়ছে মাংস।

গোড়ালি দিয়ে পতঙ্গটাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করল গ্রে। ঝুরঝুরে বালুতে ডুবে গেল প্রাণীটার দেহ। তবে ডানা ভেঙে গেলেও পরমুহূর্তে আবারও ছুটে এল শেইচানের দিকে। এবার এক লাথিতে গ্রে বালুসমেত পতঙ্গটাকে পাঠিয়ে দিল সাগরে।

পলকা কাঠির মতো শরীরের একপাশে ঝুলছে শেইচানের আঘাতপ্রাপ্ত হাত। ক্রমে বাড়ছে ব্যাথার রেশ। গাল বেয়ে পানির ধারা নেমেছে মেয়েটার। এরকম যন্ত্রণা আগে কখনও অনুভব করেছে কি না, মনে নেই। ইচ্ছা করছে কুড়াল দিয়ে হাতটা কেটে ফেলে।

কাঁপতে থাকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনমতে প্রেমিকের নাম ধরে ডাকল সাবেক আততায়ী। 'গ... গ্রে...'

ট্যাঙ্কসমেত মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিল সিগমা কমান্ডার। 'পানির নিচে চলে যেতে হবে আমাদের।'

পরিকল্পনা এটাই ছিল–স্কুবা গিয়ার পরে সাগরে নেমে যাওয়া। মাথা নেড়ে সায় দিল শেইচান। কিন্তু শরীরের মাংসপেশীগুলো যেন সব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

ঝাঁকটা পৌঁছে গেছে। বালুতে, গাছে, ঝোপে আছড়ে পড়ছে একের পর এক পতঙ্গ। প্রেমিকাকে নিয়ে শেষ কয়েক কদম ছুটে পার হলো গ্রে, তারপর ডুব দিল সাগরে।

পানির নিচেও সমানতালে জ্বলতে থাকল শেইচানের জখমী হাত।

সন্ধ্যা ৬:৩৭

একটু ধৈর্য ধরো, প্রিয়তমা, সামলাও নিজেকে...

শেইচানকে আঁকড়ে ধরে এক হাতে নিজের মাস্কটা মুখে বসিয়ে নিল গ্রে, তারপর পা ছুঁড়ল গভীর পানির উদ্দেশ্যে। দু'জনের ট্যাঙ্ক আর বয়্যান্সি ভেস্টের সম্মিলিত

ওজনও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ফাঁকে দেখে নিল, প্রেমিকার মাস্কটা জায়গামতো বসেছে কি না।

কেঁপে উঠল শেইচানের শরীরটা। বিষের প্রাথমিক ধাক্কাটা থিতিয়ে আসছে। চোখ খোলা, তবে দৃষ্টি বিভ্রান্ত। ঘোর কাটেনি এখনও।

হাতে সাবেক আততায়ীর আঙুল চেপে বসা লক্ষ্য করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রে।

হুঁশ ফিরছে...

রেগুলেটরের দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার। ইশারার ভাষায় প্রশ্ন করল, নিজে নিজে সামলে নিতে পারবে কি না। প্রশ্নটা বুঝতে পেরে হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়ল শেইচান।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। তবে পানি এখনও পরিষ্কার। উপরে তাকাতে আবছাভাবে দেখা গেল সৈকত অতিক্রমরত পতঙ্গের ঝাঁক। আকারে বেশিরভাগই ক্ষুদ্র, তবে শেইচানকে হুল ফোটানোটার মতো বড়ও আছে কিছু। টেক্সাসে বেড়ে ওঠার সময় মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদি বিভিন্ন হুলযুক্ত পতঙ্গের সাথে বেশ ভালো পরিচয় ছিল গ্রে-র। জানে প্রয়োজনে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে প্রাণীগুলো, বিশেষ করে যখন কেউ তাদের চাকে হামলা চালায়। জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়েও রক্ষা পাওয়া যায় না তখন। দল বেঁধে পানির উপর উড়তে থাকে মৌমাছিরা। অপেক্ষা করে, কখন শিকার শ্বাস নেয়ার জন্য মাথা জাগাবে।

সম্ভবত এই ঝাঁকটাও একই পরিকল্পনা ফেঁদেছে।

তবে সৌভাগ্যবশত, ওদের শ্বাস নেয়ার জন্য পানির উপরে ওঠার দরকার নেই।

বয়্যান্সি ভেস্টের ব্লাডারে পানি ভরে নিয়ে উচ্চতা স্থির করল গ্রে। শেইচানেরটাও একই রকম করে দিল তারপর। এখন সাগরতলের চেয়ে ছয় ফুট নিচে আছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখছে প্রেমিকার উপর, জানা নেই বিষের আরও কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কি না।

হুল ফোটার পর মেয়েটার তাৎক্ষণিক অবস্থা লক্ষ্য করেছে গ্রে। আগে একাধিকবার ওকে গুলি খেতে দেখেছে সিগমা কমান্ডার। ছুরিকাঘাত, বর্ষার আঘাতেও শেইচানের গতি বিন্দুমাত্র কমেনি। কিন্তু সামান্য একটা বোলতার হুল একেবারে মেয়েটাকে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল? সম্ভবত প্রাণীটার দেহে বিশেষ কোন জাতের বিষ ছিল। কে জানে, আরও কয়েকটা আঘাতে হয়তো একেবারে হৃৎপিণ্ডই থেমে যেত।

খোলা সাগরে এগোনোর ফাঁকে ফাঁকে মাথার উপরও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে গ্রে। ঢেউয়ের নড়াচড়া ছাপিয়ে আবছা আবছা পতঙ্গের ঝাঁকটা চোখে পড়ছে এখনও।

বিপজ্জনকভাবে পানির তলের উপর ঝুলে আছে দলটা। সম্ভবত আকারে বড় পতঙ্গগুলো আগে গিয়ে বাকি ঝাঁকের জন্য সৈকত পরিষ্কার করছে।

প্রানিগুলোর পরিকল্পনার তারিফ না করে পারল না গ্রে। সোজাসুজি নাক তাক করেছে সামনে। যত তাড়াতাড়ি বোলতাগুলোর ছায়া থেকে বের হওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

কয়েক মুহূর্ত পর সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেল। আলো-আঁধারিতে আর বোঝা যাচ্ছে না, এখনও পতঙ্গগুলো মাথার উপর আছে কি না। পানির উপর মাথা তুলে এলইডি ডাইভ লাইট জ্বালবে কি না, ভাবল গ্রে। তবে আলো দেখে প্রাণীগুলো আকৃষ্ট হলে আবার বিপদ!

তাই এগিয়ে চলার সিদ্ধান্তই জয়ী হলো। পথ দেখাচ্ছে কব্জিতে বাঁধা কম্পাস। তবে অনন্তকাল এভাবে সাঁতার কাঁটা যাবে না। ওয়েটস্যুট ছাড়া অবস্থায় পানির ঠাণ্ডা কাবু করে ফেলবে ওদের, বিশেষ করে শেইচানকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটাকে পানি থেকে তুলে উষ্ণ কোন আশ্রয়ে নিতে হবে।

কম্পাস দেখে দক্ষিণে বাঁক নিল গ্রে। হিসাবে ভুল না হলে এদিকেই মাইলখানেক সামনে, সৈকতে একটা আগ্নেয়গিরির ঢালের উপর বসে আছে ওদের ভাড়া করা কটেজটা।

ক্রমে পানি অন্ধকার হয়ে আসায় ভেস্টের পকেট থেকে ডাইভ লাইটটা বের করে জ্বালল গ্রে। আলোতে চোখ সয়ে আসার পর উন্মোচিত হলো রাতের সাগরের সৌন্দর্য। নিচে বিস্তৃত প্রবালের স্তর। ঢেউয়ের তালে এদিক সেদিক দুলছে নানা জাতের লতা-গুল্ম ও সামুদ্রিক আগাছা। খানিক সামনে নীলচে হাওয়াইয়ান ফ্ল্যাগটেইল মাছের ঝাঁক দেখা গেল, ধীর-স্থির একটা ঈগল-রে মাছকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করেছে। সামনের প্রবালের দেয়াল পার হওয়ার সময় পাশ কাটিয়ে গেল একটা মাঝারি আকারের হোয়াইট শার্ক।

আলোর স্তম্ভের নিচে ডিম্বাকার কয়েকটা অবয়ব, গ্রে অনুমান করল-সম্ভবত কাছিম। মাউইর আশেপাশে এই প্রাণীগুলোকে প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষতিকর কিছু না। তবে যে কোন সময় হাজির হতে পারে সাগরের মূর্তিমান আতঙ্ক। এদিকে মাঝে মাঝে সাঁতারুদের উপর টাইগার আর বুল শার্ক হামলার খবর শোনা যায়।

সবদিকে সতর্ক নজর রাখার ফাঁকে, পেছনে শেইচানের উপরও চোখ রেখেছে সিগমা কমান্ডার। মেয়েটা বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে। হাত তুলে ইশারার ভাষায় সবকিছু ঠিক আছে কি না প্রশ্ন করল গ্রে। জবাবে হুল ফোটানো হাতটা ঈষৎ নাড়ল শেইচান। তবে দুর্বল অঙ্গভঙ্গি। বোঝা গেল, বিষের প্রভাব কমে এলেও সাঁতারের ধকল কাবু করে ফেলছে ওকে।

গতি কমালো গ্রে। প্রেমিকার সাথে এক সারিতে এগোচ্ছে এখন। কম্পাসের রিডিং দেখে জানা গেল, গন্তব্য আর খুব বেশি দূরে নেই।

আধঘণ্টা পর বালুর দেখা মিলল। পানির উপর আগে মাথা জাগাল গ্রে। স্কুবা ট্যাঙ্কের গজ লাল দাগ স্পর্শ করেছে। আর বড়জোর অল্প কিছুক্ষণের বাতাস বাকি ছিল। ভালোয় ভালোয় পৌঁছানো গেছে।

এদিকের আকাশ পরিষ্কার আছে নিশ্চিত হয়ে, শেইচানকে নিয়ে পাথুরে সৈকতে উঠে এল সিগমা কমান্ডার। খুলে রাখল যার যার স্কুবা গিয়ার।

কোমর জড়িয়ে ধরতেই গ্রে টের পেল, শেইচান কাঁপছে। তবে হাত ছাড়িয়ে সৈকতে বসে পড়ল মেয়েটা। ঢালের উপর ওদের কটেজের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'যাও।'

'তোমাকে ছাড়া যাব না। দরকার হলে বয়ে নিচ্ছি।' মুখে প্রেমিকাকে আশ্বস্ত করলেও গ্রে নিশ্চিত না, পুরোটা পথ মেয়েটার ওজন সইতে পারবে কি না। দীর্ঘ পথ সাঁতরে পা দুটো রাবারের তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

'না...' এবার উত্তরদিকে হাত নাড়ল শেইচান। 'বল... বলপার্ক।'

এবার ব্যাপারটা গ্রে-র মাথায় খেলল। আজ সকালে ওয়াকিয়া রোডে গাড়ি পার্ক করেছিল ওরা। রাস্তাটার একপাশে কমিউনিটি সেন্টার, অন্যপাশে [illegible] বল পার্ক। পার্কে নবনির্মিত বেসবল কোর্টের পাশাপাশি একটা ফুটবল মাঠ, গুটিকয়েক টেনিস আর বাস্কেটবল কোর্ট আছে। আজ সন্ধ্যায় ওখানে একটা লিগ টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা। শেইচান প্রস্তাব করেছিল, হটডগ খেতে খেতে খেলা দেখবে।

পার্কটার অবস্থান কল্পনা করল গ্রে। কোনাকুনিভাবে হিসাব করলে, জায়গাটা ওই লাল বালুর সৈকতের মাত্র সোয়া মাইল সামনে। খেলা উপলক্ষ্যে এখন ওখানে প্রচুর লোক সমাগম হওয়ার কথা। সেই সাথে আলোকসজ্জা, গানবাজনা, হইচই...

'একটা মোটরসাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি যাও,' শেইচান প্রস্তাব করল। 'ওদের সতর্ক করতে হবে।'

কটেজের দিকে চোখ ফেরাল গ্রে। কয়েকটা মোটরসাইকেল ভাড়া করে রাখা আছে ওদের, যাতে গাড়ি চলার তুলনায় সরু ট্রেইল বেয়ে চলাচল করতে কোন সমস্যা না হয়। তারপর প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল শেইচানের দিকে।

প্রেমিকের চোখে চোখ রেখে ভ্রূকুটি করল মেয়েটা। 'নিজে নিজেই ওখানে পৌঁছাতে পারব আমি। তবে ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগবে। সিগমার সাথে যোগাযোগ করে বলব, স্থানীয় সতর্কবার্তা জারি করতে। তুমি দেরি হওয়ার আগেই রওয়ানা হও।'

মাথা নেড়ে সায় দিল সিগমা কমান্ডার। যুক্তি আছে।

ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে, দশ মিনিট পর খেলা শুরু হবে। সময়মত হয়তো পৌঁছানো যাবে না, তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। চোয়াল শক্ত করে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল গ্রে।

ট্রেইলের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, শেইচান নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শরীরে মৃদু কাঁপুনি থাকলেও, স্থির মুখে সংকল্পের কঠোর ছাপ। চোখাচোখি হলো। দু'জনেই উপলব্ধি করতে পারছে তিক্ত সত্যিটা।

ডাক এসেছে তাদের... ছুটি শেষ।

অধ্যায় পাঁচ

৭ মে, রাত ১:৫৫
ওয়াশিংটন ডি.সি.

মাসের পর মাস ধরে এই ফোনকলের অপেক্ষা করছিলেন পেইন্টার ক্রো।

কমান্ডার গ্রে পিয়ার্সের সাথে বিপদ-আপদের আত্মার সম্পর্ক। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই কীভাবে যেন বেচারার কাছে পৌঁছে যায় সবসময়। তাই সিগমা ফোর্সের ডিরেক্টর হিসেবে, কর্তব্যের খাতিরেই দলের কমান্ডারের ট্রেইলের খোঁজখবর রাখছিলেন পেইন্টার। শুধু বুঝতে পারছিলেন না, এবারের ঝামেলাটা কীসের রূপ নিয়ে হাজির হবে। অবশেষে এসে গেছে খবর।

শেষপর্যন্ত বোলতার ঝাঁক?

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথার চুলে হাত বুলালেন সিগমা ডিরেক্টর। দশ মিনিট আগে শেইচানের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। ইতিমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছেন ডারপাসহ হাওয়াইয়ের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে। নিজের ডেস্কে বসে এখন ভাবছেন সাবেক আততায়ীর বলা কথাগুলো সম্পর্কে।

এটা প্রকৃতির কোন খেয়াল নয়... জৈবিক আক্রমণ।

দরজায় টোকার পড়ার আওয়াজে সম্বিত ফিরল। ঘরে ঢুকেছে হালকা-পাতলা একটা অবয়ব-সিগমা ফোর্সের সেকেন্ড ইন কমান্ড, ক্যাথরিন ব্রায়ান্ট। এই মাঝরাতেও মেয়েটার কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুল পেছনে ঝুঁটি করে বাঁধা। পরনে গাঢ় নীল রঙের স্যুট, সাদা ব্লাউজ আর কালো স্কার্ট। পায়ে কালো চামড়ার জুতো। সারা গায়ে রংচঙে জিনিস বলতে কোটের ল্যাপেলে আটকানো সোনালি একটা পিন। নেভাল ইন্টেলিজেন্সে থাকার সময়, একটা অপারেশনে তার এক সঙ্গী মারা যায়। সেই থেকে মৃত বন্ধুর স্মৃতি রক্ষায় পিনটা পরে ক্যাথরিন ওরফে ক্যাট ব্রায়ান্ট।

বেশ কয়েক বছর আগে সিগমার পরিস্থিতি-বিশ্লেষক পদে ক্যাটকে নিয়োগ করেছিলেন পেইন্টার। একেবারে শুরু থেকে অসাধারণ কাজ দেখিয়ে আসছে মেয়েটা, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে হয়ে উঠেছে বিভিন্ন অপারেশনের ঐচ্ছিক অংশ।

'দ্বীপগুলোতে বেশ বড় রকমের ঝামেলা পাকিয়েছে,' ক্যাট বলল।

'মানে?'

এগিয়ে এসে হাতের ট্যাবলেটটা দেখাল ক্যাট, তারপর ইঙ্গিত করল পেইন্টারের অফিসের দেয়ালে আটকানো মনিটর তিনটার দিকে। পর্দায় হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিস্তারিত মানচিত্র ভাসছে। চোখ সরু করে মনিটরের দিকে তাকালেন পেইন্টার। তিনটা বড় দ্বীপে লাল বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করা।

'শুধু মাউই দ্বীপটাই আক্রমণের শিকার হয়নি,' দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব অংশের একটা লাল দাগের দিকে ইশারা করল ক্যাট। এখানেই আক্রমণের খবর জানিয়েছিল শেইচান। 'ওয়াহু এবং হাওয়াইয়ের বড় দ্বীপটাতেও একই ধরণের হামলা হয়েছে।'

উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার, এগোলেন মনিটরের দিকে। তিনি ভেবেছিলেন- ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সম্ভবত কোন পাতি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কাজ।

মানচিত্রে প্রদেশের রাজধানী-হনুলুলুর দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাট। 'ডায়মন্ড হেডের দিকে একটা সেসনা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, মাউইতে ঘটা বিস্ফোরণগুলোর কাছাকাছি সময়ে।' তারপর আঙুল তাক করল বড় হাওয়াইয়ান দ্বীপটার দিকে। 'হাইলো-তে, একটা হাসপাতাল থেকে তাৎক্ষণিক সাহায্য চেয়ে খবর পাঠানো হয়েছে। বোলতার হুলের শিকার হওয়া মানুষে ভরে গেছে হাসপাতালটা। কয়েকজন নাকি মারাও গেছে।'

শেইচানের সতর্কবার্তা মনে করলেন পেইন্টার।

এটা প্রকৃতির কোন খেয়াল নয়...

সম্ভবত ওর ধারণাই সত্যি। এই আক্রমণ পূর্বপরিকল্পিত।

বলে চলেছে ক্যাট। 'কাওয়াই-সহ অন্যান্য ছোট দ্বীপগুলো থেকে এখনও কোন খবর আসেনি, তবে আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আসবে। জেসনের মাধ্যমে হাওয়াইয়ের সব ধরণের গণমাধ্যম, নিরাপত্তা বাহিনী ইত্যাদির উপর চোখ রেখেছি আমি।'

'কিন্তু ওখানে কেন?' পেইন্টার অনেকটা আপন মনেই প্রশ্নটা করলেন। 'ওই দ্বীপগুলোকে কেন লক্ষ্য বানানো হলো?

'সেটা ধারণা করার মতো তথ্য এখনও হাতে এসে পৌছায়নি,' মানচিত্রটা ভালো করে দেখল ক্যাট। 'তবে হাওয়াই দুর্গম অঞ্চল। এটা একটা কারণ হতে পারে। জনবহুল পরিবেশে অচেনা কোন প্রজাতির বিষাক্ত পতঙ্গ, ওই প্রদেশের বাস্তুতন্ত্রে বেশ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে।'

শীতল একটা স্রোত ছড়িয়ে পড়ল পেইন্টারের গায়ে। তবে এই ব্যাপারে ভাবার আগে আরও একটা প্রশ্ন আছে।

'কীসের সম্মুখীন হয়েছি আমরা?' জানতে চাইলেন তিনি। 'দ্বীপগুলোতে কী ছাড়া হয়েছে ওগুলো?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ক্যাট। 'ন্যাশনাল জু-র পতঙ্গবিশারদ, ডক্টর স্যামুয়েল বেনেটের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি। নিজের কর্মক্ষেত্রে তার বেশ সুনাম আছে। শেইচানের যেমনটা বর্ণনা দিয়েছে, খুব বেশি প্রজাতির বোলতা ওরকম বড় হওয়ার কথা না।'

'ভালো,' সায় দিলেন পেইন্টার। 'যত তাড়াতাড়ি জানতে পারব-আমরা আসলে কীসের মোকাবেলা করছি, ততই মঙ্গল।'

সিগমার কার্যালয় স্মিথসনিয়ান ক্যাসলের গভীরে হওয়ায় একটা ব্যাপারে বেশ সুবিধা হয়েছে। স্মিথসনিয়ান ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ল্যাব এবং রিসার্চ সেন্টারের সাথে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করা যায়। ন্যাশনাল জু-ও তাদের মধ্যে অন্যতম।

এই অবস্থান থেকে দেশের ক্ষমতার উৎস অর্থাৎ ক্যাপিটল হিল এবং হোয়াইট হাউজ প্রভৃতির সাথেও যে কোন সময় সংস্পর্শে আসতে পারে সিগমা। পেইন্টার নিশ্চিত, এতক্ষণে তার উপরস্থ কর্মকর্তা-ডারপার ডিরেক্টর জেনারেল গ্রেগরি মেটকাফ সরকারী প্রয়োজনীয় সব জায়গায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তবে সরকারী মেশিনের এই চাকাগুলো বড্ড ধীরে ঘোরে।

মূলত এজন্যই সিগমার ফোর্সের উৎপত্তি। দলটার উদ্দেশ্যে, যখন যেখানে দরকার... সেখানেই তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেয়া। দিন দিন উন্নততর হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। এই অবস্থায় আমেরিকার এমনই একটা দল বিশেষভাবে দরকার ছিল। সিগমার মিশনের মূলনীতি: আগে ঘটনাস্থল।

ফোনের কেঁপে ওঠা লক্ষ্য করে স্ক্রিনে চোখ বুলালো ক্যাট। 'ড. বেনেট।'

'লাউডস্পিকারে দাও।'

সায় দিয়ে কলটা রিসিভ করল ক্যাট। 'ফিরতি ফোন করার জন্য ধন্যবাদ, ড. বেনেট।'

'আমার সহকারী ফোনে আপনাদের কথা বলল। ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিদিন তো আর ডারপা থেকে জরুরি খবর আসে না। তাও আবার মাঝরাতে।'

'তারপরও, সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলে ক্যাট পেইন্টারের দিকে ফিরল। 'আমার বস লাউডস্পিকারে আমাদের সাথে আছেন।'

'ওহ, ঠিক আছে,' সায় দিলেন ডক্টর। 'তাহলে বলুন, ব্যাপারটা কী?'

'আমার পাঠানো বোলতার বিবরণ পেয়েছেন?'

আবারও সায় দিলেন প্রফেসর। 'হ্যাঁ। এই অসময়ে ফোন করার পেছনে এটাও একটা কারণ। মাসখানেক আগে একই ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি। ঠিক আপনাদের বর্ণনার মতো পতঙ্গের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল এক লোক... তিন ইঞ্চির মতো লম্বা, কালো শরীর, পেটে লাচ ডোরাকাটা দাগ।'

ফোনের দিকে ঘেঁষলেন পেইন্টার ক্রো। 'কে জানতে চেয়েছিল?'

'জাপান থেকে কেউ একজন। একটা ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানির হয়ে কাজ করত। একটু অপেক্ষা করুন, কম্পিউটারে মেইল দেখে বিস্তারিত বলছি।'

অপেক্ষার ফাঁকে পেইন্টারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ক্যাট।

কেউ একজন সিগমার আগে আগে হাঁটছে।

খোঁজাখুঁজি চালাতে চালাতে বেনেট বলে চলেছেন। 'সেই লোকটাকে বলেছিলাম, আপনাদেরও বলছি-হাইমেনোপটেরা প্রজাতির কোন পতঙ্গ এই ধরণের বৈশিষ্টের অধিকারী হয় না। অতিকায় এশিয়ান বোলতাকে কাছাকাছি ধরা যায়, দৈর্ঘে এরা তিন ইঞ্চি লম্বা হতে পারে, তবে গায়ের রঙ হলুদের সাথে কালোর মিশ্রণ। আরেকটা জাত হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশি দেশ মেক্সিকোর টারান্টুলা হক বোলতা। দুই ইঞ্চি লম্বা, বিষাক্ত হুল, গায়ের রঙ নীলাভ কালো। ডানা কমলা।'

এই পতঙ্গগুলোর কোন একটা তার গায়ে লেপ্টে আছে কল্পনা করে শিউরে উঠলেন পেইন্টার।

বলে চলেছেন ডক্টর। 'নমুনা পেলে আমার জন্য সুবিধা হত। হতে পারে নতুন এই পতঙ্গটা ওই প্রজাতি দুটোরই কোন অপভ্রংশ। জিনগতভাবে স্বগোত্রীয়, তফাৎ শুধু গায়ের রঙে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট। 'দুর্ভাগ্যবশত আমরা আপনার জন্য কোন নুমনা সংগ্রহ করতে পারিনি, ডক্টর।'

'এই তো পেয়েছি মেইলটা,' বেনেটের কথায় প্রসঙ্গে ছেদ পড়ল। 'গবেষকের নাম কিন মাতসুই। করনেল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, কীটবিদ্যা বিভাগ।'

ভ্রূকুটি করলেন পেইন্টার। 'আপনি তো বলেছিলেন অনুরোধটা পেয়েছিলেন জাপান থেকে।'

'হ্যাঁ,' ডক্টর সায় দিলেন। 'তানাকা ফার্মাসিটিক্যালসের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ভদ্রলোক। মেইলটা জাপানের কিয়োটো থেকে করা। চাইলে তার সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আপনাদের দিতে পারি।'

'খুব ভালো হয় তাহলে,' ক্যাট বলল। কাজ শেষে ডক্টরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নামিয়ে রাখল ফোন। তারপর তাকাল পেইন্টারের দিকে। 'আপনার কী মনে হয়?'

'আজকের হামলার আগে কেউ এই প্রজাতিটা নিয়ে ভালো রকম ঘাঁটাঘাঁটি করেছে,' চেয়ারে বসতে বসতে বললেন সিগমা ডিরেক্টর। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই প্রফেসর কিন মাতসুইয়ের সাথে কথা বলতে হবে।'

'দেখছি,' বলে চলে যেতে উদ্যত হলো ক্যাট। কিন্তু ফিরে তাকাল প্রায় সাথে সাথে। 'গ্রে আর শেইচানের ব্যাপারে কী করা যায়?'

পেইন্টার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। গত নয় মাস ধরে শুধু গা ঢাকা দিয়ে থাকা দুই এজেন্টের ট্রেইল জেনেই সন্তুষ্ট থাকেননি তিনি, ক্রমান্বয়ে সিগমার একজন এজেন্টকেও তাদের কাছেপিঠে মজুদ রেখেছিলেন। প্রথমে দায়িত্বটা চাপে ক্যাটের স্বামী মঙ্ক কক্কালিসের ঘাড়ে। ব্যক্তিগতভাবে ও গ্রে-র খুব ভালো বন্ধু। প্যারিসে ইন্টারপোলের সাথে একটা প্রাণী পাচারকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কাজ করার পাশাপাশি, বন্ধুর উপর নজর রাখে মঙ্ক। তারপর পেইন্টার যোগাযোগ করেন টাকার ওয়েইনের সাথে। আফ্রিকায় একটা গেম পার্ক চালায় ও। গ্রে-র ওখানে থাকার সময়, যে কোন দরকারে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল টাকার। এখনও আছে এমন একজন, তবে ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে।

'মাউইর উল্টো দিকে কোয়ালস্কি আছে,' পেইন্টার বললেন। 'ওয়েইলিয়ার একটা রিসোর্টে। ওকে খবর পাঠিয়েছি। কিন্তু হেলিকপ্টারে করেও দ্বীপটা পেরোতে ঘন্টাখানেক সময় লাগবে।'

'তাহলে শেইচান আর গ্রে এখন একা?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সায় দিলেন পেইন্টার। 'তবে গ্রে-র উপর ভরসা রাখা যায়। যতটুকু করা সম্ভব, করবে ও।'

'বিপদে পড়ে যাবে না তো আবার?'

মুচকি হাসলেন সিগমা ডিরেক্টর। 'এরকম পরিস্থিতিতেই স্বরূপে আবির্ভূত হয় কমান্ডার গ্রেসন পিয়ার্স।'

অধ্যায় ছয়

৬ মে, রাত ৮:০২
হানা, মাউই দ্বীপ

হানা হাইওয়ে ধরে উত্তরদিকে মোটরসাইকেল ছুটিয়েছে গ্রে। সর্বোচ্চ গতিসীমা অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। বাতাসে পতপত করে উড়ছে ঢিলেঢালা টি-শার্ট। ভালোমতো জামা-কাপড় গায়ে চড়ানোর সময় হয়নি, পায়ে কোনমতে একজোড়া হাইকিং বুট গলিয়ে দৌড়। নিম্নাঙ্গে এখনও শুধু শর্টস পরা।

হাসেগাওয়া জেনারেল স্টোর অতিক্রম করার সাথে সাথে ব্রেক কষতে হলো। সামনে একের পর এক লাল বাতির সারি... গাড়িঘোড়ার টেইল লাইট। ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছে পুরো রাস্তা।

হেলমেটের ফাঁকফোকর দিয়ে কানে ঢোকা সাইরেনের আওয়াজ গ্রে-কে জমিয়ে দিল যেন। আঁতকে উঠল সিগমা কমান্ডার।

ইতিমধ্যে দেরি হয়ে যায়নি তো?

পার্শ্ববর্তী চার্চের আঙিনা ধরে পরবর্তী রাস্তায় উঠে এল গ্রে। হাওলি রোড নাম এটার। বাঁকটা পেরিয়ে সাথে সাথে মোটরসাইকেলের মুখ ঘোরালো সাইরেন আর দপদপ করতে থাকা লাল আলোগুলোর দিকে। রাস্তাটা একটা হেলথ-কেয়ার কমিউনিটি সেন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে। তবে অতদূর যাওয়ার দরকার নেই। তিনশো গজ এগোলে, হাতের ডানপাশেই তার গন্তব্য-হানা বল পার্ক। পার্কিং লটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা অগ্নিনির্বাপন ট্রাক, সাথে একাধিক অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের গাড়ি। মাথার উপর দিয়ে হলুদ একটা হেলিকপ্টার পেরিয়ে গেল হঠাৎ।

গন্তব্যে পৌঁছে শক্ত হাতে ব্রেক কষল গ্রে। বাইক দাঁড় করানোর সময় নেই, বাহনটা ওভাবে ফেলে রেখে দৌড়ে পার হলো বাকি পথটুকু। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বাবা-মায়ের হাত ধরে ফ্যালফ্যাল চোখে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে ভীত বাচ্চাকাচ্চারা। বেশিরভাগের পরনে লিগের সমর্থক

জার্সি। মানুষে গিজগিজ করছে বাস্কেটবল মাঠের গ্যালারি। মাঠেও আছে বেশকিছু লোক।

খেলা যে বাতিল হয়ে গেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাস্কেটবল মাঠের সামনের ফুটবল মাঠটা যেন কোন পিকনিক স্পট। হাওলি রোডে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা খাবারের গাড়ি। কোন আইসক্রিম, হটডগ, এমনকি বার্বিকিউয়ের দোকানও সাজিয়ে বসেছে ব্যাটারা। মাঠের স্পিকার থেকে হাওয়াইয়ান গানের সুর ভেসে আসছে।

হেলথ-কেয়ার সেন্টারের পার্কিং লটে জটলা করা মানুষজনের দিকে এগোল গ্রে। নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের কারো সাথে কথা বলতে হবে। পাশাপাশি চোখ রেখেছে আকাশে। কিন্তু বোলতার ঝাঁকের কোন উপস্থিতি নজরে পড়ল না কোথাও। উপস্থিত মানুষজনের চোখে-মুখে কৌতূহলের ছাপ থাকলেও, ভয় নেই।

বোলতার আক্রমণ না হয়ে থাকলে এমন জরুরি অবস্থার অবতারণা কেন!

উড়ে যাওয়া হেলিকপ্টারটা সিগমা কমান্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ফড়িংটা সরাসরি এগোচ্ছে কাউইকি হেড পাহাড়ের দিকে। জ্বলতে থাকা হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল, ওখানে ধোঁয়ার মোটা একটা রেখা আকাশে উঠছে।

কাউইকির টিলায় বিমানগুলোর সংঘর্ষের ব্যাপারটা কল্পনা করল গ্রে। এজন্যই তাহলে এখানে এমন সতর্ক অবস্থা। বিস্ফোরণের আওয়াজই আসল কালপ্রিট।

সম্ভবত কর্তৃপক্ষ চাপ দিয়ে খেলা বাতিল করেছে। তবে তার আগেই হাজির হয়ে গিয়েছিল দর্শনার্থীরা। এখন চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই কারো। এগিয়ে যাওয়ার ফাঁকে আকাশের দিকে তাকাল গ্রে।

এই হইচই-হাঙ্গামা বোলতার ঝাঁকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না তো?

হেলথ-কেয়ার সেন্টারের পার্কিং লটে কাঁচা-পাকা চুলের এক লোককে দেখা গেল। হাতে ভাঁজ করা হলুদ রঙের জ্যাকেট। একটা ফায়ার ট্রাকের ড্রাইভারকে চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে। সম্ভবত হানার ফায়ার চিফ ইনি, গ্রে ভাবল। তার ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করতেই যেন রেডিও হাতে লোকটার দিকে এগোল আরেকজন।

'...একেবারে নিচু দিয়ে উড়ছে হেলিকপ্টার। ধ্বংসস্তূপে কোন লাশ পাওয়া যায়নি।' নতুন আসা ফায়ারম্যান বলল।

কাঁধ ঝাঁকাল চিফ। 'তার মানে পাইলট সংঘর্ষের আগে নেমে গেছে।'

সায় দিল ফায়ারম্যান। 'তাই তো মনে হয়।'

গ্রে জানে, এমন কিছু হয়নি। সংঘর্ষটা ও নিজ চোখে দেখেছে। একটাই ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় ব্যাপারটার: আসলে বিমানগুলোতে কোন পাইলট ছিলই না। ড্রোনের মতো ওড়ানো হচ্ছিল বাহনগুলো। সেসনা টিটিএক্সে আধুনিক অটোপাইলট ব্যবস্থা যোগ করা সম্ভব, কিন্তু তারপরও আজকের এই বিমানগুলোর মতো খেল

দেখানো যাবে না। অর্থাৎ কাজটা যে বা যারাই করে থাকুক, বিমানে বেশ কারিকুরি ফলিয়ে নিয়েছে।

'কোন পাইলট ছিল না,' লোক দুটোর সামনে গিয়ে হেলমেট খুলতে খুলতে গ্রে বলল।

নতুন আসা আগন্তুকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলালো দু'জন। সাথে সাথে বিতৃষ্ণায় কুঁচকে ফেলল চোখ। অবশ্য এজন্য তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। গালে কয়েক দিন না-কামানো দাড়ি, অগোছালো চুল, পরনে শর্টস, সাথে আবার হাইকিং বুট... সিগমা কমান্ডারকে এই অবস্থায় আর যাই হোক, বিশ্বাসযোগ্য কেউ বলে মনে হওয়ার কথা না। তাছাড়া স্থানীয়রা আগন্তুকদের খুব একটা ভালো চোখে দেখে না, ডাকে অদ্ভুত একটা নামে-হাওল।

লোক দুটোর মনোভাব বুঝতে পেরে সাথে সাথে নিজের পরিচয় দিল গ্রে। 'বিস্ফোরণের সময় সৈকতে আমি উপস্থিত ছিলাম।' গ্রে পিয়ার্স, সাবেক আর্মি রেঞ্জার। বর্তমানে ডারপার কমান্ডার হিসেবে আছি।' একই সাথে করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে হাতটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল চিফ, চোখে বিরক্ত দৃষ্টি। পার্শ্ববর্তী ফায়ারম্যান অবশ্য থতমত খেয়ে তাকিয়ে আছে এই 'হাওল' এর দিকে। বুঝতে পারছে না কি করবে বা বলবে।

হাত নামিয়ে নিল গ্রে। 'বিশাল একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছেন আপনারা। বিস্ফোরণের চেয়েও বড় বিপদ আসছে সামনে। বিমানগুলো সংঘর্ষ ঘটানোর আগে দ্বীপে বোলতার ঝাঁক ছেড়ে দিয়ে গেছে।'

'বোলতা?' ভ্রূকুটি করল চিফ।

কর্মস্থলের উদ্ধৃতি দিয়ে একটু যা-ও জাতে উঠেছিল সিগমা কমান্ডার, এই কথায় পাশার দান পুরোপুরি উল্টে গেল। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, চিফ তাকে গাঁজাখোর ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না।

ব্যাপারটা গুরুত্ব বোঝানোর মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না গ্রে। 'বেশ বড় আকারের বোলতা। আগে কখনও এমন কিছু চোখে পড়েনি। আমার সঙ্গীর উপর হামলা করেছিল একটা। মারাত্মক বিষ ওগুলোর গায়ে।' বলতে বলতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাচ্চার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমার ধারণা-একটা বা দুটো হুলই এরকম বয়সী কাউকে মেরে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল চিফ। 'এসব ফালতু কথা শোনার সময় নেই।' তারপর তাকাল পাশের জনের দিকে। 'পালু, এই ছাগলকে এখান থেকে বিদায় করো তো।'

ইতস্তত করছে ফায়ারম্যান। এক নজর আকাশের দিকে তাকাতেও ভুলল না।

'মানছি অদ্ভুত শোনাচ্ছে,' গ্রে প্রতিবাদ করল। 'তবে আমার কথাগুলো গুরুত্ব দেয়া উচিত আপনাদের।' শেষের বাক্যটা ফায়াম্যানের দিকে ফিরে বলা। এই লোককে বিশ্বাস করানোই লক্ষ্য এখন। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে জানে, উচ্চপদস্থ কেউ আসলে ক্ষমতার দম্ভে সাধারণ লোকজনের কথা পাত্তা দেয় না।

পালু খানিকটা সদয় হলো। 'চিফ, ব্যাপারটা অন্তত একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত।'

'আরে বোলতার পেছনে ধাওয়া করার মতো আমাদের অত জনবল...'

চিফের কথা শেষ করার আগেই খড়খড় করে উঠল পালুর হাতের রেডিও।

যন্ত্রটা মুখের সামনে তুলে আনল ফায়ারম্যান। 'আবার বলো, চপার ওয়ান।'

কিন্তু জবাব এল সরাসরি। মাতালের মতো দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে হলুদ রঙের হেলিকপ্টারটা। আগু-পিছু করতে করতে কয়েক সেকেন্ড পর আছড়ে পড়ল কমিউনিটি সেন্টারের পেছনের জঙ্গলে। বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেল বাজতে থাকা গান আর সাইরেনের শব্দ। সাথে লাফিয়ে ওঠা আগুনের গোলক তো আছেই।

তবে আসল বিপদ সবে শুরু। আগুনের আলোয় দেখা গেল, দ্বীপের দিক থেকে আকাশ কালো করে ধেয়ে আসছে মেঘের মতো ঘন কি যেন।

আঁতকে উঠল গ্রে। পাশে দাঁড়ানো দুই অগ্নিনির্বাপন কর্মীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

'পৌঁছে গেছে ওরা!'

যোদ্ধা

চার ডানার ক্রমাগত আন্দোলনে, ঝাঁকের সামনে সামনে এগিয়ে চলেছে যোদ্ধা। বাকিদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সংকেত। বুক আর পেটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-যেগুলো দিয়ে শ্বাস নেয়-রাগ আর উত্তেজনায় ক্রমাগত কাঁপছে।

ঝাঁকের সামনে অবস্থান নিয়েছে যোদ্ধার দল। পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করছে পাখার কম্পন আর ফেরোমনের মাধ্যমে। সবার অ্যান্টেনা সরাসরি সামনে তাক করা, গ্রহণ করছে বাতাসে ভাসতে থাকা ঘ্রাণগুলো।

মিষ্টতা...

মাংস...

লবণ...

দলের বাকিদের মাঝে একে একে ছড়িয়ে পড়তে থাকল তথ্যগুলো। অ্যান্টেনার এগারোটা ভাঁজের মাধ্যমে গন্ধগুলোর একটা মানচিত্র তৈরি হচ্ছে মস্তিষ্কে।

ধীরে ধীরে ক্ষুধা বাড়ছে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ক্ষরিত হচ্ছে একের পর এক উত্তেজক হরমোন। পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে শাণিত তরবারির মতো বিষাক্ত হুল।

শেষবারের মতো গন্তব্যের দিকে ইশারা করল এক যোদ্ধা। তাকে অনুসরণ করল দলের বাকিরা। গোটা ঝাঁকের সামনে এখন লক্ষ্য পরিষ্কার। মাথার দুইপাশে থাকা পাতলা পর্দায় ঘেরা প্রকোষ্ঠগুলো আওয়াজে কাঁপছে। ধীরে ধীরে আরও মজবুত হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর মানচিত্র। ডানার প্রতি স্পন্দনের সাথে সাথে আদান-প্রদান করা

সংকেতের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। চারদিকে শত শত আওয়াজ, হাজারো কম্পন।

দলের অগ্রভাগে থাকা যোদ্ধার মাথার ভেতর উঁকি দিচ্ছে সহস্রাব্দ পুরনো জিঘাংসা। কোন বাধা তাকে তার লক্ষ্যবস্তু থেকে নিবৃত করতে পারবে না। বিন্দুমাত্র আটকানোর চেষ্টা করলে দিতে হবে চরম মাশুল। মনে মনে আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে প্রাণীটা।

শত শত ষড়ভূজাকার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দুই চোখ ক্রমাগত নিরীক্ষণ করে চলেছে সামনের দৃশ্য। রঙ, আকৃতি চিহ্নিত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সবার আগে লক্ষ্য করছে শুধুমাত্র একটা ব্যাপার-কম্পন।

গন্ধগুলোর চারপাশে নড়াচড়া করতে থাকা প্রতিটা জিনিসে পরখ করছে যোদ্ধা। নিজের গতিপথ থেকে সরে যাওয়া অবয়বগুলো অগ্রাহ্য করছে নিশ্চিন্তে। এরা মাথাব্যথার কারণ হবে না। তবে মনে আগেই স্থির করে নিয়েছে-হুমকি হিসেবে দেখা দিক বা না দিক, পথে থাকা যে কোন কিছুকে আঘাত করতে হবে।

তাই সবচেয়ে বড় হুমকি খোঁজার দিকে মন দিল যোদ্ধা। লক্ষ্যবস্তু পেয়েও গেল এক মুহূর্ত পর। ওর দিয়েই এগোচ্ছে ছায়া ছায়া একটা অবয়ব।

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোল প্রাণীটা। অ্যান্টেনা তাক করে রেখেছে শত্রুর দিকে। দেহ থেকে প্রতি পলে ক্ষরিত হচ্ছে যোগাযগের মাধ্যম ফেরোমন। এই ফেরোমনের ট্রেইলই বাকিদের তার পিছু পিছু টেনে আনবে।

প্রতি মুহূর্তে পরিষ্কার হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর দেহকাঠামো।

যোদ্ধা ভেবে পাচ্ছে না, অবয়বটার কোন অংশে প্রথমে আঘাত হানবে। জিনিসটা থেকে রক্ত আর ঘামের গন্ধ আসছে। তবে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগাচ্ছে... বলা যায় তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নি:শ্বাসের সাথে শরীর থেকে বের হওয়া কার্বন।

তীক্ষ্ম হুল আগেই বের করা ছিল। গরম নি:শ্বাস বের হওয়া ওই জায়গাটাতেই আঘাত করবে সবার আগে। পেটটা গুটিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিল যোদ্ধা। তারপর ধেয়ে গেল শিকারের দিকে।

অধ্যায় সাত

৬ মে, রাত ৮:২২
হানা, মাউই দ্বীপ

দৌড়াতে দৌড়াতে হেলমেটের কাচটা নামিয়ে নিল গ্রে। সাথে সাথে ওখানে আঘাত করল আঙুলের সমান আকারের একটা বোলতা। বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল না, বরং আটকে রইল তিন জোড়া পায়ের সাহায্যে। ডানাগুলো বোমারু বিমানের মতো বোঁ-বোঁ আওয়াজ তুলেছে। তারপরই শুরু হলো আসল খেলা।

প্রানিটার খোলসে ঢাকা পেট ক্রমাগত ঠোকর খেতে আরম্ভ করেছে গ্রে-র হেলমেটের কাচে। দৃশ্যটা দেখে জায়গায় জমে গেল সিগমা কমান্ডার। নাকের ইঞ্চিখানেক সামনে বোলতার কাচে হুল বেঁধানোর প্রয়াস, যে কাউকেই ভয় পাইয়ে দেয়ার মতো।

অবাক চোখে গ্রে লক্ষ্য করল-তিন ইঞ্চি আকারের প্রাণীটার হুল লম্বায় প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি হবে। কাচের সাথে জিনিসটার সংঘর্ষে মৃদু ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে, যেন কাঠে ঠোকর বসাচ্ছে কোন কাঠঠোকরা পাখি।

বিস্ময়ের রেশ কাটার আগেই এগিয়ে এল গ্লাভস পরা একটা হাত। প্রাণীটাকে এক থাবায় আছড়ে ফেলল নিচে। থমমত খাওয়া গ্রে খেয়াল করল, ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এসেছে ফায়ারম্যান পালু। হাতে একটা ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট। 'এই নাও! শরীর ঢেকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করো!'

ওজনে হালকা কাপড়টা কাঁধে জড়িয়ে নিল গ্রে। দৈর্ঘ্যে খুব একটা লম্বা না, কোনমতে হাঁটু ছাড়িয়েছে। তবুও, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

পালু অবশ্য পরিস্থিতির হিসেবে পুরোপুরি তৈরি। হলুদ ট্রাউজারের সাথে গায়ে মোটা জ্যাকেট। মাথায় আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হেলমেট। কাঁধে একটা হোসপাইপ। কমিউনিটি হেলথ-কেয়ার সেন্টারের দিকে হাত তুলে ইশারা করল বিশালদেহী হাওয়াইয়ান।

'যাও!'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গ্রে। পার্কিং লটে একটা ট্রাকে বসে আছে ফায়ার চিফ। মুখের সামনে ধরে রেখেছে একটা রেডিও। গাড়ির স্পিকার থেকে লোকটার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো:

'তাড়াতাড়ি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করুন। লুকিয়ে পড়ুন যেখানে সম্ভব হয়, সেখানেই। গাড়ি, বাড়ি, কমিউনিটি সেন্টার... সরে যান খোলা জায়গা থেকে।'

তবে সতর্কবার্তা প্রচারের পক্ষে সময়টা অনুকুল না। দেরি হয়ে গেছে। দিক্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আতঙ্কিত লোকজন। বলপার্কের স্পিকারে বাজতে থাকা গানের সাথে মানুষজনের চিৎকার-চেঁচামেচি মিলে মিশে একাকার।

একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে ছুটে গ্রে-কে পেরিয়ে গেল এক লোক। মেয়েটার গালের বড় একটা জায়গা লাল হয়ে ফুলে গেছে। ভয় আর ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে বাচ্চাটা। দয়া দেখিয়ে পার্ক করা একটা গাড়ির দরজা খুলে দিল ভেতরে থাকা আরোহীরা। লোকটা মেয়েকে নিয়ে হাঁচড়েপাচড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

পুরো এলাকা জুড়েই এমনতর দৃশ্য। বাড়ি, দোকানপাট... যে যেখানে পারে, আশ্রয় নিচ্ছে। তবে এখনও পার্ক আর রাস্তায় আটকে আছে অনেকে। মেঝেতে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে হুলের শিকার হওয়া কয়েকজন। বাবা-মা-রা ছেলেমেয়েদেরকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করছে।

সাহায্যের জন্য ছোটাছুটি করছে নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা। এক এক করে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দিচ্ছে খোলা জায়গায় থাকা মানুষজনকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় তারা বেশ অপ্রতুল।

'যাও!' কাঁধ থেকে পাইপ নামাতে নামাতে অন্যদেরও আদেশ করল পালু। পাইপটার এক মাথা ফায়ার ট্রাকের সাথে সংযুক্ত।

রাস্তার পাশে থাকা পানির কলের সাথে পাইপ জুড়ছে আরেক ফায়ারম্যান। বড় একটা রেঞ্চ দিয়ে কলের মাথা খুলে দিল আরেকজন। তারপর দু'জনে চেষ্টা করতে লাগল পানির তোড়ে উড়তে থাকা বোলতার ঝাঁককে ধরাশায়ী করার।

গ্রে-র ভেতর শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল যেন।

লোকগুলোকে কিছুটা সময় বের করে দিতে হবে।

পালুর হাত আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার। ইঙ্গিত করল ফায়ার ট্রাকের ট্যাংকারের দিকে। 'এটা কি সিএএফ সিস্টেম?'

মাথা নেড়ে সায় দিল ফায়ারম্যান। সিএএফ সিস্টেম মানে হচ্ছে কমপ্রেসড এয়ার ফোম। এসব ট্যাংকারের ভেতর উচ্চচাপে সংকুচিত এক ধরণের অদাহ্য হালকা ফোম থাকে, আগুন নেভাতে বেশ কার্যকর।

'আমাকে অনুসরণ করো,' গ্রে বলল।

ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেটের উপর থেকে বসে থাকা বোলতা ঝাড়তে ঝাড়তে আগে বাড়ল সিগমা কমান্ডার। কে জানে, এই বর্ম কতক্ষণ সুরক্ষা দিতে পারবে।

হাউলি রোডে পার্ক করা একটা আইসক্রিমের গাড়ির সামনে এসে থামল গ্রে। পাইপ হাতে অনুসরণ করছে পালু। দেখা গেল, ভেতরে বেশ কয়েকজন মহিলা আর বাচ্চা আশ্রয় নিয়েছে। কাউন্টারের জালের উপর গিজগিজ করছে বোলতার ঝাঁক, আঁচড়ে-কামড়ে ফাঁক বড় করার চেষ্টা করছে।

'এখানে আর একজনও আঁটবে না,' গ্রে-কে এগোতে দেখে কাচের পার্টিশনের ওপাশ থেকে দোকানদার চেঁচিয়ে বলল।

'ঠিক আছে,' বলে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'আপনার সিরাপের বোতলগুলো আমাকে দিন।'

'মানে?'

'যা বলছি তাই করুন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর, জানালা খুলে ব্লু-বেরি সিরাপের একটা বোতল এগিয়ে দিল দোকানদার। হাত পেতে বোতলটা নিয়ে গ্রে এক সেকেন্ডও দেরি করল না, ছুঁড়ে মারল পাশের টেনিস কোর্টে। বেড়া পার হয়ে কাচের বোতলটা সশব্দে মেঝেতে ভেঙে পড়ল।

সাথে সাথে আবারও দোকানদারের দিকে ফিরল সিগমা কমান্ডার। 'আরও দিন।'

কথামাত্র কাজ। একের পর এক ভাঙা বোতল জমা হতে লাগল টেনিস কোর্টে।

পরিকল্পনা কাজে লেগেছে। সিরাপের মিষ্টি গন্ধের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করল বোলতার ঝাঁক। দল বেঁধে এগোল ওদিকে। সন্তুষ্ট হলো গ্রে। আগেই জানত-মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদি পতঙ্গের মিষ্টি গন্ধের প্রতি আকর্ষণ থাকে।

'আর বোতল নেই,' মজুদ শেষ হওয়ার পর মাথা নাড়ল দোকানদার।

সায় দিয়ে পিছু হটল গ্রে। তারপর পালুর দিকে টেনিস কোর্টের উদ্দেশ্যে ইশারা করল। 'বোলতাগুলোর বড় একটা অংশ ওখানে জমা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর... ধুয়ে দাও।'

'তুমি একটা আস্ত শুয়োর!' আঞ্চলিক টানে ফায়ারম্যান বলল। কথাটা অপমানজনক হলেও লোকটার মুখের হাসি গ্রে-কে বলে দিল, এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তারিফের প্রেক্ষিতে। 'এখন যাও, কোথাও গা ঢাকা দিয়ে নিজের পাছা বাঁচাও।'

'এখন না,' বলে আকাশে উড়তে থাকা বোলতার দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার। এখনও কাজ শেষ হয়নি। সম্ভবত এই প্রাণীগুলোর কাছে মিষ্টি খাবারের দাম নেই।

কম্বলটা গায়ে ভালোমতো জড়িয়ে নিয়ে এবার গ্রে এগোল একটা হটডগের গাড়ির দিকে। আবার আগের পদ্ধতি অনুসরণ শুরু হলো। দোকানের শেষ হটডগটা পাশের বাস্কেটবল কোর্টে ছোঁড়ার ফাঁকে চোখের কোণা দিয়ে লক্ষ্য করল, পাইপ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে ফোম ছুঁড়ছে পালু। সিরাপসহ ঘন ফোমের আবরণে ঢেকে দিচ্ছে জমা হওয়া বোলতার দঙ্গল।

কাজের ফাঁকে গ্রে-র দিকে তাকাল ফায়ারম্যান। 'আমি দেখছি এদিকটা। তুমি এবার যাও।'

আরও থাকার ইচ্ছে ছিল সিগমা কমান্ডারের। তবে বাম পায়ের হাঁটুর পেছনে সুড়সুড়ি অনুভূত হওয়ায় চিন্তায় ছেদ পড়ল। একটা বোলতা বসেছে ওখানে। আঁতকে উঠে ডান পায়ের পাতার সাহায্যে প্রাণীটাকে রাস্তায় পিষে ফেলল গ্রে। খোলস ভাঙার কচকচ আওয়াজে সন্তুষ্ট হওয়ার সময় মিলল না। ডান পায়ে হুল ফোটাল আরেকটা বোলতা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে এগোনোর প্রয়াস পেল সে। তবে মারা যাওয়া সঙ্গীর গায়ের গন্ধে হোক, বা পালানোর কথা টের পেয়ে হোক... তাকে ছেঁকে ধরল বোলতার একটা দল। হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত যেন আগুন জ্বলছে। সামনে এগোনোই মুশকিল। চোখ বেয়ে পানির ধারা নেমেছে। মনে উঁকি দিচ্ছে শুধুমাত্র একটা ইচ্ছা-রাস্তায় শুয়ে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করা।

সবটুকু ইচ্ছাশক্তি একত্র করে আগে বাড়ল গ্রে। কমিউনিটি সেন্টারের কাচের দরজাটা যেন মাইলখানেক দূরে।

সময়মতো পৌঁছানো যাবে না কোনমতেই।

প্রতি পদক্ষেপের সাথে চিন্তাটা আরও মজবুত হয়ে গেড়ে বসছে মাথায়। ডান পায়ের উপর যেন নিজের কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। পার্ক করা একটা ফোর্ড গাড়ি দেখতে পেয়ে, খাবি খেতে খেতে সেদিকে এগোল সিগমা কমান্ডার। কিন্তু গাড়িটা কানায় কানায় ভর্তি।

বাধ্য হয়ে আবারও কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে হলো। ছোটার তালে কম্বল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এক হাত। সুযোগ বুঝে কব্জিতে আসন গাড়লো এক বোলতা। ঝাড়া মারতে উড়ে তো গেল, কিন্তু দেহের ভারসাম্য হারাল গ্রে।

বাঁকের সামনে এসে রাস্তায় শরীর গড়িয়ে দিল সিগমা কমান্ডার। এতে যেন উড়তে থাকা পতঙ্গের ঝাঁক আরও আকৃষ্ট হলো।

প্রাণপণে শরীর গুটিয়ে কম্বলের নিচে নেয়ার চেষ্টা করছে গ্রে। আচমকা পিঠে ধাক্কা খেয়ে গড়ান খেল কয়েক পাক। বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল-হেলমেটের কাঁচ ভরে গেছে সাদা সাদা ফেনায়। পালু ওর দিকে ফোমের পাইপ তাক করেছে।

এগিয়ে এসে গ্রে-কে কোমর ধরে টেনে ওঠাল ফারায়ম্যান। 'চলো!'

প্রতিবাদ করার কারণ নেই। একসাথে এগোল দু'জন। বাস্কেটবল কোর্টে ফেলা হটডগের উপর বোলতার ঝাঁক জড়ো হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে ফোম ছিটাল পালু। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর থেমে গেল ফোমের ধারা।

সম্ভবত ট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেছে!

পাইপটা ফেলে দিয়ে গ্রে-কে আঁকড়ে ধরল পালু। যুদ্ধ শেষ। এবার সরাসরি পলায়ন। কিন্তু নতুন একটা আওয়াজ দু'জনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

বাস্কেটবল মাঠের পেছন থেকে একটা টেরিয়ার কুকুর ছুটে আসছে। গলার ফিতে একটা ছোট ছেলের হাতে ধরা। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে প্রত্যেকে। ছেলেটার মুখের কোণ বেয়ে গড়াচ্ছে সাদা ফেনা। বোলতার আক্রমণের শিকার।

সেদিকে এগোনোর প্রয়াস পেল গ্রে। কিন্তু পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বাস্কেটবল কোর্টের বেড়া। পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই মুহূর্তে এমন সংকল্প প্রাণঘাতী হতে পারে। তবে আর যে-ই হোক, গ্রে অন্তত দমার পাত্র নয়।

ছেলেটা ইতিমধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। নড়াচড়া বন্ধ। কুকুরটার গর্জন পরিণত হয়েছে আর্তনাদে।

তাড়াতাড়ি এগোনোর প্রয়াস পেল গ্রে। অ্যাড্রেনালিনের তীব্র প্রবাহের কাছে ব্যথা পাত্তা পাচ্ছে না। প্রায় সারা গা এখনও ফোমের আবরণে ঢাকা। কিন্তু ও জানে না- এক হামলাকারী এরিমাঝে এই আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাম হাঁটুর পেছনে আঘাত হানল তীক্ষ্ম হুল। আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল সিগমা কমান্ডার। পাশে থাকা পালুও ততক্ষণে গ্রে-কে ছেড়ে পেটে হাত দিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়েছে। বোলতা কোনভাবে তার বর্ম পেরিয়ে আস্তানা গেড়েছে কাপড়ের ভেতর।

রাস্তাই এখন দু'জনের ঠিকানা। বিষের প্রভাবে গ্রের কোমরের নিচের দিক মারাত্মকভাবে কাঁপছে। আক্রান্ত ছেলেটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল ও।

দু:খিত বন্ধু, সাহায্য করার কোন উপায়...

মনে মনে বলা কথাটা শেষ করার আগে, বাস্কেটবল কোর্টের কোণে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। আকাশ থেকে নেমে আসছে সরু, পেঁচানো কিছু একটা। চোখ পিটপিট করল গ্রে।

একটা দড়ি।

দৃষ্টি পরিষ্কার হওয়ার পর বোঝা গেল, আলো নিভিয়ে আকাশে ভাসছে একটা হেলিকপ্টার। বোলতার ঝাঁককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না বলেই হয়তো।

দড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এল বিশালদেহী একটা অবয়ব। পরনে মোটা ওয়েটস্যুট, মাথায় হুডসহ মাস্ক। পিঠে এমনকি একটা ট্যাঙ্কও আছে। পরিস্থিতি বিচার করে মাস্কের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে ভ্রূ কুঁচকালো পরিচিত চেহারাটা।

গ্রে বুঝতে পারছে না, এই অবস্থায় তার পরিচিত কেউ কোত্থেকে উদয় হলো। তবে এখন এসব চিন্তাভাবনা না করলেও চলে। বেড়ার উল্টোদিকে হাতে ইশারা করে, মানুষটার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার।

'কোয়ালস্কি! ছেলেটাকে বাঁচাও!'

রাত ৯:১৭

বিশ মিনিট পর, কমিউনিটি সেন্টারের সিল করা দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। কাচের নিরাপত্তায় থেকে দেখছে বোলতার ধ্বংসযজ্ঞের ফলাফল। ফুটবল মাঠ এবং রাস্তায় সব মিলিয়ে এক ডজনেরও বেশি লাশ পড়ে আছে। দৃষ্টিসীমার বাইরেও বেশ কিছু থাকার কথা।

উদ্ধারকর্মীরা এসে পৌঁছতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের পরনে নিরাপত্তামূলক পোশাক। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও নাজুক। জায়গায় জায়গায় উড়ছে থোকা থোকা বোলতার দঙ্গল। বড় আকারের পতঙ্গগুলো অবশ্য আরও উপরে, একেবারে খোলা আকাশে।

বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়াল কোয়ালস্কি। 'ডাক্তার বলেছে-ছেলেটা বেঁচে যাবে। সাথের কুকুরটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।'

'সময়মতো পৌঁছানোর জন্য ধন্যবাদ।'

দৃশ্যটা মনে করল সিগমা কমান্ডার: বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছে গরিলার মতো গড়নের কোয়ালস্কি। তারপর গ্রে আর পালুকেও কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকতে সাহায্য করে। স্থানীয় ডাক্তার আর নার্স এখানে আগেই মজুদ ছিল, পরিচর্যা করছিল আহতদের।

'ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে পারো না তুমি?' নিজের পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল কোয়ালস্কি। ইতিমধ্যে পরনে থাকা ওয়েটস্যুট খুলে ফেলেছে। নিচে ছিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কার্গো শর্টস আর টমি বাহামা শার্ট। 'ফোর সিজন রেস্তোরাঁয় মজাসে মারিয়াকে নিয়ে ডিনার করতে যাচ্ছিলাম... সব ফেলে ছুটে আসতে হলো এখানে, বোলতার হুল থেকে তোমার পেছনদিক বাঁচাতে।'

বোঝা গেল, গ্রে-র উপর নজর রাখার এই সময়টা ছুটি হিসেবে কাজে লাগাচ্ছিল কোয়ালস্কি। তাই গার্লফ্রেন্ড মারিয়া ক্রেন্ডালকেও সাথে নিয়ে এসেছে। পেশাগত দিক দিয়ে মারিয়া একজন প্রজননবিদ, সিগমাকে আগে একটা ব্যাপারে সাহায্য

করেছিল। জুটিটা খুব একটা মানিয়েছে, তা বলা যাবে না। তবে মেয়েটা বিশালদেহী প্রাগৈতিহাসিক নিয়ানডারথাল মানুষ নিয়ে কাজ করেছে... সেই হিসেবে কোয়ালস্কি ঠিকই আছে।

'অবশ্য মারিয়ার পছন্দের ওই রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায় শুধু কাঁচা খাবার-দাবার,' বলতে বলতে ভ্রূ কুঁচকালো গরিলাকৃতির সিগমা এজেন্ট। 'পয়সা নষ্টের বাহানা আর কি। আরে শালা এমন জায়গায় কেন খেতে হবে, যারা কিনা খাবার রান্নাই করে না!'

গ্রে মাথা নাড়ল। 'তাহলে তো তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম বলা যায়।'

কোয়ালস্কির কোঁচকানো ভ্রূ দুটো আরও কুঁচকে গেল। 'বাঁচিয়ে দিলে বলতে কী বোঝা...?'

দু'জন লোক এগিয়ে আসায় তাদের কথোপকথনে ছেদ পড়ল-ফায়ারম্যান হানি পালু আর তার ব্যাটালিয়ন চিফ বেঞ্জামিন রেনার্ড।

পরনে থাকা ফায়ার জ্যাকেট খুলে ফেলেছে পালু, তবে হলুদরঙা ট্রাউজারটা এখনও আছে। এগিয়ে এসে কোয়ালস্কির পিঠ চাপড়ে দিল হাওয়াইয়ান। আকৃতিগত দিক দিয়ে দু'জনকে এক মায়ের পেটের ভাই না বলা গেলেও, জ্ঞাতিভাই অবশ্যই বলা যায়। দেহের উচ্চতা প্রায় একই রকম, কাঁধের সাথে কাঁধ প্রায় মিলে যায়। দু'জনেরই চুল কালো, একেবারে মাথার তালুর সাথে মিশিয়ে ছাঁটা। তবে পালুর মুখটা কোয়ালস্কির তুলনায় গোলগাল। দাগও কম।

মনোভাবের দিক দিয়ে অবশ্য দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা। ফায়ারম্যানের মুখটা হাসিখুশি। কোয়ালস্কি পুরোপুরি উল্টো। সবসময় কুঁচকে রাখে নিজের চেহারা, যেন দুনিয়ার প্রতি মায়া-মোহাব্বত উধাও হয়ে গেছে।

গ্রে-র দিকে একটা সেলফোন বাড়িয়ে দিল চিফ রেনার্ড। 'ডিরেক্টর ক্রো নামের কেউ একজন আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'ধন্যবাদ,' বলে ফোনটা হাতে নিল সিগমা কমান্ডার, তারপর বাকিদের থেকে সরে গেল একটু দূরে। পেইন্টার এখানেও তার খোঁজ রেখেছেন বলে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি।

ফোন কানে ঠেকাল গ্রে। 'তো... পরিস্থিতি কেমন?'

'আমি তো ভাবছিলাম, তোমার কাছে এই প্রশ্নটা করব। মানে ঘটনাস্থলের ব্যাপারে আর কি। তবে মাউই-ই একমাত্র হামলার শিকার না। হনুলুলু এবং হাওয়াইয়ের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হাইলো-তেও একই পরিস্থিতি।'

দরজা পেরিয়ে রাস্তার উপর স্থির হলো গ্রে-র দৃষ্টি। ঘনবসতিপূর্ণ ওই দুটো জায়গায় এমন বোলতার হামলার কথা ভেবে শিউরে না উঠে পারল না সিগমা কমান্ডার।

পেইন্টার বলে চলেছেন। 'ক্যাটের ধারণা, কাউয়াই-এর লিহিউয়ে নামক শরহটাকেও লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল। তবে জায়গাটা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে। বাতাসের তীব্রতায় সম্ভবত সাগরে গিয়ে পড়েছে উন্মুক্ত বোলতার ঝাঁক।'

'তাহলে আপনারা কীভাবে বুঝলেন, ওটা লক্ষ্যবস্তু ছিল?' জানতে চাইল গ্রে।

'শহরের অদূরে, সৈকতে একটা সেসনা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে... কোন পাইলট ছিল না।'

'সেসনা টিটিএক্স?'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘ নয় মাস যাবত কোন ধরণের যোগাযোগ না থাকার পরও, ডিরেক্টরের সাথে এত সহজভাবে কথা বলতে পারছে ভেবে বিস্মিত হলো গ্রে। জানে পেইন্টার চুপচাপ বসে নেই, মনে মনে ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে। 'মাউইর আর কোন জায়গায় এমন আক্রমণ?'

'না। শুধু হানা।'

দ্বীপটার লোকসংখ্যা মনে মনে হিসাব করল গ্রে। কাহুলুই শহর-একমাত্র বিমানবন্দর যেখানে অবস্থিত... এবং দ্বীপের উল্টো দিক-সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান... এ দুটো হচ্ছে মাউইর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

'কিন্তু হানার মতো ছোট একটা জায়গায় কেন?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন পেইন্টার। 'ভালো প্রশ্ন।'

গ্রে হামলার দৃশ্যটা আবার কল্পনা করল। তিনটা বিমানের একেবারে মাঝেরটা সরাসরি লালচে বালুর সৈকতের দিকে এগিয়ে আসছিল। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল ওর।

'তার মানে লক্ষ্যবস্তু শুধু হানা নয়... হানায় ছুটি কাটাতে থাকা আমরাও ছিলাম।'

এক ঢিলে দুই পাখি।

মাঠে পড়ে থাকা লাশগুলোর উপর স্থির হলো গ্রে-র দৃষ্টি।

তাহলে কি আমার জন্য মরতে হলো এদের?

'আমাদেরও তাই ধারণা,' পেইন্টার সায় দিলেন। 'যার মানে, ওখানে কেউ তোমাদের খুন করতে চাইছে। এবং তারা জানত, তোমরা তখন ওই সৈকতে উপস্থিত ছিলে।' শিউরে উঠল সিগমা কমান্ডার।

হামলাকারীরা যদি জানতে পারে, আমরা বেঁচে আছি...

সাথে সাথে আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ল ওর। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দক্ষিণ দিকে।

শেইচান!

অধ্যায় আট

৬ মে, রাত ৯:৩৩
হানা, মাউই দ্বীপপুঞ্জ

পুরাতন কুটিরটার পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে শেইচান। ওর চোখের সামনে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল অনাহূত আগন্তুক, প্রায় যেন উড়ছে ওটা বাগান ধরে! ইতস্তত নড়া-চড়া তার। অন্ধকার ছায়ার আড়ালে এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে। এই শিকারি জানে, কীভাবে শিকারের উপর নজর রাখতে হয়ে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা।

সারা রাত এরই আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

হাঁটু গেড়ে বইল শেইচান, অন্যজনকে সাবধান করে দিতে চায় না।

পোর্চের সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে আগন্তুক, মুহূর্তের জন্য শেইচানের দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে গেল।

গেল কোথায়...

যেন ওর ডাক শুনতে পেরেই, অবয়বটা হালকা পায়ে নেমে এল পোর্চের কাঠের ওপর। পর্দা নামানো রান্নাঘরের জানালা দিয়ে আসা হালকা আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কাচের মতো চোখজোড়ায়। একদৃষ্টিতে শেইচানের দিকে তাকিয়ে আছে ওগুলো।

'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছিস,' ফিসফিস করে অতিথিকে বলল সে।

উত্তরে পেল আদুরে মিউ-মিউ শব্দ।

টুনা মাছের ফালি ভর্তি থালা নামিয়ে রাখল শেইচান।

কালো বিড়ালটা একবার ওদিকে তাকিয়েই, নজর সরিয়ে নিল। এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙল যেন সামনে থাকা খাবারের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

'এর বেশি কিছু পাবি না।'

আরেক মুহূর্ত ইতস্তত করে, অবশেষে এগিয়ে এল বিড়ালটা। নাক দিয়ে একবার গুঁতো দিল খাবারে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন মুখ লাগাল মাছে। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল-অত্যন্ত আগ্রহের সাথে চিবোচ্ছে সবকিছু।

এক হাত বাড়িয়ে ওটার মাথা চুলকে দিল শেইচান। খাওয়া থামাল না প্রাণীটা, তবে গরগর করে উঠল। বুনো একটা বিড়াল হলেও, মাস তিনেকের চেষ্টায় অনেকটাই পোষ মানাতে পেরেছে শেইচান। ওটা মাদী, এমনকি স্তন ফুলে আছে দুধে। ধারে-কাছেই কোথাও কতগুলো ছোট ছোট বিড়ালের বাচ্চা লুকিয়ে আছে- পরিষ্কার বুঝতে পারল মেয়েটা।

গ্রের অবশ্য ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। বুনো বিড়ালের দাপটে দ্বীপের পাখিদের কী অবস্থা হয়েছে, তা বলেছে অনেকবার। তবে কথা কানে তোলেনি শেইচান। গৃহহীন হবার জ্বালা পরিষ্কার মনে আছে বেচারির। এই বিড়ালটার মতোই বুনো জীবন কাটাতে হয়েছে ওকে লাওসে। গিল্ড ওকে খুঁজে পাবার আগে, বাঁচার জন্য যা দরকার তাই করেছে। বৈরি পরিবেশে টিকে থাকার যে সহজাত ক্ষমতা আছে ওর মাঝে, সেটাকেই প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও তীক্ষ্ণ করেছে গিল্ড। এখন আর অস্তিত্ব নেই ওই সঙ্ঘের। তবে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব না শেইচানের পক্ষে। তাই এখনও মাঝে মাঝে নিজেকে গৃহহীন মনে হয়। তবে গ্রের সামনে সামলে রাখে নিজেকে।

এমনিতেই ছেলেটা ঝামেলায় ডুবে আছে।

বাবার মৃত্যুর পর, নির্দয় পৃথিবী থেকে দূরে থাকাটা জরুরী হয়ে উঠেছিল। মি. পিয়ার্সের মৃত্যুতে যে ভূমিকা রেখেছিল গ্রে, সেটা নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই। গর্বিত একজন মানুষকে আত্ম-সম্মান হারিয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেই ভূমিকা। তবে মনে মনে যে এখনও আফসোস করে গ্রে-তা জানে শেইচান। এখনও মাঝে মাঝেই শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে যুবক। বাবার ব্যাপারে কোন কথা বলে না, তবে মনের মাঝে সর্বদা নিয়ে বেড়ায় তার স্মৃতি! রাতে ছট-ফট করে বিছানায় শুয়ে। কখনও বা উঠে এসে বসে থাকে পোর্চে।

সেই মুহূর্তগুলোয় ওকে একাই থাকতে দেয় শেইচান।

বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মেয়েটার। কামড় খাওয়া জায়গাটা কেমন যেন অবশ হয়ে থাকে সবসময়, ঘষতে শুরু করল ওখানটা। আগুনে-জ্বালাটা আর নেই। কিন্তু দুই চোখের মাঝে স্থান করে নিয়েছে ভোঁতা একটা ব্যথা। তবে এই কষ্টটুকু যে কামড়ের কারণে নয়-তা জানে শেইচান।

ওটার কারণ দুশ্চিন্তা!

উত্তর দিকে তাকাল ও, ওখানেই আছে মেয়েটার দুশ্চিন্তার উৎস।

এতক্ষণ লাগছে কেন?

হানার কমিউনিটি সেন্টার থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল ওকে গ্রে। জানিয়েছিল যে সব ঠিক আছে। তারপর থেকে সিগমা কমান্ডারের আর কোন হদিস নেই! কুটিরেই থাকতে বলা হয়েছে শেইচানকে, ছোট্ট শহরটা এখনও বিশৃঙ্খলার

মুঠোয়। নিশ্চয়ই সিগমার সাথে যোগাযোগ করছে গ্রে। ভাবল মেয়েটা। কোয়ালস্কির আকস্মিক আগমন অবাক করে দিয়েছে দুইজনকেই।

তারপরও কেন যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছে, খবরের জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে ও।

হানা থেকে ভেসে আসা সাইরেনের দুর্বল আওয়াজ অনেক আগেই মিলিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তারপর যে নীরবতা ভর করেছে বাতাসে, তাতে যেন রয়েছে অশুভেরই ইঙ্গিত।

খালি পায়েই এখন কুটিরের পোর্চে হাঁটাহাঁটি করছে শেইচান। রেইলের উপর ভর দিতেই তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানাল বেচারা। কেয়ারটেকারের মতে, চল্লিশের মাঝের দিকে বানানো হয়েছে ওটা। প্রায় সেই সময়ই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দ্বীপের শেষ সুগার প্ল্যানটেশন। বাঁশ-নির্মিত পুরু স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে কুটিরটা। ওগুলো আনা হয়েছে কাছের বন থেকে। ভেতরের আসবাবগুলো বানানো হয়েছে স্থানীয় কোয়া কাঠ ব্যবহার করে।

গত স্থবির সপ্তাহগুলোতে চারপাশের শত শত একর জমির কার্যত মালিক বনে গিয়েছিল গ্রে এবং শেইচান। মাটিগুলোতে মানুষের পা খুব একটা পড়েনি। পেঁপে এবং কলা গাছের অভাব নেই, সেগুলোর মাঝে মাঝে আবার এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা তাল গাছ। বুনো জঙ্গল... এবং সেই সাথে হিবিস্কাস, রেড জিঞ্জার এবং হলদে প্লুমেইরা ফুলেরও অভাব নেই।

কাছের একটা আম গাছ থেকে ঝুলন্ত দোলনার উপর নজর গেল শেইচানের। ওটায় বসে এই কয়দিনে অগণিত ঘণ্টা পার করেছে গ্রে এবং ও। আপনমনে তাকিয়ে থেকেছে আকাশের দিকে, দেখেছে বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যার আগমন-দৃশ্য।

রাতের সুবাস বুক ভরে টানল একবার মেয়েটা। কেন যেন জায়গাটা ওকে ভিয়েতনামের ছোট গ্রামে অবস্থিত বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। চারপাশের গাছগুলো আলাদা, কিন্তু তারপরেও প্রকৃতির সাথে একই বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় এখানে। গলার সাথে ঝুলতে থাকা ছোট্ট ড্রাগন লকেটে হাত চলে গেল ওর-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া উপহার এটা। একমাত্র এটাই অবশিষ্ট আছে। মায়ের ভালোবাসা গায়ে মেখে ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট ওই কুটিরও যেন পরিণত হয়েছিল জাদুর রাজ্যে!

হয়তো সেই ভালোবাসার জন্যই, এই কুটিরটাকেও ঘর বলে মনে হচ্ছে। দোলনার দিকে আবারও তাকাল মেয়েটা। গ্রে-র হাতে হাত রেখে বসত ওখানে।

ওর ভালোবাসায় এই জায়গাকে ঘরে পরিণত করেছে।

আবার হাঁটতে শুরু করল মেয়েটা, অশুভ অনুভূতিতে ভরে আছে মন। কেন যেন মনে হচ্ছে-শেষের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছে। নাহ, গ্রে-র ভালোবাসার ক্ষমতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই শেইচানের। আছে তো নিজের সেই ভালোবাসাকে গ্রহণ করার

ক্ষমতা নিয়ে! গত কয়েকটা মাস অসাধারণ কেটেছে, কিন্তু সেই সাথে এই সময়টাকে মনে হয়েছে যেন কোন কল্পলোক। যে জগত থেকে বাস্তবে ফিরতেই হবে আজ নয়তো কাল।

তারপর? তারপর কী হবে?

বাস্তবতার কঠিন মাটিতে কী দৌড়াতে পারবে সেই কল্পনার ঘোড়া? নাকি পারা উচিত?

আচমকা গরগর করে ওর মনোযোগ নিজের দিকে টেনে নিল বিড়ালটা।

'আর নেই। চেয়ে কোনও লাভ-'

বিড়ালটা কোন দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা দেখতে পেয়ে থেমে গেল মেয়েটা। থালার দিকে পিঠ দিয়ে আছে প্রাণীটা, তাকিয়ে আছে তালের বনের দিকে। খাড়া হয়ে আছে ওটার লোম, হিস হিস করছে কীসের দিকে যেন চেয়ে।

সাথে সাথে নিচু হয়ে বসল শেইচান নিজেও। রান্নাঘরের আধো আলো-আঁধারির বাইরে চলে গেল সে-ও।

কেউ একজন আছে ওই বনে।

রাত ৯:৩৮

তৃতীয় বারের মতো নাম্বারটা ডায়াল করল গ্রে। কমিউনিটি সেন্টারের অফিসে আটকা পড়েছে সে। ওটার ফোন ব্যবহার করেই শেইচানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে তাই। কুটিরে সেলফোনের নেটওয়ার্ক নেই, তাই সেভাবে যোগাযোগ করার সুযোগও নেই।

মাত্র একবার বাজাল রিং, তারপরেই বন্ধ হয়ে গেল। সাথে সাথে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও।

আগে একবার যোগাযোগ করতে পেরেছে শেইচানের সাথে। তবে শহরের এই ইমার্জেন্সির কারণে সম্ভবত ওভার-লোড হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার। আমেরিকা ছেড়ে আসার সময় স্যাটেলাইট ফোনটা রেখে এসেছে বলে এখন নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে। কিন্তু রেখে না এসে উপায়ও ছিল না, ওটা যে আসলে সিগমার সম্পত্তি। আর তাছাড়া, তখন একাকীত্বের দরকার ছিল খুব। ফোনটা সাথে আনলে ওকে ট্র্যাক করতে সিগমার কোন অসুবিধাই হত না।

অবশ্য আনেনি বলে কোন অসুবিধাও হয়নি সিগমার।

অফিসের দরজা দিয়ে বাইরে থাকা কোয়ালস্কির দিকে তাকাল গ্রে। বোঝাই যাচ্ছে, ওর উপরে নজর রাখতে পেইন্টারের কোন কষ্টই হয়নি।

ফোন করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে লবির দিকে এগোল এবার। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে ছিল কোয়ালস্কি, ওকে দেখতে পেয়ে সোজা হলো। দাঁতের ফাকে গুঁজে রেখেছিল একটা সিগার, আগুন ধরায়নি যদিও। মাঝে মাঝে ওর দিকে কড়া নজরে তাকাচ্ছে এখন নার্স। যেন বলছে-সাহস হলে ধরাও দেখি।

নিশ্চুপ এই স্নায়ু-যুদ্ধের মাঝে বাগড়া দিল গ্রে। 'ফোনে পেলাম না। বাইক নিয়ে একবার দেখে আসি।'

'এমনি এমনি দুশ্চিন্তা করছ,' নিজের মত জানাল কোয়ালস্কি। 'কোন ঝামেলা হলে, তোমার চাইতে ভালোভাবে সামলাতে পারবে সে।'

গ্রে জানে, কথাটা একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি বিশালদেহী লোকটা। কিন্তু তাই বলে তো আর চুপচাপ বসে থাকতে পারে না! যদি এই আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য শেইচান আর ও হয়, তাহলে মেয়েটা বিপদের মাঝে আছে।

'এখানেই থাকো তুমি, আমি শেইচানের খোঁজ নিয়ে আসি।' সদর দরজার কাছে একটা পরিচিত অবয়ব দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোল। 'পালু, তোমাদের কাছে এমন কোন পোশাক আছে যা আমার দেহে আঁটবে? জ্যাকেট হলেই হয়, সাথে ট্রাউজার্স পেলে তো সোনায় সোহাগা।'

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারল পালু, 'বাইরে যেতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

'তাহলে চলো, আমিও যাব।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমার বাইকে জায়গা হবে না।'

'তোমার ওই পুঁচকে জিনিসটা নেয়ার কী দরকার?' হাত তুলল পালু, একগাদা চাবি ঝুলছে ওখান থেকে। 'আমার কাছে ওর থেকে ভালো জিনিস আছে।' মাথা দিয়ে কয়েক গজ দূরে পার্ক করা একটা উজ্জ্বল হলুদ এস.ইউ.ভি.র দিকে ইঙ্গিত করল বিশালদেহী হাওয়াইয়ান। ওটার দরজার 'ব্যাটেলিয়ন চিফ' শব্দটা জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা। বোঝাই যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে রেডিওতে ইন্টারভিউ দেয়ায় ব্যস্ত ওর বসের গাড়ি ওটা।

'তার চেয়ে বড় কথা, আমি একটা শর্টকাট জানি।' যোগ করল পালু। 'ধপাধপ নিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল গ্রে, খুশি হয়েছে প্রস্তাবে। 'তাহলে চলো।'

কাঁধের উপর থেকে আসা আওয়াজ চমকে দিল গ্রেকে। চুপচাপ কখন যে কোয়ালস্কি এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পায়নি। এমন বিশালদেহী লোকের এহেন নিশ্চুপ চলাচলের ক্ষমতা বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। 'যদি পালু যায়, তাহলে আমিও যাব।'

আপত্তি করার প্রশ্ন ওঠে না।

'বেশ', দরজার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'চলো, সবাই একসাথেই যাই।'

সিগার ধরিয়ে নিল কোয়ালস্কি, এগোবার আগে নার্সের দিকে করা একটা নজর দিতে ভুল হলো না লোকটার। তারপর কাচের দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখল ওরা, একদম মুখেই বার্বিকিউ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধোঁয়ায় প্রায় ভরে আছে জায়গাটা।

আক্রমণ আপাতত সামাল দেয়া গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। মাথার উপরে তারার ঝিকিমিকি। পতঙ্গ দলটার অধিকাংশই রেইন ফরেস্টের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। বনটা হালেয়াকালা পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মাউই দ্বীপের অর্ধেকই গড়ে আছে ঘুমন্ত এই আগ্নেয়গিরির উপর ভিত্তি করে।

তবে গ্রে জানে, বিপদ এখনও কাটেনি। এই ঘটনার পেছনে আরও বড় কোন কিছু না থেকে পারে না।

তবে আপাতত সেটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

চিফ রেনার্ডের ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। ফোর্ড এস.ইউ.ভি.টায় সাইরেনের ব্যবস্থা আছে। উঠে বসল সবাই। ড্রাইভিং-এর দায়িত্ব নিল পালু নিজে। গ্রে ওর সাথে সামনে গিয়ে বসল। পেছনের সিটটা হাত-পা ছড়িয়ে দখল করল কোয়ালস্কি।

গাড়ি ছাড়ল পালু।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা পরিচিত গুঞ্জন শুনতে পেল গ্রে। মাথা নিচু করে পেছন দিকে তাকাল ও। দেখতে পেল, পেছনের জানালায় বেশ বড়-সড় একটা ভোমরা এসে বসেছে।

মুখ থেকে সিগারটা হাতে নিল কোয়ালস্কি, তারপর একেবারে নিস্পৃহভাবে ওটার জ্বলন্ত প্রান্তটাকে চেপে ধরল ভোমরার দেহে। পোকাটার ব্যবস্থা হয়ে যেতেই আবার ওটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সে।

সিটে আরাম করে বসল গ্রে।

নাহ, লোকটার দরকার আছে বটে।

রাত ৯:৪৪

নিচু হয়ে আছে শেইচান, দেখছে কালো বিড়ালটার ছুটে যাওয়া। কুটিরের পোর্চ ধরে ফুলের ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল ওটা। কিন্তু হায়, শেইচানের সেই কাজ করার সুযোগ নেই। ধরেই নিয়েছে, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওকে।

সামনে খোলা থাকা পথগুলো একবার ভেবে নিল মেয়েটা।

ছায়া অথবা আগুন।

গিল্ডের কাছ থেকে এই প্রশিক্ষণই পেয়েছে ও। ছায়ায় পথ বেছে নেয়া মানে চুপচাপ বসে থাকা। অন্ধকার এবং ধোঁকাবাজি ব্যবহার করে একটা ফাঁদ পাতা। অথবা আরেকটা কাজ করতে পারে সে, রক্তে আগুন ধরিয়ে সরাসরি আক্রমণে চলে যেতে পারে।

আফসোসের কথা হলো, এই মুহূর্তে সাথে কোন অস্ত্র নেই। ইচ্ছামতো এক দেশ থেকে অন্য দেশে এই কদিন ঘুরে বেরিয়েছে গ্রে আর ও। তাই অস্ত্র নেয়ার ব্যবস্থা করেনি। গড়পড়তা টুরিস্টের মতোই ভ্রমণ করেছে বলে, স্থানীয় আইন মেনেই দেশের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়েছে ওদেরকে। কোথাও এত বেশি দিন ছিল না যে একটা অস্ত্রের ব্যবস্থা করে নেবে দেশের ভেতর থেকে।

তবে একেবারে নিরস্ত্র নয় মেয়েটা। ছোরাগুলো আছে। সেই সাথে আছে একটা চাইনিজ কুড়াল। নিজেকে রাঁধুনি আর এগুলোকে ওর রান্নার সরঞ্জাম বলে চালিয়ে দিয়েছে সবখানে।

এই মুহূর্তে ছোরাগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে কুটিরের অন্য প্রান্তের একটা ঘরে। অপেক্ষমাণ শত্রুর চোখের সামনে দিয়ে কুটিরে প্রবেশ করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না শেইচান।

তাই এখন আর রক্তে আগুন ধরাবার উপায় নেই, যা করার ছায়ার পথে চলেই করতে হবে।

এতসব ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে মাত্র একটা মুহূর্ত লাগল প্রাক্তন গিল্ড আততায়ীর। পরবর্তী মুহূর্তেই দেখা গেল, কাজে নেমে পড়েছে সে।

অধ্যায় নয়

৬ মে, রাত ৯:৪৫
হানা, মাউই দ্বীপপুঞ্জ

'কেউ দেখেছ ওকে?'

অনেক নিচে এসে আছাড় খাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। চূড়ায় দাঁড়িয়ে গেনিনদের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছে মাসাহিরো ইতো। ওরা কুটিরের চারপাশে স্থান নিয়েছে, মিনিট পনেরো হলো। বোটে করে কাছাকাছি এসে, বাকিটা পথ দাঁড় বেয়ে এগিয়েছে। কারও নজরে না পড়ার জন্য যা যা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, তার একটাও বাদ দেয়নি।

মনে মনে গালি দিল মাসাহিরো।

কাকে?

যে প্রাণীটা ওদের টার্গেটকে সাবধান করে দিয়েছে, তাকে। সবাইকে যার যার অবস্থান গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে সে। আমেরিকান পুরুষটা আসার আগে কোন পদক্ষেপ নেয়ার ইচ্ছা নেই।

আজ রাতে ওই যোদ্ধা আর এই মহিলা-দু জনেরই শেষ দেখতে চান ওর দাদা।

কিন্তু পরিস্থিতি যে বিপক্ষে। ওদের বর্তমান টার্গেট-ইউরোশিয়ান মেয়েটা উধাও হয়ে গিয়েছে। কেইজ-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা মেয়েটা একটু আগেই খাবার খাওয়াচ্ছিল একটা বিড়ালকে। তারপর কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল! অতর্কিতে কাজ সারার সুযোগ আর নেই দেখে, অপেক্ষা করতে পারছে না ইতো। আমেরিকান যোদ্ধাকে সাবধান করে দেবার আগেই এই মহিলার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

'নেগেটিভ, চুনিন ইতো।' মাসাহিরোর ডানহাত রেডিওতে জানাল। 'কেউ দেখতে পায়নি।'

দাঁতে দাঁত চাপল যুবক।

ওর সঙ্গীরা সবাই কেইজের প্রাক্তন আততায়ী। দাদা-তাকাশি ইতো, নিজে এদেরকে বাছাই করেছেন। দলটার শীর্ষস্থানীয় খুব কম নেতাই রক্ষা পেয়েছে আইন

রক্ষাকারী সংস্থাদের হাত থেকে। মাসাহিরোর জানা মতে, একমাত্র তার দাদার সম্পৃক্ততার কথাই কেউ জানে না।

নব্বই বছর বয়সী কোন বুড়োর দিকে কে-ই বা দ্বিতীয়বার নজর দেবে?

ভুল করেছে সবাই।

কেইজ ধ্বংস হবার সময়, মাসাহিরোর দাদা ওকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু তাই বলে কোন অন্ধ-গুহায় আটকে রাখেননি তিনি নাতিকে। বরঞ্চ আরও জোরেশোরে ঠেলে দিয়েছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন মাসাহিরোকে। ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে টাকা ঢালছেন তাকাশি। এমনকি বোর্ডের একজন মেম্বারও বানিয়ে দেয়া হয়েছিল মাসাহিরোকে।

তবে দাদার কাছ থেকে আরেকটা দায়িত্ব পেয়েছে যুবক। কেইজের হয়ে কাজ করা নিচু শ্রেণীর সদস্যদের এক করতে হবে ওকে। সবাইকে নিজের অধীনে এনে আরও ক্ষুদ্র, কিন্তু মারাত্মক এক দলে পরিণত করতে হবে।

দাদার নির্দেশিত পথে চলে শিনোবিদের অনুকরণে নিজের এই দলটাকে সাজিয়েছে মাসাহিরো। প্রাচীন জাপানের সামন্তদের দল ছিল এই শিনোবি। পরবর্তীতে বিকৃত হয়ে যারা নাম নিয়েছিল-নিনজা। তবে তাকাশি বিশ্বাস করেন প্রাচীন সেই দিনগুলোতে, তখন জাপান ছিল তার মাহাত্ম্যের শীর্ষে। নব্বই বছরের বেশি বয়স হলেও, তাকাশি হচ্ছেন এই দলের জোনিন বা নেতা। মাসাহিরোর পদের নাম চুনিন, জোনিনের সহকারী বলা চলে। দলের অন্যরা, মানে গেনিন যারা, তারা মাসাহিরোর নির্দেশ মোতাবেক চলে।

সংগঠন চালাবার জন্য এর চাইতে ভালো ঘটনা-প্রণালী আর হয় না। শত শত বছর ধরে এভাবেই কাজ করে আসছে শিনোবি। ঐতিহ্যের সাথে তাল মিলিয়ে গেনিনদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে।

ঐতিহ্য রক্ষা ওদের কাছে এতটা দামী যে, পিঠে একটা কাতানা পর্যন্ত ঝুলিয়েছে মাসাহিরো। সেই সাথে আছে একটা কুসারিগামা-চেইন লাগানো বাঁকানো কাস্তে। কোমরের সাথে ঝুলিয়ে রাখা।

শিনোবিদের প্রাক্তন অস্ত্র এগুলো, সেই সাথে যোগ হয়েছে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্রও। সবাই পরে আছে ঘন সবুজ রঙা ক্যামোফ্লেজ, হালকা কেভলার নির্মিত বডি আর্মারক। সাথে আছে নয় মিলিমিটার মিনেবিয়া মেশিন পিস্তল, সাপ্রেসর আর নাইট-ভিশন স্কোপ।

তবে সবার পরনেই আছে একটা করে তেনুগুই, অবয়ব ঢাকার জন্য ব্যবহৃত এক প্রস্ত কাপড়। বেল্ট, এমনকি রশি হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ওগুলো।

নিজের তেনুগুইটাকে নাক পর্যন্ত টেনে তুলল মাসাহিরো।

কে এই মেয়ে?

অধৈর্য হয়ে ভাবল, আর অপেক্ষা করা যায় না।

'এগিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল সে। 'দেখা মাত্র মেরে ফেল।'

রাত ৯:৪৭

শতবর্ষী আমি গাছটার একটা ডালে নিচু হয়ে বসে আছে শেইচান। মাথারও প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে গিয়ে শেষ হয়েছে গাছটার শীর্ষ, তাই অন্ধকারে ছেয়ে আছে নিচটা।

কয়েক মুহূর্ত আগে, পোর্চের রেইলটা এক লাফে টপকেছে ও। সাবধানতায় কোন ছাড় দেয়নি। শত্রুপক্ষের চোখে নাইট-ভিশন বা গগলস আছে ধরে নিয়ে, পোর্চের নিয়ে চলে গিয়েছে গড়িয়ে। কুটিরের স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশগুলোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য পাশে। একদম কাছের বনের প্রথম গাছটার কাছে পৌঁছবার আগে মাথা তোলেনি।

ওর আশা, কুটিরটার দিকে বা বাগানের মাটির দিকে থাকবে সবার নজর।

উপর দিকে থাকবে না।

পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে আছে শেইচান। নড়াচড়া বলতে গেলে কেবল শ্বাস নেয়ার সময় ফুসফুসের ফুলে ওঠা। আচমকা শুকনো পাতার মর্মর-ধ্বনি ওকে সাবধান করে দিল। নিচ দিয়ে ঘন একটা ছায়া চলে যাচ্ছে। উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে রইল শেইচান। আশপাশে আর কেউ আছে কিনা তা দেখে নিল একবার।

কেউ নেই।

এবার পূর্ণাঙ্গ মনোযোগে ছায়াটাকে দেখল ও। যতদূর বুঝতে পারছে, পাঁচ থেকে সাত জনের একটা দল এসেছে।

কম না সংখ্যাটা, তবে এর চাইতেও বড় দল সামলে অভ্যাস আছে ওর।

তবে তখন হাতে ছিল অস্ত্র, এখনকার মতো আম না!

আম দিয়েই কাজ চালাতে হবে!

পাকা ফলটা বাঁ দিকে আলতো করে ছুঁড়ে দিল সে।

একটা ছায়া সাথে সাথে ঘুরে গেল সেদিকে, চোখ রেখেছে বন্দুকের স্কোপে। শিকারের পিঠ ঘুরে যেতেই, নিচে লাগানো রশির দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা। এটার সাথেই ঝুলছে সেই দোলনা। রশি টেনে দোলনাটাকে উঁচু করল ও।

লোকটা ঘোরার আগেই চুপচাপ ডাল থেকে নেমে পড়ল শেইচান, নামতে নামতেই রশিটাকে ছুঁড়ে দিল শত্রুর মাথার উপর দিয়ে। নিজেকে ও নামিয়ে আনল

বাঁকা দোলনার উপরে। মেয়েটার ওজনের ভারে শক্ত হয়ে শত্রুর গলায় এঁটে বসল রশি। দোলনার কাঠে নেমেই ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার মাথা ধরে ফেলল ও, দোলনার রশি যা করতে পারেনি-সেটাই করে ফেলল।

শিরদাঁড়া ভেঙ্গে মারা গেল বেচারা।

দোলনা থেকে নেমে, অস্ত্রটা হাতে তুলে নিল শেইচান।

লুকোছাপার পালা শেষ...

এখন সময় রক্তে আগুন লাগাবার!

রাত ৯:৫২

গুলির শব্দে কুটিরের দিকে নজর গেল মাসাহিরোর। আক্রমণ শুরু হয়েছে তাহলে। হাততালির চাইতে বেশি শব্দ করছে না রাইফেলগুলো। চূড়ার উপর নেয়া অবস্থান থেকে সরে গেল সে।

মেয়েটাকে নিশ্চয়ই লুকানো জায়গা থেকে বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছে ওর দল।

এখন কেবল সময়ের ব্যাপার...

আরও দুটো মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে, রাতের উপর পুনরায় নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। পেছন থেকে ভেসে আসা ঢেউয়ের সুশ-সুশ আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। আরেকবার গুলি উগরালো বন্দুক। তবে এবার নতুন এক জায়গা... ওর অবস্থানের খুব কাছের একটা জায়গা থেকে!

সন্দেহ খেলে গেল ওর মনে। নিচু হয়ে টেনুগুই দিয়ে ঢাকা মাইক্রোফোনটা ঠোঁটের কাছে আনল সে। 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাই।'

অপেক্ষা করতে লাগল মাসাহিরো, বুকের ভেতর চলছে ঢাকের নাচন। বুঝতে পারছে, কোথাও কোন ঘাপলা হয়েছে।

গুলির আরও কিছু শব্দ ওর সন্দেহকে পোক্ত করল।

ঠিক তখন কথা বলে উঠল মাসাহিরোর ডানহাত, যিরো। আহত শোনাল লোকটার কণ্ঠ। 'মেয়েটা একটা অস্ত্র যোগাড় করে ফেলেছে, মারা গিয়েছে আমাদের তিনজন।'

গুলির শব্দে বন্ধ হয়ে গেল কণ্ঠটা। চিৎকার শুনতে পেল মাসাহিরো।

চারজন হলো...

রাগে দম বন্ধ হয়ে আসার দশা হলো মাসাহিরোর।

আবারও কথা বলে উঠল যিরো। 'চুনিন ইতো, আপনি বোটে ফিরে যান।'

কিন্তু সে মানা করার আগেই, নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এলো রেডিওতে। ঠাণ্ডা এবং গুমোট শোনাল কণ্ঠটা।

'অথবা অপেক্ষা করো, আমি আসছি।'

অস্ত্রের বাঁটে শক্ত হয়ে বসল মাসাহিরোর হাত। শুধু অস্ত্রই নয়, রেডিও পর্যন্ত যোগাড় করে ফেলেছে মেয়েটা।

'নাকি তুমি একটু বেশিই কোশিনুকে?'

অপমানটা যেন জ্বালিয়ে দিল ওর ভেতরটা। কাপুরুষ নয় মাসাহিরো, নির্বোধও নয়। মেয়েটা যে ওকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে তা পরিষ্কার। লম্বা একটা দম দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল। 'আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, গেনিন যিরো।'

'বুঝতে পেরেছি,' সায় দিল যিরো। 'আমি মেয়েটাকে খুঁজে বের করছি।'

আবার ফিরে এল বিদ্রুপমাখা কণ্ঠটা। যেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। 'তাহলে...খেলা হবে।'

রাত ৯:৫৬

তালগাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শেইচান। চোখ বন্ধ করে কানে গুঁজে রেখেছিল চুরি করা রেডিও ইয়ারপিসটা। যিরোর বলা শেষ কথাগুলো শোনার জন্য অবশ্য ওটার দরকার ছিল না। বাঁ দিকের কোথাও থেকে ফিসফিসিয়ে লোকটা বলেছে কথাগুলো।

ভেবেছিল, ভয় পাইয়ে দিতে পারবে শত্রুপক্ষকে। তা হয়নি, তবে বনের ভেতরে থাকা শত্রুদলের একমাত্র অবশিষ্ট সদস্যের অবস্থান আঁচ করতে পেরেছে। আগেই ধরে নিয়েছিল, দলটা এসেছে বোটে করে। এবার নিশ্চিত হলো। নিশ্চয়ই নিচের সৈকতে রাখা হয়েছে ওটা।

মনে মনে হিসাব কষে নিল সে, দলটার নেতা পালিয়ে যাবার আগেই কি সৈকতে যেতে পারবে? এই জায়গাটা ওর হাতের তালুর মতোই চেনা। সেই সুবিধা কাজে লাগিয়েই প্রতিপক্ষের চারজনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে ও। কিন্তু চতুর্থ জন, যিরো, সতর্ক থাকবে।

তা থাকুক...

দলনেতাকে আটকাতে পারবে না, বুঝে ফেলেছে শেইচান। তাই এখন ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ এই যিরোকে জান্তা পাকরাও করার কাছে দিল। ধরার আগেই কীভাবে অত্যাচার করবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

এর মুখ আমি খুলিয়েই ছাড়ব...

বাঁ দিকে হেঁটে গেল মেয়েটা। কোন ডাল না ভেঙ্গেই পার হয়ে গেল একটা ঝোপ। মাঝে মাঝে থেমে নাইট-ভিশনে চোখ রাখছে। বলা যায়, দিনের আলোর চাইতেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে চারপাশ। কান পেতে শুনছে প্রতিটা ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ।

এখানে এসেই চারপাশের ভূ-গঠন মুখস্থ করে নিয়েছি, নতুন যে কোন জায়গায় গেলে প্রথমেই এই কাজটা করে। এত দিনে দম নেয়ার মতোই হয়ে গিয়েছে

ব্যাপারটা। প্রতিটা ঝোপ, প্রতিটা গাছ আর পাথরকে চেনে ও। তাই যখন পা পাশের স্থির পাথরটাকে পেপে গাছের দঙ্গলের ভেতরে দেখতে পেল, তখনই বুঝতে পারল যে আগে ওটা ওখানে ছিল না।

একটা হিবিস্কাসের ঝোপের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসল শেইচান। তাক ঠিক করে পাথরটার ঠিক মাঝখানে সেঁধিয়ে দিল দুটো বুলেট। জ্যান্ত পাকড়াও করতে চায় ও লোকটাকে। গুলি ছোঁড়া শেষ হলেও, চোখের সামনে থেকে স্কোপটাকে সরাল না সে। বুলেটের ধাক্কায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছে ক্যামোফ্লাজ কাপড়। অবাক হয়ে মেয়েটা দেখল-আড়াআড়ি পুতে রাখা দুটো ডাল ঢেকে রাখা হয়েছিল কাপড়টুকু দিয়ে!

টোপ...

আরেকটু হলেই গালি দিয়ে উঠেছিল শেইচান। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে ডানে গড়িয়ে দিলে দেহটা। ভাগ্যিস দিয়েছিল, এক মুহূর্ত পরই গুলির আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ঝোপটা। কয়েক গড়ান খেয়েই উঠে দাঁড়াল ও। আক্রমণকারীর সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটতে শুরু করল। গুলি লক্ষ্যে আঘাত হানবে, সেই আশা করছে না। শত্রুকে আটকে রাখতে পারলেই খুশি।

একবার ভুল করেছে, নিচু করে দেখেছে শত্রুকে। আরেকবার ভুল হবে না।

লোকটাকে জ্যান্ত ধরার সব ইচ্ছা ত্যাগ করল শেইচান। এমন প্রতিপক্ষের সামনে পড়ে একটাই চিন্তা আসা উচিত মনে।

মারো...নয়তো মরো...

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, লোকটার চালাকি পুরোপুরি বুঝতে পারেনি মেয়েটা। পথের মধ্যে উদ্বৃত্তের মতো বেরিয়ে থাকা একটা টুকরা শিলার সামনে আসা মাত্র দেখতে পেল, একটা অবয়ব আগেই ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। না বুঝেই আরেকটা ফাঁদে পা দিয়েছে ও। এই লোকটা যে যিরো নয় তা বুঝে ফেলল সাথে সাথে।

দলনেতা এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওর আসার...

মুখোশের নিচে লুকায়িত মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে, ভাবল শেইচান।

পরমুহূর্তেই গুলি ছোঁড়া হলো ওকে লক্ষ্য করে।

রাত ১০:০২

ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছে মাসাহিরো।

তবে নিজেকে এত আগেই সফল বলে ধরে নেয়াটা ঠিক হয়নি ওর। বেচারার বন্দুকের নলের সামনে এসে পৌঁছলেও, চলা কিন্তু বন্ধ করেনি মেয়েটা। সেই গতি

ব্যবহার করে একদিকে বেঁকে গেল সে। হাত তুলে এনেছে পাশে, মাসাহিরোর প্রথম দফার গুলিগুলো পেটের একটু উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তাক ঠিক করার আগেই, হাত নিচে নামিয়ে আনল শেইচান। ওর 'ধার করা' অস্ত্রের বাটটা দিয়ে আঘাত হানল মাসাহিরোর হাতে। ব্যথায় হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য হলো লোকটা।

সৌভাগ্যক্রমে, সংঘর্ষের তীব্রতায় মেয়েটার হাত থেকেও খসে পড়েছে অস্ত্র। অর্ধ-শ্বাস নেয়ার সময়টুকু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুইজন। এরপর একই মুহূর্তে নড়তে শুরু করল।

প্রথমেই মেয়েটা চেষ্টা করল একটা রাউন্ড-হাউস কিক বসাবার জন্য। দেহ নিচু করে পা উপরে তুলে হানতে এই আঘাত। সেই সুযোগে হাত বাড়াল নিজের খসে পড়া অস্ত্রের দিকেও। এক পা পিছিয়ে এসে আঘাতটা এড়াল মাসাহিরো, কাঁধের উপরে বেরিয়ে থাকা কাতানার বাটে চলে গেল ওর হাত।

পিস্তলটা তুলছে শেইচান, এমন সময় ছোট তলোয়ারটা খাপ থেকে বের করে এনে ওর মুখের দিকে চালিয়ে দিল লোকটা। একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেল শেইচান, নাকের ঠিক সামনে দিয়ে চলে গেল ধারালো ফলা।

রক্ত ঝরাতে না পারলেও, ক্ষতি ঠিকই করে গেল তলোয়ারটা।

শিনোবিদের অনুকরণে, খাপের মাথায় ঝাঁঝালো এক ধরনের পাউডার রাখে মাসাহিরো। আগেকার দিনে যোদ্ধারা রাখত মরিচের গুড়া। সেটার অনুকরণে নিজের খাপের ভেতর মরিচের সাথে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে রেখেছে সে।

ফল হলো মারাত্মক।

চোখে পাউডার ঢোকামাত্র আঁতকে উঠল মেয়েটা। ফলশ্রুতিতে আরও বেশি করে পাউডার ঢুকে গেল তার নাক এবং ফুসফুসে। প্রায়ান্ধ অবস্থাতেই গুলি ছুঁড়ল সে, তারপর কাশতে কাশতে পিছিয়ে এল।

পাথরের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে মাসাহিরো, শেইচানের গুলি ফুরোবার আগে বের হবার নাম পর্যন্ত নিল না। গুলি বৃষ্টি শেষ হলে অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে ধাওয়া করতে শুরু করল আবার। ইচ্ছা, নিজ হাতে শিকারের একটা ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু প্রায়ান্ধ হলেও, ফেলনা নয় শেইচান।

আচমকা বন থেকে বেরিয়ে এল আরও একজন-যিরো।

পলায়নরতার দিকে ইঙ্গিত করল মাসাহিরো। একসাথে পিছু ধাওয়া করল তারা। খুন করার নেশা চেপে বসেছে দুইজনকেই।

পালাবার কোন আশাই নেই শেইচানের।

রাত ১০:০৪

দৌড়াচ্ছে শেইচান, পানি বেরোচ্ছে চোখ দিয়ে। সামনের দিকে বাড়িয়ে আছে এক হাত। প্রতিটা শ্বাসের সাথে যেন ফুসফুসে আগুন ধরে যাচ্ছে। চোখগুলোকে মনে হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা।

মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে চারপাশে, আর তার ভেতর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ও।

হঠাৎ একটা গুঁড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে গেল, অনেক কষ্টে হজম করে নিল ব্যথাটুকু। এখন মাটিতে পড়া চলবে না। পেছনে, খুব কাছেই ভেসে আসছে পিছু ধাওয়াকারীদের পায়ের আওয়াজ।

ব্যথা এবং চোখের পানিকে পাত্তা না দিয়ে ঝাপসা চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ করল ও। কুটিরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে যেতে হবে ওকে, ছোরাগুলোকে নিতে হবে। আর যদি চোখের জন্য কিছু পেলে তো সোনায় সোহাগা!

এছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই।

এক পা আরেকটার সামনে ফেলে এগোতে লাগল শেইচান, দৌড়াচ্ছে আলোটার দিকে। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাস এবং ঢাল ব্যবহার করে পথ খুঁজে নিচ্ছে। ডাল এবং কাঁটার আঘাত নিচ্ছে দেহ পেতে। তীক্ষ্ণ শিলা-পাথরে কেটে ফালি ফালি হচ্ছে নগ্ন পা। তারপরও একবিন্দু কমছে না গতি।

যেকোন মুহূর্তে পিঠের উপর গুলির আঘাত আশা করছে সে।

অবশেষে খোলা বাতাসে এসে উপস্থিত হলো মেয়েটা। ঝোপ আর ঝাড়ে বাধা পাচ্ছে না দেহ। সম্ভবত বন পার হয়ে এসেছে, প্রবেশ করেছে কুটিরের বাগানে। জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলো।

এই তো আরেকটু।

ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো ওর দুনিয়া।

ডান দিক থেকে ভেসে এল যেন সুপারনোভার আলো, সরাসরি ওর দিকেই আসছে। উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল যেন চোখ, যেন গাড়ির হেডলাইটের সামনে এসে পড়েছে কোন ভীত হরিণী...

...হেডলাইট

অসম্ভব উঁচু একটা কণ্ঠ এল কানে।

'শেইচান! শুয়ে পড়ো!

সাথে সাথে নির্দেশ পালন করল মেয়েটা। ওই কণ্ঠের মালিকের উপর জান-প্রাণ ছেড়ে দিতেও দ্বিধা নেই। সুপারনোভা দুটো যেন উড়ে গেল ওর উপর দিকে। নাকে এল গাড়ির তেল-পোড়া গন্ধ।

তারপরই গুলির আওয়াজ।

পরক্ষণেই ধাতুর সাথে মাংসের ধাক্কা লাগার শব্দ।

যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে রইল শেইচান; নড়ার শক্তি নেই।

গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেল কানে, তারপর কে যেন এসে বসল ওর পাশে। 'ঠিক আছ তুমি?' জানতে চাইল গ্রে।

'এখন আছি,' গুঙিয়ে উঠে কাত হলো মেয়েটা, গ্রের অবয়বই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না। 'দুই... দু'জনেই শেষ?'

'নাহ, একজন। অন্যজনকে শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে সে।'

নিশ্চয়ই নেতাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে যিরো।

'হারামজাদার পিছু নিয়েছে কোয়ালস্কি। কিন্তু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে সে। আমরা খুঁজে না পেলেও, এদিকে আবার আসার সাহস পাবে না সে।'

জঙ্গলের দিকে চলে গেল শেইচানের নজর।

রাত ১০:১২

সৈকত থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে বোটটা। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে মাসাহিরো। এরিমধ্যে রেডিওতে আসতে বলে দিয়েছে প্লেনকে। এখান থেকে দ্রুত সরে যেতে হবে। তীরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ছোকরা।

জৈব-আক্রমণটা কাওয়াই বাদে সবখানে ভালোভাবেই সফল হয়েছে। অকস্মাৎ এক ঝড় এসে উপস্থিত হওয়ায় ভেস্তে গেছে ওখানকার আক্রমণ। নইলে অন্যসব দ্বীপেও এতক্ষণে নরক নেমে আসত। তবে যাই হোক না কেন, এখন আর কেউ ওদেরকে থামাতে পারবে না।

খোলা সমুদ্রের দিকে চলে গেল ওর নজর।

সফলতা সত্ত্বেও, লজ্জা ভর করেছে ওর উপরে।

দাদার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বাজে ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কেইজের ধ্বংসের সাথে জড়িত দু'জনের ব্যবস্থা করতে পারেনি সে।

দোষটা আমারই।

তবে এই ব্যর্থতা থেকে শেখার মতো মানসিকতা আছে ওর।

আপাতত এই দ্বীপগুলোকে জ্বলতে দেখেই সান্ত্বনা পাওয়া যাক। সামনে এমন এক পরিস্থিতি আসছে যে আমেরিকানরাই বাধ্য হবে হাওয়াইকে ধ্বংস করতে।

সামনে আর কোন পথ খোলা থাকবে না ওদের।

সত্য একবার সামনে আসলে, বিশ্বই ওদেরকে বাধ্য করবে কাজটা করতে।

টেনুগুইয়ের আড়াল থেকে হাসল মাসাহিরো।

আর আগ পর্যন্ত, অপরিসীম ক্লেশ বিরাজ করবে এখানে।

দ্বিতীয় পর্ব

ইমার্জেন্স স্টেজ

Σ

অধ্যায় দশ

৭ মে, রাত ৩:০৫
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

হাওয়াই-এ আক্রমণের বারো ঘণ্টা পরের কথা। সিগমার কমিউনিকেশন রুমে পায়চারি করছে ক্যাট ব্রায়ান্ট। স্টারবাকসের কাপ ধরে আছে হাতে, বলতে গেলে না ঘুমিয়েই কাটাতে হয়েছে সারা রাত। ক্যাফেইন আর অ্যাড্রেনালিনের উপর ভিত্তি করে চলছে এখনও।

এই কাজে এমন ঘটনা হয় প্রায়শই।

গোলাকার ঘরের ঠিক মাঝখানে থামল মেয়েটা। আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে, মনে হচ্ছে বুঝি কোন নিউক্লিয়ার সাবমেরিনে আছে এখন। চারপাশে অসংখ্য কম্পিউটার স্টেশন, প্রতিটায় বসে আছে একজন করে টেকনিশিয়ান। মনিটার আলো উজ্জ্বল করে রেখেছে ওদের চেহারা। এই ঘরটা সিগমার চোখ আর কানের কাজ করে। তথ্য যেন এখানে এসে সমুদ্রের স্রোতের রূপ ধারণ করে। নানা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির তরফ থেকে আসে তথ্য-দেশের ভেতর... এমনকি বাইরে থেকেও।

এই এলাকার রাণী ছিল সে, ডিজিটাল এই জালের নিয়ন্ত্রণকারী মাকড়সা। হলের দরজার কাছে দেখা একটা অবয়বের দিকে নজর গেল ওর। ভেতরে প্রবেশ করলেন পেইন্টার। নিশ্চয়ই ওদের সবার বস, জেনারেল মেটকাফের সাথে দেখা করে এসেছেন।

'নতুন কোন খবর?' জানতে চাইলেন পেইন্টার।

'কেবল একটা হতাহতের ঘটনা জানাব।'

মুখ কুঁচকে ফেলল পেইন্টার। 'খারাপ?'

'খুবই খারাপ।' একটা ট্যাবলেট তুলে নিল মেয়েটা। 'দ্বীপে মারা যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা চুয়ান্ন, তবে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও এক হাজার জন্য। তাই চোখ বন্ধ করে বলা যায়-মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।'

মাথা নাড়লেন পেইন্টার। 'ওই পঙ্গপাল যে আরও কত মৃত্যুর ঘটনা ঘটাবে তা ঈশ্বরই জানেন।'

'বিশৃঙ্খলা ছড়াতে চলেছে ওই এলাকা জুড়ে। বিশেষ করে যেহেতু স্থানীয় ইমার্জেন্সি সার্ভিস এসব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রস্তুত না। কী করবে, তা কেউ-ই বুঝতে পারছে না।'

'কেউ দায় স্বীকার করেছে?'

'এখন পর্যন্ত না। তবে আমার ধারণা, অতি দ্রুতই এগিয়ে আসবে সচরাচর জানাশোনা সব দল।'

আরও ঝামেলা বাঁধাবে তারা।

'ক্রাশ করা সেসনাগুলোর থেকে ফরেনসিক কিছু খুঁজে পেয়েছে?' জানতে চাইলেন পেইন্টার।

'ড্রোন চালিত সবগুলো। বিগত দুই বছরের মাঝে প্রত্যেকটা চুরি করা হয়েছে বিশ্বের নানা জায়গা থেকে।'

'বোঝাই যাচ্ছে, কেউ না কেউ দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

একটা ওয়ার্ক-স্টেশনের সামনে বসল ক্যাট। ক্লিক করে মনিটরে ফুটিয়ে তুলল প্যাসিফিক সাগরের একটা মানচিত্র। স্বচ্ছ একটা লাল বৃত্ত যেন গিলে খেয়েছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জকে।
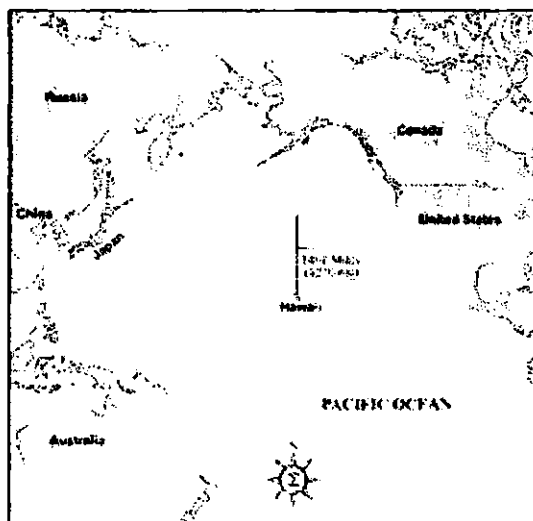
'সেসনা টিটিএক্স প্রায় তেরো শো নটিক্যাল মাইল উড়তে পারে।' বৃত্তটা দেখাল ক্যাট। 'তার মানে, এই এলাকার ভেতরের কোন জায়গা থেকে ছাড়া হয়েছিল ওটাকে।'

ম্যাপের দিকে এগিয়ে গেলেন পেইন্টার। 'যদি মাঝখানে কোথাও তেল ভরা হয়ে থাকে, তাহলে প্লেনটার উৎস আরও অনেক দূরে হতে পারে।'

ভ্রূ কুঁচকালো ক্যাট। 'তাই বলে এতগুলো পাইলট-হীন সেসনা একসাথে? এমন দৃশ্য যে কারও নজর কাড়বে।' আবার মনিটরের দিকে তাকাল সে। 'আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই এলাকার মাঝেই কোন জায়গা থেকে ছাড়া হয়েছে সেসনাগুলোকে।'

'বিশাল এলাকা!'

'প্রায় সাত মিলিয়ন বর্গ মাইল। আমাদের আটচল্লিশ স্টেটের সম্মিলিত আকারের দ্বিগুণ!'

ভ্রূ কুঁচকে পর্দার দিকে তাকিয়ে রইলেন পেইন্টার। 'ওই এলাকায় না হলেও একশোটা দ্বীপ আছে!'

'দ্বীপপুঞ্জ, মগ্নচড়া ইত্যাদি ধরলে আরও বেশী হবে। যাই হোক, এয়ারস্ট্রিপ আছে এমন আকৃতির দ্বীপের সংখ্যা কম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাট। 'মানছি, তারপরও অনেক বেশি হবে সংখ্যায়।'

'হাওয়াইয়ের রাডার রেকর্ড থেকে আর কিছু পাওয়া গিয়েছে?'

'একদম না। ওদের যন্ত্রের ক্ষমতা মাত্র দুইশো মাইল। রাডারে যখন বিমানগুলো ধরা পড়ে, তখন চারপাশ থেকে আসতে শুরু করেছে সব আকাশ যান!'

আচমকা টেকনিশিয়ানদের একজন সিট সরিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে, বিরক্ত করবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

'কী হলো?' জানতে চাইল ক্যাট।

'আমাদের নিরাপদ চ্যানেলে আপনার কল এসেছে।'

'কে করেছে?'

'নিজের পরিচয় দিয়েছে প্রফেসর কিন মাতসুই বলে। বলছে, আপনি নাকি যোগাযোগ করতে বলেছেন।'

পেইন্টারের দিকে তাকাল ক্যাট। 'কর্নেলের বিষ-বিশারদ ভদ্রলোক,' মনে করিয়ে দিল বসকে। 'জাতীয় জাদুঘরে তিনিই ড. বেনেটের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে সহকারীর দিকে তাকালেন পেইন্টার। 'মানে?'

'ভদ্রলোক বেঁচে আছেন দেখছি।'

বিজ্ঞানীর একটা ফাইল বানিয়েছে ক্যাট। ব্রাজিল থেকে পাওয়া রিপোর্ট অনুসারে, এক ছাত্র এবং দুই ব্রাজিলিয়ানসহ হারিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ধারণা করা হয়, মারা গিয়েছেন।

'আমার অফিসে পাঠিয়ে দাও ফোনটা,' জানাল ক্যাট।

কফির কাপ হাতে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এল ক্যাট, সাথে পেইন্টার। বলতে গেলে কোন আসবাব নেই ওর অফিসে, দক্ষতার প্রমাণ চারপাশে। পেনেলোপ আর হ্যারিয়েট, ওর দুই মেয়ের ছবি না থাকলে বোঝাই যেত না যে এই অফিসের দখল ক্যাটের। অবশ্য সেই সাথে মঙ্ক, ওর স্বামীরও একটা ছবি আছে। সেটাও দুই মেয়ের সাথে। রুক্ষ লোকটা মুখ বাঁকা করে আছে। দেখে মনে হয়, পাঁচ এবং সাত বছর বয়সী দুই মেয়ের চাপে অবস্থা খারাপ।

ছবিগুলো দেখা মাত্র চোখে আনন্দ খেলে গেল ক্যাটের। মেয়েদেরকে ক্যাটস্কিলসের একটা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে মঙ্ক। ওর-ও সেখানে যাবার কথা ছিল, কিন্তু এই ঝামেলার কারণে ডিসিতে আটকা পড়ে গেছে।

হয়তো আমি আসলে এই জালের মাকড়সা নই... হয়তো আটকে পড়া কোন মাছি।

তবে জানে, মঙ্ক থাকতে পেনি এবং হ্যারিয়েটের কোন অসুবিধা হবে না। স্বীকার করতে কষ্ট হয় বটে-কিন্তু বিগত কিছু দিন মঙ্ককেই ওর হয়ে মায়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কখনও আপত্তি করেনি অবশ্য লোকটা। গ্রে এবং শেইচানের নেয়া ছুটি ওর মনে ঈর্ষার জন্ম দেয়। মঙ্ককে... ওর পরিবারকে এমনভাবে সময় দিতে পারলে কতই না ভালো হত।

তবে এটাও জানে-প্রায়শই অ্যাড্রেনালিন দেহে না দৌড়ালে, পেটের ভাত হজম হবে না।

কাপে চুমুক দিল মেয়েটা।

এই ক্যাফেইন-ই মারল ওকে...

ইন্টারকমে ভেসে এল একটু আগে ওদের সাথে কথা বলতে আসা টেকনিশিয়ানের কণ্ঠ। 'দুই নাম্বার লাইনে দিয়েছি।'

কাপ নামিয়ে রেখেছে ডেস্ক ফোনের স্পীকার চালু করল ক্যাট। 'প্রফেসর মাতসুই, আমাকে ফোন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'আমার হাতে বেশি সময় নেই। বলুন, কী বলবেন?'

আন্তর্জাতিক কানেকশনের অবস্থা ভালো না। তারপরও অন্যজনের কণ্ঠের সন্দেহ কান এড়াল না ক্যাটের। পেইন্টারের দিকে তাকাল সে, হাতের ইঙ্গিতে কথা চালাবার নির্দেশ দিলেন সিগমা ডিরেক্টর।

প্রফেসরের মৃত্যু সংবাদের ব্যাপারে না জানার ভান করল ক্যাট। 'আপনার নামটা ডিসির এক পতঙ্গ-বিদের মুখে শুনেছি। বোলতার এক অস্বাভাবিক প্রজাতির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন আপনি।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন মাতসুই। তবে পুরোপুরি নয়, ফিসফিস করে বলা কথার আওয়াজ এ পাশ থেকেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অন্য কারও সাথে আলাপ করে নিচ্ছেন প্রফেসর।

পেইন্টারের দিকে তাকাল ক্যাট।

কী হচ্ছে ওখানে?

'তা বলেছি,' অবশেষে জবাব দিলেন ভদ্রলোক। 'তবে আমাদের যে দেরি হয়ে গিয়েছে, তা সম্ভবত আপনিও বুঝতে পারছেন।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'ওডোকুরোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

'ওডোকুরো মানে?'

'হাইমেনোপটেরার এই প্রজাতিকে আমি সেই নামেই ডাকি। জাপানিজ এক দানব, গাসাডোকুরো-র নামে নাম। বিশ্বাস করুন, এর চাইতে ভালো আর কোন নাম অন্তত এই প্রজাতির ক্ষেত্রে খাটে না। দুই মাস হলো এদেরকে নিয়ে গবেষণা করছি। এদের জীবনচক্র আপনার মাথাতেও আসবে না।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান। এদের নিয়ে গবেষণা করছেন কোথায়? কিয়োটো-তে?' প্রফেসর শেষ যে ঠিকানা ব্যবহার করেছেন, সেটা মনে করল ও।

'এখন আর কিয়োটোতে নেই।'

'তাহলে?'

'হাওয়াই-এর দিকে রওনা দিয়েছি। তানাকা কর্পোরেটের জেটে, এক ঘণ্টার মাঝে পৌঁছে যাব।'

'ওখানে যাচ্ছেন কেন?'

'সারেজমিনে ওদের ঘাঁটি দেখতে। এছাড়া নিশ্চিত হবার আর কোন উপায় নেই।'

'কোন ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছেন?' প্রশ্নটা করার আগেই উত্তরটা আন্দাজ করতে পারল সে।

'ওই দ্বীপগুলোতে নিউক্লিয়ার বোমা মারতে হবে নাকি আপনাদের, তা জানার জন্য।'

সকাল ৯:২৮
উত্তর প্যাসিফিক সমুদ্রের উপরে

কর্পোরেট হোন্ডা-জেট ৪২০ এর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন কিন মাতসুই। তার কথা যে বোমা বিস্ফোরণ করেছে, তা জানেন। সেই ধাক্কা সামলাবার সময় দিচ্ছেন ক্যাটদের। হনলুলুর দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছে আকাশযানটা। এই ধরনের যানবাহনের মাঝে এর চাইতে দ্রুতগামী জেট আর হয় না। মাঝপথে একবার তেল নিয়ে নেয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ছোট কেবিনে পায়চারী করছেন তিনি।

চুপ থাকতে রাজি হওয়া উচিত হয়নি আমার।

আইকো হিগাশির দেহাবয়বের দিকে তাকালেন তিনি। জাপানের পাবলিক সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সদস্য বলে মেয়েটা দাবী করছে নিজেকে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি-এমন সব ব্যাপার খতিয়ে দেখে এই সংগঠন। সেই সাথে স্থানীয় জঙ্গি গ্রুপগুলোর উপরেও নজর রাখে। অবশ্য কিনের সন্দেহ, এই মেয়ের অতীতে আরও অনেক ঘটনা আছে।

অবশ্য মেয়েটার আচরণ মিলিটারি ট্রেনিং পাওয়া একজনের মতো। চুলগুলো ছোট ছোট করে কাটা। নেভি ব্লু রঙের স্যুট মাড় দেয়া। চেহারার শক্ত ভাবটার মাঝে বিগত মাসগুলোতে কোন পরিবর্তন আসতে দেখেননি তিনি একবারও।

অনেকক্ষণ পর শোনা গেল ক্যাথরিন ব্রায়ান্টের কণ্ঠ। কিনের মনে এই মহিলা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আসলেই কি সে ডারপার আরেকজন কর্মী মাত্র? যখন শুনেছেন যে ক্যাট তার সাথে কথা বলতে চায়, তখন মানা করে দিতে চেয়েছিলেন। বলতে গেলে আইকোর জোরাজুরিতেই রাজি হতে হয় তাকে। এখনও কান পেতে আছে মেয়েটা, সামনের দিকে ঝুঁকে কথা শুনতে চাইছে।

'এমন অকস্মাৎ এত বড় একটা কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কী?' জানতে চাইল ক্যাট।

'আমি নিজেই দেখেছি, এই ওডোকুরো কতটা ভয়াবহ দংশ ডেকে আনতে পারে।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

আইকোর দিকে তাকালেন কিন, আলতো মাথা দোলাল মেয়েটা। আগেই বলে রাখা হয়েছে থাকে-এই মহিলাকে যেন সত্য কথা বলা হয়। ভাবখানা এমন, ক্যাটকে ভালোভাবেই চেনে আইকো... বিশ্বাস করে।

কিন জানেন না, কাকে বিশ্বাস করা যায় আর কাকে যায় না। সরকারের প্রতি সন্দেহটা আসলে বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া। তারা জানতেন, সরকারী ক্ষমতা কতটা সহজে সবাইকে গিলে নিতে পারে। তার জাপানি বাবা ইন্টারমেন্ট ক্যাম্পের অধিবাসী হিসেবে সেই জঘন্যতা দেখেছেন। জার্মান মা-ও কী কম যান? নিজ দেশে

একই দৃশ্য দেখেছেন তিনিও, যদি কখনও সে ব্যাপারে কথা বলেননি খুব একটা। কর্তৃপক্ষের প্রতি সন্দেহ এবং দলিতদের পক্ষ নেয়া শিখিয়েছেন খুব ভালো ভাবেই।

তবে এটাও জানেন কিন, তার এই গল্প সবার শোনা উচিত।

বিশেষ করে এখন।

'আট সপ্তাহ আগের কথা...' শুরু করলেন তিনি, বলতে বলতেই স্তিমিত হয়ে এল কণ্ঠ।

এরিমাঝে এতদিন পার হয়ে গেল?

তার ছাত্র, অস্কার হফের হাস্যরত চেহারা এখনও ফুটে ওঠে চোখের সামনে। কানে শুনতে পান গুলির শব্দ। চোখ বন্ধ করে ভয় আর আতঙ্ককে পেছনে ঠেলে দিলেন তিনি। তারপরও কেন যেন অপরাধবোধ বুকের ভেতর আস্তানা গেড়ে বসে আছে।

'তারপর?' তাড়া দিল ব্রায়ান্ট।

মুখ খোলার আগে ঢোক গিলে নিলেন কিন। তারপর আস্তে আস্তে এলহা ডা কুইমাডা গ্র্যান্ডে-তে কী হয়েছিল, তা বলতে শুরু করলেন। গল্প শেষ করার আগেই যেন ফিরে এল সেদিনকার সেই ভয়। মৃত দেহগুলোর কথাও বললেন তিনি-চোরাচালানকারী এবং সাপের দঙ্গল-কারও কথাই বাদ গেল না। সেই সাথে বললেন হেলিকপ্টার আক্রমণের কথা।

'জ্বালিয়ে একেবারে ছারখার করে ফেলেছে দ্বীপটাকে। কিন্তু আমি পালাতে পেরেছিলাম... খালি হাতে আসিনি। একটা নমুনা আনতে পেরেছিলাম। অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে একটা ছোট্ট ব্রাজিলিয়ান গ্রামে গিয়ে পৌঁছাই। ভয় হতে থাকে, যদি কেউ আমার বেঁচে থাকার সংবাদ পায় তো...'

'আপনাকে মেরে ফেলবে,' ওপাশ থেকে নিস্পৃহ একটা কণ্ঠ বলল।

কিনের মনে হলো, স্বস্তি ভর করেছে তার মনে। আসলে অস্কারের মৃত্যু চোখের সামনে দেখেও চুপ থাকাটা তিনি হজম করতে পারছিলেন না। এটাই ছিল তার অপরাধবোধের উৎস।

নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন প্রফেসর। 'ওই নমুনার গুরুত্ব আমার বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। দ্বীপে কী হলো, কেন হলো, তা বোঝার জন্য এটার খুব দরকার ছিল। তাই আমার এক সহকর্মীর শরণাপন্ন হলাম, তানাকার এই কর্মচারী আমার বিশ্বস্ত। কোম্পানিটার টাকা ছাড়া সাবধানে এবং সবার অলক্ষ্যে আমার ব্রাজিল থেকে জান নিয়ে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।'

'তানাকা আপনাকে নকল কাগজ-পত্র জোগাড় করে দিল?'

আবারও আইকোর দিকে তাকালেন তিনি, মেয়েটা মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ। কিয়োটোতে সাবধানেই পৌঁছলাম। এরপর ল্যাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম গবেষণা নিয়ে। নমুনাটা ছিল একটা সাপের। ওটার দেহ ভর্তি ছিল লার্ভায়-বোলতার এই বিশেষ প্রজাতির ইনস্টারে।'

'ইনস্টার?'

'পতঙ্গের জীবনচক্রের একটা ধাপ।' ব্যাখ্যা করলেন প্রফেসর। 'এই ইনস্টারগুলো ভেতর থেকে সাপটাকে খেয়ে বড় হচ্ছিল।'

কথাগুলো বলতে বলতেই গা শিউরানো দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল তার।

কিন্তু ঘটনা তো এখানেই শেষ না।

'দ্বীপের ব্যাপারে ফিরে আসি।' বলল ক্যাট। 'আমার মনে হচ্ছে, হাওয়াই-এ আক্রমণ যে লোকটার মাথা থেকে বেরিয়েছে, সে আসলে অনুশীলন করেছে আপনার ওই দ্বীপে।'

'সম্ভবত আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু এমন পরিকল্পনা করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। আমার ধারণা ছিল, ওখানে কোন গোপন গবেষণাগার আছে। হয়তো আচমকা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ওদের গবেষণার বিষয়বস্তু, সেখানে ধামাচাপা দেবার জন্য সব জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি? এদিকে আপনি আচমকা ওই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলেন?'

'আমিও প্রথমে তেমনটাই ভেবেছিলাম।' মেনে নিলেন প্রফেসর। এই ঘটনাটা কাকতাল হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি।

না হলেও অন্তত নিজেকে সেটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

'এখন সন্দেহ হচ্ছে?'

চুপ করে রইলেন কিন। আসলেই সন্দেহ হচ্ছে এখন।

আবারও ফোনে শোনা গেল মহিলার কণ্ঠ। 'আপনি বলছেন, তানাকা ফার্মাসিটিক্যাল আপনার রিসার্চের পেছনে টাকা ঢেলেছে। এই কোম্পানিই কি আপনাকে সাপের বিষ আনতে পাঠিয়েছিল ওই দ্বীপে?'

'হ্যাঁ,' ইতস্তত করতে করতে বললেন প্রফেসর। নজর তার আইকোর দিকে। কিন্তু মেয়েটা চোখের পলকও ফেলছে না।

'ভাবছি,' বলল ক্যাট। 'ওই দ্বীপে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কাজ করছে, এই সন্দেহে আপনাকে পাঠায়নি তো?'

মেয়েটা যেন ওর মনের কথা পড়ছে, ভাবলেন কেন। মুখ ফুটে বলেননি বটে, কিন্তু নিজেকে কোন বিশাল খেলার নগণ্য ঘুঁটি বলে মনে হয়েছে তার। জাপানের ব্যবসা-ক্ষেত্রে রক্ত ঝরা খুব স্বাভাবিক। হয়তো আসলেই কোন গুজব শুনেছিল তানাকা।

আর আমাকে পাঠিয়েছে সেই গুজবের সত্যতা জানার জন্য!

ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভদ্রলোকের হাত-পা।

কিন্তু এখন কথা শেষ হয়নি মহিলার।

'আমার ধারণা সত্যি হলে, তানাকার পোষা গোয়েন্দাদের দেয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনাকে ওই দ্বীপে পাঠানো হয়েছে। তার মানে এখানে অন্য কোন কোম্পানি জড়িত। সম্ভবত জাপানেরই কোন কোম্পানি হবে সেটা।'

'জা... জাপানেরই কেন?'

'গত রাতের আক্রমণের লক্ষ দেখে সেটাই মনে হয়।'

ইশ, কথাটা আমি কেন ভাবিনি?

আচমকা স্যাটেলাইট ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য ইঙ্গিত দিল আইকো।

ইতস্তত করলেও, মেনে নিলেন প্রফেসর।

'কনিচুয়া, ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট। আমি আইকো, আইকো হিগাশি। প্রফেসরের সাথে আমিও বিমানে আছি-এ কথা না জানাবার জন্য ক্ষমা চাইছি। দেখতে চাচ্ছিলাম, আমার সংস্থার মতো আপনিও এই সিদ্ধান্তে আসেন কিনা।'

'হ্যালো, আইকো,' বিন্দুমাত্র ইতস্তত ভাব নেই মহিলার কণ্ঠে, যেন বিমানে কোন গোয়েন্দার উপস্থিতি প্রত্যাশিতই ছিল। 'এই সিদ্ধান্তে আসাটাই তো স্বাভাবিক। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল।' তার পরের কথাটা নাড়িয়ে দিল কিনকে। 'সম্ভবত আরেকটা পার্ল-হারবার ঘটাবার চেষ্টা করছে কেউ।'

একমত হলো আইকোও। 'হ্যাঁ, জৈব-পার্ল-হারবার।'

জানালার দিকে তাকালেন কিন।

এদের কথা সত্যি হলে, আমি কি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোচ্ছি?

দুপুর ৩:৫৫ ই.ডি.টি.
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

ডিরেক্টরকে সাথে নিয়ে অফিস থেকে বেরোল ক্যাট।

ফোনের কথা শেষ। হনলুলুতে না গিয়ে, মাউই-এর কাহুলুই বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পরামর্শ দিয়েছে সে আইকোদের। ওখান থেকে হানায় গিয়ে গ্রে-দের সাথে যোগ দেবে তারা, বিচার করবে পরিস্থিতির।

ফোন কল তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয়েছে ওদের, জেটের কারণে। তাই হুমকির আসল রূপটা জানতে পারেনি ক্যাট। তাই বলে বসে থাকার মতো মেয়ে সে নয়, নতুন একটা পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিল ও। মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে পেইন্টারকে শোনাল পুরোটা।

‘আইকো জানিয়েছে-ওডোকুরো প্রজাতি সংক্রান্ত প্রফেসর মাতসুই-এর গবেষণাপত্র, ল্যান্ড করার সাথে সাথে পাঠিয়ে দেবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি ডা. বেনেটের সাথে কথা বলতে চাই।’

‘তার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে আসবে।’ আলতো করে মেয়েটার হাত স্পর্শ করলেন পেইন্টার। ‘কিন্তু এই আইকো হিগাশি মেয়েটাকে তুমি বিশ্বাস করো?’

লম্বা শ্বাস নিল ক্যাট। ‘পেশাদার একটা সম্পর্ক আছে আমাদের মাঝে। কিন্তু তার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানি না। আমি যখন ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের ছিলাম, আইকো তখন জাপানের মিনিস্ট্রি অফ জাস্টিসের হয়ে কাজ করত। অচিরেই পাবলিক সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ওকে দলে ভেড়ায়। দুই বছর আগে হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর আবার একই প্রতিষ্ঠান, মানে পিএসআইএ-এর পতাকা তলে এসে দাঁড়ায়।’

‘এসব থেকে কী বুঝছ?’

‘আইকো উধাও হবার কয়েক মাস আগে, সিরিয়ার এক সংগঠন পাকড়াও করে দুইজন জাপানিজকে। মিলিটারির চাপে পড়ে যান প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লেখা জাপানিজ সংবিধান অনুযায়ী-বিদেশি মাটিতে গোয়েন্দা কার্যক্রম কমাবার কথা ছিল। তবে ক্ষমতাবান অনেকেই চাইছেন-সংবিধান সংশোধন করে জাপানের ইন্টেলিজেন্স অপারেশন বাড়ানো হোক।’

‘তোমার ধারণা, এই মহিলা কোন নতুন করে গড়ে তোলা সংগঠনের এজেন্ট?’

‘তেমনটা না-ও হতে পারে। জাপানের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর মাঝে কোন সদ্ভাব নেই। তাই বিদেশে কোন অপারেশন চালাতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে ওদের লম্বা সময় লাগবে।’

‘তাই তোমার ধারণা, সরকারী কাজের চাকা ঘোরার আগেই ওরা নিজেদের মতো করে কাজে নেমে পড়েছে?’

‘আমি হলে তাই করতাম,’ শ্রাগ করল ক্যাট। ‘এমনিতেও জাপানিজদের ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় করার অভ্যাস আছে।’

‘আইকো যদি এই গোপন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অংশ হয়, তাহলে কী তার উপর বিশ্বাস করা বোকামি হবে?’

হলের দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাট। ‘আমার মতোই, নিজ দেশের স্বার্থ সবার সামনে রাখবে সে।’

নড করলেন পেইন্টার। ‘ঠিক আছে, ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে।’

ডিরেক্টরকে তার অফিসে ফেরত দিয়ে আসার কথা ভাবছিল ক্যাট, ঠিক সেই সময় টেকনিশিয়ান ছেলেটা ওর দিকে তাকিয়ে একটা ফোন তুলে ধরল।

‘কে?’ জানতে চাইল ক্যাট।

'আরেকটা কল।' উত্তর পেল সাথে সাথে। 'জরুরী মনে হচ্ছে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল মেয়েটা। আইকোর তো এত তাড়াতাড়ি ল্যান্ড করার কথা না।

'সাইমন রাইট ফোন করেছেন।' জানাল টেকনিশিয়ান।

ক্যাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন পেইন্টার। 'ক্যাসেলের কিউরেটর?'

অদ্ভুত ফোন কলটা ক্যাটের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। সাইমন, যাকে দুর্গের রক্ষণা-বেক্ষণকারী বলা হয়। জাদুঘরের একমাত্র কর্মচারী, যিনি ভূ-গর্ভে সিগমার অবস্থানের ব্যাপারে জানেন।

'কী চান তিনি?' জানতে চাইল ও।

এবার পেইন্টারের দিকে তাকাল টেকনিশিয়ান। 'তিনি জানতে চাইছেন, ডিরেক্টর তার সাথে ক্যাসেলের রিজেন্ট'স রুমে দেখা করতে পারবেন কিনা। আসলে নাকি অনুরোধটা করেছেন ইলেনা ডেলগাডো, লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসের লাইব্রেরিয়ান।'

হতভম্ব চেহারা নিয়ে ফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন পেইন্টার। 'কী ব্যাপার, সাইমন?'

ডিরেক্টরের পিছু পিছু এগিয়ে এসেছে ক্যাটও।

'ড. ডেলগাডো বলছেন, হাওয়াই-এর ঘটনার ব্যাপারে নাকি তার কাছে তথ্য আছে। এর সাথে নাকি এই ক্যাসেলের প্রতিষ্ঠা সরাসরি জড়িত!'

একেবারে বোকা বনে গেলেন পেইন্টার। 'কী তথ্য? কী বলতে চাইছেন তিনি।'

'আমি নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে তার কাছে নাকি হাওয়াইতে ছেড়ে দেয়া পতঙ্গের ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্য আছে। অতীতের এক বিশেষ সাবধান বাণী শোনাতে চান তোমাকে।'

'কার সাবধান বাণী?'

'আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের।'

অধ্যায় এগারো

৭ মে, সকাল ১১:০৫
হানা, মাউই দ্বীপ

সূর্যালোকে উদ্ভাসিত পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে, কাছের এক খেলার মাঠে ছোট হেলিকপ্টারের অবনমন দেখছে গ্রে। আরেকটা আকাশযান-একটা মেডিভ্যাক, বসে আছে মাঠে। সকালের হাওয়া গায়ে মেখে পতপত করে নড়ছে তাঁবুগুলো।

চারপাশ থেকে মাঠটাকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো ইমার্জেন্সি বাহন। রাতভর আগমন ঘটেছে তাদের। হানার ঘোরানো-প্যাঁচানো হাইওয়ে ধরে এগিয়ে এসেছে ওগুলো। সেই সাথে বুলহর্ণে চিৎকার করে আদেশ দেয়া হচ্ছে, বিশৃঙ্খলা তাতে আরও বেড়েছে।

মৃতদেরকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আহতদের অবস্থা দেখা হচ্ছে পরীক্ষা করে। খারাপ অবস্থা যাদের, তাদেরকে জাহাজে করে মাউই-এর নানা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যান্য কিছু দ্বীপেও পাঠানো হচ্ছে কাউকে কাউকে, হনুলুলু এবং হাইলোতেও আক্রমণ হয়েছে। তাই বিছানার পরিমাণও কম।

খেলার মাঠে নামা হেলিকপ্টার থেকে নামল দু'জন মানুষ। ওদেরকে দেখে হাত তুলল গ্রে, এদিকেই এগিয়ে এল ওরা। কাছে আসতেই মানুষ দু'জনকে চিনতে পারল গ্রে। ক্রো আগেই বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রফেসর কিন মাতসুই-এর হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ, বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছেন। বয়স ত্রিশের ঘরে হবে, তবে চামড়ার বাদামি রঙ এবং চোখের চারপাশের চামড়ার কুঁচকানি দেখে বোঝা যায় যে সেই ত্রিশ বছরের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন রাস্তায়। কাজে নামার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন তিনি। পরনে খাকি প্যান্ট, বুট আর শার্টের নিচে ইউটিলিটি ভেস্ট।

জাপানিজ ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট আসছে তার পেছন পেছন। আইকো হিগাশি একেবারে হ্যাংলা-পাতলা। চারপাশে নজর বুলাতে বুলাতে আসছে সে। ওই এক নজরই যে সবকিছু মুখস্থ করার জন্য কাফি, তা বুঝতে কষ্ট হলো না গ্রে-র।

কেন এই দুজনকে এখানে পাঠানো হয়েছে, তা-ও জানে ও: পতঙ্গ-পালের আকস্মিক বসতি স্থাপনের কারণে, উদ্ভূত পরিস্থিতি কতটা জটিল তা বের করার জন্য।

গ্রে-র কাজ হলো, তাদের এই উদ্দেশ্যকে দ্রুত সফল করার জন্য যা যা দরকার তার ব্যবস্থা করা। সেজন্য প্রথমেই ওদেরকে হানা থেকে সরিয়ে, সরকারী আমলাতান্ত্রিক জটিলতার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রে-র দিকে এগিয়ে এলেন প্রফেসর মাতসুই, করমর্দন করলেন। তবে তার নজর থমকে আছে মেডিভ্যাক কপ্টারটার উপর। 'ওরা এখানে কী করছে? এই পুরো এলাকাকে আলাদা করে ফেলা উচিত ছিল।'

'ওটা করে লাভ নেই, প্রফেসর।' আইকো ভদ্রলোকের পাশে দাঁড়িয়ে বলল। 'এরিমাঝে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দলবল নষ্ট হওয়া ছাড়া আলাদা করে আর কোন লাভ হবে না। একটা না, অনেকগুলো দ্বীপ আক্রান্ত হয়েছে। যদি আপনার সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পরিস্থিতি গুরুতর, তাহলে ওই জনবলের দরকার পড়বে খুব।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল গ্রে। 'কী বলতে চাইছেন?'

'পুরো হাওয়াইকেই আলাদা করে ফেলতে হবে। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যেন কেউ এই দ্বীপ থেকে বাইরে বেরোতে না পারে।'

জিপের দিকে এগোতে এগোতে খবরটা শুনল গ্রে। আগেই শুনেছে, প্রফেসরের বিশ্বাস যে এই বিপদের একমাত্র সমাধান নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ।

এখন যদি কাউকে দ্বীপ থেকে বেরোবার অনুমতি দেয়া না হয়...

জিপে ওঠার আগেই প্রফেসরকে থামাল গ্রে। 'আপনার একটা প্রাথমিক সিদ্ধান্তে আসতে কেমন সময় লাগবে?'

'একদিনেরও কম। কিন্তু যদি আমার সন্দেহ ঠিক হয়, তাহলে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবার জন্য মাত্র তিনদিন থাকবে আমাদের হাতে।'

কড়া চোখে গ্রের দিকে তাকালেন প্রফেসর, 'উপযুক্ত পদক্ষেপ' বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন-তা আর কাউকে বলে দিতে হলো না।

জিপের দিকে ঘুরতে ঘুরতে বললেন তিনি। 'আমার কথা বিশ্বাস করুন, যদি সন্দেহ ঠিক হয় তো দ্বীপবাসীরাই আমাদের পা ধরে বলবে-বোমাগুলো ফেলুন।'

নীল স্ক্রাব পরিহিত এক ডাক্তারের কানে গেল কথাটার শেষ অংশ। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সে। অযথা আতঙ্ক যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য সবাইকে জিপে ওঠার তাগাদা দিল সে।

পালু এরিমাঝে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসে গিয়েছে। আশপাশের এলাকা সম্পর্কে জানে, এমন একজনকে দরকার ছিল গ্রে-র। তাই হাওয়াইয়ান

ফায়ারম্যানকে ভাড়া করেছে। পুরো ঘটনা সম্পর্কে জানার পর অবশ্য পালুর আপত্তি করার কোন কারণও ছিল না। শহরে ওর স্ত্রী এবং দুই সন্তান বাস করে।

সবাই উঠে পড়লে, জিপ ছাড়ল পালু। ভাড়া করা কুটিরের দিকে এগোতে শুরু করল গাড়ি। রাস্তায় ওঠার নামও নিল না বিশালদেহী লোকটা, মাটির রাস্তা দিয়েই ছুটল জিপ। এমনকি একপর্যায়ে তো এক নারকেলের ফার্মের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল।

দরজার হ্যান্ডেল আঁকড়ে ধরে রইলেন প্রফেসর মাতসুই। দোল খাচ্ছেন বটে, কিন্তু সামনের সবুজ দৃশ্যের উপর থেকে নজর হটাচ্ছেন না একবিন্দু।

'ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'আমি যেন ভুল হয়ে থাকি!'

অবশেষে কুটিরে পৌঁছল জিপ। পোর্চের নিচেই জিপ পার্ক করল পালু। কোয়ালস্কি ওখানেই বসে অপেক্ষা করছিল, স্যাটেলাইট ফোনটা কানের সাথে লাগিয়ে রেখেছে। গ্রে-র দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল বটে সে, কিন্তু কলটা ছাড়ল না।

'যথেষ্ট টাকা দিয়েছি আমি,' বলল কোয়ালস্কি। 'ওই হারামজাদাকে বলো-পুলের পাশের কাবানাটা কেবলই তোমার। যদি তারপরও ঝামেলা করে, তাহলে আমি এসে একটা ছাতা নিয়ে ওর এমন জায়গায় ঢোকাবো, যেখানে সূর্যের আলো যায় না!'

কোয়ালস্কির প্রেমিকা, মারিয়া, কাছের একটা জায়গা-ওয়াইলিয়াতে থাকার প্রস্তাব দিয়েছে। মেয়েটা জেনেটিক্সে দক্ষ। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে তার জ্ঞান কাজে আসতে পারে।

অন্তত অনুমতি দেবার সময় তেমনটাই মনে হয়েছিল গ্রে-র। তবে এখন যখন আসল পরিস্থিতি আঁচ করতে পারছে, তখন মনে হচ্ছে-শুধু শুধু জিনবিদের জীবনটা হুমকির মধ্যে ফেলা হলো।

দরজায় দেখা গেল শেইচানকে। ফুলে ওঠা চোখজোড়া দিয়ে তাকাল আগন্তুকের দিকে। মনোযোগ আইকোর দিকেই বেশি বলে মনে হলো ওর।

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়াল গ্রে। 'ভেতরে খাবার এবং পানীয় আছে।' অন্যদেরকে জানাল সে। 'তথ্য-বিনিময় করে নিতে পারি আমরা। এক ঘন্টার মাঝে পথে নামতে চাই।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর মাতসুই। 'যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভালো।'

সবার সাথে সবাইকে পরিচিত করিয়ে দিল গ্রে। শেইচানের হাত ধরে ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'আমাকে কিন বলে ডাকতে পারেন।' সবাইকে উদ্দেশ করে কথাটা বললেও নজর রইল তার শেইচানের উপরেই। অবশ্য পুরুষদের চোখের এমন দৃষ্টি মেয়েটার জন্য নতুন নয়... এমনকি কিছু মেয়ের চোখেও দেখা যায় সে দৃষ্টি।

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরল গ্রে। কাজটা অবশ্য করা হলো প্রফেসরের ভালোর জন্যই।

নইলে আপনার বারোটা বাজাবে শেইচান...

কোয়া কাঠের তৈরি একটা ছোট ডাইনিং টেবিলে সবাইকে বসাল গ্রে। উপর থেকে বাতাস দিচ্ছে একটা সিলিং ফ্যান। সবাই বসলে, প্রফেসরের দিকে তাকাল ও।

'আমরা এখানে কীসের সম্মুখীন হয়েছি?' জানতে চাইল সে।

সকাল ১১:২৮

ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে একটা ল্যাপটপ আর কিছু ফাইল বের করলেন কিন। ওগুলো গোছাতে শুরু করলেন তিনি, নিজের চিন্তাকে গুছিয়ে নেবার জন্য কিছুটা সময় দিতে চাইছেন।

কোত্থেকে শুরু করব?

অবশেষে ছবি ভর্তি একটা ফাইল তুলে নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করলেন তিনি।

'আমি এই প্রজাতির নাম দিয়েছি ওডোকুরো হরিবিলিস। এর সম্পর্কে সবকিছু আমি জানি না, তবে এতটুকু জানি-এরা আসলেই হরিবল!'

চেয়ারে বসা শেইচান নড়ে উঠল, চেহারা কিছুটা কুঁচকে গিয়েছে। 'ওডোকুরো নামটা পরিচিত লাগছে,' বলল সে। 'জাপানী পুরাণ অনুসারে, ওডোকুরো এক দানবের নাম।'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন প্রফেসর। 'গাসাডোকুরো এক প্রাচীন আত্মা। বলা হয়ে থাকে-সে জন্ম নিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিশাল এক কঙ্কাল-রুপী দানব, যাকে তৈরি করে হয়েছে মৃতদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাড় ব্যবহার করে। ওসব হাড়ের খটখটানি ছাড়া দানবের আগমন বোঝা যায় না।'

আবারও ফাইলের দিকে তাকালেন কিন। কুইমাডা গ্রান্ডে-এর দৃশ্য মনে পড়ে গিয়েছে তার। সেই সাথে মনে পড়ে গিয়েছে পতঙ্গ দলটার ভেসে আসার আওয়াজটাও। খটখটানি আওয়াজ বলেই মনে হচ্ছিল ওটাকে।

তবে একমাত্র এই কারণেই প্রজাতির এমন নামকরণ করেননি তিনি।

'গাসাডোকুরো একবার কারও গন্ধ পেলে,' যোগ করলেন প্রফেসর। 'কোন কিছুই তাকে থামাতে পারে না। দরকার পড়লে নিজেকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করে সে ক্ষুদ্র কোন ফাঁক দিয়েও ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। ওপাশে গিয়ে আবার বানিয়ে নেয় নিজের পূর্ণ আকৃতি।

'আর যখন শিকারকে পাকড়াও করে, তখন আর পালাবার কোন উপায় নেই। হাজার অনুরোধ-উপরোধ করেও তাকে থামানো সম্ভব না। শিকারের রক্ত, মাংস, চামড়া গিলে খায় সে। তবে হাড়গুলো যোগ করে নেয় নিজের মধ্যে।'

গুডিয়ে উঠল কোয়ালস্কি। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনার গল্পের বাকি অংশটুকু আমার পছন্দ হবে না।'

তা হবে না।

'ভুলের গল্প বাদ দিন,' বলল গ্রে। 'বোলতার গল্পে আসুন।'

'অবশ্যই,' গলা পরিষ্কার করলেন প্রফেসর। 'প্রথম কথা, এই প্রজাতির জন্ম কোন ল্যাবরেটরিতে হয়নি। ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখেছি, জেনেটিক-ইঞ্জিনিয়ারিং করে বানানো হয়নি এদেরকে। মনে হয়েছে অতি প্রাচীন, প্রি-হিস্টোরিক কোন প্রজাতি এই বোলতা। সেই জুরাসিক আমলের বোলতার ফসিলও কিন্তু আমরা পেয়েছি। ওই সময়ের পর থেকে, বোলতার প্রজাতির অনেক বিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রায় ত্রিশ হাজার আলাদা আলাদা প্রজাতি পাওয়া যায় পরিবেশে। বুঝতেই পারছেন, বাঁচার প্রশ্নে অত্যন্ত দক্ষ এই বোলতা। এজন্য নানা রকম পরিবর্তন এনেছে তারা নিজেদের মাঝে। অন্যান্য অনেক পতঙ্গের কর্ম-পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্যের আত্তীকরণ করেছে।'

'এই বিশেষ প্রজাতিটি?' প্রশ্ন করল গ্রে।

'আমি অন্তত এত চালু প্রজাতি এর আগে দেখিনি। একটা উদাহরণ দেই। বোলতা প্রজাতিকে সাধারণ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে থাকবে একাকী শিকারি। অন্য ভাগে দলগতভাবে বাস করা প্রজাতি।' অন্যদের চোখে-মুখে বিভ্রান্তি দেখে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'দলগতভাবে যেসব বোলতা থাকে, যেমন ইয়েলো জ্যাকেট বা হর্নেট, তারা সাধারণ চাক বানায়। ওদের দলে থাকে একজন রাণী। ওই রাণী ডিম পাড়ে, সেই সাথে খাবার সংগ্রহের জন্য থাকে কিছু কর্মী। যোদ্ধাও থাকে। এদের বিষ সাধারণত শত্রুর দেহে ব্যথার জন্ম দেয় নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য। যেন শত্রু ভুলেও আর ওমুখো না হয়।'

হাওয়াইয়ান পালু পেটে হাত বুলালো। 'তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

'হুম। কিন্তু যদি কেউ অনেকগুলো কামড় খায়, তাহলে কিন্তু তার ফল মারাত্মকও হতে পারে।'

মুখ বিকৃত করল গ্রে। 'গত রাতে তার উদাহরণ দেখেছি।'

'তবে একাকী শিকারিদের তুলনায় এরা অনেক শান্ত।' নিজের অজান্তেই শেইচানের দিকে তাকালেন কিন। 'একাকী থাকে বলে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী পদ্ধতি বানিয়ে নিয়েছে তারা। ওদের কোন চাক থাকে না। এই প্রজাতির যোদ্ধারা,

যারা সবাই স্ত্রী, দুটো কাজে নিজেদের হুল ব্যবহার করে। তাদের মাঝে একটা হচ্ছে সেই কাজ, যেটা করার জন্যই হুলের উৎপত্তি হয়েছিল।'

'মানে?' প্রশ্ন করল শেইচান।

আবারও ব্যাখ্যা করলেন কিন। 'সব ধরনের হাইমেনোপটেরার হুল আসলে ওভিপজিটর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ওটার কাজ ছিল সিরিঞ্জের মতো করে কলা ভেদ করা, তারপর শিকারের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া নিজেদের ডিম। সময়ের সাথে সাথে ওভিপজিটর রূপ নিয়েছে অস্ত্রের।'

'কীভাবে?'

'যেকোন চাকে মাত্র একজনই ডিম দেয়-রাণী। তাই প্রজাতির অন্যান্য মাদীগুলোর অভিপজিটরের নিচে আর কোন ডিম্বথলি থাকে না। কালের প্রভাবে তাই ওটা পরিণত হয়েছে বিষথলিতে। এজন্যই আমরা এখন মৌমাছি বা বোলতা প্রজাতির পুরুষ সদস্যদের নিয়ে খুব একটা চিন্তা করি না। তাদের কোন ডিম্বথলি নেই বলে, হুলেরও দরকার নেই!'

বড় করে দম নিল কোয়ালস্কি। 'এখন আমাকে বোলতার স্কার্ট তুলে দেখতে হবে, ওটা নারী না পুরুষ? তারচেয়ে বরং পায়ের নিচে সবাইকে পিষে মারব!'

কিনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল গ্রে। 'বলতে থাকুন। যেহেতু একাকী শিকারি প্রজাতির কোন চাক নেই, ওই প্রজাতির মহিলারা নিশ্চয়ই এখন ওভিপজিটর ব্যবহার করে ডিম ঢুকিয়ে দেয় শিকারের দেহে?'

'ঠিক বলেছেন। তবে যেটা বলছিলাম, ওই হুলগুলোর দুটো কাজ আছে। একটা ডিম প্রবেশ করানো, অন্যটা শিকারকে কাবু করার জন্য বিষ ঢুকিয়ে দেয়া। এই বিষ খুব একটা তীব্র ব্যথার জন্য দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে তো শিকারের মাঝে নেশার জন্ম দেয়! এমন অনেক প্রজাপতি আছে, যারা এই বিষের প্রভাবে এমন হয়ে যায় যে ওদেরকে মাটিতে পুঁতে রাখলেও রা করেনি। যাই হোক, বিষটার প্রভাব একেক প্রজাতিতে একেক রকম দেখা যায়। কোন কোন প্রজাতি অবশ হয়ে থাকে। অনেকে আবার ওর ভেতরে থাকা ডিম রক্ষার জন্য লড়াই পর্যন্ত করে! যাই হোক, এই বিষের কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।'

'কী সেটা?' জানতে চাইল শেইচান।

'পোষককে জ্যান্ত রাখা।' অন্যরা তার কথার অর্থ ধরতে পেরেছে, বুঝতে পারলেন প্রফেসর। তারপরও ব্যাখ্যা করলেন। 'ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে লার্ভা। এসেই পায় গরমা-গরম খাবার।'

সবার চোখে-মুখে ঘেন্না দেখা গেল।

সত্যটা ওদের এখনই জানা উচিত।

দ্বীপ থেকে নিয়ে আসা সাপটার কথা মনে পড়ে গেল তার, ভেতরে কীভাবে সাদা লার্ভা কিলবিল করছিল।

'যে প্রজাতি এই দ্বীপগুলোতে ঘাঁটি গেড়েছে,' বলল গ্রে। 'তারা নিশ্চয়ই সামাজিক প্রজাতির? নইলে এমন দল বেঁধে আসত না!'

'না,' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন কিন। 'এই প্রজাতিটা যেমন সামাজিক, তেমনি একাকী!'

'তা কীভাবে সম্ভব?'

'একটু আগেই বললাম, এই প্রজাতি অতি প্রাচীন। বোলতারা এরকম দুটো ভাগে ভাগ হবার আগেই ছিল এদের অস্তিত্ব। তাই বলা চলে, উভয় প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে এরা।'

সোজা হয়ে গেল গ্রে। 'কী বলতে চাইছেন?'

'এই প্রজাতির মাত্র একটাই লক্ষ্য, একটাই উদ্দেশ্য।'

'সেটা কী'

'খুঁজে পেতে একটা "লেক" প্রতিষ্ঠা করা।'

'লেক মানে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

'এমন এক জায়গা, যেখানে ওরা মিলিত হতে পারে।' সবার দিকে তাকালেন তিনি। 'সেটা হতে দেয়া যাবে না।'

এবার প্রশ্ন করল গ্রে। 'কেন?'

ওর কথার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য চুপ করে রইলেন কিন। তারপর বললেন। 'কেননা, তাহলে দুনিয়ার এই জায়গাটা পরিণত হবে নরকে।'

জন্মদানকারী

ছোট্ট পোকাটা প্রায় অন্ধ এবং বধির। ছোট ছোট দুটো কালো চোখ কয়েক ইঞ্চি দূরে অবস্থিত। দুনিয়া ওর কাছে ঝাপসা, ধূসর। খুব কাছে না এলে, কিছু দেখতে পায় না।

তবে মাথায় রয়েছে বড় বড় দুটো অ্যান্টেনা। প্রতিটা ওর দেহের চাইতে আকারে বড়। এক প্রান্তে রয়েছে স্পর্শকাতর সেনসিলাই। উড়তে উড়তে সেই অ্যান্টেনা দুটো নাড়ায় সে, গন্ধ শুঁকে চলে পথ।

একটা পাপড়ির উপর গিয়ে বসল পোকাটা, সুগন্ধ শুঁকেই হয়তো। অ্যান্টেনাগুলো দিয়ে খোঁচা দিল ফুলে মাথাটা আরও নিচে নামিয়ে আনল। অন্যদের মত শক্তিশালী চোয়াল নেই পোকাটার। তাই লম্বা জিভ বের করে পাপড়ির ভেতর থেকে চেটে গেল রস।

পেট ভর্তি হতে বেশিক্ষণ লাগল না। এদিকে পতঙ্গের পাল স্থান নিয়েছে ঘন, ছায়াময় বনে। ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল বলে, দলের অন্যান্যদের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে না সে। পেট পুরে রস খেয়ে, পাপড়ির এক প্রান্তে গিয়ে বসল সে। ঝাড়া দিয়ে শরীর থেকে খসিয়ে ফেলল পরাগ-রেণু।

প্রস্তুত থাকতে হবে ওকে।

ইন্দ্রিয় ওকে কীসের যেন আভাস দিচ্ছে।

সংবেদী সেনসিলাইগুলো যেন ফেরোমনের এই গন্ধের জন্যই অপেক্ষা করছিল। ঘুরে গেল তার অন্ধ চোখগুলো, যেখান থেকে গন্ধটা আসছে-সেদিকেই রওনা দিলো। এই অমোঘ আকর্ষণকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মাথার ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রাসায়নিক। গতি বাড়িয়ে দিল সে, প্রচণ্ড গতিতে নড়ছে পাখাগুলো। একটু আগে পান করা রস যেন ফুরিয়ে ফেলবে কয়েক মুহূর্তেই।

তাতে কিছু যায় আসে না ওর।

ফেরোমন শুঁকে শুঁকে এগিয়ে গেল ও। এখন দুনিয়া বলতে কেবল হরমোনের গন্ধ। ধূসর দুনিয়া জুড়ে কেবল একটাই ছবি।

পুরস্কারের উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সে। পেছনে ফেলছে একই পুরস্কারের লোভে উড়তে থাকা স্বজাতির অন্য সদস্যদের। প্রথম হবার অত্যুগ্র আগ্রহ সবার মাঝেই।

গন্ধটা আস্তে আস্তে অবয়বের রূপ নিচ্ছে।

কাছাকাছি আসার পর, লক্ষ্যবস্তুকে দেখতে পেল সে। অবয়ব রূপ নিল অস্তিত্বের।

ওর নিজের চাইতে আকারে শতগুণ বড় মাদীটা সামনেই উড়ছে। ওটার দেহ থেকেই বেরোচ্ছে ফেরোমন। তার দিকেই উড়ে চলছে ও এবং ওর মতো আরও অনেকে।

অন্যান্যদের দেখাদেখি সে নিজেও পেছনের পাগুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরল মাদীটাকে। বেশ কিছু মদ্দা এসে আছড়ে পড়ল ওর দেহে, এমনকি পাখা পর্যন্ত ভেঙে ফেলল। কিন্তু পেছনের পা, মানে ক্লাসপারের সাহায্য মাদীটার পেট আঁকড়ে ধরে রইল সে।

এদিকে বাধা দিতে শুরু করেছে মাদীটা। পা দিয়ে আঘাত হানছে বার বার।

অবশেষে, মদ্দাদের ওজন এবং নিজের পাখা ঝাপটাতে না পারার কারণে, নিচে নেমে আসতে বাধ্য হলো মাদীটা।

অবস্থানের জন্য লড়তে শুরু করল সবাই। এদিকে মাদীটার দেহের পাশ থেকে ফেরোমোন বের হওয়া এখনও বন্ধ হয়নি। গন্ধের উৎস লক্ষ্য করে সেদিকে চলে গেল মদ্দাটা।

উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে নিজের পেট সংকুচিত করে ফেলল সে। ফলে বেরিয়ে এল দেহের ফ্যালিক এইডেগাস। গন্ধের উৎসে সেটাকে প্রবেশ করল ও, মাদীর অগণিত ওভিডাক্টের একটা খুঁজে নিল।

সঠিক অবস্থান খুঁজে পেয়েই, নিজের সবটুকু তাতে ঢেলে দিল মদ্দাটা। অচিরেই দেখা গেল, ফাঁপা এক খোলসে পরিণত হয়েছে সে।

আর কিছু দেবার নেই বুঝতে পেরে, ক্লাসপারগুলো খুলে উড়াল দিল সে। আচমকা এই আচরণের প্রচণ্ডতায় ছিঁড়ে গেল ওর এইডেগাস, রয়ে গেল ওভিডাক্টে।

কিন্তু আগেই ভেঙে গিয়েছে পাখা, ভঙ্গুর দেহটা তাই আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ওর মতো অবস্থা হলো অন্য মদ্দাদেরও।

দেহে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট না থাকলেও, দায়িত্ব শেষ হয়নি ওর।

দুর্বল দৃষ্টির প্রায় পুরোটা দখল করে নিল একটা ছায়া। কিছুক্ষণের মাঝেই বুঝতে পারল, কী এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

এক জোড়া চোয়াল।

মদ্দাটা জানে, মাদীর কাছে ওর কিছু দেনা আছে।

ক্ষুধার্ত হয়ে আছে মাদীটা।

অধ্যায় বারো

৭ মে, সকাল ১১:৪৯
হানা, মাউই দ্বীপপুঞ্জ

ডাইনিং টেবিলের উপর ঝুঁকে এল গ্রে। প্রফেসর মাতসুইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে, ভদ্রলোক ওডোকুরো লেখা একটা ফাইল বের করে আনছেন। ওটার ভেতর থেকে একগাদা ছবি বের করে কাঠের উপর বিছিয়ে দিলেন তিনি। সবগুলোই আসলে বিভিন্ন ধরনের বোলতার ছবি: কিছু ছোট, কিছু আবার অনেক বড়।

কী দেখছে, তা বোঝার চেষ্টা করল গ্রে।

'বোলতার একই প্রজাতির নানা উদাহরণ এগুলো।' ছবি সাজাতে সাজাতে বললেন কিন। 'তারপরও, এদের মাঝে যে পার্থক্য আছে তা অসাধারণ। শারীরবিদ্যা থেকেই দেহের নানা অঙ্গের কাজ ধারণা করা যায়। একেকটার কাজ একেকরকম, নির্ধারিত।'

কিছুক্ষণ আগে কিন জানিয়েছেন, এই বোলতাগুলোকে তিনি কীভাবে পেয়েছেন। একটা ব্রাজিলিয়ান দ্বীপে খুঁজে পাওয়া সাপের মরদেহ থেকে নিয়েছেন তিনি লার্ভাগুলোকে। তারপর কিয়োটোর ল্যাবে বড় করেছেন। একে একে জীবনচক্রের নানা ধাপ পার করে এসেছে পতঙ্গগুলো-লার্ভা, ইনস্টার এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ।

একটা ছবি কাছে নিয়ে এলেন কিন। ছোট একটা বোলতা দেখা যাচ্ছে ওতে, পতঙ্গটার অ্যান্টেনা অনেক লম্বা। সারা দেহে ছোট ছোট লোম। 'এই ছোটগুলোর কথাই ধরা যায়। দেহটা যেন শুধু মাত্র সংবেদী তথ্য সংগ্রহ এবং পালের সাথে সেটা আদান-প্রদান করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। পালের অগ্রদলের সদস্য বলেই আমার সন্দেহ। এলাকাটা দেখে-শুনে আসে।'

ছবিটা দেখল গ্রে। 'শেইচানকে নিয়ে আমি সৈকত থেকে পালিয়ে আসার সময় এদেরকে মরে পানিতে পড়ে থাকতে দেখেছি।'

'তাই?' চিবুক কুঁচকালেন কিন। 'সম্ভবত নিজেদের দায়িত্ব পালন করার পর মারা গিয়েছে। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

আপনার কাছে হতে পারে।

প্রফেসরের এই ছোট ব্যাপারে অবাক হওয়াটা সবাইকে মনে করিয়ে দিল, শত্রুর ব্যাপারে কতটা কম জানে ওরা। মাত্র দুই মাস গবেষণার সুযোগ পেয়েছেন প্রফেসর, তার অগ্রগতিও অসাধারণ। কিন্তু এখনও অনেক কিছুই অজানা রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে যেহেতু প্রফেসরের গবেষণা মাঠে হয়নি, হয়েছে গবেষণাগারে। তবে ব্রাজিলের সেই বীভৎস ঘটনার কথা মনে রাখলে বলতে হয়- কাজটা বুদ্ধিমানের মতোই হয়েছে।

আরেকটা ছবির উপর টোকা মারলেন কিন। এটায় দেখা যাচ্ছে বিশালাকার একটা বোলতাকে, বোর্ডের উপর পিন দিয়ে গেঁথে রাখা। তুলনা করার জন্য একটা ছোট রুলার রাখা আছে ওটার পাশে। মোট তিন ইঞ্চি প্রশস্ত দেহ বোলতাটার।

'এর সাথে আপনাদের মোলাকাত হয়েছে।' বললেন কিন।

মুখ কুঁচকে মাথা নাড়ল গ্রে।

'এই মাদীটা বন্ধ্যা। এরা হুল দিয়ে বিষ উগরে দেয়। তবে আফসোসের কথা, কী কী উপাদান দিয়ে সেই বিষ তৈরি তা আমি বের করতে পারিনি। এই বোলতার কাজ কী, তা তো পরিষ্কার।'

আন্দাজ করতে পারছে গ্রে। 'দলের পথ পরিষ্কার করা।'

'এবং একবার লেক বানানো হয়ে গেলে সেটাকে সুরক্ষা দেয়া।'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল গ্রে। 'আগেও এ ব্যাপারে আমাদের সাবধান করেছেন।'

'হ্যাঁ। এই লেক যে আসলে কতটা ভয়াবহ, তা আমাদের সবার জানা থাকা দরকার।' ছবিগুলোর ভেতরে কী যেন খুঁজলেন প্রফেসর। 'প্রথম দুটো ছবি থেকে আমার আগের কথাগুলো আপনাদের বুঝে যাবার কথা। সামাজিক বোলতার দলে, একেকজনের একেক রকম কাজ থাকে। কেউ কেউ অনুসন্ধানের জন্য থাকে, অনেকে থাকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য। কিন্তু এদেরকে আমি বলি হার্ভেস্টার এবং গার্ডেনার।'

যা খুঁজছিলেন, তা অবশেষে পেয়ে গেলেন কিন। নতুন দুটো ছবি বাড়িয়ে দিলেন গ্রের দিকে। 'এই জোড়াগুলো আলাদা। এদের থেকে আমরা বুঝতে পারি, একটা মাত্র রাণী বোলতা জন্মদানের দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়নি। এই পঙ্গপালের প্রজনন হয় অনেকগুলো একাকী শিকারি বোলতার দ্বারা। একবার পছন্দসই লেক পেয়ে গেলে, শুরু হবে সেই কার্যক্রম।'

ছবিগুলো দেখল গ্রে। একটায় বড় করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে খুব ক্ষুদ্র বোলতাকে। ওটা আকারে পিপড়ার চাইতে বড় হবে না।

'ওটা মদ্দা,' বোঝালেন কিন। 'অন্য ছবিতে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাদী দেখতে পাবেন।'

শিস দিল কোয়ালস্কি। 'ছোটটার তুলনায় তো দেখে বিশাল বিমান বলে মনে হয়।'

উদাহরণটা একেবারে যথার্থ। মাদীটা আকারে গতরাতে আক্রমণ করা বোলতাগুলোর চাইতেও বড়। পাঁচ ইঞ্চির বেশি হবে।

কপাল ভালো, আমাদের কারো এই বেটির কামড় খেতে হয়নি!

কিনের পরবর্তী কথাগুলো শুনে সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল সবাই।

'একে ডিম্বাণু উৎপাদনের কারখানা বলতে পারেন।' ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'আমি এর আগে এমনটা কখনও দেখিনি। একই সাথে শত শত মদ্দার সাথে মিলিত হয় এটা, নিজের জন্য দরকারি স্পার্মাথেকা গ্রহণ করে। তারপর আবার মদ্দাগুলোকে খেয়েও নেয়।'

'খেয়ে নেয় মানে?' ঘেন্নার সাথে মাথা নাড়ল কোয়ালস্কি। 'মারিয়াকে নিয়ে আর কখনও গাঁইগুঁই করব না।'

একই মনোভাব পালুর-ও। 'আমেন, ভাই, আমেন।'

প্রফেসর মাতসুই দুই বিশালদেহীকে অগ্রাহ্য করলেন। 'এই প্রজাতিটা রসদের নয়-ছয় করে না।' মাদীটার পেছন দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'হুলটা দেখুন। প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা। পেটের ভেতর ডিম্বাণুগুলো অনেকটা কনভেয়ার বেল্টের মতো করে থাকে। একবার কোন পোষককে খুঁজে পেলে, সেটার ভেতরে হাজারো ডিম ঢুকিয়ে দেয়। পেছনে মোটা পাগুলো দেখুন, ওগুলো অসাধারণ শক্তিশালী। ওগুলো এক করলে, মানুষের তুড়ি দেবার মতো শব্দ হয়। যখন পালের সবাই করে কাজটা তখন অদ্ভুত এক খটখটানি আওয়াজের জন্ম নেয়। তীব্রতায় যা ঝিঁঝিঁ পোকার সমান।'

'কিন্তু এই আওয়াজ করে কী লাভ?' জানতে চাইল শেইচান।

'আমার ধারণা, আওয়াজটা সোনারের কাজ করে।'

'সোনার?'

'আধুনিক কালের বোলতাদের মাঝেও এটা দেখা যায়। ওরা সোনার ব্যবহার করে পোষকের দেখে লার্ভা খোঁজে। বুঝতে চায়-ওটার মাঝে এরিমধ্যে ডিম আছে কিনা।'

'অন্যভাবে বলতে গেলে,' গ্রে মুখ খুলল। 'দেখতে চায় যে মাঠ ফাঁকা কিনা।'

ঢোক গিললেন কিন। মুহূর্তের জন্য দূরে চলে গেল তার নজর। 'বাজে একটা শব্দ। ওটা শুনলে বুঝতে হবে, শেষের শুরু হয়েছে।'

'কেন?' জানতে চাইল শেইচান।

'কারণ আমি আপনাদেরকে সবচেয়ে বাজে ব্যাপারটা বলিনি। আপনারাও আমাকে এই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটার ব্যাপারে আসল প্রশ্নটা করেননি।'

ভ্রূ কুঁচকালো শেইচান। 'কোন প্রশ্ন।'

আন্দাজ করতে পারছে গ্রে, 'প্রজাতিটা অতি প্রাচীন, তাহলে আজও বেঁচে আছে কী করে?'

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, উত্তরটা জানেন কিন। 'কেননা এরা মরে না!'

সকাল ১১:৫৮

আরেকটু হলেই মিস করে বসেছিলাম...

যদি বোলতার জীবনচক্রের এই ব্যাপারটা ধরা না পড়ত কিনের চোখে, তাহলে এরিমাঝে ধ্বংস লেখা হয়ে যেত মানবজাতির কপালে। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে এই পঙ্গপালের বসতি বানানোর আসল গুরুত্ব বোঝাতে হবে তার। শুরু না হয় ডারপার এই ছোট্ট দলটাকে দিয়েই হোক।

পায়চারী করতে শুরু করলেন তিনি, উৎকণ্ঠা কমাবার চেষ্টা বলা যায় একে। 'আগেই বলেছি, জুরাসিক সময়ে প্রথম আবির্ভাব ঘটে এই বোলতাদের। সেখান থেকে ক্রমাগত বিবর্তন হয়ে আসছে। বাঁচার জন্য দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে এরা। কেউ কেউ শুধু একটা নির্দিষ্ট পোষককে বেছে নেয়, অন্যদের আবার এত বাছ-বিচার নেই। আধুনিক যুগের অনেক বোলতার তো গর্ভধারণের জন্য মিলিত হবারই দরকার হয় না। এমনও অনেক প্রজাতি আছে, যাদের মাঝে কোন মদ্দাই নেই।'

'আমার কোন আপত্তি নেই তাতে।' বিড়বিড় করে বলল শেইচান।

'এই বোলতাদের ব্যাপারে বলুন। এদের কী অবস্থা?' জানতে চাইল গ্রে।

'ওডোকুরো প্রজাতি একটা না, একাধিক উপায়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আধুনিক কিছু বোলতার মতো, এদের ডিম থেকে জন্ম নেয় একাধিক লার্ভা। প্রায় প্রতিটাই প্লুরিপোটেন্ট হয়ে জন্ম নেয়, মানে দরকার হলে পালের প্রয়োজনে যেকোন ধরনের কর্মী হতে পারে এরা।' ছবিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'অবশ্য এখনও পর্যন্ত আমি জানি না, কে কী হবে, তা কীভাবে নির্ধারিত হয়! ডিম থেকে পূর্ণ পতঙ্গ হতে সময় লাগে দুই সপ্তাহ। প্রজাতিটা সারাক্ষণ নতুন সদস্য জন্ম দিতে থাকে। বুঝতেই পারছেন, যেকোন পালের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে জ্যামিতিক হারে। কেবল খাবার আর পোষক নিশ্চিত করতে পারলেই হলো!'

গুরুত্বটা বোঝাবার জন্য আবার মুখ খুললেন কিন। 'সাধারণ, অন্যান্য কলোনিতে থাকে মাত্র একজন রাণী। তাই যখন পরিবেশ প্রাণধারণের অনুপযুক্ত হয়, তখন কলোনিটাও মারা যায়। বেঁচে থাকে শুধু রাণী। সে শীত-নিদ্রায় চলে যায়। সময় আবার উপযুক্ত হলে, নতুন সদস্য জন্ম দিয়ে নতুন এক কলোনি গড়ে তোলে।'

কালো হয়ে গেল গ্রের চেহারা। 'কিন্তু এই প্রজাতির গল্পটা আলাদা।'

মাথা নেড়ে সায় জানালেন কিন। 'হ্যাঁ। ওডোকুরোর এই কলোনি কেবল বাড়তেই থাকবে, কমবে না।'

'একটু আগে তিন দিনের একটা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন, কেন? এদের যেহেতু প্রাপ্ত বয়স্ক হতে দুই সপ্তাহ সময় লাগে, তাহলে তিন দিনের এই সময়?'

ঘোঁত করে উঠল কোয়ালস্কি। 'এটাও বললেন যে ওই পোকাগুলো মরে না। কিন্তু এই পায়ের নিচে,' বুট দেখাল ও। 'ফেলে অনেকগুলোকে পিষে মেরেছি।'

নড করলেন কিন। 'আপনাদের দু'জনের প্রশ্নের জবাবই এক। আরেকটা উপায় আছে, যেটার সাহায্যে পালটা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। ওডোকুরো অযৌন পদ্ধতিতেও বংশ-বিস্তার করতে পারে। লার্ভা অবস্থাতেই তারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, বিশেষ করে যখন তারা তৃতীয় ইনস্টার, মানে পরিবর্তনের তৃতীয় ধাপে পা রাখে!'

'সেজন্য নিশ্চয়ই তিন দিন সময় লাগে?' ধরে ফেলেছে গ্রে।

'হ্যাঁ। আরেকটু হলেই ব্যাপারটা মিস করে বসেছিলাম। ব্যাখ্যা করছি। পোষকদেহে প্রবেশের প্রায় সাথে সাথেই ডিম ফুটে লার্ভা বেরোয়। ওটাকে ধরে নিন-প্রথম ইনস্টার। এগুলো জন্মগত ভাবেই ক্ষুধার্ত থাকে, ইচ্ছেমত খায়। এক দিনের মাঝে খোলস ছেড়ে পরিণত হয় দ্বিতীয় ইনস্টারে। এক[illegible] হয় তৃতীয় ইনস্টারে। এই ধাপে এসে লার্ভাগুলো এক অদ্ভুত কাজ করে। আকারে তখনও এতটা ছোট থাকে যে পোষকের হাড় ভেদ করে, অস্থি মজ্জায় বাসা বাঁধে।'

ঘৃণায় কেঁপে উঠল কোয়ালস্কি। 'গল্পটা পছন্দ হবে না, তা আগেই বুঝতে পারছিলাম।'

'আপনাকে বুঝতে হবে, বোলতার সব প্রজাতিই বুদ্ধিমান। অন্তত পোষককেই ব্যবহার করে নিজেদের লার্ভা লুকাবার কাজে। অনেক সময় দেখা যায়, একেবারে শেষ মুহূর্ত আসার আগ পর্যন্ত পোষক কিছু টেরই পায় না!'

'হাড়ে লার্ভা ঢোকার পর কী হয়?' জানতে চাইল গ্রে।

'প্রথম প্রথম তো ভেবেছিলাম, কেবল খাবারের আশাতেই এসেছে। কিন্তু যখন ওই কলাগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে দিলাম, তখন অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম। কিছু ময়লা রয়ে গিয়েছে ওখানে, প্রথমে ওগুলোকে ধরে নিয়েছিলাম ফ্রাস, মানে লার্ভার মল হিসেবে। কিন্তু আকারে ওগুলো অনেক বেশি একরকম দেখতে। দাঁড়ান, দেখাই আপনাদের।'

কয়েকটা ছবি এদিক-সেদিক করে উদ্দিষ্টটা খুঁজে পেলেন প্রফেসর।
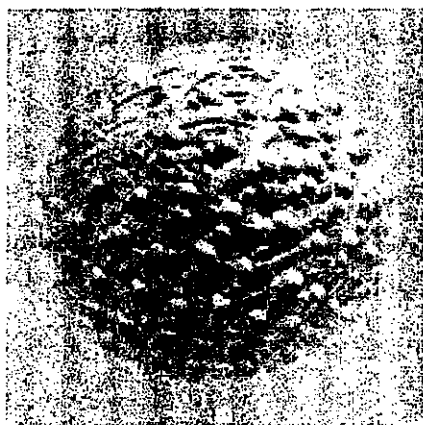
'দেখে তো রোঁয়া ওঠা ডিম মনে হচ্ছে।' মন্তব্য করল পালু।

'কী এটা?' জানতে চাইল গ্রে।

'পালু খুব একটা ভুল বলেনি। শুকিয়ে যাওয়া সিস্ট এটা, চালের এক-দশমাংশ হবে আকারে। আসলেই অসংখ্য রোঁয়া আছে এতে, এক হাজারের বেশি। প্রতিটার মাঝে আছে তৃতীয় ইনস্টারের ছোটখাটো জেনেটিক ক্লোন। তবে এগুলোর রয়েছে কেবল নখর।'

আরেকটা ছবি দেখালেন ওদের কিন।

'মনে আছে? বলেছিলাম যে বোলতারা অনেকসময় অন্যান্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে আত্তীকরণ করে।' ছবিতে টোকা দিলেন তিনি। 'এটা তার একটা উদাহরণ।'

'আমি বুঝতে পারছি না,' বলল গ্রে। 'কোন বৈশিষ্ট্য?'

'টারডিগ্রেড-এর নাম শুনেছেন?'

টেবিলে উপস্থিত সবাই মাথা নাড়ল।

'এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো অনেকটাই এমন দেখতে। মাঝে মাঝে তাদেরকে আদর করে ডাকা হয় 'পানির ভালুক' বলে। দেখে যেমনই লাগুক, আকারে একেবারে ক্ষুদ্র তারা। ০.০৫ মিলিমিটারের বেশি হবে না।'

'তাদের সাথে বোলতার কী সম্পর্ক?' জানতে চাইল গ্রে।

'টারডিগ্রেড-এর বয়স বোলতার চাইতেও বেশি, প্রায় দ্বিগুণ। ক্যামব্রিয়ান যুগের প্রাণী এরা। কিন্তু আজও এদেরকে প্রায় সবধরনের পরিবেশে পাওয়া যায়। বাঁচার ক্ষমতা এদের অনেক বেশি। পরিবেশ কঠোর হলেই মৃতবৎ হয়ে পড়ে, এই পদ্ধতির নাম ক্রিপ্টোবায়োসিস। টান নামের একটা গোলাকার আকৃতি ধারণ করে তারা। এই রূপে শূন্য ডিগ্রীর অনেক নিচে, আবার তিনশো ডিগ্রী ফারেনহাইটেও বাঁচতে পারে। প্রচণ্ড চাপ বা একেবারে বায়ুশূন্য পরিবেশেও কষ্ট হয় না। এমনকি প্রচণ্ড রেডিয়েশনেও টিকে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে, এদেরকে ধ্বংস করা অসম্ভব।'

ছবির সিস্টের দিকে ইঙ্গিত করলেন কিন। '১৯৪৮ সালে, জাপানের বৈজ্ঞানিকরা দেখিয়েছেন, এই টানগুলো প্রায় একশো বিশ বছর পরেও ক্রিপ্টোবায়োসিস ভেঙে ফিরে আসতে পারে। সাম্প্রতিক কালের কিছুর গবেষণা বলছে, আসলে এই সময়টা আরও অনেক বেশি। অনন্তকাল বললেও অত্যুক্তি হবে না।'

সিস্টের ছবি হাতে তুলে নিল গ্রে। 'আপনার বিশ্বাস, বোলতারা টারডিগ্রেডের কাছ থেকে সেই বৈশিষ্ট্য আত্তীকরণ করেছে?'

'ক্ষতি কী?' শ্রাগ করলেন কিন। 'টারডিগ্রেডরাও তো অন্যান্য প্রজাতির কাছ থেকে নানা ফন্দি-ফিকির শিখেছে। তাদের জিনোমের প্রায় আঠারো শতাংশ এসেছে প্রাগৈতিহাসিক গাছ এবং ফাঙ্গাস থেকে। সেই সাথে আছে জীবনের কৃষ্ণ বস্তু-ও।'

'জীবনের কৃষ্ণ বস্তু, মানে?'

মাথা নাড়লেন কেন। 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা ব্যাকটেরিয়াদের বোঝানো হয় এই শব্দ দিয়ে। এদেরকে অতি-সম্প্রতি আমরা খুঁজে বের করেছি। নাম দেয়া হয়েছে-ল্যাযারাস মাইক্রোব। ন্যাট্রোনোব্যাকটেরিয়াম আছে না? যেটা ক্রিস্টাল রূপে একশো মিলিয়ন বছর কাটাবার পর আবার জীবিত হয়ে উঠেছে? আরও আছে-ভিরগিব্যাসিলাসিস। এরা সুপ্তাবস্থায় ছিল প্রায় দুইশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর। এরকম আরও অনেক আছে।'

'আপনার বিশ্বাস, এই বোলতাগুলো এসব প্রাচীন পদ্ধতি নিজেদের কাজে ব্যবহার করছে?' কিনের দিকে ঘুরল গ্রে। 'কেন? কীসের লোভে?'

'বিবর্তনের ফাঁদে পড়ে যেন হারিয়ে না যায়, সেজন্য। মৃত পোষকের দেহে এরা ধ্বংস করা যাবে না, এমন কিছু জেনেটিক ট্রেইল রেখে যায়। হয়তো হাড়গুলোর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার অপেক্ষা। যেন ভেতরে রেখে যাওয়া সিস্টগুলো দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়োতে পারে। অন্য কোন পোষক দেহে গিয়ে সেগুলো ফুটে লার্ভা বেরোবে, চতুর্থ ও পঞ্চম ইনস্টার হবে। একদিন বেরিয়ে আসবে পোষক দেহ থেকে।'

প্রথমবারের মতো মুখ খুলল আইকো হিগাশি। 'যেমন করে ছাইয়ের ভেতর থেকে জন্ম নেয় ফিনিক্স পাখি।'

মেয়েটার কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল, যা নাড়া দিয়ে গেল কিনকে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তার দিকে তাকাল সে, কিন্তু আইকো পাত্তা দিল না।

'যাই হোক, তৃতীয় দিনের মাথায়,' তাই বলে চললেন প্রফেসর। 'এই দ্বীপগুলোতে অবস্থানরত পালগুলো এমনভাবে গেঁড়ে বসবে যে তাদেরকে আর দূর করা যাবে না। কিন্তু বিপদ শুধু এতটুকুই নয়।'

'মানে?' জানতে চাইল গ্রে।

'এই বোলতাগুলো তাদের পোষকদের বাঁচিয়ে রাখে। তাই লার্ভা বহন করে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে পাখি। ইঁদুরও থাকবে এই দলে।'

'মানুষ তো আছেই।' যোগ করল গ্রে।

'এখানেই একে থামিয়ে দিতে না পারলে,' সাবধান করে দিল আইকো। 'বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে সব।'

'আবহাওয়ার দফারফা করে ছাড়বে।' বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন। 'এদের সাথে কাটাবার মতো বেশি সময় পাইনি। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি যে পোষক হিসেবে তাদের কোন প্রজাতির প্রতি আলাদা আকর্ষণ আছে কিনা।'

সামনে ঝুঁকে এল শেইচান। 'আছে?'

'না।' মাদী বোলতাটার ছবি টেনে নিলেন প্রফেসর। 'এই হুলটার জন্ম হয়েছে জুরাসিক আমলে। এক ইঞ্চি লম্বা তো বটেই, সেই সাথে তৈরি হয়েছে স্ক্লেরোটাইজড কলা দিয়ে। মানে ইস্পাতের মতো শক্ত এটা। শক্ত চামড়া ভেদ করার জন্যই এদের জন্ম, ডাইনোসরও পাত্তা পাবে না। সে সময়কার সাথে তুলনা করলে, এখনকার প্রাণীগুলো তো এদের জন্য ডাল-ভাত।'

'এর মানে, আমরা একেবারে সহজ শিকার!' বলল কোয়ালস্কি।

ধীরে ধীরে নড করল গ্রে। 'তাছাড়া, আধুনিককালেও তো এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে নতুন প্রজাতি এসে পুরনো প্রজাতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এভারগ্লেডে পাইথনের প্রবেশ, অস্ট্রেলিয়ায় ইউরোপিয়ান খরগোশের আগমন, আমাদের লেকগুলোতে এশিয়ান কার্প মাছের প্রবেশ।'

'এসব বললেন এক মহাদেশের প্রাণী অন্য মহাদেশে যাবার উদাহরণ।' ঘটনার আসল গুরুত্ব বোঝাতে না পেরে, রেগে আছেন কিন। 'কুইমাডা গ্রান্ডের অবস্থা নিজের চোখে দেখেছি। বোলতাগুলো নড়ে-চড়ে, এমন যেকোন কিছুর বারোটা বাজিয়ে দেবে। পরিবেশের কী হলো, সেদিকে নজর দেবে না।'

'কেননা, টিকে থাকার আলাদা পরিকল্পনা আছে ওদের।' সিস্টের ছবিটা সরিয়ে দিল গ্রে। 'আমাদেরকে তার আগেই কিছু না কিছু করতে হবে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কিন।

করার চাইতে বলা সহজ।

উঠে দাঁড়াল গ্রে। 'কী করব, তা বলে দিন।'

জানালার দিকে হেঁটে গেলেন প্রফেসর। তাকালেন বাইরের বাগানের দিকে। 'প্রথমত, পালটা কোথায় আস্তানা গেড়েছে তা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'কোত্থেকে শুরু করব, সেই বুদ্ধি দিতে পারেন।'

'আমার সংক্ষিপ্ত গবেষণা থেকে বুঝতে পেরেছি, ওডোকুরোরা অন্যান্য সামাজিক বোলতার মতো নয়। সম্ভব কলোনি গড়ার ব্যাপারে তারা একাকী শিকারিদের মতো। তাহলে তারা ভূ-গর্ভস্থ কলোনি গড়ার জন্য খাদ খুঁজবে।'

ম্যাপের উপর ঝুঁকল পালু। 'বাতাস সাধারণত এদিকে বয়।' বলে হানা থেকে বন পর্যন্ত একটা লাইন টানল সে, হালেয়াকালা পাহাড়ের ঢালের উপর দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ম্যাপের একটা জায়গার উপরে টোকা দিল সে।

বিশালদেহী হাওয়াইয়ান লোকটা অন্যদের দিকে ফিরল, মুখ বড় হয়ে আছে হাসিতে। 'ওই হারামজাদারা কোথায় আছে, তা সম্ভবত আন্দাজ করতে পারছি।'

অধ্যায় তেরো

৭ মে, সন্ধ্যা ৬:০১
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

স্মিথসনিয়ান ক্যাসেলের তৃতীয় তলায়, আট-কোনা আকৃতির ঘরটা পার হলেন পেইন্টার। দুইপাশে দরজার অভাব নেই, একেকটা একেক অফিসে নিয়ে যাবে তাকে। তবে তার লক্ষ-রিজেন্টের ঘর। ওটার আধ-খোলা দরজা থেকে এরিমধ্যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'কে জানে, এই আকস্মিক ডাকের কারণ কী!' ফিসফিস করে ক্যাটকে বললেন পেইন্টার। তার এই ফিসফিসানির কারণ গোপনীয়তা নয়, মহান এই দালানের প্রতি শ্রদ্ধা। জায়গাটা যেন কোন প্রার্থনা-স্থল; বিশাল বড় তো বটেই, সেই সাথে আছে লম্বা গ্যালারি, ব্যক্তিগত চ্যাপেল। সময় যেন ভারী হয়ে আছে এখানকার বাতাসে। প্রথম সেক্রেটারি, জোসেফ হেনরিকে কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন তিনি। এই হলঘর ধরেই একদা হাঁটতেন তিনি। তার ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি ক্যাসেলের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকে তো এটাও বলে, এই দালানটায় আসলে ভুতের আড্ডা আছে!

ভূ-গর্ভস্থ হেডকোয়ার্টার থেকে গোপন এলিভেটরে করে উঠে এসেছে ক্যাট আর পেইন্টার। মিনিট ত্রিশেক আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে জাদুঘর। তাই নিচের হলগুলোতে রয়েছে কিছু ডোসেন্ট আর কয়েকজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী। এই সময়টুকু জাদুঘরে ঘোরাফেরা করতে বেশ ভালোই লাগে পেইন্টারের, নিজের বলে মনে হয় জায়গাটাকে। মাঝে-মাঝে মধ্যরাতে হলগুলোতে হাঁটেন তিনি, বিশৃঙ্খল মনকে শান্ত করেন। বিজ্ঞানীর প্রতি সম্মান দেখাবার এক উপযুক্ত স্মারক যেন এই জায়গাটা, সেই সাথে ইতিহাসের শিক্ষা দেবারও। সিগমার গুরুত্বকে আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেয়!

রিজেন্টের কামরার কাছাকাছি এসে ফোন নামিয়ে রাখল ক্যাট। 'ডা. বেনেট নিশ্চিত করলেন যে তিনি প্রফেসর মাতসুই-এর নোটগুলো পেয়েছেন। এখুনি সেগুলো দেখার কাজে লেগে পড়বেন।'

নড করলেন পেইন্টার। এখানে আসার আগে গ্রে-র সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন তিনি। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কী হয়েছে, সে সম্পর্কে ভাসা-ভাসা হলেও জেনেছেন। হয়তো জাতীয় চিড়িয়াখানার এই পতঙ্গবিদ আরও কিছু তথ্য জানাতে পারবে...

...গ্রের বেঁধে দেয়া সময়সীমা ফুরোবার আগেই।

তিন দিন।

এমনিতেই সময় হাতে অল্প, তার মাঝে আচমকা এই ডাক। সময় নষ্ট করছে চাচ্ছেন না তিনি। এদিকে আবার কৌতূহল পেয়ে বসেছে। কংগ্রেসের লাইব্রেরিয়ান এমন কী জানাতে চাচ্ছেন? এর সাথে পরিস্থিতির কী সম্পর্ক?

জানার মাত্র একটাই পথ খোলা আছে।

দরজায় নক করলেন পেইন্টার, এরপর ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললেন পুরোটা। প্রথমে ক্যাটকে প্রবেশের নির্দেশ দিয়ে, নিজে পেছন পেছন ঢুকে পড়লেন।

রিজেন্টের কামরাটার প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছে একটা বিশাল, গোলাকার টেবিল। ওটার মাঝখানে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে স্মিথসনিয়ান এর সিল। চারপাশে অনেকগুলো জানালা, প্রতিটায় ভেলভেটের পর্দা ঝোলানো। এখানে প্রতি চার মাস অন্তর জড়ো হন বোর্ড অফ রিজেন্টসের আঠারো জন সদস্য।

এখন অবশ্য মাত্র দু'জন মানুষ উপস্থিত আছেন।

একজন ক্যাসলের কিউরেটর, সাইমন রাইট। এগিয়ে এসে ওদের সাদরে বরণ করে নিলেন। লোকটার বয়স মধ্য-পঞ্চাশের আশপাশে। তবে চুলে আরও আগেই পাক ধরেছে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলে অবশ্য তাকে দেখতে বয়স্ক কোন রকস্টার বলেই মনে হয়!

'ডিরেক্টর ক্রো, আসার জন্য ধন্যবাদ। আর ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্ট, তোমাকে দেখলেন মনটা আনন্দে ভরে ওঠে, মেয়েরা ভালো আছে তো?'

লোকটার সাথে করমর্দন করল ক্যাট, হাসি ফুটেছে আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে। এক দশকের বেশি হয়ে গেল একে-অন্যকে চেনে ওরা। 'মঙ্কের সাথে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'বাচ্চারাও নেই... স্বামীও নেই? আহা, এমন সময় বিরক্ত করে বসলাম! ক্ষমা চাইছি।'

'পরিস্থিতি যা দেখছি, তাতে ক্ষমা চাওয়ার কোন দরকার নেই।'

চেম্বারের অন্য সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন সাইমন। ইলেনা ডেলগাডো, বর্তমান 'লাইব্রেরিয়ান অফ কংগ্রেস'। মাত্র চার মাস আগে এই পদ পেয়েছেন তিনি, ইতিহাসের প্রথম হিস্পানিক মহিলা-লাইব্রেরিয়ান। তাই বলতে গেলে পেইন্টারদের কেউই তাকে ভালোভাবে চেনেন না।

তবে তাকে শ্রদ্ধা করেন পেইন্টার। ক্যালিফোর্নিয়াবাসী বাবা-মার চার মেয়ের মাঝে সবচেয়ে ছোট ইলেনা। আর শিক্ষাগত এবং অ্যাথলেটিক রেকর্ডের জন্য স্ট্যানফোর্ডে দ্বৈত-বৃত্তি পেয়ে পড়াশোনা করেছেন। আমেরিকার ইতিহাসের উপর

স্নাতকোত্তর ডিগ্রী তো আছেই, সেই সাথে মিউনিখ অলিম্পিকে সাঁতারে পেয়েছেন সোনা এবং রূপা। তবে ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা মরেনি, সেজন্যই মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে করেছেন দ্বিতীয় পিএইচডি। এবার লাইব্রেরি সায়েন্সে।

আনন্দের সাথেই মহিলার সাথে করমর্দন করলেন পেইন্টার। বয়স চৌষট্টি হলেও, শক্তি এক বিন্দু কমেনি। বয়সের সাক্ষ্য বলতে গলার সাথে সরু রুপোর চেইনে ঝুলতে থাকা চশমা। সেই সাথে দুটো ছোট্ট ছোট্ট ক্রুশও আছে। 'আমি জানি যে আপনার সময় কতটা মূল্যবান।' আচমকা ওদেরকে টেবিলের কাছে নিয়ে এলেন মহিলা। 'তবে আমার বিশ্বাস-এই ব্যাপারটাও কম জরুরী না।'

তার সামনের টেবিলে দুটো বই দেখা যাচ্ছে। একটা মোটা চামড়ায় বাঁধানো, তবে মলাট ভেঙে গিয়েছে। ওটার কালো বর্ণ দেখে মনে হয়, বুঝি কেউ জ্বালিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। অন্যটা তুলনামূলক নতুন, ইলাস্টিক দিয়ে বন্ধ করে রাখা আছে। তবে বাঁধাইটা সম্ভবত হাতে করা। নিঃসন্দেহে কয়েক দশক পুরনো হবে।

একটা বইয়ের উপর হাতের তালু রাখলেন তিনি, যেন ওটা তার নিজের সম্পদ। 'এই বইগুলো বিশেষ সংগ্রহ থেকে এনেছি। কেবলমাত্র কংগ্রেসের লাইব্রেরিয়ানরাই এগুলোকে দেখতে পান। এমনকি এধরনের যে কোন সংগ্রহ আছে, তাই অধিকাংশ লোক জানে না। আপনারা তো জানেন, নানা জাদুঘর থেকে প্রায়শই বই হারিয়ে যায়। তাই ঠিক করে হয়েছে যে আমাদের জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব বই আলাদা করে সংরক্ষণ করা হবে। এসব বইয়ের সবগুলো কিন্তু খুব দামী, এমনটাও না। এই যেমন গুটেনবার্গ বাইবেলের কথাই ধরুন। তবে দাম যাই হোক না কেন, সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ।'

নড করলেন সাইমন। 'ইলেনা ঠিক বলেছেন। কিউরেটর হিসেবে আমি বলতে পারি, স্মিথসনিয়ানের সংগ্রহের অনেক নিদর্শনই কেন যেন 'হারিয়ে' যায়। আমাদের মোট সংগ্রহের না হলেও দশ শতাংশের কোন খবর নেই। শুধু ছোট ছোট জিনিসের কথাই বলছি না। এর মাঝে তিন ডজন নিদর্শন চতুর্থ শ্রেণীর, মানে প্রতিটার দাম কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলার!'

চমকে উঠল যেন ক্যাট। 'চুরি হয়েছে?'

শ্রাগ করলেন সাইমন। 'কিছু হয়েছে। কিছু কেউ না কেউ সই করেই নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ফেরত আর আসেনি। আমার ধারণা, কিছু হারিয়েছে কাগজপত্রে তোলার ভুলে। খুঁজলে হয়তো আমাদের স্যুইটল্যান্ডের স্টোরেজে মিলবে।'

জায়গাটার কথা পেইন্টারের জানা আছে। মোট পাঁচটি দালান নিয়ে স্টোরেজ, প্রতিটা ফুটবল মাঠের সমান হবে। স্মিথসনিয়ানে যা আছে, তার চল্লিশ শতাংশ আছে ওখানে। সংখ্যায় পঞ্চাশ মিলিয়ন।

'বুঝতেই পারছেন,' কথার রাশ নিজের হাতে টেনে নিলেন ইলেনা। 'যে বইগুলোকে অন্যরা সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে না, যাদের দাম খুব একটা

বেশি নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম-সেগুলোকে আমরা সংরক্ষণ করছি। বলা যায়, ওটা আমাদের নিজস্ব ভ্যাটিকান আর্কাইভ।'

টেবিলের উপরে থাকা বইগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। 'ওই আর্কাইভ থেকে এসেছে এই দুটো?'

হাসলেন ইলেনা, অপেক্ষাকৃত নতুন বইটা নিজের দিকে টেনে নিলেন। 'এই বইয়ের লেখকই আসলে আমাদের আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাতা। কংগ্রেসের নবম লাইব্রেরিয়ান, আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে কাজ করেছেন। আমাদের জাতীয় সব সম্পদ একীভূত করার দায়িত্ব ছিল তার ওপর, কথা ছিল দেশজুড়ে সেগুলোকে লুকিয়ে রাখবেন। তারপর যখন তিনি পদত্যাগ করলেন, তখন স্বরাষ্ট্র-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেলেন। আগে যে কাজটা করছিলেন, সেটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন আবার। আর্চিবাল্ডের কাজেরই ফলশ্রুতিতে তৈরি হয়েছে গোপন এই সংগ্রহ।'

'নিজের বই দিয়েই শুরু করেছিলেন?' জানতে চাইলেন পেইন্টার।

'আরও তো আছে,' উত্তর দিলেন ইলেনা। 'তবে আমার ধারণা, এই দুই বইকে মানুষের নজর থেকে সরিয়ে ফেলায় তার একটা উদ্দেশ্য ছিল।'

দুই হাত এক করল ক্যাট, যেন কাজটা না করলে যেকোন মুহূর্তে বই দুটোকে হাতে নিয়ে নেবে। 'এখনকার পরিস্থিতির সাথে এই দুই বইয়ের কী সম্পর্ক?'

'হয়তো পুরোটাই... হয়তো কোন সম্পর্কই নেই। আমি জানি না। কিন্তু যখন আমি সাইমনকে এই দুই বইয়ের ভাষ্য জানালাম, ও আপনাদের সাথে কথা বলতে বলল।' চোখে সন্দেহ নিয়েই পেইন্টার এবং ক্যাটের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমাকে জানানো হয়েছে, আপনারা দুইজনেই ডার্পার এজেন্ট।'

সিগমার ব্যাপারে চুপ করে থেকেছেন বটে সাইমন, কিন্তু মিথ্যাবাদী হিসেবে তিনি খুব একটা সুবিধার নন। লাইব্রেরিয়ানের মনে যে সন্দেহ জন্মেছে তা পরিষ্কার।

আস্তে করে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন পেইন্টার। 'বই দুটোর ভাষ্য কী?'

'প্রথমেই বলে নেই, একমাত্র ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে এগুলো পড়েছি আমি। আমার থিসিসের বিষয় ছিল গৃহযুদ্ধ, বিশেষ করে লিঙ্কনের একান্ত পরামর্শদাতারা। জোসেফ হেনরি, স্মিথসনিয়ানের প্রথম সেক্রেটারি, এর মাঝে আছেন। নিদর্শনগুলো তখন এই একটা বিল্ডিং-এ রাখা হত।'

নড়েচড়ে বসলেন ইলেনা। 'গল্পের শুরুতেই আছেন জোসেফ হেনরি, সাথে একটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। আরেকটু হলেই যেটা গৃহযুদ্ধের সময় এই ক্যাসেলকে ধ্বসিয়ে ফেলত।'

গল্প বলা শুরু করলেন ভদ্রমহিলা। প্রথমে বললেন জেমস স্মিথসনের কথা, যিনি তার সমুদয় সম্পত্তি এক শিশু-জাতিকে দিয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে জন্ম নেয় তারই নামে নামকরণ করা একটা প্রতিষ্ঠান। গল্পের অধিকাংশটুকুই নেয়া হয়েছে

ম্যাকলিশের জার্নাল থেকে। জেনোয়ায় অবস্থিত স্মিথসোনের কবরে একটা নিদর্শন থাকার কথা জানতে পান জোসেফ হেনরি। ওটার নাম-ডেমন ক্রাউন। কয়েক দশক পর, আলেক্সান্ডার গ্রাহাম বেলকে গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো হয় ওখানে। স্মিথসনের দেহাবশেষ আনা তো ছিলই, সেই সাথে ছিল এই নিদর্শনকে উদ্ধার করার দায়িত্ব। গুজব আছে, জিনিসটা বিপজ্জনক! এমনকি কোন অস্ত্র পর্যন্ত হতে পারে!

'খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি?' জানতে চাইল ক্যাট।

'ম্যাকলিশের মতে, বেল খুঁজে পেয়েছিলেন অ্যাম্বারের একটা খণ্ড। ওটার ভেতরে ছিল একটা সরীসৃপের হাড়। সেটা কোন ছোটখাটো ডাইনোসরও হতে পারে। স্মিথসনের মতো, বেলও একটা রহস্যময় নোট লিখেছিলেন। তবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে জিনিসটা বিপজ্জনক... আবার অলৌকিকও!'

'অলৌকিক!' ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন পেইন্টার। 'কীভাবে?'

'বেলের দাবী ছিল, জিনিসটা মৃত্যুর পরের জীবনের ব্যাপারে নতুন এক দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম। কিন্তু এমন পাগলাটে কথা কেন বললেন, সে ব্যাখ্যা দেননি কখনও।'

ক্যাটের দিকে তাকালেন পেইন্টার। প্রাচীন বোলতার আক্রমণের যে হুমকি, তার স্বরূপ গ্রের মুখ থেকে শুনেছে মেয়েটা।

ইলেনা ওদের এই নীরবতা ঠিক বুঝতে পেরেছেন। 'আপনারা সম্ভবত কিছু একটা ধরতে পেরেছেন। তাই না?'

'হয়তো। নিদর্শনটার কী হলো?'

'বেল কিন্তু স্মিথসনের পদাঙ্কই অনুসরণ করলেন। আবার পুঁতে রাখলেন ওটাকে, তবে আমেরিকার মাটিতে।'

'কোথায়?' জানতে চাইল ক্যাট।

'ক্যাসেলের সাথে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের সংযোগ করেছে একটা টানেলের। ওটায়, মলের নিচে।'

পরিস্থিতি গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও, অবাক না হয়ে পারলেন না পেইন্টার।

এসবের শুরু আমাদেরই প্রাঙ্গণে?

'ম্যাকলিশ আমাদের সব জাতীয় সম্পদ নিরাপদে রাখার জন্য একটা বম শেল্টার বানানো পরিদর্শন করছিলেন।'

'তারপর আচমকা বেলের চেম্বার খুঁজে পান?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্যটা হলো, আবিষ্কারটা একেবারে নীরবে সারা যায়নি। ম্যাকলিশের সন্দেহ ছিল, এই কাজে জড়িত ইঞ্জিনিয়ারদের কেউ তথ্যটা ছড়িয়ে দিয়েছে। শত্রুপক্ষের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায় খবর। আগ্রহী হয়ে ওঠে তারাও।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল ক্যাট। 'তারপর?'

‘টানেলের ভেতরে খণ্ডযুদ্ধ হয়। জাপানিজ গোয়েন্দারা চুরি করে নেয় অ্যাম্বারটাকে।’ চোখে প্রশ্ন নিয়ে দুই জনের দিকে তাকালেন ইলেনা। ‘ম্যাকলিশ কিন্তু আক্রমণকারীদের দেহে অঙ্কিত ট্যাটু টুকে রাখতে পেরেছিলেন। তার দাবী ছিল, এই একই চিহ্ন ছিল প্রায় এক শতাব্দী আগে লাগা আগুনের মূল হোতার দেহেও। যেন একই গ্রুপ এই নিদর্শনটার নাম-নিশানা মুছে দিতে চাচ্ছিল।’

‘চিহ্ন? কেমন ধরনের?’ জানতে চাইলেন পেইন্টার।

বইয়ের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে চোখে চশমা তুললেন ইলেনা। ‘দেখাচ্ছি, বেশ মেসনিক দেখতে।’

‘মেসনিক?’ ঢোক গিললেন পেইন্টার। এদিকে চেহারায় চিন্তা নিয়ে পিছিয়ে এসেছে ক্যাট। ‘চিহ্নটায় কী চাঁদ আর মাঝখানে একটা তারা আছে?’

চশমা নামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে ওদের দিকে তাকালেন ইলেনা। ‘আছে, আপনি জানলেন কী করে?’

চোখ বন্ধ করে গাল বকে উঠল ক্যাট।

গ্রে-শেইচানকে টার্গেট করবে না তো কাকে করবে?

আচমকা বলে উঠলেন লাইব্রেরিয়ান। ‘এখন সম্ভবত আপনাদের গল্প শোনাবার পালা এসেছে।’

রাত ৬:৩৩

ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করছেন ইলেনা। আজীবন জেদি ছিলেন তিনি। চৌষট্টি বছরের প্রায় পুরোটাই কেটেছে মানুষজনের কথা শুনে। বাবা চাইতেন, বিয়ে করে ঘর-কন্না সামলাক তার মেয়ে। আর প্রফেসররা অদ্ভুত-খুঁটির জোরে যা পাওয়ার না, তাও পেয়ে যাচ্ছেন ইলেনা।

বয়স হয়েছে তার। এক-একাই বড় করে তুলেছেন এক মেয়েকে। সেই সাথে স্তন ক্যান্সারের সাথে লড়ে জয়ীও হয়েছেন। এখন আর ইলেনাকে সহজে বোকা বানানো সম্ভব না।

কী হচ্ছে এখানে?

জাদুঘরের কিউরেটর, সাইমন রাইট যখন ডারপার এই দুই এজেন্টের সাথে রিজেন্টের কামরায় এসে দেখা করার জন্য জোরাজুরি করছিলেন, তখনই সন্দেহ হয় তার। এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?

যুবতী মেয়েটার দিকে তাকালেন তিনি-ক্যাপ্টেন ক্যাট ব্রায়ান্টকে দেখে যোগ্য বলে মনে হয়। মনে হয় বন্ধু হতেই এসেছে। বসের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল মেয়েটা। যেন বলতে চায়-কিছু গোপন করবেন না কিন্তু।

কিন্তু ডিরেক্টর ক্রো সম্ভবত ইলেনার নিজের মতোই একগুঁয়ে। শক্ত হয়ে গিয়েছে লোকটার পিঠ, চোয়ালও। প্রথমবার দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছেন ইলেনা।

লোকটার শক্ত চেহারা, তীক্ষ্ণ নীল চোখ, কালো চুল-সবমিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয় এক চরিত্র বলে মনে হয়েছে। সম্ভবত নেটিভ আমেরিকান রক্ত বইছে দেহে।

তবে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা।

ক্যাট সম্ভবত অচলাবস্থাটা বুঝতে পারল। 'আমাদের দিকের গল্প শোনার আগে, আপনারটা শেষ করলেই ভালো হয়।' বইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশের গল্প এত ছোট না নিশ্চয়ই। বইটা তো বিশাল।'

ইতস্তত করলেন ইলেনা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন। 'ম্যাকলিশের কথাটা ঠিকই বলেছেন। আর্চিবাল্ড ওই চেম্বার খুঁজে পান ১৯৪৪ সালে... এক সপ্তাহ পরই তিনি পদত্যাগ করেন... তা-ও যুদ্ধের ঠিক মাঝখানে! জার্মানদের অবস্থা তখন দিশেহারা, কিন্তু জাপান তখনও হুমকি। বিশেষ করে প্যাসিফিক অঞ্চলে। ম্যাকলিশ ভয় পাচ্ছিলেন, জাপানিজরা চুরি করা জিনিসটা কোন ভয়াবহ কাজে ব্যবহার না করে বসে। তাই ওটার সত্যতার খোঁজে যান।'

'সত্যতা বলতে? উৎস?' সন্দেহ করল ক্যাট। 'জানতে চাইলেন, কেন স্মিথসন ভয় পাচ্ছিলেন?'

'একদম ঠিক। স্মিথসনকে অনুসরণ করলেন তিনি, কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না।' পোড়া বইটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ইলেনা। 'ওতে কিন্তু জিনিসটার উৎসের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত নেই। ওই আগুনে স্মিথসনের সব ব্যক্তিগত কাগজই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ম্যাকলিশ শক্ত মানুষ। তিনি ইউরোপে গেলেন, ওখানে তখনও যুদ্ধ চলছিল। অনেক খুঁজে বের করে আনলেন অতীতের কথা জানে, এমন একজনকে। বন্ধু, সহকর্মী, আত্মীয়। এককথায়, সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করেছেন তিনি।'

'কিছু পেয়েছিলেন কী?' প্রশ্ন করলেন পেইন্টার।

'রহস্য সমাধানে নেমে পেয়েছিলেন আরও কিছু রহস্য। পুরোটা এখানে লেখা আছে। তবে ট্রেইল হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল এস্টোনিয়ায়। বাল্টিক সমুদ্রের ধারেই টালিন শহরে।'

ক্যাটের চেহারায় হতাশা ছেয়ে গেল। 'ম্যাকলিশ তাহলে ওই নিদর্শনের উৎস খুঁজে পাননি?'

'না, তবে এক ভূ-তত্ত্ববিদের কাছে গল্প শুনেছেন। লোকটা তখন মৃত্যুশয্যায়। কয়েক দশক আগে, যখন লোকটার ক্যারিয়ার কেবল শুরু, তখন স্মিথসনের সাথে নাকি টালিনের এক সরাইয়ে মদ গিলছিল। মাতাল হয়ে এক গল্প শুনিয়েছিলেন স্মিথসন। ভূ-তত্ত্ববিদের মতে, গল্পটা পুরোই বানোয়াট।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল পেইন্টারের। 'কোন গল্প?'

'গল্পের নায়ক একদল খননকর্মী। আচমকা অ্যাম্বারের এক সমৃদ্ধ পকেটে ঢুকে পড়ে তারা।' স্মিথসনের পোড়া জার্নালটা স্পর্শ করলেন ইলেনা। 'ওদের খননের ফলে মাইনের ভেতরে কিছুটা একটা মুক্তি পায়। অদ্ভুত এক রোগে আক্রান্ত হয় সবাই, যার উৎস ছিল হুল ফোটানো কিছু বিশাল বোলতা। এখানে লেখা শব্দগুলো

সরাসরি বলছি-ওগুলো যেন বেরিয়ে এসেছিল পাথরের গহীন থেকে। মাইনটাকে আগুনে বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল, খননকারীদের সহই। তারপর মাটিচাপা দেয়া হয়!'

বসের দিকে তাকাল ক্যাট, ইলেনা বুঝলেন যে আপাত বানোয়াট এই কাহিনীর মাঝে সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে।

পেছন দিকে হেলান দিলেন পেইন্টার। 'আপনি বললেন, টালিনে গিয়ে শেষ হয়েছে ম্যাকলিশের খোঁজ। আমার ধারণা, এই গল্পকে তিনিও বানোয়াট ধরে নিয়েছিলেন।'

'সেটাও একটা কারণ...সবচেয়ে বড় কারণটা হলো, এই গল্প তাকে শোনান হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ছয় আগস্ট।'

হতভম্ব দেখাল পেইন্টারকে, বুঝতে পারছেন না যেন।

'হিরোশিমায় বোমা ফেলবার দিন।' ব্যাখ্যা করল ক্যাট।

মাথা নেড়ে সায় জানালেন ইলেনা। 'সেই ঘটনার পর, জাপানিজদের তরফ থেকে কোন হুমকি আসার দুশ্চিন্তা ছেড়ে ফেললেন ম্যাকলিশ।'

এবার হতাশ হয়ে পেইন্টারের মাথা নাড়ার পালা। 'বোঝাই যাচ্ছে, তিনি ভুল করেছিলেন।'

'এবার হাওয়াই-এ আক্রমণের কথায় ফিরে আসি,' বললেন ইলেনা। 'যদি স্মিথসনের আবিষ্কারের সাথে হাওয়াইয়ের টেরোরিস্ট অ্যাটাকের কোন সম্পর্ক থাকে, তাহলে ম্যাকলিশের কাজটা শেষ করা দরকার।'

'ঠিক বলেছেন,' বসের দিকে ফিরল ক্যাট। 'প্রফেসর মাতসুই যদি এই প্রাচীন প্রজাতির ব্যাপারে ঠিক আন্দাজ করে থাকেন, তাহলে তাদের উৎসের খোঁজ নেয়াটা খুব জরুরি।'

'কেন?'

'কেননা এই বোলতাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।' নিশ্চয়ই পেইন্টারের হতভম্ব চেহারা নজরে পড়েছে ক্যাটের। সে যোগ করল, 'এগুলো এখনও প্রকৃতিতে নেই কেন? কেন বিশ্বজুড়ে তাদের আধিপত্য দেখতে পাচ্ছি না আমরা? আগে কীভাবে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়েছিল? ক্রিপ্টোবায়োসিসকে তো একধরনের পলায়ন বলা চলে। কেন পালাতে হলো ওদের?'

প্রসঙ্গ বুঝতে পারছেন না ইলেনা, কিন্তু চুপ করে যে থাকতে হবে তা বুঝতে পারছেন।

টেবিলে রাখা বই দুটোর দিকে তাকালেন পেইন্টার। 'যদি সেই কারণটা আমরা বের করতে পারি...'

'তাহলে হয়তো আরেকবার এই পতঙ্গদের পালাতে বাধ্য করা যাবে।'

ইলেনা বুঝতে পারলেন, কিছু জানতে হলে এখনই চাপ দিতে হবে। 'যদি আপনারা টালিনে সূত্র খোঁজার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে ম্যাকলিশের যাত্রা

সম্পর্কে সব আপনাদের জানা থাকতে হবে। আর...' বইটার উপর হাত রাখলেন তিনি। 'এটা যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব!'

উঠে দাঁড়ালেন পেইন্টার, বোঝাই যাচ্ছে যে প্রস্তাবটা কানে তুলবেন না। 'অমূল্য এই ঐতিহাসিক বইটা নিয়ে ঝুঁকি নেবার কোন অর্থ হয় না। নকল হলেই চলবে।'

দুটো বই-ই টেবিল থেকে তুলে নিলেন ইলেনা। 'সফল হতে চাইলে, চলবে না।' সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকালেন তিনি। 'এই পাতাগুলোয় নেই, এমন সব তথ্যও দরকার হবে আপনার। এমন কাউকে লাগবে, যে এই লেখকদের সম্পর্কে, বিশেষ করে স্মিথসনের সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানে।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?' কিছুটা বিদ্রূপের সাথেই বললেন পেইন্টার। 'নাকি আপনিই সেই মানুষ?'

ওর হাত স্পর্শ করল ক্যাট। 'আমাদের হাতে কিন্তু আর মাত্র তিন দিন আছে।'

এ ব্যাপারে কিছুই জানা নেই ইলেনার, তবে ক্যাটের সমর্থন তার ভালো লাগল। তবে অচলাবস্থা ভাঙলেন সাইমন। তিনি ভ্রূ কুঁচকে পেইন্টারকে বললেন, 'লাইব্রেরিয়ান অফ কংগ্রেসকে নিয়ে ক্যাসেলের একটা পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে!'

রাত ৭:০৫

মিনিট পনেরো পর দেখা গেল, সিকিউরিটি এলিভেটরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাট। ইলেনা ডেলগাডোর চেহারায় ফুটে ওঠা বিস্ময়টুকু উপভোগ করল সে। ভূ-গর্ভস্থ কমপ্লেক্সে এসে লাইব্রেরিয়ান হতবাক হয়ে গিয়েছেন।

'এমন একটা জায়গার অস্তিত্ব আছে, এমনটা কখনও কল্পনা করিনি...' বড় বড় হয়ে গিয়েছে তার চোখজোড়া। 'নিজেকে চকলেট ফ্যাক্টরিতে ঢোকা চার্লি বলে মনে হচ্ছে।'

হাসলেন পেইন্টার, আস্তে আস্তে লাইব্রেরিয়ানের প্রতি সহজ হয়ে আসছে তার ব্যবহার। 'তাহলে আমি নিশ্চয়ই উইলি ওয়াঙ্কা!'

লাল হয়ে গেল ইলেনার গাল। 'দু:খিত। আসলে দুই নাতনির সাথে আজকাল একটু বেশিই সময় কাটানো হয়। ওই মুভিটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।'

'আমার অফিসে চলুন না হয়,' প্রস্তাব দিলেন পেইন্টার। 'ক্যাট এর মাঝে সব প্রস্তুতি সেরে ফেলুক।'

'জেসন এরিমাঝে জেটের ব্যবস্থা করছে।' জানাল ক্যাট। 'ঘণ্টা-খানেকের মাঝে রওয়ানা হওয়া যাবে।'

'এত তাড়াতাড়ি?' ইলেনার প্রশ্নের উত্তরে কেবল নড করল ক্যাট।

সিগমায় স্বাগতম।

কমিউনিকেশন নেস্টের কাছে আসামাত্র পেইন্টার আর ইলেনাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল ক্যাট। 'আমি আসছি,' বলল সে। 'যাবার আগে নিশ্চিত করে নিতে চাই যে জেসন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সব জানে।'

জেসন কার্টারকে খুঁজে পেতে সময় লাগল না ওর। ছেলেটা দু'জন টেকনিশিয়ানের মাঝে বসে আছে।

'কী খবর?' জানতে চাইল ক্যাট।

ওর দিকে না থাকিয়েই মুখ খুলল ছেলেটা। 'ডা. বেনেটের সাথে এইমাত্র কথা শেষ হলো। আপনাদের সাথে যোগ দেবেন তিনি। তবে প্রফেসর মাতসুইয়ের সব নোট নিয়ে আসতে তার চল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।'

'খুব ভালো।'

সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাই যেখানে যা পাওয়া যায়-তাকেই কাজে লাগাতে হবে।

'গ্রের কাছ থেকে কোন খবর এসেছে?' জানতে চাইল সে।

'নাহ, এখনও আসেনি। শেষ খবর পাওয়া মাত্র, পঙ্গপালের ব্যাপারে একটা সূত্র অনুসরণ করছে ওরা।' না ঘুরেই একটা স্টারবাকসের কাপে কনুই ঠেকাল ও। 'ভ্যানিলা লাটে, ডাবল।'

কাপের হাত বাড়াল ক্যাট। আরামদায়ক উষ্ণতায় ভরে উঠল আঙুল। 'মাত্র ডাবল?'

আড়চোখে তাকাল ছেলেটা। 'আরও লাগবে?'

সহকারীকে অগ্রাহ্য করে চুমুক দিল ক্যাট। 'শেইচেনের আক্রমণকারী কী খবর? যে নৌকা নিয়ে পালিয়েছিল?'

'হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তবে প্যাসিফিকের সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে সাবধান করা হয়েছে।'

দাঁতে দাঁত চাপল ক্যাট। মাথার ভেতর হাজারো তত্ত্ব খেলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় কর্মস্থল ত্যাগ করাটা ঠিক হচ্ছে না, জেসনের কাঁধে অপরিসীম দায়িত্ব পড়ে যাচ্ছে। আচমকা ওর দিকে তাকাল ছেলেটা। 'দুশ্চিন্তা করবেন না, বস। আমি সামলে নেব।'

নড করল ক্যাট।

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তারপরও, শেষ কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা সেরে নিল ক্যাট। সন্তুষ্ট হয়ে একবার তাকাল ঘরজুড়ে। তারপর আবার মনোযোগ দিল সহকারীর দিকে।

'দোকান এখন তোমার,' ওর দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'কিছু আবার ভেঙে ফেলো না কিন্তু।'

'একটা... মাত্র একটা কফির মগ ভেঙেছিলাম! আজও তার জন্য কথা শুনতে হচ্ছে!'

‘ওটা যে আমার সবচেয়ে পছন্দের ছিল।’ বলে বেরিয়ে গেল ক্যাট।

হল ধরে হাঁটতে হাঁটতে, উষ্ণ কাপটা হাত দিয়ে ধরে রাখল ক্যাট। কেন যেন মনে হচ্ছে, কিছু একটা ভুলে গিয়েছে। এদিকে পেইন্টারের অফিসের খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছে মানব কণ্ঠের আওয়াজ। নক না করেই ঢুকে পড়ল সে। তারপরেই মনে পড়ে গেল, কী ভুলে গিয়েছে!

পেইন্টারের ডেস্কের উপর বসে আছে এক গাঁট্টাগোট্টা লোক। ইলেনার কোন কথায় যেন হাসছে। লাইব্রেরিয়ানকে নিজের প্রস্থেটিক হাত দেখাচ্ছে সে। ডারপার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। খোলা হাতটা পাঞ্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও, আঙুল নাড়িয়ে যাচ্ছে। অবাক হয়ে ইলেনা বললেন, ‘দূর থেকেও ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আপনি!’

‘হ্যাঁ। বুড়ো আঙুলের নিচে একটা ক্যামেরাও লাগানো আছে।’ গর্বে ভরে উঠল মালিকের কণ্ঠ। ‘ছোট একটা বোমাও আছে তাতে।’

‘মঙ্ক?’ এগিয়ে গেল ক্যাট। স্বামীকে দেখে হতবাক। ‘এখানে... এখানে কী করছ তুমি?’

দুষ্টুমির ভঙ্গিতে সোজা হলো লোকটা। পরনে শর্টস আর হুডি। বুকে লেখা-ক্যাম্প উডচাক।

‘তোমার আরেকটা বাড়তি হাতের দরকার হবে মনে হলো,’ প্রস্থেটিক হাতটার দিকে ইঙ্গিত করে মজা করার চেষ্টা করল মঙ্ক। কিন্তু স্ত্রীর কপালের ভাঁজ মসৃণ হলো না দেখে, জায়গা মতো লাগিয়ে রাখল জিনিসটা। ‘তার চেয়ে বড় কথা, বউয়ের সাথে সময় কাটাবার এই সুযোগকে হাতছাড়া করতে মন চাইল না।’

‘মেয়েরা কোথায়?’

কামানো মাথায় হাত বুলালো মঙ্ক। ‘ক্যাম্প কাউন্সিলরদের জ্বালিয়ে মারছে সম্ভবত।’

বসের দিকে তাকাল ক্যাট, ওর সন্দেহ-পেইন্টারই কিছু একটা করেছেন।

সেটা মেনেও নিলেন তিনি। ‘ড. ডেলগাডো আর ড. বেনেটের সাথে এস্টোনিয়ায় একা পাঠাতে মন চাইল না।’

হাসল মঙ্ক। ‘ধরে নাও, কোম্পানির খরচায় ইউরোপে হানিমুন করে এলাম।’

চোখ উল্টাল ক্যাট।

হাহ, হানিমুন...

...এদিকে সারা পৃথিবীর ভাগ্য সুতোয় ঝুলছে!

অধ্যায় চৌদ্দ

৭ মে, দুপুর ১:০৪
হানা, মাউই দ্বীপ

প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা পালু সামনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'বাঁয়ে যাবে এরপর।'

'কোন বাঁয়ে?' স্টিয়ারিং-এর দিকে ঝুঁকে আছে গ্রে, চোখ কুঁচকে দেখছে ফার্নের দেয়াল আর আয়রনউডের গাছগুলোকে। ভাড়া করা জিপটার দুই পাশে এসে আঁচড় কাটছে গাছের ডাল। হানা ফরেস্ট রিজার্ভের মানচিত্রহীন একটা অংশ ধরে এগোচ্ছে ওরা। প্রায় এক ঘণ্টা আগেই নেমে এসেছে হাইওয়ে থেকে।

গ্রের ইচ্ছা ছিল, সামনে থাকা মাঠের মাঝ দিয়ে নিয়ে যাবে জিপটাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ভয়ে মানা করেছে পালু। তাই অনেকটা বাধ্য হয়েই ঘুরপথে যেতে হচ্ছে ওকে। হাজার হলেও, ভাগ্যের সাথে পাঙ্গা নিয়ে লাভ কী?

'আর কত দূরে?' কোয়ালস্কির প্রশ্ন। বিশালদেহী শরীরটা বাঁকিয়ে-চুরিয়ে প্রফেসর মাতসুইয়ের পাশে বসে আছে বেচারা। আইকো হিগাশি আসেনি, ক্যাটের সাথে যোগাযোগের জন্য রয়ে গিয়েছে কুচিরোই। নতুন তথ্য আসছে সিগমা থেকে, সম্ভবত গিল্ডের সাথে সম্পর্কিত।

রিয়ারভিউ মিররের দিকে গেল গ্রের নজর। শেইচান একটা মোটর বাইক নিয়ে পিছু পিছু আসছে। সামনের রাস্তা বাজে বলেই মনে হচ্ছে ওর, তাই বাইক ওদেরও লাগতে পারে। এসবের সাথে গিল্ডের সম্পর্ক থাকতে পারে শুনে, চুপ হয়ে গিয়েছে শেইচান। অবশ্য এমনিতেও আজকাল চুপচাপ থাকে সে। কিছু একটা ওকে জ্বালাচ্ছে, তবে গ্রে জানে-একা থাকতে দিলে, নিজেই ব্যাপারটা সামলে উঠতে পারবে।

একবার কম্পাস দেখে নিয়ে, কোয়ালস্কির প্রশ্নের উত্তর দিল পালু। 'এক বা... দুই মাইল হবে, দোস্ত। রাস্তাটা এখন গত সপ্তাহের বৃষ্টিতে ডুবে না গেলেই হয়।'

গুঙিয়ে উঠল বেচারা বিশালদেহী।

আচমকা ড্যাশবোর্ডের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল হাওয়াইয়ান। 'ওই যে বাঁয়ের রাস্তা।'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ওটা নজরে এল গ্রের। দ্রুত গাড়ির নাক ঘোরাল ও, সামনের রাস্তা আরও বেশি চিকন বলে মনে হচ্ছে। পেছনে এক পলক দেখে নিশ্চিত হলো গ্রে, শেইচান ওদের পেছনেই আছে।

দুইপাশে বিশাল ফার্নের জঙ্গল রেখে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। গাছগুলোর নাম হাপু'উ। মনে হচ্ছে যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন 'কার-ওয়াশ' এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আসলেই যাচ্ছে হয়তো। জঙ্গলটা দেখে মনে হচ্ছে, এখানে কখনও কারও পা পর্যন্ত পড়েনি। কয়েকটা গাছ দেখে তো শতবর্ষী বলে সন্দেহ হয়!

আচমকা উইন্ডশীল্ডে এসে বাড়ি লাগাল একটা লতা, যেন ওদেরকে চলে যেতে বলছে। ব্যাপারটা দেখে হাসল পালু। 'জঙ্গল তোমাদেরকে পছন্দ করছে না। একমাত্র কামা'আইনা জানেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তোমাদের।'

গ্রে-র সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। এই দ্বীপগুলোতে পর্যটনই ইনকামের প্রধান মাধ্যম। তবে স্থানীয়রা নিজেদের মতো করে পথ বানিয়ে নেয়। অন্যদেরকে পা-ও রাখতে দেয় না।

স্থানীয়দের দুশ্চিন্তা বুঝতে পারছে গ্রে। মাস তিনেক এখানে থাকার পর বুঝতে পারছে, দ্বীপের সাথে অধিবাসীদের কী আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান! এখানকার প্রতিটা পাথর, গাছ এবং প্রাণীর সাথে জড়িয়ে আছে তাদের ইতিহাস।

যেন গ্রে-র মনের কথা বুঝতে পেরেই, লতার জঙ্গলের দিকে তাকাল পালু। 'আমরা এই সোনালী চুল-হাপু'উ ব্যবহার করে বালিশ, জাজিম বানাই। এমনকি এই পাতাগুলোকেও খাওয়া যায়।' মুখ কুঁচকে ফেলল যদিও। 'স্বাদ অবশ্য ভালো না।'

নার্ভাস হয়ে এসব বলছে পালু, নাকি দ্বীপের প্রাণ-বৈচিত্র্যের কথা শোনাতে-তা বুঝতে পারল না গ্রে। হয়তো লোকটা বোঝাচ্ছে চাচ্ছে, কিছু করা না হলে শুধু এই দ্বীপের মাটিই নয়... তার ইতিহাসও ধ্বংস হয়ে যাবে।

সেটা হতে দেয়া যাবে না ভেবে, এগিয়ে যাওয়ায় মন দিল গ্রে। হালেয়াকালা পাহাড়ের রুক্ষ ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল গাড়িটা। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হচ্ছে ক্যানোপি। মাঝে মাঝে তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সৈকত। হানার হৈ-চৈ শুনতে হচ্ছে না ওদেরকে। দূরত্ব এবং পাহাড়ের নির্জনতা-দুই প্রাচীর ভেদ করে আসতে পারছে না।

যতই উপরে উঠছে ওরা, ততই ঘন হয়ে আসছে কুয়াশা। মাঝে মাঝে ওয়াইপার চালাতে হচ্ছে পর্যন্ত! চারপাশের জঙ্গল যেন কোন ভূতের আবাস।

পেছন থেকে কথা বলে উঠলেন প্রফেসর মাতসুই, পরিবেশের গাম্ভীর্যের সাথে তাল মিলিয়ে তার নিজের কণ্ঠও ফিসফিস করছে। 'এগুলো কি কোয়া গাছ?' সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

হাসল পালু। 'হ্যাঁ। এককালে হালেয়াকালার পুরোটা জুড়ে ছিল কোয়া গাছের জঙ্গল। এখন জায়গায় জায়গায় আছে।' অন্যদের দিকে তাকাল সে। 'হাওলদের এই জায়গার কথা না বলার এটাও একটা কারণ।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এলেন কিন। 'যেমন বললে-লাভা টিউব ভর্তি জায়গা আসলেই থাকলে, ওডোকুরো ওখানেই লেক বানাবে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। 'তাদের দরকার হবে গভীর গুহা, সেই সাথে ক্যানোপির ছায়া আর যথেষ্ট পরিমাণে পানি। এখানে যে রসালো ফুল দেখতে পাচ্ছি...'

'পোষকের কথা নাহয় বাদই দিলাম।' যোগ করল গ্রে।

পাখি, স্তন্যপায়ী এবং পতঙ্গ-কোনটারই অভাব নেই চারপাশে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সিটে হেলান দিলেন কিন।

গন্তব্য-স্থলটাকে মানসচোখে দেখার প্রয়াস পেল গ্রে। তিন সপ্তাহ আগে, কা'এলেকু গুহা দেখতে গিয়েছিল শেইচানকে সাথে নিয়ে। বিশাল গুহাটায় লাভা টিউবের অভাব নেই। স্ট্যালাকটাইট এবং চকলেট-রঙ্গা পাথরে বোঝাই। স্কাইলাইটের জন্য ভেতরের টানেলগুলো দেখতে অসুবিধা হয় না। জনপ্রিয় এক পর্যটন কেন্দ্র বলা চলে জায়গাটাকে। হালেয়াকালার ফুঁসে ওঠা রূপের পরিচায়ক, যার কারণে গড়ে উঠেছে মাউই দ্বীপ।

হালেয়াকালার পাশ দিয়ে বের হওয়া এরকম লাভা টিউবের সংখ্যা কিন্তু কম না। তবে অধিকাংশই লুকিয়ে আছে ঘন জঙ্গলের আড়ালে। স্থানীয়রা বাদে ওসবের অবস্থান আসলে কেউই জানে না। পালু ওদেরকে তেমনই একটা টিউবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আসার পথে বোলতার কোন নিদর্শন নজরে পড়েনি গ্রে-র। মনে হচ্ছে যেন পুরো পালটাই হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

তেমন কপাল নিয়ে জন্মালে তো ভালোই হত...

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল পালু। 'রাস্তা শেষ, হাঁটতে হবে।'

সে কথা আসলে বলে দেয়ার দরকার ছিল না। বট গাছের কাছে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। বিশাল গাছটা লম্বাই সত্তর ফিট মতো হবে, পাশে পঞ্চাশ গজ। শতশত শিকড় ঝুলছে ডাল থেকে।

'দৃশ্যটা সুবিধার মনে হচ্ছে না।' কোয়ালস্কির মতের সাথে একমত না হয়ে পারল না গ্রে। কেননা একটা পুরনো ভি-ডব্লিউ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে গাছটার পাশে।

'আমাদের আগেই চলে এসেছে কেউ।' গ্রে বিড়বিড় করে বলল।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল পালু। 'দেখে তো এমেট লয়েডের ভ্যান বলে মনে হচ্ছে। মাকাও-নির্ভর একটা ট্যুর কোম্পানি চালায়। কানাপাপিকি'টার তো এখানে কাউকে আনা উচিত হয়নি।'

বটগাছের ওপাশের জঙ্গলের দিকে গেল গ্রে-র নজর।

বিশেষ করে এখন।

দুপুর ১:৩১

এমেট তার তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আস্তে! আস্তে!'

পিচ্ছিল আগ্নেয় পাথর ধরে নামল সে। দুই পাশের দুই বিশাল বাঁশের খুঁটি ধরে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল।

হালেয়াকালার ধারে ক্যাম্প করেছিল ওরা। তারপর বেশ দ্রুত গতিতেই এগিয়েছে। রাতভর পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে একের পর এক হেলিকপ্টার। ফোনের নেটওয়ার্ক নেই, তাই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানে না। কিন্তু কোন একটা ঝামেলা যে হয়েছে তা বুঝতে পারছে পরিষ্কার।

তবে কপাল ভালো, গাড়ি রাখার জায়গাটা থেকে বেশি দূরে নেই আমরা।

বড়জোর মাইল খানেক হবে।

বাঁশের ছোট্ট এই বনটাকে পথচিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করছে ও। দক্ষিণ-পূর্বদিকে এর চেয়ে বড় বন পাওয়া যায়। কিন্তু ওই এলাকায় দিনের বেলাতেও ভরে থাকে পর্যটকে। ওর কোম্পানির নীতির সাথে ব্যাপারটা ঠিক যায় না। ভ্যানের এক পাশে লিখেও রেখেছে কথাটা।

নির্জনতা চাইলে... নির্জন রাস্তায় হাঁটুন।

কাদাময় রাস্তা ধরে অনেকটা পিছলেই নেমে পড়ল সে, দাঁড়াল দুই পায়ের উপর। অতীত দিনে সার্ফার ছিল লোকটা, সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেল। চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল, কিন্তু সে যেন এক জীবন আগের কথা। তবে বায়ান্ন বছর বয়সেও, নেশাকে ছাড়ান দিতে রাজি না এমেট। বলা চলে, নেশাকেই পেশা বানিয়ে নিয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটকদের ক্যাম্পিং ট্রিপে নিয়ে আসে হালেয়াকালায়।

বর্তমান এই দলটার সাথে তিন রাত কাটিয়েছে লোকটা। স্বামী-স্ত্রী তাদের এগারো বছরের ছেলে, বেঞ্জামিনকে নিয়ে এসেছে।

'আস্তে যাও, বেঞ্জি!' পল সিমন্স সাবধান করে দিল, বড় করে দম ছাড়ল সে। বাচ্চা ছেলেটা ছাগলের মতো তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। স্যান রাফায়েলে একটা প্রযুক্তি নির্ভর কোম্পানি চালায় সিমন্সরা। স্বামী-স্ত্রী, দুজনেই বেশ পোক্ত স্বাস্থ্যের

অধিকারী। পল তো জিম বলতে পাগল। এদিকে র‍্যাচেল প্রত্যহ যোগ ব্যায়াম করে।

অবশেষে এই দম্পতির কাছে এসে পৌঁছল এমেট, বেঞ্জি অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এমনকি বাঁশঝাড়ের ভেতরে হারিয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

দুশ্চিন্তা ভর করল লোকটার মনে। এই এলাকা যে কতটা বিশ্বাসঘাতক, তা ভালো করেই জানে। খানা-খন্দ-খাদ, কোনটারই অভাব নেই। সামনের দিকে ইঙ্গিত করে তাই সে বলল, 'ছেলেকে সামলাও।'

আচমকা ছোট্ট একটা চিৎকার করে উঠে, ঘাড়ে চাপড় বসাল পল।

ঘুরে দাঁড়াল র‍্যাচেল। যতটা না দুশ্চিন্তায়, তারচেয়ে বেশি ক্লান্তিতে। 'আবার কী হলো?'

কিছু একটা দেখাবার জন্য হাত নাড়ল পল-পরক্ষণেই কেঁপে উঠল বেচারা। ছোট্ট চিৎকারটা রূপ নিল প্রচণ্ড আক্ষেপে। হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল সে, দুই হাতে চেপে ধরে আছে ঘাড়।

র‍্যাচেল ঘাবড়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরল স্বামীর হাত। 'পল!'

এক পা পিছিয়ে এসে চারপাশে তাকাল এমেট। এই বাঁশঝাড়ের মাঝে সাধারণত খুঁজে পাওয়া যায় জাদুর মাদকতা। চারপাশ জুড়ে থাকা লম্বা বাঁশ, মাথার উপর ছাতার মতো চেয়ে থাকা পাতা... আর এগুলোকে এক সুতায় গেঁথে রাখা ভারি কুয়াশা! কিন্তু এখন কেমন যেন অশুভ একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে চারপাশে! নিজেকে মনে হচ্ছে অনাহূত কোন আগন্তুক।

অশুভ আবহটুকু শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছে নিচু একটা গুঞ্জন। নিজের হাঁপানোর শব্দে যা আগে টের পায়নি এমেট। এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে।

আওয়াজটা কীসের?

র‍্যাচেল ওর স্বামীকে তুলতে তুলতে, চক্কর ঘুরে এল এমেট। চারপাশের জমাটবদ্ধ কুয়াশা যেন কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য কোন শক্তির আওতায় এসে গিয়েছে সেটা। গুঞ্জন শুনতে শুনতে খাড়া হয়ে গিয়েছে ওর দেহের পশম। আচমকা দেখতে পেল, কালো কিছু জিনিস উড়ে বেড়াচ্ছে কুয়াশা ভেদ করে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে ওগুলো, ওদেরই দিকে।

'দৌড়াও!' সাবধান করল এমেট।

হুমকির আসল ধরন জানা নেই ওর, কিন্তু বিপদ যে সমাগত তা জানে। র‍্যাচেলের মনোযোগ তার স্বামীর দিকে, কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। 'ক-কী?'

এমেট ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। কিছু একটা এসে ওর শার্টের লম্বা হাতায় এসে বসল। দৃশ্যটা দেখে হাঁ করে রইল সে। বিশাল একটা বোলতা বা

ভোমরা বসে আছে ওখানে, পাতা ঝাপটাচ্ছে। অবাক হয়ে একটা বাঁশের সাথে হাত ঘষল ও, ফেলে দিল পোকাটাকে।

ধুরো...

'দাঁড়াও!' ওকে পালাতে দেখে চিৎকার করে উঠল র‍্যাচেল। 'সাহায্য করো আমাদের!'

আবার চিৎকার করে উঠল পল, তার এক মুহূর্ত পর-র‍্যাচেল। দেখে যেমনই মনে হোক না কেন, এমেট আসলে ওদেরকে ফেলে যাচ্ছে না। এই দম্পতি প্রাপ্তবয়স্ক, নিচে যাবার রাস্তা চেনে। সমস্যা বাচ্চাটাকে নিয়ে, সেদিকেই দৌড়াচ্ছে।

বেঞ্জির দিকে।

বাঁকটা ঘুরল এমেট, আরেকটু হলেই পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে থামাল ও, সার্ফার হিসেবে কাটানো দিনগুলোর কথা যেন মনে পড়ে গিয়েছে এমেটের মাংসপেশির।

বাচ্চাটা কোথায় গেল?

মুখের উপর হাত রেখে চিৎকার করে উঠল লোকটা, 'বেঞ্জি!'

বাচ্চাটাকে অনেকটা আচমকাই দেখতে পেল এমেট। রাস্তায় নেই সে, আছে বাঁ পাশের বনে। হয়তো পথ হারিয়েছে, আর নয়তো কিছু একটা বিপথে নিয়ে গিয়েছে ওকে।

তা যেটাই হোক...

'এদিকে এসো,' চিৎকার করল আবারও।

ভয়ার্ত দেখাচ্ছে বেঞ্জিকে, এক জায়গায় জমে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই বাবা-মায়ের চিৎকার শুনতে পেয়েছে! এমেটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে, প্রায় অপরিচিত লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না মন থেকে।

'জলদি এসো, বাছা! আমাদের এই পাহাড় থেকে চলে যেতে হবে!' অনেক চেষ্টা করে কণ্ঠ থেকে ভয়ের ছাপটাকে সরাল এমেট। 'তোমার মা-বাবা আমার পেছনেই আছে। চলো, আমরাও যাই!'

বেঞ্জি তাকাল চারপাশে। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রওনা দিল।

মন্দ কপাল, তিন পা ফেলা মাত্র উধাও হয়ে গেল বেচারা। যেন মাটি গিলে নিল ওকে। অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল এমেট, ওর কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিল বাচ্চাটার কণ্ঠ। ভয় পেয়ে সেদিকে দৌড় দিল এমেট। লম্বা বাঁশের ঝাড়ের উপর আছড়ে পড়ল বেচারা, কাঁপতে শুরু করল বাঁশগুলো।

হাড়ের সাথে হাড়ের বাড়ি খাবার মতো খটখটে শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ।

ডিম-বহনকারী

মদ্দাদেরকে খেয়ে নেবার পর, শীতল অন্ধকারে অপেক্ষা করতে লাগল মাদীটা। এখন ওর প্রতিটা কর্মকাণ্ড, প্রতিটা নড়াচড়া সন্তান-ধারণের জন্য। মাথার উপরে কুঁচকে আছে অ্যান্টেনা, পাখা চারটি ভাঁজ হয়ে আছে। সন্তুষ্ট মাদীটার প্রতিটা অনুভূতি প্রায় অবশ হয়ে আছে। বড় বড় চোখগুলোর কোন পলক পড়ছে না।

পালটা আগেই নিজেদের জন্য একটা আস্তানা খুঁজে পেয়েছে। ফেরোমোনের ট্রেইল ছড়িয়ে মাদীটাকে নিয়ে এসেছে সেখানে। ওর মতো অন্যান্য মাদীদের সাথে গিয়ে বসেছে অন্ধকারে। মাঝে মাঝে দেয়াল থেকে ঝরতে থাকা পানিতে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে। আপাতত আর কিছু দরকার নেই তার।

চোখের পেছনে থাকা গ্যাংগলিয়নগুলো আলোর প্রতি সংবেদী। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার থেকে শুরু করে প্রচণ্ড উজ্জ্বলতা, কিছুই বাদ পড়ছে না। দেহের ভেতরে খেলে বেড়াচ্ছে হরমোন, জানাচ্ছে যে নিরাপদ পরিবেশ এখানে। সাথে সাথে ওভিডাক্ট সংকুচিত করে হাজার হাজার ডিম্বাণু নিষিক্ত করল মাদীটা। কোষগুলো বারংবার বিভাজিত হলো, ফুলে উঠছে শুরু করেছে ডিম্বাণুগুলো।

কাজ শেষে, কিছু একটার চাহিদায় দপদপ করতে লাগল বেচারার পেট। হুল থেকে বেরিয়ে এল এক ফোঁটা বিষ।

আচমকা সাবধানতা খেলে গেল সারা দেহে। ওদের এলাকার একেবারে প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে কোন কিছু।

হুমকি... তবে লোভনীয় এক সম্ভাবনাও।

লেক নিয়ে আর কোন সমস্যা নেই; প্রান্তে থাকা যোদ্ধারা ইচ্ছা হলেও, নড়া-চড়া করে এমন কিছুকে আক্রমণ করছে না। পালের চাহিদার কারণে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে তাদের স্বাভাবিক চাহিদা। ঢুকুক না হয় নানা ধরনের প্রাণী, ওগুলো পালের কাজে আসলেই হলো। তাই সবগুলোকেই কাছে আসতে দেয়া যায়। আঘাত হানলেও খুব একটা জোরালো ভাবে না। ওদের লক্ষ্য থাকে সেই আগন্তুককে পালের ভেতরের দিকে নিয়ে যাওয়ার।

কোঁচকানো অ্যান্টেনা সোজা করল মাদীটা, গন্ধ শুঁকে ও শব্দ শুনে ফাঁদটাকে পরখ করে দেখল। পেটটা ভাঁজ করে আবার খুলল সে। ডিম্বাণুগুলোকে *ঠেলে* দিল

তীক্ষ্ণ ওভিপোজিটরের দিকে। তারপরও অপেক্ষা করে রইল সে, দেয়ালের সাথে লেগে থাকে অন্য মাদীগুলোও। কয়েকটা পাখা ঝাপটালো, নিজেদের ইচ্ছা বোঝাচ্ছে। কয়েকটা পায়ের সাথে পা ঘষল, শব্দে ভরে উঠল আস্তানা।

আচমকা একটা নতুন শব্দ সতর্ক করে দিল মাদীটাকে।

পালের সম্মিলিত আওয়াজে পরিবর্তন এসেছে, ধরতে পারল মাদীটা। পায়ের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে এল। ইন্দ্রিয়ের আদেশে, পেছনের পা দুটো ঘষল সে। যোগ দিল পঙ্গপালের সাথে।

অবশেষে, নতুন দুটো গন্ধ পেল নাকেঃ বিজয়ের ফেরোমোন এবং নিঃশ্বাসের কার্বন।

এটুকুই যথেষ্ট।

বাতাসে ভাসল মাদীটা, ভারি দেহটাকে তুললে কিছুটা বেগই পেতে হলো পাখাগুলোকে। ওর মতোই, অন্যান্য মাদীগুলো হয় উড়াল দিল আর নয়তো পা ঘষতে শুরু করল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পথ 'দেখে' এগোবার জন্য এর চাইতে ভালো আর কোন উপায় নেই।

চোখ অন্ধকার হলেও, মাথার দুই পাশে অবস্থিত ঝিল্লীগুলো শক্ত হয়ে আছে। যেকোন ধরনের কম্পন ধরতে পারছে পরিষ্কারভাবেই। ফেরোমোনের গন্ধ শুঁকে এগোতে থাকল সে। এরিমধ্যে হুলে চলে এসেছে বিষ।

ডিমের কথা পরে ভাবা যাবে।

উড়তে উড়তেই পা ঘষল মাদীটা, সামনের দিকে যেন ছুঁড়ে দিল শব্দ তরঙ্গ। তরঙ্গ ফিরে এলে, অন্ধকারের অবয়বটা যেন বুঝতে পারল কিছুটা।

অদ্ভুত এক কম্পন, এমন একটা কিছুর, যাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।
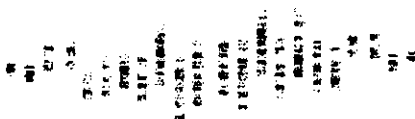
গতি বেড়ে গেল মাদীটার, ওটার কাছে ওকেই প্রথমে যেতে হবে। আস্তে আস্তে আলো আসতে শুরু করেছে, তবে সেটা অস্বীকার করে অবয়বটার দিকে মন দিল। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে উঠছে ওটা। ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে স্পন্দন।

মাথা নিচু করে ফেলল সে, অ্যান্টেনা সোজা হয়ে আছে। সোজা ওটার দিকেই ছুটতে শুরু করল ও। আচমকা সামনে এসে উপস্থিত হলো নড়তে থাকা একটা অবয়ব। সেদিকে ছুটে গেল মাদীটার মন।

পঙ্গপালের তৈরি করা কম্পন এখন মাংসপেশিকেও ভেদ করে যাচ্ছে। হাড়ের খাঁচা ভেদ করে ওগুলোকে দেখতে পাচ্ছে যেন মাদীটা। লক্ষ্যের নিঃশ্বাসের সাথে নির্গত হওয়া কার্বন গ্যাসকে অনুসরণ করে সেদিকে এগিয়ে ও।

নরম চামড়ায় উড়ে গিয়ে বসল সে। একদা আরও বড় বড় শিকারের পেছনে ছুটত ও; ওগুলোর চামড়া ছিল প্রচণ্ড শক্ত, মাংসপেশির কম্পন যেন ছিল ড্রামের আঘাত। নরম চামড়ায় খুব সহজেই বসিয়ে দিল হুল, ওর পেটের নিচের মাংসগুলো সংকুচিত হলো সাথে সাথে, বিষ প্রবেশ করল শিকারের দেহে। তবে প্রাণীটা কোন প্রতিক্রিয়ায় দেখাল না। আসলে মাদীটার বিষের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করা, ব্যথা দেবার জন্য না।

বিষ প্রয়োগ শেষ হলে, সরে গেল সে। তবে রইল কাছেই, লক্ষ্যের আশপাশে। শিকারের উপর ফেরোমোনের জাল বিছিয়ে দিল, নিজের বলে দাবী করল শিকারকে। পেট ভর্তি ডিম নিয়ে উজ্জ্বল আলোয় বেরিয়ে এল অন্যরা, পোষকের খোঁজে।

একই জায়গায় উড়তে থাকল সে, নড়ছে অ্যান্টেনা।

দুই পায়ের ঘর্ষণ থামাল না মাদীটা, শিকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। নিশ্চিত করতে চাইছে যে অন্য কেউ আগেই তার দেহে ডিম্বাণু ঢুকিয়ে দেয়নি। হাজারো নিষিক্ত ডিম্বাণু পেটে নিয়ে উড়ছে ওটা। প্রতিটা ডিম্বাণুতে শুয়ে আছে আরও অনেক লার্ভা। ওদের ক্ষুধা, আসলে মাদীটার নিজেরই ক্ষুধা। বিশাল পরিমাণে রক্ত, মাংস এবং হাড়ের দরকার হবে এদের। সেটা নিশ্চিত করার জন্যই অপেক্ষা করছে।

ওর বিষের সাধারণ লক্ষ্য ছিল আকারে অনেক বড় বড় শিকার। তাই বেশিক্ষণ লাগল না। বুঝতে পারছে, আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে উঠছে শিকার।

সময় হয়েছে।

আবারও নি:শ্বাসের সাথে বেরোতে থাকা কার্বন গ্যাস ভেতর দিয়ে নরম চামড়ায় গিয়ে বসল মাদীটা। পেটটাকে বাঁকাল ও; প্রতিবার হুল ফোটাবার সাথে সাথে, অসংখ্য উত্তরসূরি প্রবেশ করাবে শিকারের দেহে।

বিষের প্রভাবে শান্ত হয়ে থাকবে বেচারা, তাই কোন অসুবিধাই হবে না।

খাবারের কোন কমতি নেই।

অধ্যায় পনেরো

৭ মে, দুপুর ১:৪৯
হানা, মাউই দ্বীপ

এটাই যে আসল জায়গা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিনিট পাঁচেক আগে, বট গাছের পাশে জিপ পার্ক করেছে গ্রে। পাহাড়ের ঢাল থেকে, বনের ফাঁক গলে ভেসে আসছে চিৎকার। বিপদের আশঙ্কায় দলকে পেছনে রেখে শেইচানকে সাথে নিয়ে বাইকে এগিয়ে এসেছে ও। ইয়ামাহা অফ-রোডারটার হ্যান্ডেলবারের উপর ঝুঁকে আছে গ্রে। বাইকের নড়বড়ে টায়ার আর সাপ্রেসনকে এক মুহূর্তের জন্য রেহাই না দিয়ে উঠছে একটা সরু পথ ধরে।

ওর কোমর জড়িয়ে ধরে আছে শেইচান। অন্য হাত দিয়ে রক্ষা করছে কাঁধের উপর ঝুলে থাকা বিশাল থলেটার ভারসাম্য। ভেতরে রয়েছে ফায়ার ব্লাঙ্কেট এবং মেড-কিট। এপিনেফ্রিন ভর্তি পেনও আছে ওতে। ক্যাম্পারদের কাছে সময়মতো পৌঁছানো খুব জরুরী। তবে সমস্যা হলো, সরু রাস্তাটা খুঁজে পাবার আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই চিৎকার।

একেবারে আচমকা।

দাঁতে দাঁত চেপে গতি বাড়াল সে বাইকটার, দক্ষতার সাথে চলতে শুরু করল রাস্তাটায়। ইঞ্জিনটা বারবার বিচার জানাচ্ছে, কাদা ছিটাতে ছিটাতে সামনে এগোচ্ছে।

সামনের রাস্তাটা আবার পরখ করে দেখল সে।

পুরাতন এই লাভা টিউবগুলোর ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে পালু।

পথ ধরে এগোও। বনের গাছের জায়গায় যখন বাঁশ দেখতে পাবে, তখন বুঝছে এসে পড়েছ।

তবে হাওয়াইয়ান আরেকটা ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছে ওদেরকে। সামনের রাস্তা বড় উল্টা-পাল্টা। খানা-খন্দ প্রচুর, সেই সাথে অসংখ্য টানেল। গোপন ফাটলের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। গুহায় প্রবেশের প্রধান রাস্তা-যেটাকে পালু ডাকে পুকা বলে-একটা ছোট পুকুরের কাছে অবস্থিত।

দলটা ওখানেই দেখা করবে।

পেছন পেছন অনুসরণ করে আসছে পালু এবং কোয়ালস্কি। দুইজনের হাতেই একটা করে প্রোপেন ভর্তি ট্যাঙ্ক। সাথে স্পার্ক ইগনাইটার এবং টাইমারও আছে।

তবে কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন প্রফেসর মাতসুই। ট্যাঙ্কগুলোকে ফেলে দেয়া হবে টানেলের ভেতরে, স্কাইলাইট দিয়ে। যদি আসলেই পতঙ্গপাল ওখানে বাসা বেঁধে থাকে, তাহলে দুটো লাভ হবে দলটার। পালটার ভয়াবহ ক্ষতি তো হবেই, সেই সাথে কোন পতঙ্গ বেঁচে থাকলেও পালিয়ে যাবে। কিনের আশা, এতে করে লেক বানাতে দেরি হবে ওদের।

আপাতত পরিকল্পনাটায় কোন খুঁত দেখা যাচ্ছে না। অন্তত কিছুটা হলেও সময় মিলবে।

যদি না এরিমাঝে অনেক বেশি দেরি না হয়ে যায়...

সত্যিটা বোঝার উপায় একটাই। প্রায় যুদ্ধ করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠল গ্রে। আরেক মিনিট পর দেখা গেল, অলৌকিকভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে বন! লতাগাছ নেই, নেই শক্ত কাঠের কোন গাছ। আছে তো কেবল বাঁশ! চোখ জুড়ানো সবুজ বাঁশ! কুয়াশা ভারি পর্দার মতো ঝুলে আছে সামনে।

আঁতকে উঠল গ্রে।

মন অন্য দিকে ছিল বলে, ডান দিকের বন থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসা অবয়বটা নজরে পড়ল না ওর। রাস্তায় উপরেই আছড়ে পড়ল লোকটা, কাঁধের সাথে ধাক্কা খেল বাঁশ। অনেকটা বাধ্য হয়েই জোরাল ব্রেক করল গ্রে।

লোকটাকে যেন ধাক্কা না দিতে হয়, সেজন্য বাইকটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিল ও, আছড়ে পড়ল পুরু লতার উপর। আচমকা বন্ধ হয়ে পিঠ থেকে আরোহীদের ছুঁড়ে দিল সাইকেলটা। গড়ান খেল গ্রে, দেহে চড়িয়েছে মৌমাছি পালকদের পোশাক। প্রফেসরে কথামতো এখানে আসার আগেই ও এবং শেইচান এই পোশাক পরেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল গ্রে, হুড ঠিক করল। এদিকে শেইচান ঝোপের ভেতর থেকে বের করে আনল তার থলে। একসাথে দৌড়ে গেল তারা লোকটার দিকে।

প্রথমে পৌঁছল গ্রে, হাঁটু গেঁড়ে বসল লোকটার পাশে। রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটার বয়স মধ্য-পঞ্চাশের ঘরে। মাথার চুল কম, নাকের নিচে গোঁফ। সম্ভবত এ-ই এমেট লয়েড। একপাশে কাত হয়ে আছে লোকটার মাথা, দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে গ্যাঁজলা। গালে থাপ্পড় বসাল গ্রে। 'মি. লয়েড, অন্যরা কোথায়?'

মনে হলো, ওর কথা শুনতে পেয়েছে এমেট। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও মনোযোগ স্থির করতে পারছে না। চোখের মণি বড় বড় হয়ে আছে।

হয়তো লোকটা নেশার ঘোরে আছে... আর নয়তো মাথায় আঘাত পেয়েছে।

গ্রের পাশে এসে দাঁড়াল শেইচান। মেডি-কিটটা খুলে ভেতর থেকে এরইমাঝে বের করে এনেছে একটা এপিপেন। এমেটের গলায় ঢুকিয়ে দিল সে সুঁই, ঢুকিয়ে দিল এপিনেফ্রিন।

এই বোলতাদের বিষে পাওয়া টক্সিন নিয়ে গবেষণা করেছনে প্রফেসর মাতসুই। এটাই তার বিশেষত্ব। আগেই বলেছিলেন তিনি, এই প্রজাতির মাদীদের বিষে বিশেষ ধরনের টক্সিন আছে।

প্রচণ্ড শক্তিশালী নিউরোটক্সিন।

এপিনেফ্রিন কোন রোগেরই ওষুধ নয়, তবে লোকটার অবস্থার অনেক উন্নতি হলো।

'মি. লয়েড,' আবারও বলল গ্রে।

চোখের তারায় ফিরে এল কিছুটা মনঃসংযোগ। কিন্তু পুরোপুরি না।

'গ্রে,' সাবধান করে দিল শেইচান।

মেয়েটার কণ্ঠ কানে বাজল গ্রে। ও ঘুরে দাঁড়াতেই, কুয়াশাচ্ছন্ন বনের দিকে ইঙ্গিত করল শেইচান। ঘন কুয়াশার চাদর ভেদ করে দেখা যাচ্ছে কালো ধোঁয়া। তা-ও আবার একটা না, কয়েক ডজন! মাটিতে কার্পেটের মতো শুয়ে থাকা ফার্ন থেকে আসছে ধোঁয়া! সেই সাথে গুঞ্জনের আওয়াজ।

পালটা আসছে!

ভূ-গর্ভস্থ আস্তানা ছেড়ে বাইরে বেরোচ্ছে বোলতাগুলো, সম্ভবত বাইকের ইঞ্জিনের শব্দেই ধ্যান ভেঙেছে ওদের। ডান দিকে তাকাল গ্রে। ছায়া উঠে আসছে ওদিক থেকেও।

সময় শেষ...

এমেটের দিকে তাকিয়ে গালে চাপট বসাল একবার। কাজ হলো না দেখে আরও দুই বার। অবশেষে বিরক্তিতে বেঁকে উঠল লোকটার ঠোঁট।

'বাকিরা কোথায়?' জানতে চাইল গ্রে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত পর, কম্পিত হাত তুলে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত দিল লোকটা। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'উপরে...'

'কয়জন?'

উত্তর দিতে যেন শরীরের সব শক্তি খরচ করতে হচ্ছে লোকটা। 'দুই... স্বামী-স্ত্রী...'

'আমাদের এত সময় নেই যে ওই দু'জনের খোঁজে যাব।' নিষ্কম্প কণ্ঠে জানিয়ে দিল শেইচান। ভুল কিছু বলেনি, তাই বলে তো আর ওদের ফেলে যাওয়া যায় না!

আচমকা পেছন থেকে ভেসে এলো কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ। দুই হাতে দুটো প্রোপেন ট্যাঙ্ক নিয়ে দৌড়ে আসছে পালু। এমনভাবে আনছে, যেন বালিশ ধরে রেখেছে। তামাটে চামড়ায় ঘামের কয়েকটা ফোঁটা ছাড়া পরিশ্রমের আর কোন নিদর্শন নেই।

পরিস্থিতি বাজে হওয়া সত্ত্বেও, মুখ ভরে আছে হাসিতে। 'পেয়েছি তোমাদের।'

পেছন পেছন হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে কোয়ালস্কি। বেচারার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে উল্টে পড়বে। কোন রকমে কাঁধ থেকে ট্যাঙ্ক দুটো নামাল ও। তারপর শুরু করল গাল বকা।

চারপাশের ফাটল এবং গর্ত থেকে বেরোতে থাকা পতঙ্গ-পাল হাত দিয়ে দেখাল গ্রে। 'কাজে লেগে পড়ো। টাইমারে পাঁচ মিনিট রাখবে। আর একটাকেও বেরোতে দেয়া যাবে না।'

ওদের পরিকল্পনার একটা বড় লক্ষ্য হলো, অধিকাংশ পতঙ্গকে মাটির নিচে রেখেই বিস্ফোরণ করানো। প্রফেসরের মতে, প্রোপেনের মিষ্টি গন্ধে বোলতাদের মাথা ঠিক থাকে না। এমনিতে গ্যাসটা গন্ধহীন হলেও, প্রস্তুতকারীরা সাধারণত গন্ধ মিশিয়ে দেয়... যেন বাড়ি মালিকরা গ্যাস-লিক হলে তা টের পেতে পারে।

পরিকল্পনা ছিল, ট্যাঙ্ক খুলে সবগুলোকে টানেলের গোলকধাঁধায় ফেলে দিতে হবে। ভারী গ্যাসটা ছড়িয়ে পড়লে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে ওতে। দ্রুত ট্যাঙ্ক ফেলতে পারলে, পোকাগুলো আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

গুঙিয়ে উঠে, ট্যাঙ্কটা তুলে ধরল কোয়ালস্কি। 'চলো তাহলে, শুরু করা যাক।'

ইতস্তত করল পালু। 'ক্যাম্পারদের কী হবে? কোথায় ওরা?'

রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'ওখানে। স্বামী আর স্ত্রী।'

'আমি এই রাস্তা চিনি।' পালু কোয়ালস্কির দিকে তাকিয়ে নড করল। 'এগুলো টানেলে ফেলে, আমরা ওদের খুঁজতে যাব।'

'পাঁচ মিনিট,' একটু পর কী হবে তা মানসচোখে দেখতে পেল গ্রে। 'ওদেরকে পাও আর না পাও, টাইমারের কথা মাথায় রেখো।'

বিশালদেহী দুজনকে এগিয়ে দিয়ে, এমেটকে জড়িয়ে ধরল গ্রে। দেখল, কোয়ালস্কি এগিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার মতো কালো এক স্তম্ভের দিকে। ফাটলের কাছে পৌঁছে, ছুঁড়ে দিল ট্যাঙ্কটা।

পালুও অনুসরণ করছে ওকে। কাজ সেরে দুজনে মিলেই এগিয়ে গেল সামনে। নতুন জায়গার খোঁজে ব্যস্ত।

নিজের বোঝার দিকে মন দিয়ে, রাস্তা ধরে এগোল গ্রে। শেইচানের নজর বাইকের দিকে। কিন্তু সিগমা কমান্ডার তিন ধাপ এগোবার আগেই কেঁপে উঠল এমেট। 'থামো...'

থমকে দাঁড়াল গ্রে। 'কী?'

'আরেকজন... একটা বাচ্চা... বেঞ্জি...' যেখান থেকে টলতে টলতে বের হয়েছে, সেইদিকটা দেখাল এমেট। 'ওখানে পড়ে গিয়েছে।'

কথাটা শোনা মাত্র দীর্ঘ শ্বাস ফেলল শেইচান। 'আমি যাচ্ছি।' প্রেমিকার কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল গ্রে, কিন্তু মেয়েটার তিরস্কার মাখানো দৃষ্টির সামনে পাত্তা পেল না।

'যাও!' হাতঘড়ি দেখিয়ে বলল শেইচান। 'পাঁচ মিনিট, আমার মনে আছে।'

নিজের ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে রওনা দিল গ্রে।

পাঁচ মিনিট... যা কমছে আস্তে আস্তে।

দুপুর ২:০৭

ঘন ঝোপ ধরে এগোচ্ছে শেইচান। মনে হচ্ছে যেন কাদা ঠেলে এগোতে হচ্ছে। লতার দাপটে পা রাখা দায়! সেই সাথে আছে কাঁটা।

তবে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা করছে পরনের ভারি পোশাক, বোলতার কারণে খুলতেও পারছে না। মুখের সামনে আসাগুলোকে তাড়াচ্ছে হাত নেড়ে, হাতে বা বুকের বড় গুলোকে পিষে ফেলছে। পোশাকের উপর ভরসা আছে ওর, তবে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত। প্রফেসরের কথা মনে আছে ওর-এই বোলতাগুলো প্রাগৈতিহাসিক কালে, এই পোশাকের চাইতেও মোটা ত্বক ভেদ করে টিকে ছিল।

বাড়তি সাবধানতার জন্য চারপাশে একবার নজর বুলানোই যথেষ্ট। মাটিতে পড়ে আছে ছোট ছোট পাখি। ওগুলোর পাখা নড়ছে এখনও। ডান দিকে, অদূরেই, বেরিয়ে আছে অ্যান্টলার। ওখানে নিশ্চয়ই পড়ে আছে একটা হরিণ! যেটাকে প্রথমে কালো আগাছা জন্মানো পাথর মনে করেছিল, ওটা আসলে পড়ে থাকা একটা জংলী শুয়োর! এতক্ষণে হলদে দাঁতগুলো নজরে পড়েছে।

বোলতাগুলো ব্যস্তই ছিল দেখা যাচ্ছে।

বিপদকে সম্মান জানায় শেইচান, ছোট করে দেখে না। ব্যাকপ্যাকের পকেট থেকে একটা ম্যাগলাইট বের করে মোচড়াল ও। তাড়াতাড়ি এগোতে চাইছে।

পিচ্চিটা গেল কোথায়?

ঘড়ির দিকে তাকাল একবার।

আর তিন মিনিট আছে।

ট্যাঙ্কগুলো যখন বিস্ফোরিত হবে, তখন এখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই শেইচানের। কিন্তু বিভ্রান্ত এক বাচ্চার চেহারা মনে পড়ে যাচ্ছে যে বারবার। তবে

এজন্য বাচ্চাটার বাবা-মাকেই দোষ দেবে ও। যদিও জানে, এমন কিছু হবে তা কল্পনাতেও ছিল না তাদের।

তারপরও...

পরবর্তী ফাটলের দিকে এগিয়ে গেল শেইচান, চারপাশে গুঞ্জন-রত বোলতাকে পাত্তাই দিল না। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে, ফাটলের ভেতরে দেখে নিল একটা। বেশ বড় আকারের ফাটল ওটা। মেঝে না হলেও বারো ফুট নিচে হবে।

আরও বোলতা দেখা যাচ্ছে ওখানে, প্রতিটা তল ঢেকে আছে পতঙ্গে।

ঘুরে দাঁড়াল ও, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে মাটিতে একটা ছোট্ট ছাপ দেখতে পেল। সম্ভবত কোন স্নিকারের। গাল বকে আবার টানেলের দিকে মন দিল শেইচান। এখান থেকে কেবল বরাবর নিচের দৃশ্য দেখা যায়। ভীত ছেলেটা নিশ্চয়ই আরও ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে। মাত্র কয়েক গজ এগোলেই আর দেখতে পাওয়া সম্ভব না ওকে।

নিশ্চিত হবার মাত্র একটাই উপায় আছে এখন।

চাইলেই লাফিয়ে নামতে পারে নিচে। কিন্তু উপরে ওঠার জন্য একটা রাস্তা তো বানাতে হবে। ব্যাকপ্যাকে রশি আছে, তবে খুলে কুণ্ডলি ছাড়াতে অনেক সময় লেগে যাবে।

তাই ওটা না করে কোমরে হাত দিল সে। গত রাতে, কুটিরে অস্ত্রহীন অবস্থায় ধরে পড়েছিল শত্রুর হাতে। এবার তাই প্রস্তুত হয়েই এসেছে। স্যুটের নিচে আছে ছোরা। বেল্ট থেকে খুলে নিল একটা বড়-সড় চাইনিজ রামদা।

কোমর-সমান মোটা একটা বাঁশ কাটল শেইচান, ধারালো রামদা বলে একবারের বেশি আঘাত হানতে হলো না। কাটা বাঁশটাকে কাঁধের উপর নিয়ে, এক প্রান্ত নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

দুই মিনিট।

বাঁশটা বেয়ে নামতে বেশিক্ষণ লাগল না। একগাদা বোলতার উপর পা রাখল শেইচান। ওর আগমনে আচমকা নড়ে ওঠা বোলতাগুলোর আওয়াজকে পাত্তাই দিল না। দেয়ালে বসে থাকা পতঙ্গগুলোও উড়ে আরও ভেতরে চলে গেল।

হাতের আলোক-উৎসটা টানেলের দিকে তাক করল ও। প্রথমে একদিকে, তারপর অন্যদিকে। সাদা চামড়া আর একটা ছোট লাল স্নিকার পড়ল নজরে।

বেঞ্জি।

রবারের গ্লাভস পরিহিত হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটার গোড়ালি আঁকড়ে ধরল ও, টেনে নিয়ে এল নিজের দিকে। ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা, তা দেখার সময় নেই হাতে। কাঁধে তুলে নিল ছোট দেহটাকে।

এক মুহূর্তের জন্য ঝুঁকেই আবার লাফ দিল শেইচান। বাঁশটা পাকড়াও করতে কোন কষ্টই হলো না। জুতা পরা পা ব্যবহার করে ধাক্কা দিয়ে নিজেকে উপরে তুলল তারপর। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলত, কিন্তু সদ্য কাটা প্রান্তটা খসে এল... অন্য প্রান্ত নাচতে শুরু করল ভেজা মেঝের উপর।

দেয়ালের সাথে শক্তভাবে আঘাত খেল শেইচান। তবে হাত থেকে বাঁশ ছাড়ল না মেয়েটা। কপাল ভালো, কিছুক্ষণ লাফিয়ে আবার জায়গা মতো ফিরে এল বাঁশটা। নিশ্চিত হবার জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও। মাথার ভেতর চলছে ঘড়ি।

আর মাত্র এক মিনিট।

আবার উঠতে শুরু করল শেইচান।

মুক্তি মাত্র ফুট চারেক দূরে।

তারপরই ওর দেহের পাশটা যেন ফেটে পড়ল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে!

অবাক হয়ে নিচে নেমে এল শেইচান। বুট মেঝেতে বাড়ি গেল আবার; অজ্ঞান বাচ্চাটাকে সামলে, ব্যথার উৎসের দিকে তাকাল মেয়েটা। স্যুটের ত্রিকোণাকার একটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে।

আগেরবারই ছিঁড়েছে সম্ভবত।

একটা বোলতা, সম্ভবত যোদ্ধাদের একজন, ছেঁড়া জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এল... কাজ শেষ।

প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে পানি চলে এল বেচারির।

উপরের দিকে তাকাল একবার।

এত দূরে...

এখন পালাতে হলে, ছেলেটাকে এখানে ফেলেই পালাতে হবে। কিন্তু গলায় থেকে থেকে আঘাত করছে বাচ্চাটার হৃৎস্পন্দন। যেন অনুরোধ করছে-ওকে ফেলে না যাওয়া হয়।

ক্ষমা করো আমায়...

দুপুর ২:১১

বটগাছটার পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে হালেয়াকালার দিকে তাকিয়ে আছে গ্রে। ঘড়ি দেখার কোন দরকার হচ্ছে না ওর। প্রতিটা মুহূর্ত যেন জানান দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। এদিকে একপাশে প্রায় অজ্ঞান এমেটের পাশে হাঁটু গেঁড়ে আছেন কিন। গাছের গোড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে লোকটা। তার গলায় আঙুল ঠেকালেন প্রফেসর, পালস দেখছেন।

সামনের বন থেকে ভেসে এল একটা আওয়াজ।

আচমকা দুটো বিশাল অবয়ব দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রে।

কোয়ালস্কি এবং পালু।

দুইজনেরই ঘাড়ে একটা করে দেহ।

'খুঁজে পেয়েছি,' আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে বলল কোয়ালস্কি, ষাঁড়ের মতো হাঁপাচ্ছে।

হাত দিয়ে ডাকলেন প্রফেসর। 'ওদেরকে এদিকে নিয়ে এসো!'

হয় কোয়ালস্কি পাত্তা দিল না, আর নয়তো শক্তি একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে বেচারার। দম্পতির একজন, স্ত্রীকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল ও, তারপর বসে পড়ল। 'তারচেয়ে না হয় আপনিই এদিকে আসুন।'

মহিলার পাশে নিজের বোঝা নামিয়ে রাখল পালু।

ওদের দিকে এগিয়ে গেল গ্রে, কিন্তু নজর এখনও বনের দিকে। 'শেইচান কোথায়?'

'মানে কী?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কোয়ালস্কি।

গ্রের মনে পরে গেল, শেইচান উধাও হবার আগেই কাজে নেমে পড়েছিল কোয়ালস্কি। পালু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। 'আমরা যখন আসি, তখন কাউকে দেখিনি। কিন্তু আমরা তো উইকি-উইকি... মানে খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম।'

বনের দিকে এক পা এগোল গ্রে।

তাহলে কোন চুলোয় গেল-

ভাবনাটা নাকচ করে দিল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজ।

দুপুর ২:১২

ভেজা ফার্নের উপরে গড়ান খেল শেইচান, ইচ্ছা করেই ভিজিয়ে নিল নিজেকে। অচিরেই যে প্রচণ্ড উত্তাপকে সামাল দিতে হবে! ওর মাত্র দুই গজ পেছনে, নীলচে-কমলা আগুন আসমান ছুঁতে যেন লাফিয়ে উঠল।

মাথা নিচু করে রইল সে, চারপাশে চলতে থাকা গোলমাল দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছে। আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠছে বার বার। স্কাইলাইট এবং ফিসার গলে বেরোচ্ছে গোলাগুলো।

বুকে হেঁটে এগোতে লাগল শেইচান, চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে। পায়ের নিচে এখনও কাঁপছে মাটি। ঢাল গড়ে উঠেছে লাভা দিয়ে। টানেল এবং গুহা মিলে তাই তৈরি হয়েছে যেন মৌমাছির চাক, বিস্ফোরণের ধাক্কায় আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছে।

পালাচ্ছে শেইচান, এদিকে ওর পেছনে তৈরি হচ্ছে নিত্য-নতুন ফাটল। ধোঁয়া বেরোচ্ছে পুরোদমে, সাথে সাথে আগুনের শিখাও। ধ্বসে পড়ছে গাছ, বাঁশ নড়ছে

বাতাসে। অনেক কষ্টে ট্রেইলে ফিরে এল সে। পথে কোথাও হারিয়ে ফেলেছে মাথার হুড। তবে ধোঁয়া এবং উত্তাপ সরিয়ে রাখছে পতঙ্গ-পালকে। অবশেষে পথের উপর এসে পৌঁছল ও, নিজের দেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছে বাচ্চাটাকে।

কখনও ভাবেইনি যে বেঞ্জিকে ফেলে যাবে।

এখন তো আরও না।

একটু আগে, আপন মনেই বলে উঠেছিল শেইচান-আমি দুঃখিত। তবে সেই দুঃখ প্রকাশটা ছিল গ্রেকে উদ্দেশ করে। সবকিছু ঝুঁকি নেবার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা। ওদের জীবন, ওদের সবকিছু কেবল এই এক বাচ্চার জন্য ঝুঁকিতে তোলা...

তবে জানে, আরও অনেককিছু দাঁওতে রেখেছে সে। সেজন্যই কেন যেন অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। ওর কোন অধিকারই নেই-

আবারও কেঁপে উঠল পৃথিবী, মনে করিয়ে দিল যে এখনও বিপদ কাটেনি।

বাচ্চাটাকে শক্ত করে ধরে নিজের সাথে টেনে নিয়ে চলল সে, সামনে দেখতে পেল-কোন একটা ধাতু ঝলসে উঠেছে। সেই সাথে আছে রবারের একটা কালো টায়ার।

ওর মোটর বাইক।

বেঞ্জিকে মাটিতে রেখে, বাইকটাকে টেনে নিল শেইচান। ওটাকে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে রেখে, ফিরে এল বাচ্চাটার কাছে। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল, বাইকে বসে আছে ও... কোলে রেখেছে বাচ্চাটাকে। হ্যান্ডেলবারের দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা।

আরেকটু, বেঞ্জি... আরেকটু...

ইঞ্জিন চালু করতে তিনবার চেষ্টা করতে হলো ওকে। অবশেষে যখন সিলিন্ডারগুলো মেয়েটার ডাকে সাড়া দিল, মনে হলো যেন কেঁদে ফেলবে। কিন্তু চাকা ঘোরার আগেই, ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল পাহাড়। আরেকটু হলেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। ডান দিকে তাকাল একবার, দেখতে পেল-বিশালাকার একটা সিঙ্কহোল তৈরি হয়েছে ওখানে।

ওর চোখের সামনেই বড় হতে থাকল ফাটলটা, ওর দিকেই ছুটে আসছে। বাচ্চাটার দিকে ঝুঁজে এল শেইচান, গতি বাড়িয়ে দিল।

সিঙ্কহোলকে পেছনে ফেলল বেচারি। চারপাশের দুনিয়াকে একই সাথে ঘোলাটে আর খুব উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার, তাতে তো লাভ হলোই না, উল্টো আরও কেঁপে উঠল ওর দৃষ্টি। রঙের নাচন লেগেছে যেন চারদিকে। বুঝতে পারছে না, উপরের দিকে যাচ্ছে না নিচের দিকে।

আসলে নড়ছে কিনা, সেটাও নিশ্চিত না।

অর্থ হারিয়ে ফেলল দুনিয়া, কিন্তু বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরল ও।

আমি দুঃখিত...

বাচ্চাটাকে বাঁচাতে ব্যর্থ হচ্ছে ও।

দুপুর ২:২৪

বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবারও আগে, পাহাড়ের ঢাল ধরে উঠতে শুরু করেছে গ্রে। পালু আর কোয়ালস্কিও আছে সাথে। ওর উঠছে পাহাড় বেয়ে, আর উপর থেকে ধেয়ে আসছে ধোঁয়া। এমন প্রচণ্ডভাবে যে দেখাই যাচ্ছে না কিছু। এখনও কাঁপছে মাটি। মনে হচ্ছে যেন পাহাড়টা নিজেকেই কয়েক টুকরা করে ফেলবে!

ভয়ে যেন গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড।

আচমকা সামনে থাকে কিছু একটার গুঞ্জন ভেসে এল।

থমকে দাঁড়াল গ্রে।

আচমকা একটা মোটরসাইকেল দেখতে পেল ও, এদিকে ছুটে আসছে। প্রথম প্রথম গ্রে-র মনে হচ্ছিল-শেইচান বুঝি ওর সচরাচর ভঙ্গিমায় হ্যান্ডেলবারের উপর ঝুঁকে আছে! পরক্ষণেই দেখতে পেল বেঞ্জির ক্ষুদ্র দেহটাকে। একহাতে হ্যান্ডেল ধরে আছে মেয়েটা, অন্য হাতে বাচ্চাটাকে।

প্রায় অজ্ঞান দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, অদম্য ইচ্ছাই কেবল খাড়া রেখেছে শেইচানকে। দূরত্ব কমে এলেও, ওদেরকে চিনতে পারল না মেয়েটা। এমনকি কোয়ালস্কি হাত নেড়ে ওকে ডাকার পরেও না। একবিন্দু গতি কমল না বাইকটার, বরঞ্চ উৎরাই বলে প্রতিক্ষণে বেড়ে চলছে গতি।

শেইচানের সৌভাগ্য এবং তার জ্ঞান, দুটোই সম্ভবত আর বেশিক্ষণ টিকবে না। তার চেয়ে খারাপ কথা-গ্রে এবং অন্যরা খাড়া শৈলশিরা বেয়ে উপরে উঠে এসেছে। সরাসরি এখন সেদিকেই এগোচ্ছে সাবেক আততায়ী।

'সরে যাও!' চিৎকার করল গ্রে।

দুই পাশে লাফ দিল পালু এবং কোয়ালস্কি।

গ্রে-ও সরে দাঁড়াল, তবে রইল কাছেই। পা ভাঁজ করল ও, শক্ত করে তুলল মাংসপেশিগুলোকে। একটা মাত্র সুযোগ মিলবে ওর।

বাইকটা ওর কাছে আসা মাত্র, লাফ দিল গ্রে। শেইচানের দেহটার সাথে মিলিত হলো ওর দেহ, এক হাতে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা এবং বেঞ্জিকে। এক ধাক্কায় উল্টে পড়ল সবাই। মোটরসাইকেলটা ছুটে গেল সামনে, লাফ দিল রাস্তাটার শেষে এসে।

শেইচান এবং বাচ্চাটার শরীর পরীক্ষা করে দেখল গ্রে। কাউকেই খুব একটা আহত বলে মনে হলো না, তবে জ্ঞান নেই কারও। পালুকে সাথে নিয়ে যোগ দিল

কোয়ালস্কিও। দুশ্চিন্তা ভর করেছে ওদের চেহারায়। পাহাড়ের নিচের দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে, 'এদের জিপে নিয়ে যেতে সাহায্য করো।'

বাচ্চাটাকে তুলে নিল পালু, কোয়ালস্কি এবং গ্রে দুইজনে মিলে বয়ে নিচ্ছে শেইচানকে। কয়েক মিনিট পর, বট গাছের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। কিন দৌড়ে এলেন ওদের দিকে। 'ধন্যবাদ ঈশ্বর, ওরা সুস্থ আছে।'

আসলেই কি আছে?

শেইচানকে শুইয়ে দিল গ্রে। 'প্রফেসর, এদের সমস্যা কী?'

অজ্ঞান রোগীদের দিকে এগোলেন কিন, তারপর আবার শেইচানের দিকে। 'মাদী পতঙ্গের নিউরোটক্সিনের প্রভাব। সময় লাগবে, তবে সমস্যা হবে না।'

গ্রে বুঝতে পারল, কিছু একটা লুকাচ্ছেন প্রফেসর। 'আর?'

'আপনারা যখন ছিলেন না, তখন আমি... আমি মি. লয়েডের দেহ একটা ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস দিয়ে খুঁজে দেখেছি। হুলের অসংখ্য দাগ দেখতে পেয়েছি ওর চামড়ায়। তবে যোদ্ধারা হুল ফোটালে যেমন লালচে দাগ পড়ে, তেমন কোন দাগ পাইনি।'

বুঝতে পারল গ্রে, প্রফেসরের ব্যাখ্যা মনে আছে ওর-উপযুক্ত পোষক পেলে নিষিক্ত সব ডিম তার দেহে ঢুকিয়ে দেয় গর্ভবতী মদ্দা। 'আপনার ধারণা, লোকটার দেহে ডিম্বাণু প্রবেশ করেছে?'

'হয়তো অন্যদের দেহেও করেছে।'

শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে।

কিন নিশ্চয়ই ওর চিন্তা পড়তে পেরেছেন। 'গর্ভবতী মাদী কেবল মাত্র তখনই ডিম পোষকদেহে প্রবেশ করায় যখন তারা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে।'

আশা আছে তাহলে।

শেইচানের পাশে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসল গ্রে-আচমকা বিশাল একটা বোলতা ওর স্যুটের ছেড়া অংশটা থেকে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ স্যুটের উপরেই বসে রইল ওটা, ডানা ঝাপটাচ্ছে।

প্রফেসরের দেখানো ছবিতে একে দেখেছে গ্রে। গর্ভবতী মাদী!

লাথি দিয়ে পোকাটাকে এক পাশে সরিয়ে দিল কোয়ালস্কি, তারপর থেঁতলে ফেলল পায়ের নিচে।

কিনের দিকে তাকাল গ্রে। অনুচ্চারিত প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলো না তাকে।

এখন আর কোন আশা নেই।

অধ্যায় ষোলো

৭ মে, দুপুর ৩:৩৮
হানা, মাউই দ্বীপ

নিরাপদে কুটিরে ফিরে এসে, পোর্চে দাঁড়িয়ে রইলেন কিন। হাত দুটো চিন্তায় বুকের উপর বেঁধে রেখেছেন। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ, সন্ধ্যার দিকে শুরু হতে পারে। সেই সাথে এসে মিশেছে বাগানের সুবাস। সবুজ এই দৃশ্যটা পেছনেই হালেয়াকালার সাথে একবারেই বৈ-সাদৃশ্যপূর্ণ!

বেশ কিছুক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভূ-কম্প। ভেজা বনের প্রভাবে নিভে গিয়েছে আগুন। তবে তিনি জানেন, আসল হুমকি রয়েই গিয়েছে দ্বীপে। বিপদের মাত্রা জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তার আগে অন্য কিছু ব্যাপার সামলাতে হবে।

নুড়ি বিছানো পথ ধরে হাইওয়ের দিকে এগোচ্ছে একটা অ্যাম্বুলেন্স। সিমন্স পরিবার এবং এমেট নামের লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে ওটা। পালুর কাজ, রেডিওতে ও-ই প্যারামেডিকদের এখানে দেখা করতে আসতে বলেছে। জিপটা কুটিরে যখন পৌঁছে, তখন নিউরোটক্সিনের প্রভাব আর নেই বললেই চলে। তারপরও, আহতদের চিকিৎসা দরকার। স্থানীয় মেডিকেল সেন্টারে ওদেরকে আলাদা করে রাখার ব্যাপারে চিফের সাথে কথা বলেছে পালু। ওদের অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হবে।

হাত শক্ত করে, বাচ্চাটার চেহারা মনে করলেন কিন। পরিবারটা আচ্ছন্ন হলেও, জটলা করে বসে ছিল। ওদের শরীরের আসল অবস্থা বলতে পারেননি তিনি। আপাতত তার দরকারও নেই। তবে জানেন, দরকার হলেও হয়তো বলতে পারতেন না। নিজের কাপুরুষতা তো আছেই, সেই সাথে আছে কিছুটা হলেও অপরাধবোধ।

আগেই যদি সবাইকে সতর্ক করে দিতাম...

ওর পেছনের দরজাটা আচমকা খুলে গেল। মাথা ভেতরে ঢোকাল গ্রে। 'শেইচান জেগেছে। চাইলে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন।'

'চা... চাই।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কিন। তিনি ঢুকতেই, গ্রে মেয়েটার হাতে আলতো করে চাপ দিল। যেন বোঝাতে চাইছে, আমরা সবাই মিলে এই বিপদের মোকাবেলা করব। কাজটা বেশ পছন্দ হলো কিনের। তবে জানেন, এই 'আমাদের' মাঝে মাত্র একজনের অবস্থাই সঙ্গিন।

ডাইনিং টেবিলে বসে রয়েছে শেইচান, ত্বক ছাই-বর্ণ ধারণ করেছে। চোখে ভাসা ভাসা দৃষ্টি। একটা কফির মগ ধরে আছে মেয়েটা। কিন তাকে তার আসল অবস্থাই বলেছেন। অন্যদের সাথে তাকেও অ্যাম্বুলেন্সে চড়তে অনুরোধ করেছিলেন কিন। কিন্তু সাফ মানা করে দিয়েছে শেইচান।

মেয়েটার পাশের চেয়ারে বসল গ্রে, কাছাকাছি থাকতে চাইছে। 'আমাকে যা বলেছিলে তা কিনকেও বলো।'

ধোঁয়া ওঠা কফি মগের দিকে তাকিয়ে রইল শেইচান। 'ছেলেটার খোঁজে গিয়েছিলাম। দেখলাম যে চারপাশে অসংখ্য পশু পড়ে আছে। হরিণ, বুনো শুয়োর, পাখি।'

'জীবিত না মৃত?' প্রশ্ন করলেন প্রফেসর।

'অধিকাংশের কথা বলতে পারব না। তবে কয়েকটা নড়ছিল।'

'খারাপ খবর, তবে প্রত্যাশিত।' তথ্যটা পর্যালোচনা করলেন কিন। 'আগেও বলেছি, ওডোকুরো প্রজাতি পোষক খোঁজার ব্যাপারে বাছ-বিচার করে না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওখানকার অধিকাংশ প্রাণী এরইমাঝে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।'

'এখন আমাদের করণীয়?' জানতে চাইল গ্রে।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন কিন। 'ওখানে দল পাঠাতে হবে। কোন প্রাণীদেহ নজরে আসা মাত্রই জ্বালিয়ে ফেলতে হবে, যদিও তাতে কাজ হবে বলে মনে হয় না। আক্রান্ত প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই বিষের প্রভাব কাটিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তার চেয়ে বাজে ব্যাপার হলো, পালটার অবশিষ্ট সদস্যরা নিশ্চয়ই নতুন এক আশ্রয়ের খোঁজে নেমে পড়েছে!'

'তাহলে আপনি কী করতে বলেন?' জানতে চাইল গ্রে।

উত্তরটা এল আইকো হিগাশির কাছ থেকে। জাপানিজ ইন্টেলিজেন্স অফিসার পিঠ খাড়া করে টেবিলের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় অনুভূতির কোন ছাপ নেই। 'প্রফেসর বলতে চাইছেন, এরিমাঝে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বোলতাগুলো বংশবৃদ্ধি শুরু করে দিয়েছে। তিন দিনের মাঝে আমাদের হাতে আর কোন বিকল্প থাকবে না। এই দ্বীপগুলোতে আগুন-নরক নামিয়ে আনতে হবে। ছড়াতে দেয়া যাবে না বোলতাদের।'

শক্ত হয়ে গেল গ্রের চেহারা, হাল ছাড়তে রাজি নয় যুবক। 'প্রফেসর, লার্ভাগুলোকে কোনভাবে সরিয়ে ফেলা যায় না প্রকৃতি থেকে? যাতে কিছুটা বাড়তি সময় মেলে?'

কিন দেখতে পেলেন, প্রেমিকার উরুতে হাত স্থির হয়ে আছে গ্রের। প্রশ্নটার পেছনে ব্যক্তিগত একটা কারণ জড়িয়ে আছে-বুঝতে পারলেন তিনি। 'গবেষণার বেশি সময় পাইনি। সচরাচর যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যেমন ইভারমেকটিন, ব্যবহার করেছি।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'ওগুলো দেহের অভ্যন্তরে বাসা বাধে, এমন সব পরজীবীর বিরুদ্ধে কাজ করলেও, এদের বিরুদ্ধে করেনি!'

স্থির দৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে তাকাল শেইচান। 'এখন কী হবে?'

নজর ফিরিয়ে নিলেন কিন। সুগারকোট করবেন কিনা ভাবছিলেন, কিন্তু মনে পড়ল-এই মেয়েটা সত্যের ভক্ত।

'তোমার চামড়া পরীক্ষা করে দেখেছি আমি, অজ্ঞান ছিলে তখন।' কণ্ঠ স্থির রাখার চেষ্টা করলেন কিন, কিন্তু পারলেন না। 'একশোরও বেশি হুলের দাগ পেয়েছি। সম্ভবত কয়েক হাজার ডিম্বাণু তোমার দেহে বাসা বেঁধেছে।' ক্ষমা-প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকালেন কিন।

'তারপর?'

'ডিমগুলো ফুটে লার্ভা বেরিয়েছে সম্ভবত তোমার দেহে প্রবেশের কয়েক মিনিটের মাঝে। প্রতিটা থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রথম ইনস্টার। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় তেমন কোন সমস্যা হবার কথা না।'

'তারপর?'

'ওরা দ্বিতীয় ইনস্টারে পরিণত হবে। আণুবীক্ষণিক থেকে হয়ে যাবে চালের সমান বড়। তখন শুরু হবে সমস্যা। প্রথম দিকে স্নায়ুতন্ত্র বা হৃদপিণ্ডের কাছ থেকে দূরে থাকবে ওরা। কীভাবে বুঝতে পারে যে দূরে থাকতে হবে, তা জানি না।' মেয়েটার চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'তবে ব্যথা হবে প্রচণ্ড। যদিও তা পরেরদিনের ব্যথার সামনে কিছুই না।'

'পরেরদিন আমার হাড়ের ভেতর ঢুকতে শুরু করবে ওরা,' নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলল শেইচান।

কিয়োটোর ল্যাবে পরীক্ষা চালানো ইঁদুরগুলোর কথা ভাবলেন কিন। তৃতীয় দিন শুরু হতেই ব্যথার চোটে বেঁকে যেত ওদের দেহ। নিজের দেহকে নিজেই কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলত। অনেকগুলো তো নিজের পেটই চিরে ফেলত, যেন চাইছে ব্যথার উৎসের কাছে পৌঁছতে। অপয়েড ব্যথানাশক দিয়েও লাভ হতো না। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান করে রাখতেন তিনি ওদের।

‘তারপর থেকে প্রতিক্ষণে পরিস্থিতি আরও বাজে হতে শুরু করবে।’ বললেন কিন।

‘একেবারে শেষে কী হবে?’

মাথা নাড়লেন কিন। এতটা সততার সাথে তার পক্ষে সব বলা অসম্ভব। ইঁদুরগুলোর দেহ ভেসে উঠতে চাইছিল মানসপটে, জোর করে সেই দৃশ্য তাড়ালেন তিনি। চতুর্থ এবং পঞ্চম ইনস্টার তাদের পোষক দেহের কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। ভেতরের সবকিছু খেয়ে ফেলে। খোলসটাকে ব্যবহার করা হয় পিউপাগুলোকে রক্ষার কাজে। কয়েকদিনের মাঝে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ বেরিয়ে আসে মৃতদেহ চিরে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই বীভৎস জন্মগাথা নিজ চোখে দেখেছেন তিনি। একবার সেই দৃশ্য দেখে ফেললে, তা আর মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। কেঁপে উঠল প্রফেসরের দেহ।

গ্রে তার অবস্থা বুঝতে পেরেছে। ‘পরিস্থিতি অত দূর গড়াতে দেব না আমরা।’

ঢোক গিললেন কিন। ‘যা বলছিলাম, কোন ওষুধই কাজ করেনি। আরও সময় পেলেও মনে হয় না কিছু আবিষ্কার করতে পারতাম। পরজীবী লার্ভা শরীরে প্রবেশ করার পর, কোন ওষুধই কাজ করে না।’ পরিস্থিতি ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি। ‘আপনারা স্ক্রু-ওয়ার্মের সাথে পরিচিত?’

পালুর ভ্রূ সংকুচিত হয়ে গেল। ‘স্ক্রু-ওয়ার্ম?’

‘হ্যাঁ, একধরনের মাছির লার্ভা ওগুলো। নাম কোক্লিওমাইয়া হোমিনিভোরাক্স। এই মাছিরা ক্ষতের উপর ডিম পারে, সেখান থেকে শুঁয়োপোকা জন্মায় এবং চারপাশের কোষ খেয়ে বড় হয়। সঠিক চিকিৎসা ছাড়া, রোগীকে বাঁচানো মুশকিল।’

‘সেই সঠিক চিকিৎসা কী?’ জানতে চাইল গ্রে।

‘সার্জারি... শল্যচিকিৎসা। ওদেরকে টেনে বের করে আনতে হয়। ওষুধে কাজ হয় না।’

শেইচানের দিকে তাকাল গ্রে। ‘তাহলে হয়তো সার্জারি করে।’

যুবকের আশার বেলুন ফুটো করে দিলেন কিন। ‘স্ক্রু-ওয়ার্ম কেবল মাত্র উপরের দিকেই থাকে। এদের মতো ভেতরেও ছড়িয়ে পড়ে না।’

এগিয়ে এল আইকো, যেন এই মুহূর্তটার অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল সে। ‘প্রফেসর মাতসুই যা বললেন, মাত্র দুই মাস গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু ওয়াশিংটন থেকে আসা খবরগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে এই পতঙ্গগুলো কয়েক দশক ধরে কারও না কারও কাছে ছিল। তাই প্রশ্ন হলো, এখন কেন তারা এই বোলতাগুলোকে ছাড়ল? আগে কেন না?’

উত্তর দিল না কেউ।

‘কোন না কোন কারণ তো অবশ্যই আছে।’ বলল মেয়েটি। ‘এই দানবদের বায়োলজি আমাদের জানতে হবে। তাহলে হয়তো প্রতিষেধক তৈরির আশা করা যেতে পারে।’

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন কিন। 'তোমার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু আমরা শুরু করব কোত্থেকে?'

ছোট্ট করে হাসল আইকো। 'আমার একটা বুদ্ধি আছে।'

'কী?' জানতে চাইল গ্রে।

'আগেই বলে নেই, একেবারে ভুলও হতে পারে আমার প্রস্তাব। আপনারা যখন ছিলেন না, তখন ক্যাপ্টেন ব্রায়ান্টের সাথে আলোচনা করেছি আমি।'

'ক্যাটের সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল আইকো। 'দুই মাথা এক করেছিলাম। আমরা জানি, সেসনা ব্যবহার করে পতঙ্গগুলোকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এসবের পেছনে কোন জাপানিজ লোকের হাত আছে বলেও সন্দেহ করেছি। তাই সেসনার রেঞ্জ ব্যবহার করে, আমি কিছু জাপানিজ কোম্পানির নামের তালিকা করেছে।'

'তারপর?' জানতে চাইল গ্রে।

'তালিকা দেখে অবাক হতে হয়! এশিয়ান বিনিয়োগকারীরা পলিনেশিয়ায় ভারী বিনিয়োগ করেছে। জাপানের সাথে চীনের বেশ উত্তপ্ত প্রতিযোগিতা চলছে এ নিয়ে। তবে একটা জায়গার উপর আমাদের সন্দেহ শক্ত ভাবে পড়ে। ছোট্ট একটা দ্বীপ কিনে নিয়েছে একটা ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি। আরও ঠিক করে বললে, বৃত্তাকার এক প্রবাল দ্বীপ ওটা।'

পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করে আনল সে, বিছিয়ে দিল টেবিলের উপরে। লেখা দেখে বোঝা গেল, ওটা উত্তর-পশ্চিম হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের মানচিত্র। ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ প্যাসিফিকের হাজারো মাইল জুড়ে অবস্থান করছে।

ব্যাখ্যা করতে শুরু করল মেয়েটা। 'আমাদের এই বিশেষ দ্বীপ এতটাই ছোট যে মানচিত্রে আসে না। তবে ওটা লাইসান দ্বীপের কাছেই অবস্থিত।' ইঙ্গিতে দেখাল সে।

কাছে চলে এল পালু। 'আমি চিনি। মাঝে মাঝে ভাইকে নিয়ে যেতাম। খুব সুন্দর... আর নির্জন। কেউ যায় না।'

আইকোও একমত। 'প্রায় সবগুলো দ্বীপই জনমানবশূন্য।'

গ্রে যোগ দিল সাথে। 'কিন্তু এই দ্বীপের উপর সন্দেহ পড়ল কেন?'

'প্রথমত, এই কোম্পানি হচ্ছে প্রফেসর মাতসুইয়ের কাজের পৃষ্ঠপোষক, তানাকা ফার্মাসিটিক্যালসের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর দ্বিতীয়ত, একদা এই দ্বীপেই ছিল ইউএস কোস্ট গার্ডদের লোরান স্টেশন। এখন শুধু একটা এয়ারস্ট্রিপ আর কিছু পরিত্যক্ত দালান অবশিষ্ট আছে।'

'যেগুলোর আধুনিকিকরণ করা হলে,' বাকিটা বলে দিল গ্রে। 'ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে, অবস্থানও সেসনার রেঞ্জের ভেতর।'

'কোন জাপানিজ কোম্পানির কথা বলছেন?' জানতে চাইলেন কিন।

'কয়েক বছর ধরেই এদের উপর নজর রাখছি আমরা। তবে এসবের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন কারণে নয়। কালোবাজারি, কারচুপি-এসবের কারণে। আফসোস, কখনও শক্তিশালী কেস দাঁড়া করাতে পারিনি। জাপানের আইন, কর্পোরেশনের পক্ষে।'

ব্যাপারটা কিন নিজেও জানেন। 'নাম বললেন না তো।'

এক ভ্রূ তুলল আইকো। 'ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজ।'

চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন কিন, চিনতে পেরেছেন নামটা।

'কী হলো?' জানতে চাইল গ্রে।

'ফেনিকুসু,' জানালেন প্রফেসর। 'জাপানিজে এই শব্দ দিয়ে ফিনিক্সকে বোঝায়।'

'যাই হোক,' শ্রাগ করল আইকো। 'এসব কাকতালীয় হলেও হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে তো ফেনিকুসুর কোন স্থাপনার তল্লাশি চালানো যায় না।'

'আরও শক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।' বলল গ্রে।

মানচিত্রের দিকে তাকাল আইকো। 'প্যাসিফিকের মাঝে অবস্থিত একটা ছোট্ট দ্বীপে যা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

'তাহলে আমরা সেখানেই যাব।' সিদ্ধান্ত নিল গ্রে।

'আমি তোমাদের সাথে যাব,' মাঝখান থেকে বলে উঠল পালু। 'আমি ওই দ্বীপগুলো চিনি। আমার আত্মীয় থাকে ওখানে, নৌকা পাওয়া যাবে। গাইড হিসেবে মন্দ নয়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল গ্রে, প্রস্তাবটা ওর পছন্দ হয়েছে। 'আমিও যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল শেইচান।

তীক্ষ্ণ হয়ে এল গ্রে-র নজর। 'ভালো হতো যদি-'

'আমি যাচ্ছি।'

'আপাতত আপনার আলাদা থাকা উচিত,' মাঝখান থেকে বলে উঠলেন কিন। 'মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটিতে না গেলেও, অন্তত এখানে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকাল শেইচান। 'আমি কি এখন সংক্রামক?'

পিছিয়ে গেলেন কিন। 'মানে... না।'

'তিন দিন আছে আমার হাতে।' বলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

ধপাস করে দরজা বন্ধ হতেই দুই হাত তুলে বলল কোয়ালস্কি। 'আগেই বলে রাখি, ও আমাদের সাথে গেলে, তাতে অন্তত আমার কোন আপত্তি নেই।'

বিকাল ৪:৪৪

আস্তে করে পোর্চে বেরিয়ে এল গ্রে। তবে তার আগে শেইচান পায়চারী বন্ধ করেছে কিনা, তা দেখে নিয়েছে। পুরো আধঘণ্টা লেগেছে মেয়েটার শান্ত হতে।

'হাই,' বলল গ্রে।

ওকে পাত্তা দিল না শেইচান, মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে।

পরিস্থিতি ভালো না।

আস্তে আস্তে এগোল গ্রে, চমকে দিতে চাইছে না।

'তাজা কিছু মাছ কেটে এনেছি,' বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল গ্রে। 'একঘণ্টার মাঝে রওনা দেব তো। তাই ভাবলাম, তোমার বিড়ালটাকে যদি কিছু খাওয়াতে চাও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্লেটটা নিল মেয়েটি।

ওর পাশে বসল গ্রে, তবে কয়েক ইঞ্চি দূরত্ব রেখে।

'তোমার না গৃহহীন প্রাণীকে খাওয়াতে ভালো লাগে না?' জানতে চাইল শেইচান।

'দ্বীপের উপর ওই বিড়াল কী প্রভাব ফেলবে, সেটা ভাববার সময় অনেক আগেই পার হয়ে এসেছি আমরা।'

'তা ঠিক।'

এখনও ওর দিকে তাকাচ্ছে না মেয়েটা।

'শেইচান...'

'তুমি আমাকে ফেলে যাচ্ছ না।'

'তা জানি, কিন্তু-'

'যদি মরতেই হয়, লড়ে মরব।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু চিন্তা কোরো না, আমরা একটা প্রতিষেধক বের করবই করব।'

'একত্রে... একসাথে।'

কাঁধ ঝুলে গেল শেইচানের, মনে হলো যেন বিশাল কোন বোঝা নেমে গিয়েছে। হাত বাড়িয়ে গ্রের হাতটাকে নিজের হাতে নিল সে। কাঁপছে শেইচান, অবাক হয়ে খেয়াল করল গ্রে।

'তোমার কিচ্ছু হবে না,' ওয়াদা করল ও।

'নিজেকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি না,' অবশেষে ওর দিকে ঘুরল মেয়েটি, গাল ভিজে আছে অশ্রুকণায়। 'তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল।'

শক্ত হয়ে গেল গ্রের চেহারা। ও জানে, এক মাস হলো কিছু একটা শেইচানকে দুশ্চিন্তায় রেখেছে। 'কী?'

চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে প্রেমিকের দিকে তাকাল শেইচান।

'আমি গর্ভবতী!'

তৃতীয় পর্ব

দ্য অ্যাম্বার রোড

Σ

অধ্যায় সতেরো

৮ মে, বিকাল ৫:০৩
ফুজিকাওয়াগুচিকো, জাপান

নীরব মেহমানকে অগ্রাহ্য করে একটা নিচু টেবিলের সামনে বসলেন তাকাশি। কোতাতসু, প্রথার প্রতি সম্মান রেখে বানানো একটা টেবিল ওটা। শুকনো, আর্থ্রাইটিক হাঁটু-জোড়া কোতাতসুর ধারেই রয়েছে। কয়লার উত্তাপে উষ্ণ হচ্ছে ধীরে ধীরে। বসন্ত এসে পড়েছে; ফুজি পাহারের ধার ধরে, আটশো মিটার উপরে অবস্থিত এই লেক।

পবিত্র পাহাড়টাকে ঘিরে রাখা পাঁচটা হ্রদের একটা এই কাওয়াগুচি। তবে এখানকার দারুণ দৃশ্যের কারণে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আঁকিয়েরা আসছে এখানে, দৃশ্যটাকে ধরে রাখতে চেয়েছে তুলির আঁচড়ে।

একজনও পারেনি।

এই দৃশ্যের আসল রূপ দেখতে হলে, এখানে বেড়াতে আসতেই হবে।

চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন তাকাশি। এখান থেকেও কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ব্যস্ত শহর। এজন্যই বেছে নিয়েছেন জায়গাটাকে। ফেনিকুসু ল্যাবরেটরীজের নতুন স্থাপনা বানাবার কাছে ব্যস্ত লোকদের কোলাহল থেকে দূরে।

সেই সাথে অসাধারণ দৃশ্য তো আছেই।

ফুজির উজ্জ্বল চূড়া, যেটা কিনা দেখছে প্রতিসম কোনের মতো, শান্ত মহিমায় ভেসে আছে আকাশে। শিনটো পুরাণ অনুযায়ী, ওখানে বাস করেন অমর দেবতা কুনিনোতোকোটাচি। এমনকি পাহাড়টার নাম, ফুজি, 'অমর'-এর প্রতিশব্দ।

পাহাড়ের দ্ব্যর্থতাও পছন্দ তাকাশির। শান্ত, অথচ বিশৃঙ্খল। অগণিতবার, ফুজি থেকে নির্গত লাভা, চারপাশের বারোটা বাজিয়েছে। সতেরোশো এক সালের শেষ অগ্নুৎপাতটা নামিয়ে এনেছিল ছাইয়ের বৃষ্টি। টোকিও ঢেকে গিয়েছিল পুরোপুরি। ফলশ্রুতিতে শুরু হয়েছিল এক দশক স্থায়ী হওয়া দুর্ভিক্ষ।

আবার সেই একই পাহাড়ের চূড়া থেকে এই এলাকা পেয়েছে পানি।

এই জন্যই জাপানের আত্মা হচ্ছে এই ফুজি পাহাড়। দেশটার জনসাধারণের জ্ঞান এবং শান্ত-সমাহিত-ভাবের প্রতিনিধি সে। আবার এটাই জানিয়ে দেয়, বিরক্ত করা হলে চারপাশ ধ্বংস করার আগে সে থামে না।

অতীতকালে সামুরাই যোদ্ধারা একে ব্যবহার করত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাছে। যে জায়গার উপরে রিসার্চ ল্যাবরেটরি দাঁড়িয়ে আছে, সেটা একদা ছিল টোকুগাওয়া শোগুনদের আবাসস্থল। এই যোদ্ধারাই কান'এইজি মন্দিরে মারা গিয়েছিল। মন্দিরের পেছনের পাথুরে স্মৃতিস্তম্ভের কথা মনে পড়ে গেল তাকাশির। ওখানে প্রতিবছর, মিয়ুর স্মৃতিচারণ করে সুগন্ধি জ্বালান তিনি।

এই জায়গাটা না বেছে, কোনটা বাছব?

তবে সেই সাথে আরেকটা বাস্তব কারণও আছে। ফুজিকাওয়াগুচিকো শহরটা টোকিও থেকে মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, কোম্পানির সদর দফতর টোকিওতেই। রাজধানীর এত কাছে থাকার যেমন আলাদা কিছু সুবিধা আছে, তেমনি এত কাছে থেকেও বজায় রাখতে পেরেছে নির্জনতা।

দরকার আছে দুটোরই।

এখানকার প্রত্যেককে বেছে বেছে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আনুগত্য, গোপনীয়তা বজায় রাখার ক্ষমতা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে। গড় বেতন প্রায় ষাট মিলিয়ন ইয়েনের বেশি। সেই সাথে রয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এসব করে অবশ্য গুজব রটানো বন্ধ করা যায়নি। প্রতিপক্ষ এবং নিরাপত্তার বেড়া ভেদ করা উঁকি দেয়া যে কেউ এই স্থাপনা নিয়ে গুজব রটাবেই।

ডিজাইনটা আরও সাধারণ করা উচিত ছিল।

বাড়তি অনেক দালান থাকলেও, প্রধান বিল্ডিংটাকে কাচ এবং ইস্পাতের এক অপূর্ব সৃষ্টি বলতেই হয়। পাঁচ তলা বিশিষ্ট প্যাগোডা বা গোজু-নো-টো-এর আকৃতিতে বানানো হয়েছে এটাকে।

দালানটাকে যে নামে ডাকা হয়, সেটা তাকাশি নিজেও শুনেছেন। কেউ কেউ সেই নামে ডাকে শ্রদ্ধায়... আবার কেউ কেউ বিতৃষ্ণায়।

কোরি নো শিরো।

বরফের দুর্গ।

নামটা তার পছন্দই হয়েছে। বিশেষ করে যখন শীতের মাঝামাঝিতে ফুজি পাহাড় থেকে বরফ নেমে এসে চারপাশের স্থলভূমি ঢেকে ফেলে, তখন দালানটাকে তেমনটাই দেখায়। যেন জাপানের অতীত ইতিহাসকে ধরে রেখেছে নিজের মাঝে।

সৌন্দর্য তো একটা কারণ বটেই, কিন্তু ফ্যাসিলিটির এই ডিযাইনের পেছনেও রয়েছে বাস্তব একটা কারণ। যদি ফুজি আবার ফুঁসেও ওঠে, তবুও এই কাচ এবং ইস্পাত জ্বলবে না। তাছাড়া অধিকাংশই জানে না, এই ফ্যাসিলিটি শুধু মাটির উপরেই নয়... পাঁচটা তলা নিচ পর্যন্তও বিস্তৃত! নিচে অবস্থিত বাঙ্কারে রাখা আছে

কর্পোরেশনের সেরা রহস্যগুলোকে। পারমাণবিক বোমা মেরেও যার ক্ষতি করা যাবে না।

অচিরেই মিলবে এত গোপনীয়তার পুরস্কার।

লক্ষ্য প্রায় অর্জন করা হয়ে গিয়েছে। তার প্রিয় স্ত্রী, মিয়ুর খুনের প্রতিশোধ তিনি অচিরেই নিতে সক্ষম হবেন। তার মতো করেই কষ্ট পাবে সারা বিশ্ব। একই সাথে, এই মন্দির থেকেই জন্ম নেবে নতুন এক জাপানী সাম্রাজ্য।

ব্যক্তিগত কামরায়, নীরব অতিথিকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। কামরাটা কাচের প্যাগোডার একেবারে শীর্ষে অবস্থিত। নিজেকে ব্যস্ত রাখছেন ছোটবেলা থেকে পালন করে আসা একটা শখ নিয়ে। কোতাতসুর উপরে বিশ্রাম নিচ্ছে সমতল এক খণ্ড কাচ। কনুইয়ের কাছে খোলা পড়ে আছে একটা ল্যাপটপ। কিছুক্ষণের মাঝেই যোগাযোগ করবে তার নাতি। তবে তাকাশির মনোযোগ ভাঁজ করা এক টুকরা কাগজের উপর।

অপরিসীম ধৈর্য এবং সাবধানতার সাথে আরও দুবার ভাঁজ করলেন তিনি কাগজটাকে। ছোটবেলা থেকেই অরিগামী পছন্দ করেন তিনি। ইম্পেরিয়াল জাপানের রাজসভাতেও অরিগামীর প্রচলন ছিল। মিয়ুর সাথে থাকার সময় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তার আগ্রহ। ভালোবাসার পাত্রীর এক টুকরা হাসির জন্য কাগজের ফুলের বাগান বানিয়েছিলেন তিনি। তার বিশ্বাস-মেয়েটার মন জয় করার পেছনে এই দক্ষতাও কাজ করেছিল।

এখনও অরিগামী বানান তিনি, তবে মনকে শান্ত রাখার জন্য। আর্থ্রাইটিক আঙুলগুলোকে অনুশীলন করানো, এবং গাণিতিকভাবে মনকে উজ্জীবিত করার জন্যও। অনেক গুরুর সামনে মাথা নত করে শিখেছেন এই কৌশলগুলো। আকিরা ইয়োশিযাওয়া ছিলেন তাদের একজন। চুরানব্বই বছর বয়সে মারা যান তিনি।

এই বছরের শেষের দিকে, আমার বয়সও তাই হবে।

আঙুল ভিজিয়ে নিলেন তিনি, ইয়োশিযাওয়ার কাছ থেকে শেখা একটা কৌশল ব্যবহার করে শেষ ভাঁজটা দিলেন। কাজ শেষে ওটাকে রেখে দিলেন কাচের উপর।

শিকার-রত ম্যান্টিস বানিয়েছেন তাকাশি।

বরাবরের মতোই, কী বানাবেন তা আগে ঠিক করে নেননি তিনি। আঙুলের উপর ছেড়ে দিয়েছেন কাগজকে ভাঁজ করার দায়িত্ব। তবে কাজ শেষ হবার পর বুঝতে পারছেন, কেন বানিয়েছেন এই প্রতিকৃতি।

টেবিলের ওপাশে আনুষ্ঠানিক সেইযা ভঙ্গিতে বসে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালেন তিনি। সাদা একটা কিমানো পরেছে ও, সেই সাথে আছে লাল হাকামা, খড়ের স্যান্ডেল এবং টাবি মোজা। কালো চুলগুলো বেণী করা, মাথার উপর সুন্দর পিন দিয়ে রাখা হয়েছে। পরনের পোশাকটা একজন মিকো, বা শিনটো মন্দিরের পূজারিণীর মতো।

তবে তাকাশি জানেন, এই মেয়ের ধর্মের শিক্ষার সাথে মিশে আছে রক্ত ও মৃত্যু।

সামনে বসা এই মেয়ের কারণেই, কাগজ দিয়ে তার হাত বানিয়েছে ম্যান্টিস। তার মতো এ-ও কেইজ-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বিগত কয়েক বছর ধরে তাকাশি এবং তার নাতি, কেইজের বেঁচে থাকা সদস্যদের এক করার কাজ করে আসছেন।

তবে একে তাদের খুঁজে বের করতে হয়নি, মেয়েটাই তাদের খুঁজে নিয়েছে। এরিমাঝে নিজের যোগ্যতাও প্রমাণ করেছে সে। এস্টোনিয়ার দিকে যে আমেরিকান একটা গ্রুপ যাচ্ছে, সেই খবর এর-ই আনা। জাপানিজ ইন্টেলিজেন্সে থাকা লোকের মাধ্যমে খবরটার সত্যতা যাচাই করিয়েছেন তাকাশি। দলটার উদ্দেশ্য, যে অ্যাম্বার নিদর্শনের কারণে মিযু মারা গিয়েছে, সেটার উৎস খুঁজে বের করা। বিরক্ত হয়ে, এরিমাঝে একটা দল পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই অদ্ভুত মিশনের কারণ জানতে চান, দরকার হলে নেবেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

আচমকা শব্দ ভেসে এল তার ল্যাপটপ থেকে, কল এসেছে। সামনে ঝুঁকে মাসাহিরোর কলটা নিলেন তিনি। নাতির চেহারায় ভরে উঠল পর্দা। ঘামে ভেজা ভ্রূয়ের নিচে যেন জ্বলজ্বল করছে ছেলেটার কালো চোখ। তবে লজ্জায় নিচু হয়ে আছে বেচারার নজর। মাউই-এর ঘটনাগুলো শুনেছেন তাকাশি। অপারেশন চলছে ভালোভাবেই, তবে একটা ব্যর্থতা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

সিগমার দুই এজেন্ট-যারা কেইজের ধ্বংসের জন্য দায়ী-বেঁচে আছে এখনও।

'কোনিচুয়া, সোফু।' মাসাহিরো বলল, উপরের দিকে উঠল নজর। তাকাশির চেহারার রাগটা নজর এড়াল না যুবকের। তাই সাথে সাথে আনুষ্ঠানিকতা ফিরে এল ওর কণ্ঠে। সোফু, মানে দাদা বলে ডাকার আগে, আবার নিজেকে প্রমাণ করতে হবে ওর।

'জোনিন ইতো,' আবারও শুরু করল মাসাহিরো, মাথা নত করে সম্মান দেখাল।

'বেসের খবর কী?'

মাউই থেকে পালাবার পর, ইকিকাউও দ্বীপে আশ্রয় নেয় মাসাহিরো। ছোট একটা দ্বীপে অবস্থিত ওদের সদর দফতর। মিডওয়ের কাছেই ওটা, ইম্পেরিয়াল জাপানিজ নেভি ওখানেই লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তাই ওখান থেকেই শুরু হোক পুনরুত্থান।

'আই,' আবারও মাথা নাড়ল মাসাহিরো। 'তথ্য সংগ্রহ শেষ। বংশধারণের পেনগুলো ধ্বংস করে ফেলেছি। রাত নামতেই সব জ্বালিয়ে দেয়া যাবে।'

উপস্থিত মেয়েটার মাথা নাড়া দেখে ফেললেন তাকাশি। আগেই নিজের মনের কথা জানিয়ে দিয়েছে সে।

'তুমি নিশ্চিত যে ওরা সেই দ্বীপেই যাবে?' জানতে চাইলেন তার কাছে।

আবারও মাথা নোয়াল মেয়েটা। সিগমার বেঁচে থাকা দুই এজেন্ট যে ওখানেই যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই তার। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক হলেও, মেয়েটার পরামর্শ কানে নেয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাকাশি।

দৃশ্যটা নজর এড়াল না মাসাহিরোর। 'জোনিন ইতো, সব সময়মতই হচ্ছে। আমরা-'

এক হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন তাকাশি। 'উপযুক্ত এক সৈন্যকে হারিয়েছ তুমি। গেনিন যিরো, যাই হোক-নতুন আরেকজনকে পাঠাচ্ছি।' মেয়েটার দিকে চলে গেল তার নজর।

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মাসাহিরো। 'কিন্তু, আমাদের হাতে এত সময় নেই।'

লম্বা শ্বাস নিলেন তাকাশি।

এই বাচ্চাটা সময়ের ব্যাপারে জানেটা কী?

'পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যাও।' আদেশ দিলেন তিনি। 'তুমি নতুন একটা মিশন যোগ হচ্ছে। হয়তো হারানো সম্মান ফিরে পাবে তুমি।'

সবকিছু বললেন তাকাশি। এদিকে মেয়েটা অপেক্ষা করছে, তার আঙুলগুলো হাকামার নিচে অবস্থিত ড্যাগারটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। ওটাকে সে অ্যাথামে বলে ডাকে। অশুভ উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় ড্যাগারটাকে। আমেরিকানদের হাতে পাবার ইচ্ছা ওর-ও, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।

নাতিকে নির্দেশনা দিচ্ছেন তাকাশি। আচমকা কম্পিউটারের পর্দার কোনায় অবস্থা একটা ছোট ছবির দিকে চলে গেল তার নজর। এখানে অবস্থিত মেয়েটার ছবি ওটা। কিন্তু সামনে বসে থাকা কালো চুলের সুন্দরীর সাথে অনেক পার্থক্য আছে তার।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক ভূতকে। মলিন এক মেয়ের ছবি ওটা, নীলচে চোখ আর তুষার-শুভ্র চুল। যেন পিগমেন্টেশন না থাকাটাকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার জন্য চেহারা এবং গালের একপাশে ট্যাটু করিয়েছে। এখন অবশ্য দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। কেইজে কাটানো সপ্তাহগুলো মেয়েটাকে দারুণ দক্ষ করে তুলেছে। ধোঁকা এবং ছদ্মবেশের মাস্টারে পরিণত হয়েছে সে।

এর ব্যাপারে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাকাশি।

ছবিটার নিচে লেখা রাশিয়ান নামটা দেখলেন তিনি: ভালিয়া মিখাইলভ।

তবে এই নামটুকুই শুধু তার পরিচয় দেবার জন্য যথেষ্ট নয়।

শিকারি ম্যান্টিসের দিকে চলে গেল তার আঙুল। জানেন, মেয়েটার স্বভাব ফুটিয়ে তুলেছে তার অন্তরাত্মা।

অধ্যায় আঠারো

৮ মে, দুপুর ১২:০৯
টালিন, রিপাবলিক অফ এস্টোনিয়া

'মনে হচ্ছে কোন বইয়ের ভেতর ঢুকে পড়েছি,' বলল মঙ্ক।

স্বামী মনের ভাবনা বুঝতে পারছে ক্যাট। টালিন শহরটা ইউরোপের অন্যতম পুরনো এক রাজধানী, সেই তেরোশো শতকে যার জন্ম। এমন এক দেশের শহর এটা, যে দেশ অহরহই জড়িয়ে পড়ত প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধে। অথচ তারপরও, মধ্যযুগের নানা নিদর্শন এখনও টিকে আছে।

বিশেষ করে শহরের এই পুরনো অংশটায়।

ঘোরানো-পেঁচানো গলি আর খোয়া দিয়ে বানানো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাট। মঙ্ক গাড়ি চালাচ্ছে। হালকা লাল-রঙা টাইল দিয়ে তৈরি দালানগুলোর বয়স অনেক। তবে সবার উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট ওলাফ'স চার্চের গম্বুজ। ষোল শতাব্দীর সবচেয়ে লম্বা দালান ওটা।

বিএমডব্লিউ এর অন্য পাশে দেখা যাচ্ছে শহরের আধুনিক অংশটাকে। এই সহস্রাব্দে পা রেখেই, নিজেকে নতুন রূপে সাজিয়েছে টালিন। একদা যেটা ছিল বন্দর নগরী, সেটা এখন পরিণত হয়েছে ইউরোপের সিলিকন ভ্যালিতে। এমনকি স্কাইপ পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে এখানে।

তবে এখনও ইতিহাসকে গর্ব ভরে স্মরণ করা হয় এখানে। প্রায়শই লেগে থাকা নানা পার্বণ, এই যেমন এখন হচ্ছে। বিমানবন্দরেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে দলটাকে, টালিনা ভানালিনা পায়ভাদ চলছে এখন। নর-নারীরা কস্টিউম পরে নেমে এসেছে রাস্তায়। চারপাশে আনন্দের মেলা।

ক্যাটদের ধীর গতিতে চলমান সেডানের পাশেই হাঁটছে এক ছেলে। ক্যালেভ চকলেট বার এবং ক্যান্ডি ভর্তি একটা বাস্কেট ধরে রেখেছে হাতে। সবগুলোই এস্টোনিয়াতে বানানো। পরে আছে লিলেনের শার্ট এবং ট্রাউজার্স। প্রথাগত এই পোশাকে ব্যবহার করা হয়েছে রঙ-বেরঙের সুতা... এমব্রয়ডারি করা।

স্টিয়ারিং-এর পেছন থেকে ইঙ্গিত করল মঙ্ক। 'মেয়েদের জন্য কিছু ক্যান্ডি নিলে মন্দ হয় না।'

ভ্রূ কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকাল ক্যাট। 'ওদেরকে আরও মিষ্টি খাওয়াতে চাও?' যদিও বুঝতে পারছে, নিজের জন্যই ক্যান্ডি কিনতে চাচ্ছে ওর স্বামী।

'কিছু চকলেট হলে মন্দ হয় না,' পাশ থেকে বলে উঠলেন ড. বেনেট।

'আমিও একমত,' ইলেনাও বাদ গেলেন না!

গণতান্ত্রিক নিয়ম মেনে, সংখ্যাধিক্যের সামনে মাথা নত করল ক্যাট। আসলে বেক করা খাবার এবং রান্না করা মাংসের গন্ধে ওর নিজেরও পেটে ছুঁচোর কেত্তন বসেছে। কয়েকটা ক্যান্ডি বার এবং ক্যারামেলের একটা ব্যাগ কিনল ও। ব্যাগটা রেখে দিল নিজের কাছেই। বলাই বাহুল্য, কেবলমাত্র 'রিসার্চের' জন্যই।

এস্টোনিয়ায় বানানো এসব ক্যান্ডির মান দেখতে হবে না?

ওল্ড টাউন পার হয়ে আসামাত্র, পরিষ্কার হয়ে গেল রাস্তা। দেরি হওয়া সত্ত্বেও, বিমান বন্দর থেকে শহরের কেন্দ্রে আসতে ত্রিশ মিনিটের বেশি লাগেনি। সামনেই দেখা যাচ্ছে ওদের গন্তব্য: দ্য এস্টি রাহভুসরামাতুকোগু, বা এস্টোনিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার।

'দারুণ,' বিশাল দালানটা দেখে বললেন ইলেনা।

আট তলা লম্বা দালানটা শহুরে ব্লকের প্রায় পুরোটা দখল করে আছে। দক্ষ শিল্পীর হাতের কাছের জন্য, সদর দরজাটা রূপ নিয়েছে স্টালিনের আমলের জিনিসে। দেখে বোঝা যায়, এস্টোনিয়া যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিল, তখন শুরু হয়েছিল দালানটার নির্মাণ-কর্ম। তবে কাজ শেষ হয়েছে ১৯৮৮ সালে দেশটা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার পর।

এখন দালানটা দাঁড়িয়ে আছে এস্টোনিয়ার স্থৈর্যের প্রতীক হয়ে।

তবে ওদের কাছে গ্রন্থাগারটা হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে একদা পা রেখেছিলেন আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ।

আট ঘণ্টা বিমান ভ্রমণের মাঝে, প্রাক্তন লাইব্রেরিয়ান অফ কংগ্রেসের জার্নাল পড়ে শেষ করেছে ক্যাট। টালিনে ম্যাকলিশ এসেছিলেন উত্তাল সময়ে। নাজিদেরকে বীভৎস বোমাবাজির মাধ্যমে তাড়িয়ে দেবার পর, তখন সোভিয়েতরা এসেছিল শহরের দখল বুঝে নেবার জন্য। সোভিয়েতদের বোমায় মারা গিয়েছিল অসংখ্য বেসামরিক লোক, সেই সাথে বাচ্চারাও। এস্টোনিয়ার থিয়েটারের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া কিছু শব্দও লিখে রেখেছেন ম্যাকলিশ: ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবে প্রতিশোধ! এখানকার লোকদের নতুন করে সব শুরু করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা, সেই তখনই অবাক করেছিল তাকে। আজও এস্টোনিয়ানরা প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী।

অবশ্য এখানেই জেমস স্মিথসনের সেই অ্যাম্বার নিদর্শনের উৎসের খোঁজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ম্যাকলিশ। যেদিন 'লিটল বয়' আছড়ে পড়েছিল

হিরোশিমাতে, সেদিনই। জাপানিজ হুমকি দূরীভূত হয়েছে মনে করে, ম্যাকলিশ আর আগে বাড়েননি।

তবে আমরা আজ আগে বাড়তে বাধ্য হচ্ছি।

গাড়ি পার্ক করছে মঙ্ক, আর বিশাল দালানটার দিকে চেয়ে আছে ক্যাট। এতক্ষণে যেন দায়িত্বের ওজন উপলব্ধি করতে পারছে। স্মিথসন এই নিদর্শন কোথায় পেয়েছিলেন, তা ওরা খুঁজে বের করবে কীভাবে? তাও মাত্র তিন দিনের মাঝে?

ইলেনা সম্ভবত ওর হতাশা বুঝতে পেরেছেন। 'বাল্টিকের দেশগুলোর মাঝে এই লাইব্রেরীটাই সবচেয়ে বড়। উপরে যা দেখতে পাচ্ছেন, তা তো আছেই; সেই সাথে নিচেও আছে দুইটি তলা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো রাখা হয় ওখানে। সব মিলিয়ে পাঁচ মিলিয়নের বেশি হবে। স্মিথসন যদি কোন সূত্র রেখে যান তো তা এখানেই আছে।'

বেরোতে বেরোতে প্রশ্ন করলেন ড. স্যাম বেনেট। 'কিন্তু খোঁজা শুরু করব কোত্থেকে?'

পতঙ্গবিদের বয়স ষাটের ঘরে, মাঝের দিকে। খড় রঙা চুল, তীক্ষ্ণ নীল চোখ আর টানটান ত্বক অবশ্য বয়স কমিয়ে দিয়েছে অনেক। মন্টানায় অবস্থিত পারিবারিক রানশটা এখনও দেখাশোনা করেন তিনি, তাই তাকে কাউবয়ের মতোই দেখায়।

ক্যাট লক্ষ করল, পতঙ্গবিদের দিকে বেশ আগ্রহ নিয়েই তাকাচ্ছেন ইলেনা। স্যামের কনুই ধরে তিনি সদর দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'এই ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টর, গ্রেগর টাম, আমাদের জন্য অপেক্ষা করার কথা। ভালো লোক, স্মিথসনের সম্পর্কে তাদের সংগ্রহে থাকা যাবতীয় তথ্য আগেই আলাদা করে রেখেছে। আশা করি সেখান থেকে আমরা কিছু পাব।'

'বেশ,' হাসলেন স্যাম। 'লাল ফিতার দৌরাত্ম না থাকলে কাজ করতে ভালোই লাগে।'

শ্রাগ করলেন ইলেনা, গাল লাল হয়ে আছে। 'কংগ্রেসের লাইব্রেরিয়ান হবার কিছু তো সুবিধা আছে, নাকি?'

ক্যাটের তারা খেয়ে ভেতরে প্রবেশ করল সবাই। মঙ্ক চলে এল ওর পাশে; হাত ধরে বলল, 'আহ... প্রথম প্রেম...', সামনে থাকা জোড়ার দিকে ওর ইঙ্গিত।

'চুপ,' বকা দিল ক্যাট, তবে মুচকি না হেসে পারল না।

দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মাত্র মাঝবয়সী এক লোক এগিয়ে এল তাদের দিকে। কালো স্যুট পরা লোকটা ইলেনার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কালো চুল আর পাতলা গোঁফ দেখে মনে হয়, এই মাত্র তাতে কিছু একটা লাগানো হয়েছে।

'টেরে টুলেমাস্ট, ড. ডেলগাডো, স্বাগতম।' বুকের উপর হাত রাখল লোকটা। 'আমি ডিরেক্টর টাম, ফোনে কথা হয়েছে।' সোজা হয়ে করমর্দন করলেন ইলেনা।

'হ্যাঁ, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। মাঝ রাত্রিরে ফোন করার জন্য এবং সেইসাথে আপনার অধীনস্থদের এমন ঝামেলায় ফেলবার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

'কোন সমস্যা নেই। আপনাদেরকে সাহায্য করতে পেরে আমরা খুশিই হয়েছি। আমার সাথে আসুন।' লবির অন্য দিকটার দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। 'আপনাদের জন্য ব্যক্তিগত কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর, এলিভেটরের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাটদের। পথে দামী কিছু বিরল বই দেখাল লোকটা, খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। আট তলায় পৌঁছালে, লম্বা একটা হলঘরে নেয়া হলো ওদের। লাইব্রেরীর ভেতরটা দেখে মনে হয় যেন কোন মধ্যযুগীয় দুর্গে চলে এসেছে ওরা। অদ্ভুত একটা ভাস্কর্য নজরে পড়ল ক্যাটের। দেহটা ইঁদুরের, কিন্তু চেহারা মানুষের!

ওটার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার আগেই, ডিরেক্টর টাম ঘুরে তাকালেন। 'আমি যতদূর বুঝতে পারলেন, অনুষ্ঠিতব্য একটা অনুষ্ঠানের জন্য স্মিথসনিয়ান জাদুঘর তাদের প্রথম দাতার ব্যাপারে জানতে চাইছে?'

'ঠিক বলেছেন,' জবাব দিলেন ইলেনা, তবে মিথ্যাটা বলতে যে তাকে বেগ পেতে হচ্ছে তা পরিষ্কার।

দায়িত্বটা তাই নিজের কাঁধে তুলে নিল ক্যাট। 'স্মিথসন ছিলেন আকরের এক উৎসাহী সংগ্রহকারী। ইউরোপ জুড়ে ঘুরে ঘুরে, নানা নমুনা সংগ্রহ করেছেন। অদ্ভুত কিছুও আছে ওদের মাঝে। আপনি তো জানেন, তার সেই সংগ্রহটা উনিশ শতকের এক দুর্ভাগ্যজনক আগুনে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সেটা আবার গড়ে তুলতে চাইছি, তার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য।'

কাভার হিসেবে এই গল্পটাই ব্যবহার করছে ওরা।

'বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্ট বলতে হবে,' বললেন টাম। 'মানুষটাকে সম্মান জানাবার সেরা উপায়ও বটে। এক রাতে যা জেনেছি তা হলো-মি. স্মিথসন ছিলেন একজন রসায়নবিদ এবং মিনারেলোলজিস্ট। আপনাদের প্রতিষ্ঠানে তার যে অবদান, সেটার ছায়ায় ভদ্রলোকের এই পরিচয়টা ঢাকা পড়ে গিয়েছে।'

'আমরা এই ভুলটাই ঠিক করতে চাচ্ছি,' বললেন ইলেনা। 'দাতার পরিচয়ের সামনে আনতে চাচ্ছি বৈজ্ঞানিকের পরিচয়টাকে।'

নড করলেন টাম। ওদেরকে একটা ঢেউ খেলানো কাঠের দরজার দিকে নিয়ে গেলেন। 'এই ঘরটা সাধারণত আমাদের এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত স্কলারদের দেয়া হয়। আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। যদি চান, তাহলে আমিও সাহায্য করতে পারি।'

'আপনার সাহায্য পেলে আমাদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।' জানাল ক্যাট।

'আমিও নিজেকে সম্মানিত বোধ করব।'

দরজা খুলে ওদের প্রবেশ করার ইঙ্গিত দিলেন ডিরেক্টর টাম। ভেতরটা দেখে মনে হয় যেন কোন মধ্যযুগীয় জেলে এসে উপস্থিত হয়েছে! এক কোনায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটা বর্ম। চার দেয়ালের সবগুলো জুড়ে বড় বড় বইয়ের তাক। মাঝখানে রয়েছে একটা মাত্র কাঠের টেবিল চেয়ার। প্রতিটা চেয়ারের সামনে রয়েছে একটা করে লাইট এবং বই রাখার জন্য একটা করে বেদী।

ক্যাটের মনে হলো, এই পরিবেশে কুঁজো হয়ে থাকা কোন সন্ন্যাসীকে দারুণ মানাবে। কিন্তু দেখতে পেল, এক যুবতী মেয়ে, সোনালী চুলগুলো খোপা করে বেঁধে বসে আছে একটা কম্পিউটারের সামনে। পাশেই ঘরটার একমাত্র জানালা।

পরিচয় করিয়ে দিলেন টাম। 'এই হচ্ছে লারা, আমাদের নবতম গবেষকদের একজন।' হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে। 'এবং আমার মেয়ে।'

মুচকি হাসল মঙ্ক। 'পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে তাহলে।'

'এরচেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে?'

লোকটার গর্ব এবং মেয়েটার লজ্জা, দুটোর কোনটাই ক্যাটের নজর এড়াল না। মনে হলো, মেয়েটা সম্ভবত নিজের পরিচয়ে পরিচিত হতে চায়। নিজের মেয়েদের কথা মনে পড়ে গেল ওর।

মঙ্কের চিন্তা অন্যখানে। ক্যাটের কানে কানে বলল, 'আমাদের মেয়েরা যেন আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। এক কাজ করলে কেমন হয়, ওদেরকে না হয় বালিশ বিক্রেতা বানানো যাক?'

'নিজের মেয়েদের আমি ভালোই চিনি। বালিশ বিক্রি না করে, একে অন্যের মুখে চেপে ধরবে ও।'

'তা ঠিক,' মঙ্ক বলল। 'তাহলে নাহয় অ্যাকাউন্টিংই গেল!'

বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রেখে, মঙ্ক এবং ক্যাট এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। শত শত বই রয়েছে সামনে। হতাশায় ভরে গেল মেয়েটার মন।

'দেখতেই পাচ্ছেন,' বললেন ডিরেক্টর। 'মেয়েকে নিয়ে আমি বেশ ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। যদি আপনাদের খোঁজের ব্যাপারে আরও ভালোভাবে জানতাম, তাহলে হয়তো আরও সাহায্য করতে পারতাম।'

একমত হলো ক্যাট। 'আমরা চাচ্ছি, জেমস স্মিথসন ইউরোপের কোথায় কোথায় নমুনার জন্য গিয়েছেন তা বের করতে। আশা করি, এতে তিনি টালিনে কেন এলেন, তা জানতে পারব।'

'আহ...' মেয়েকে কাছে আসার জন্য ইঙ্গিত দিলেন তিনি। 'আপনারা তাহলে মেরেভায়াগুটি, মানে আপনাদের ভাষায় অ্যাম্বারের খোঁজে এসেছেন।'

ডিরেক্টরের পিঠ ওর দিকে ছিল বলে, কপালকে ধন্যবাদ দিল ক্যাট। নইলে ওর চমকে ওঠা পরিষ্কার দেখতে পেত লোকটা। ইলেনা আর স্যামও চমকে গিয়েছেন। তবে মঙ্ককে দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হলো।

টাম এসবের কিছুই দেখেননি। 'জেমস স্মিথসন কেন এসেছিলেন টালিনে, তা আমার জানা আছে। অ্যাম্বারের সাথে জড়িত একটা রহস্যের জন্য।'

দুপুর ১:০৩

এই লোক এতকিছু জানে কী করে?

চমকে গিয়েছেন ইলেনা, হতবাকও বলা যায়। এক পা পিছিয়ে ড. বেনেটের সাথে ধাক্কা খেলেন তিনি। লোকটার হাতের স্পর্শ তাকে শক্তি জোগাল।

'মানে?'

হলুদ হয়ে আসা একটা বই তুলে নিলেন টাম টেবিল থেকে। 'এটা মি. স্মিথসনের লেখা একটা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য, তবে আমাদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্ক আছে বলে বিরল একটা কপি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।'

ইলেনা আগ্রহ ভরে নিলেন বইটা, উঁচু স্বরে পড়লেন ওটার নাম। 'অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ এক্সপেরিমেন্টস উইথ দ্য স্পিরিট অফ অ্যাম্বার।' মানে, অ্যাম্বারের আত্মা নিয়ে গবেষণার ইতিবৃত্ত। মহিলা জানেন, জেমস স্মিথসন তার করা পরীক্ষা-নিরীক্ষা লিখে রাখতেন। কিন্তু এটার কথা তার জানা ছিল না। 'আমি বুঝতে পারছি না, কী অর্জন করতে চাইছিলেন তিনি।'

উত্তর দিল লারা, লজ্জিত কণ্ঠে। 'এই বিষয়ে আমি নিজে থেকেই কিছু খোঁজ খবর নিয়েছি। অ্যাম্বারের আত্মাকে মাঝেমাঝে অ্যাম্বারের অম্লও বলা হয়।' হলদে পাতাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'মি. স্মিথসন নিজেও এ কথা লিখে রেখেছেন। তিনি অপক্ব অ্যাম্বারকে গরম করে বানিয়েছেন অম্ল, তারপর সেটাকে সাদাটে অম্লীয় পাউডারে পরিণত করেছেন। আজকাল আমরা একে ডাকি সাকসিনিক অ্যাসিড বলে।'

গলা পরিষ্কার করল মঙ্ক, ইলেনার মনোযোগ আকর্ষণ করল। 'কিছু বুঝতে পারছ?' ক্যাট স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল।

প্রস্থেটিক হাতটা বাড়িয়ে দিলে মঙ্ক, ইলেনা ওকে বইটা দিলেন। 'এটা পড়তেই হবে। যাই হোক, আমি সাকসিনিক অ্যাসিডের ব্যাপারে জানি। আমাদের কোষাভ্যন্তরে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়া এটা তৈরি করে। দেহের শক্তি উৎপাদন সিস্টেমের অংশ এই যৌগ, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী।'

'কিন্তু স্মিথসন কেন এর পেছনে লাগলেন?' জানতে চাইলেন ইলেনা।

চিন্তিত দেখাল ক্যাটকে, ডিরেক্টরের দিকে ফিরল মেয়েটা। 'পরীক্ষাগুলো কি তিনি এই টালিনের করেছেন?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোকের নোট পড়লে বুঝবেন, তেমন কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। এজন্যই এখানেই রেখে গিয়েছেন ওগুলো, প্রকাশ করেননি। গোপন রাখতে চেয়েছেন।'

ইলেনা জানেন, ডিরেক্টর ঠিক বলছেন। গোপনীয়তাটুকু কবরেও নিয়ে গিয়েছেন তিনি। তবে স্মিথসন আগুনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জার্নালগুলোয় কোন সূত্র রেখে গিয়েছিলেন কিনা, তা ভাবলেন।

যদি রেখে থাকেন, তাহলে অন্য কোথাও কী সূত্র রেখে যাননি?

প্রশ্নটা নিয়ে ভাবার আগেই, স্ত্রীর দিকে ফিরল মঙ্ক। 'ক্যাট, বুঝতে পারছি-তুমি কিছু একটা ধরে ফেলেছ।'

গলা নামাল মেয়েটা, টাম এবং তার কন্যার দিক থেকে মুখ ঘোরাল। 'ম্যাকলিশের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, মাতাল হয়ে স্মিথসন খনির ওই গল্পটা এক জিওলজিস্টকে বলেছেন। তার মানে, এখানে আসার আগেই তিনি তার নমুনা পেয়ে গিয়েছিলেন।'

'যুক্তি আছে কথায়। কিন্তু এসব পরীক্ষা তিনি করলেন কেন?'

'হয়তো তিনি অ্যাম্বারে আটকা পড়া কোন প্রাণীকে আবার কী করে জীবন্ত করে তোলা যায়, সেটা আবিষ্কার করতে চাইছিলেন। এমন করাটা কিন্তু অসম্ভব না!'

'হুম, তবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।' মাঝখান থেকে বলে উঠলেন স্যাম। 'অ্যাম্বারের মধ্যে এমন কিছু নেই, যেটা হাড়ের ভেতর আটকে থাকা সিস্টকে জীবিত রাখতে পারবে। ওই বৈশিষ্ট্যটা বোলতাগুলোর নিজস্ব।'

'সেটা তো আর তিনি জানতেন না।' নিজেকে স্মিথসনের উকিল বলে মনে হচ্ছে তার। 'ব্যর্থ হলেও, নিদর্শনটাকে ইউএসে না রাখার মতো প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। আবার ওটা এতোটাই অসাধারণ যে ধ্বংসও করেননি।'

'প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মতো ছিল তার আচরণ,' মেনে নিল ক্যাট। 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন।'

নড করলেন ইলেনা। 'স্মিথসনিয়ান গড়ে তোলার পেছনে তার লক্ষ্যও ছিল সেটাই।'

'কিন্তু আমেরিকায় কেন? ব্যাপারটা আমাকে সর্বদা ভাবিয়েছে।'

শ্রাগ করলেন ইলেনা, আন্দাজ করে বললেন, 'অভিজাত পরিবারে জন্ম তার। তবে বাবা-মা হঠাৎ করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়ায়, কখনও তাকে মেনে নেয়া হয়নি। আমার ধারণা, ইউরোপের শ্রেণী-বিভেদ সেজন্য পছন্দ করতেন না। বুঝতে পেরেছিলেন, জ্ঞানের বিকাশ হলে হবে নতুন বিশ্বে।'

ইলেনা নিজেও মুক্ত এই সমাজের এক পরিণতি। শরণার্থী এক পরিবারে জন্ম নিয়ে আজ উঠে এসেছেন এই অবস্থানে।

স্মিথসন কী এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন?

বর্তমানে তাদেরকে ফিরিয়ে আনল মঙ্ক। 'সব তো ভালোই, কিন্তু স্মিথসন যদি এই শহরে আসার আগেই নিদর্শনটা পেয়ে থাকেন, তবে কোত্থেকে পেলেন?'

ওদেরকে গোপনীয়তা দেয়ার জন্যই দূরে সরে ছিলেন কন্যাসহ টাম। কিন্তু মঙ্কের প্রশ্নে এগিয়ে এলেন। লোকটার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। 'বিরক্ত করতে চাই না, তবে

আগেই বলেছি যে কেন মি. স্মিথসন টালিনে এসেছিলেন তা আমি জানি। হয়তো আপনারা প্রকৃতপক্ষেই যা খুঁজছেন সেটার ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারব।'

ক্যাটের দিকে তাকালেন ইলেনা। ডিরেক্টরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। তার লাইব্রেরিয়ান অফ কংগ্রেস হওয়ার সাথে সম্ভবত আচরণটার সম্পর্ক আছে।

এজন্যই তো এসেছি।

ক্যাটও নিশ্চয়ই তেমনটা ভাবছে। ইলেনার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও।

'ডিরেক্টর টাম, আপনার সাথে খোলাখুলিই আলোচনা করি।' বললেন ভদ্রমহিলা। 'আমাদের উদ্দেশ্য হলো স্মিথসনের একটা বিশেষ নিদর্শনের উৎস খুঁজে বের করা। প্রায় সতেরো পাউন্ড ওজনের একটা অ্যাম্বার।' হাত দিয়ে প্রায় দুই গ্যালন দেখালেন তিনি।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডিরেক্টরের। 'অসাধারণ! বুঝতে পারছি, অমন একটা জিনিস কেন খুঁজছেন আপনারা!'

'সেজন্যই,' যোগ করল ক্যাট। 'আমরা চাই স্মিথসন যেখান থেকে নিদর্শনটা নিয়েছেন, সেখান থেকেই নিতে...অকৃত্রিমতার একটা ব্যাপার আছে।'

'অবশ্যই, কিন্তু বাল্টিকের অ্যাম্বার সবার সেরা।' গর্বের সাথে বললেন টাম। 'প্রাগৈতিহাসিক কালে এই এলাকা এবং চারপাশের সমুদ্র-সবটাই পাইন বন দিয়ে ভর্তি ছিল। এই বিশালাকার গাছগুলোর রস থেকে তৈরি হয় অ্যাম্বার। তারপর অনেক অ্যাম্বারই বের হয়েছে সমুদ্রের তলদেশ থেকে, ভেসে এসেছে সৈকতে। পুরাতন অনেক শিরা আছে এখনও মাটির নিচে। কিছু কিছু তো কয়েক মিটার মোটা। ভেবে দেখুন।'

ইলেনা খেয়াল করলেন, নিজের অজান্তেই পায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। স্বর্ণালী স্রোত কল্পনা করছেন।

'তাই মি. স্মিথসন যে এখানে আসবেন অ্যাম্বারের খোঁজে,' বলে চলেছেন টাম। 'তাতে আর সন্দেহ কী? অনেককাল হলো মানুষ এখানে আসে ওই জিনিসটার খোঁজে। এর জন্য দায়ী ওটার রত্ন-সুলভ বৈশিষ্ট্য এবং ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ইলেনা। 'ঐন্দ্রজালিক?'

'হ্যাঁ। ইতিহাস বলে, সেই অনেক আগে থাকেই অ্যাম্বারের এক অদ্ভুত ক্ষমতার কথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। রোগ সারায় ওটা, সেই সাথে তাড়ায় অশুভকে।'

ক্যাটের দিকে তাকালেন ইলেনা, হয়তো স্মিথসনও এসব শুনে এসব গল্প শুনেছিলেন। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে ক্যাটের ধারণাই ঠিক-হয়তো এসব দাবীর পেছনের সত্যতাটুকু খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন তিনি। হয়তো দেখতে চাইছিলেন, অশুভের বিরুদ্ধে অ্যাম্বার কাজ করে কিনা!

হয়তো তার পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল একটা ওষুধ খুঁজে বের করা।

আবার শুরু করলেন ডিরেক্টর। 'কোথায় মি. স্মিথসন ওটা আবিষ্কার করেছেন, তা জানি না। তবে কোন পথে হেঁটেছিলেন, তা বলতে পারব।' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। 'দেখাচ্ছি আপনাকে।'

দুপুর ১:২৭

ডিরেক্টরের পিছু নিয়ে তার মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল ক্যাট। টাম ফিরে তাকালেন ওদের দলটার দিকে। 'সিল্ক রোডের সাথে আপনি পরিচিত?'

প্রসঙ্গের অকস্মাৎ এই পরিবর্তনে অবাক হলো ক্যাট। 'প্রাচীন সেই ব্যবসা-পথ? ইউরোপ থেকে চীনের মাঝে ছিল যেটা? যে পথে রেশম আনা-নেয়া করা হত?'

'সেটাই। কিন্তু আরেকটা রাস্তা আছে, পাঁচ হাজার বছর পুরাতন।'

কী সব বলছে লোকটা?

মেয়ের দিকে ফিরে এস্টোনিয়ার ভাষায় বেশ কিছু কথা বললেন টাম। নড করল লারা, কম্পিউটারে কিছু একটা টাইপ করে বের করে আনল একটা মানচিত্র।

কম্পিউটারের পর্দাটাকে ঘিরে ধরল সবাই।

ম্যাপের একটা লাইন আঙুল দিয়ে দেখালেন টাম। 'এই রাস্তাকে একদা ডাকা হত অ্যাম্বার রোড নামে। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে দামী অ্যাম্বার নিয়ে যাওয়া হত ভেনিস, ইটালিতে। সেখান থেকে জাহাজে করে ভূমধ্যসাগরে।' ওদের দলটার দিকে তাকাল সে। 'জানেন? তুতেনখামেনের ব্রেস্ট প্লেট সাজানো হতো বাল্টিকের অ্যাম্বার দিয়ে?

'এমনকি প্রাচীন গ্রিকদের মাঝেও বাল্টিকের অ্যাম্বারের চাহিদা ছিল দারুণ। বিশেষ করে ওটার ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। প্রায় পঁচিশশো বছর আগের কথা, মেলেটোসের থালেস এক টুকরা কাপড় একটু অ্যাম্বারের উপর রেখে জন্ম দিয়েছিল স্ফুলিঙ্গের। এই অদ্ভুত শক্তির নাম দিয়েছিল সে ইলেকট্রিসিটি, বিদ্যুৎ। নামটা এসেছে ইলেকট্রন থেকে। গ্রীকরা অ্যাম্বারকে এই নামেই ডাকে।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল মঙ্ক। 'কিন্তু এসবের সাথে জেমস স্মিথসনের কী সম্পর্ক?'

'সবকিছু।' ম্যাপের দিকে মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করলেন টাম। 'মি. স্মিথসন তার ভ্রমণ শুরু করেছিলেন ভেনিসে, অ্যাম্বার রোড ধরে এগিয়েছেন। একদম সেন্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু টালিনে এসে থেমে গিয়েছেন। কেন, তা জানি না।'

তবে কারণটা আন্দাজ করতে পারছে ক্যাট। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্যর্থ হয়ে সব বাদ দিয়েছিলেন তিনি।

ম্যাপে থাকা 'টালিন' শব্দটার উপর টোকা দিলেন টাম। 'আমার ধারণা এই রাস্তারই কোন জায়গা থেকে নিদর্শন গ্রহণ করেছিলেন মি. স্মিথসন।'

ক্যাটের দিকে তাকালেন ইলেনা। 'ঠিক বলেছেন, ডিরেক্টর।' ম্যাপের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন তিনি, অ্যাম্বার রোডের দৈর্ঘ্য দেখছেন।

মাত্র তিন দিনে সেই উৎস খুঁজে পাব কী করে?

সম্ভাব্য একটা উত্তর দিল লারা। 'আমার বাবা পুরোপুরি ঠিক বলেননি।' ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল পিতার দিকে। 'মি. স্মিথসন ভেনিস থেকে উত্তর দিকে এগোলেও, বাল্টিক সাগরে পৌঁছে নৌকা ভাড়া করেছিলেন। টালিনের পোর্টে পৌঁছেছেন ওতে করেই।'

'তুমি জান কীভাবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন টাম।

কী-বোর্ড স্পর্শ করল মেয়েটা। 'মি. স্মিথসন আমাদের শহরে যখন এসেছিলেন, তখনকার ডিজিটাল রেকর্ডগুলো দেখছিলাম। তার নাম দেখতে পেলাম একটা বাণিজ্যিক জাহাজে, যাত্রী হিসাবে। ওটা ছেড়েছিল দানেস্ক, পোল্যান্ড থেকে।'

পর্দার কাছে ঝুঁকে এল ক্যাট, পোলিশ শহরটা বাল্টিক সাগরের একদম ধারে অবস্থিত। মঙ্ক স্ত্রীর কাছে এসে বলল, 'আমাদের খোঁজের এলাকা কমে গেল।'

'একদম! এখন এই অ্যাম্বার রোডের অর্ধেক খুঁজলেই হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাট।

স্ত্রীর কাঁধে কাঁধ রাখল মঙ্ক। 'এর চেয়ে কম সময়ে, এরচেয়ে বড় অনেককিছু করেছি।'

তা ঠিক।

লারা দিকে তাকাল ক্যাট। 'আর কিছু জানতে পেরেছ?'

'নাহ,' বুকের উপর হাত বাঁধল লারা। 'তবে দানেস্ক সবসময় অ্যাম্বার রোডের কেন্দ্রে ছিল। কয়েক বছর আগে, বিশাল এক অ্যাম্বার-জাদুঘর স্থাপন করেছে শহরটা। সেই ১৪৭৭ সাল পর্যন্ত রেকর্ড আছে ওদের কাছে। হয়তো ওখানে কিছু পায়া যাবে।'

শ্রাগ করল মঙ্ক। 'সম্ভাবনা খুব কম।'

নড করল ক্যাট। 'তা ঠিক, তবে এর চাইতে অনেক কম সময়ে অনেক বড় কিছু করেছি।'

দুপুর ২:০১

লাইব্রেরির টেবিল ধরে পায়চারী করছেন ইলেনা, এদিকে ওদের বিদায় নেবার সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। টেবিলের উপর পড়ে থাকা বইটার দিকে তাকালেন তিনি। মনে হচ্ছে যেন স্মিথসনের দেহটাই পড়ে আছে ওখানে।

মৃত্যুর পর কি কেবল এতটুকুই অবশিষ্ট থাকে?

বিয়ে করেননি কখনও স্মিথসন, তাই বাচ্চাও নেই। তার নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হলেও, খুব কম সংখ্যক মানুষই ব্যক্তি স্মিথসনের ব্যাপারে জানে। তার জীবনের টুকরো টুকরো অংশ-বিশেষ জড়ো করতে সক্ষম হয়েছে কেবল। হলদে, হাতে লেখা বইটি তুলে নিলেন ইলেনা।

পরক্ষণেই রেখে দিলেন আবার।

স্যাম যে কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, জানেন না। 'ঠিক আছ তো?'

সঙ্গীর দিকে ফিরলেন ইলেনা। লম্বা মানুষটা একটু বেশিই কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'ক্লান্ত খুব। সেই সাথে একটু উত্তেজিতও।'

'বুঝতে পারছি।' স্যাম দলের অন্য সদস্যদের দিকে তাকালেন। 'ওই দুইজনের জ্বালায় কোথাও এক দণ্ড তিষ্ঠানো যায় না।'

হাসলেন ইলেনা।

তা ঠিক।

জেটের পাইলটের সাথে কথা বলছিল মঙ্ক, শেষ করে এগিয়ে এল স্ত্রীর দিকে। ‘তাড়াতাড়ি করলে, এক ঘণ্টার মাঝে রওয়ানা দিতে পারব।’

নড করল ক্যাট। ‘তাহলে চলো। আশা করি, শহরের অনুষ্ঠান আমাদের দেরি করিয়ে দেবে না।’

ডিরেক্টর টাম ওর দুশ্চিন্তা বুঝতে পারলেন। ‘ভিড় এড়িয়ে এগোবার একটা রাস্তা দেখিয়ে দেই।’ পুরু দরজার দিকে এগোলেন তিনি। ‘লবিতে একটা ম্যাপ আছে।’

তাকে অনুসরণ করল মঙ্ক এবং ক্যাট। স্যাম এবং ইলেনাও সঙ্গী হলো।

এগোতে এগোতে ভ্রূ তুলে ইলেনার দিকে তাকালেন স্যাম, ‘কী? কথা সত্য হলো তো?’ দরজা খুলে দিলেন টাম, ‘প্যারেড শুরু হবার কথা-’

আচমকা তীক্ষ্ণ হাততালি থামিয়ে দিল তাকে। ডিরেক্টরের গলার পাশ থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল ক্যাটকে। ভেতরের দিকে আছড়ে পড়ল লোকটার দেহ।

সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

চিৎকার করে উঠল লারা।

যেন আগে থেকেই অনুশীলন করা, এমনভাবে বসে পড়ল ক্যাট। টামের শরীরটা সরিয়ে নিল একদিকে, এদিকে মঙ্ক কাঁধের ধাক্কায় বন্ধ করে দিল ভারী দরজাটা।

পরক্ষণেই দরজায় আছড়ে পড়ল অগণিত বুলেট। ইলেনার কোমর আঁকড়ে ধরে তাকে সরিয়ে আনলেন স্যাম, ছাড়লেন না।

দরজা আটকে ধরে অন্যপাশ থেকে ডাকল মঙ্ক। ‘লারা, এখান থেকে বেরোবার আর কোন পথ আছে?’

ডিরেক্টরের মেয়ে যেন মূর্তি হয়ে গেছে, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে গলা। চোখজোড়া বিস্ফারিত।

হাতের তালু দিয়ে ক্ষতটা চেপে ধরল ক্যাট, রক্ত প্রবাহ বন্ধ করার প্রয়াস পাচ্ছে। ‘লারা, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।’

রক্তের ডোবায় পরিণত হওয়া মেঝের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কমবয়সী মেয়েটা। হালকা স্বরে উত্তর দিল, ‘না...’

অধ্যায় উনিশ

৮ মে, রাত ১২:০২
উত্তর পশ্চিম হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জ

কালো রঙের কাটামারানটার সামনের ডেকে বসে আছে গ্রে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি চাঁদ ভাসছে নিচু হয়েছে, আলো খুবই কম। হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে, ইস্পাতের একটা রোলেক্স সাবমেরিনার।

সময় হয়ে গিয়েছে প্রায়।

হাত মুঠো হয়ে গেল ওর, ফুলে উঠল হাতের পেশি। অধৈর্য হয়ে উঠছে সিগমা কমান্ডার। দলটার প্রায় সতেরো ঘণ্টা লেগেছে লক্ষ্যে পৌছতে, মাঝরাতের কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে যাত্রা। মাউইতে থাকা কালে, তানাকা ফার্মাসিটিক্যালের কর্পোরেট একটা হোন্ডা-জেট বলতে গেলে দখলই করে নিয়েছে ওরা। ওতে করে এসে পৌছেছে মিডওয়েতে। সেখানে পালুর আত্মীয়ের সাথে দেখা করে উঠেছে এই মাছ ধরার কাটামারানে। ৩৯০ মডেলের বাহনটা চল্লিশ নট গতি তুলে ওদের পৌছে দিয়েছে এখানে।

বাইনোকুলার চোখে তুলে, টার্গেটের দিকে তাকাল গ্রে। দুই মাইল দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ইকিকাউও দ্বীপটাকে। মনে হচ্ছে যেন ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসেছে ওটা। পশ্চিম দিকে জ্বলছে কয়েকটা বাতি। ইউএস কোস্ট গার্ডদের দালানগুলো ওখানেই অবস্থিত। একটু আগে, ওদের কাটামারানটা দ্বীপের কাছে আসার আগেই, ছোট একটা বিমান অবতরণ করেছে ওখানে।

একেবারে নির্জন নয় তাহলে জায়গাটা।

মাছ ধরার জন্য নৌকা ভাড়া করেছে, এমন ভাব ধরেছে দলটা। দ্বীপ থেকে বেশ দূরে থাকছে। পালু এবং তার দুই কাজিন, যারা লোকটার চাইতে তুলনামূলক খাটো, বড়শি বেঁধে রেখেছে নৌকার দুই পাশে।

অন্যরা নিচে, ছোট কেবিনে আত্মগোপন করে আছে। চাঁদ ঠিকমতো উঠলে, স্কুবা গিয়ার পরে পানিতে নামবে ওরা। তারপর সাঁতরে উঠবে সৈকতে। আক্রমণটার

সূত্রপাত যে ওই দ্বীপটা থেকেই হয়েছে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে ওদের। তারপর খুঁজে বের করতে হবে, এই আক্রমণের পেছনে কে আছে।

কঠিন কাজ... তাও আবার শত্রু এলাকায় ঢুকে।

বাইনোকুলার নামিয়ে, দ্বীপের স্যাটেলাইট ম্যাপের দিকে তাকাল গ্রে। কাটামারানটার হুইলের কাছে লাগানো রয়েছে ওটা। এক হাজার একর লম্বা দ্বীপটা আসলেই প্রায় বৃত্তাকার, সবদিক দিয়ে প্রবাল ঘিরে রেখেছে। তবে সবচেয়ে বড় অস্বাভাবিকতা হলো, ওটার কেন্দ্রে অবস্থিত আয়তাকার হ্রদ। ঘন রেইন ফরেস্ট দিয়ে নিচু পাহাড়গুলো যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। প্রাক্তন কোস্ট গার্ড রেকর্ড অনুসারে, হ্রদটা প্রায় ত্রিশ মিটার গভীর এবং লবণাক্ত। যার অর্থ, সমুদ্রের সাথে সংযোগ আছে এই হ্রদের।

পালু পেছনের ডেক থেকে বেরিয়ে এসে বোটের হুইল-হাউসে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশালদেহী হাওয়াইয়ান নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে গ্রের মনোযোগ। ম্যাপের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এই জন্যই দ্বীপটাকে আমরা ইকিকাউও বলে ডাকি। তোমাদের ভাষায় যার অর্থ ছোট্ট ডিম।' হ্রদের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আর এই হচ্ছে তার কুসুম।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'ওখানে যেসব যেসব প্রাণী জন্মায়, সেটাও এই নামকরণের একটা কারণ। ফিঞ্চ, হাস, টার্ন, অ্যালবাট্রস। আর এখানকার পানি এমন যে চাইলেই মাছ ধরা যায়!'

গ্রের সন্দেহ হলো, এসব কথা বলার পেছনে পালুর কারণটা শুধু তথ্য দেয়াই নয়, কত কিছু ওর উপর নির্ভর করছে-সেটা জানানোও।

'পুরাণ অনুসারে,' জানাল পালু। 'পেলের স্টাইল, কানে মিলোহাই, এই দ্বীপগুলোর সুরক্ষা দেন। তবে,' গ্রের দিকে তাকাল সে। 'দেবতাদেরও মাঝেমধ্যে সাহায্য দরকার।'

'আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা যা আছে, তা করবই।' কথা দিল গ্রে।

'জানি, জানি।' ম্যাপের দিকে মন দিল পালু। 'কিন্তু এই জায়গা... এই দ্বীপগুলো এর আগেও হুমকির মুখে পড়েছে।' হাত দিয়ে সবগুলো দ্বীপ দেখাল সে, তবে থামল দক্ষিণপশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে। 'গ্রেট প্যাসিফিকের গার্বেজ প্যাচে বসে আছে ওগুলো।'

সমুদ্রের দিকে তাকাল গ্রে। ওখানে কোথাও যে আবর্জনা জমছে, তা জানে সে। টেক্সাসের দ্বিগুণ পরিমাণ এলাকা জুড়ে জমা হচ্ছে আবর্জনা-ভাসমান রাবার, প্লাস্টিক, পুরাতন জাল এবং অন্যান্য।

মাথা নাড়ল পালু। 'আমাদের দ্বীপগুলোতে বিষ ঢালছে ওগুলো। ওসব আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে আসছে সৈকতে। পাখি মরছে, মরছে কচ্ছপ। অবশ্য সেদিকে কারও

নজর নেই।' শ্রাগ করল সে। 'পাপাহানাউমোকুয়াকিয়া সাহায্য করে বটে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে না।'

সংরক্ষিত মেরিন রিজার্ভের নামটা পরিচিত মনে হলো গ্রের।

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে নড করল পালু। 'কপাল মন্দ, ইকিকাউও এবং এরকম ছোট ছোট দ্বীপগুলো রিজার্ভের মধ্যে পড়েনি।'

নড করল গ্রে। 'এই জন্যই সম্ভবত কর্পোরেশনটা এই দ্বীপকে ভাড়া নিয়েছে। এখানে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে তারা।'

'হয়তো, কিন্তু এই দ্বীপটা আমাদের কাছে এখনও গুরুত্বপূর্ণ।' আত্মীয়দের দিকে ইঙ্গিত দিল পালু। 'মাকাইও এবং টুয়া বলেছে, দ্বীপের পূর্ব দিকে কয়েক পুরাতন শেল্টার দেখেছে। তাতে নাকি পেট্রোগ্লিফও ছিল। এমনকি হেইউ, মানে পুরাতন এক হাওয়াইয়ান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও আছে!'

ম্যাপে দেখানো দ্বীপটার পূর্ব সৈকতের দিকে ইঙ্গিত করল পালু। 'এই কানাপাপিকিসরা হয়তো মাছ বা বুনো জীবন নিয়ে খুব একটা চিন্তিত না। তবে এদিকে আসার ব্যাপারে কয়েকবার ভাববে।' গ্রের দিকে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকাল পালু। 'ওই দিকটা নির্জন থাকার কথা।'

আহ...

বুঝতে পারল গ্রে। 'আমাদের সাঁতরে ওখানে উঠতে বলছ তো?'

ফিরে এল পালুর হাসি। 'ওখানে উঠলে, আমরা শত্রুদের বেকায়দা অবস্থায় পাব।'

চাঁদের দিকে তাকাল গ্রে।

সময় হয়েছে।

কেবিনের দিকে এগোল সে। 'সবাইকে বলা যাক।'

রাত ১২:১২

বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার ভান করছে শেইচান।

কোয়ালস্কি অবশ্য কেবিনের অন্যপাশে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এমনভাবে যে মনে হচ্ছে কেউ ওর গলা টিপে ধরেছে! কেবিনের আরেক ধারে ফিসফিস করে কথা বলছে কিন এবং আইকো। সেদিকে অবশ্য নজর নেই শেইচানের।

পেটের উপর হাত রেখে ভাবছে মেয়েটি। বুঝতে চাইছে, কী ঘটছে ওর দেহাভ্যন্তরে। যোগ বন্ধ করে কল্পনা করছে, ছোট ছোট লার্ভা দখল করে নিচ্ছে ওর দেহ। যেমনভাবে পোকা খেয়ে ফেলে রসালো আপেল। ওগুলোর কোন লক্ষণ

অবশ্য এখনও পর্যন্ত টের পাচ্ছে না। ব্যথাও নেই কোন। তবে প্রফেসরের কথা মোতাবেক, অচিরেই তা শুরু হবে।

এদিকে হাত নিয়ে নিজের ভেতরে বেড়ে উঠতে থাকা অন্য জীবনটার লক্ষণ খুঁজতে চাইছে।

আর কত সময় লাগবে তোমার।

এখানে আসার সময়, গ্রে এই গর্ভের ব্যাপারে জানতে চেয়েছে অনেকবার। কিন্তু কাটাকাটা জবাব দিয়েছে কেবল শেইচান।

সম্ভবত ছয় সপ্তাহ চলে।

ছয় সপ্তাহের বাচ্চার ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইল মানসপটে। ওর জানা মতে, এই বয়সে তার আকৃতি হয় ডালিমের বিচির সমান। তবে হৃৎস্পন্দন চলে আসার কথা, যদিও কোন স্টেথোস্কোপে ধরা পড়বে না। আল্ট্রাসাউন্ডে অবশ্য পড়তে পারে। এই মুহূর্তে সম্ভবত বাচ্চাটার মস্তিষ্ক দুইভাগে ভাগ হতে শুরু করেছে, আদান-প্রদান হচ্ছে ইলেকট্রিকাল ইমপালসের।

আমাকে আগে বলনি কেন?

গ্রের আহত কণ্ঠটা এখনও কানে বাজছে ওর। কেবল মাথা নেড়েছিল শেইচান। নিজেও জানে, কেন বলেনি গ্রেকে। অথবা হয়তো জানে, কিন্তু ভাবতে চাইছে না সেটা।

বাচ্চাটাকে কী রাখতে-?

প্রশ্নটাকে কড়া চোখে তাকিয়েই থামিয়ে দিয়েছিল শেইচান।

এখন অবশ্য আমার চাওয়া-না চাওয়ায় কিছু যায় আসে না।

সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যেকোন মুহূর্তে কেড়ে নেয়া হবে ওর কাছ থেকে, হয়তো এরিমাঝে নেয়া হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিত করে এখন আর কিছুই বলতে পারবে না।

আশা না রাখাই ভালো।

কিন্তু আশা ছাড়া, কোন সিদ্ধান্ত নেবেই বা কী করে?

তাই একটা কথাকে চোখের মণি করে রেখেছে।

আশা ওর বাচ্চাকে বাঁচাতে পারবে না।

এরচেয়ে উত্তম পথটা ভালো করেই জানা আছে শেইচানের।

প্রতিশোধ।

যদি ওর রোগের কোন প্রতিষেধক থেকে থাকে, যেটা ওকে এবং ওর বাচ্চাকে বাঁচাতে পারবে, তাহলে সেটাকে অবশ্যই খুঁজে বের করবে শেইচান। সেই সাথে এসবের জন্য দায়ী লোকগুলোকে পাকড়াও করবে...

...অথবা খুন করবে।

ভাবনাটা ওর দেহে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিল যেন। হাতের তালুটাকে আবারও পেটের উপর রাখল সে।

আমার বাচ্চা...

আচমকা খুলে গেল কেবিনটার দরজা। না তাকিয়েই বুঝতে পারল, কে ভেতরে প্রবেশ করেছে। মানুষটার শ্বাস, তার গন্ধ খুব পরিচিত ওর। তলপেটের উপর এসে থামল ওর হাত। ক্ষণিকের আশায় ভরে উঠল ওর মন।

আমাদের বাচ্চা...

রাত ১২:৩২

স্টারবোর্ড রেইলের উপর হেলান দিল গ্রে। সবার শেষে পানিতে নামছে ও। পিঠে বাঁধা স্কুবা ট্যাঙ্কটা ওকে গভীরে নিয়ে যাচ্ছে।

কব্জিতে বাঁধা ডাইভ কম্পিউটারটা যখন বিশ ফুট গভীরতা দেখাচ্ছে, তখন ওর বয়েন্সি কমপেন্সেটরটাকে ঠিক করল গ্রে। ভাসতে ভাসতে ডিভিএস-১১০ ড্রাইভার নাইট-ভিশন সিস্টেমটাকে নামিয়ে আনল চোখের উপর। পেইন্টারের সাহায্যে এসব যোগাড় করেছে মাউইতে থাকতেই।

পানির উপর নজর বোলাল গ্রে। অন্য পাঁচজনকে গিলে খেয়েছে অন্ধকার। অবয়ব দেখা যাচ্ছে কেবল। একটা আলট্রা ভায়োলেট পেন-লাইট নাড়িয়ে ওদেরকে ইঙ্গিত দিল সে, দ্বীপের দিকে তাক করল। সবাই বুড়ো আঙুল দেখাল ওকে।

অন্ধকারে সাঁতরাতে পারলেই খুশি হতো ও, কিন্তু সাথে বেসামরিকরাও আছে। ইউভি পেন-লাইটটার ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই গ্রে-র, কিন্তু অতটুকুই। নইলে আইকো এবং কিন হয় পেতে পারে। এই মিশনের জন্য প্রফেসরকে দরকার হতে পারে। এদিকে জাপানিজ মহিলাটা নৌকায় থাকতে কোনক্রমেই রাজী হয়নি। বলেছে, জাপানিজ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে হলে ওকে প্রমাণ জোগাড় করতে হবে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে গ্রে-কে। সময় কম হাতে, তাই বেশি সাবধান হবার সুযোগ নেই। গ্রে, শেইচান এবং কোয়ালস্কিকে দায়িত্ব নিতে হবে, অন্যদেরকে রক্ষা করার। পালু হবে দলের গাইড। হাওয়াইয়ান লোকটার ওদের দলের একমাত্র লোক, যে ইকিকাউও দ্বীপে পা রেখেছে।

রওয়ানা দেবার জন্য প্রস্তুত গ্রে। বুকের কাছে একটা স্কুবাজেট লাগানো আছে। টর্পেডো আকৃতির প্রপালশন সিস্টেমটা ওর হাতের চাইতে একটু বড়। তবে ভারি কোন ড্রাইভারকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

অন্যরা ওকে অনুসরণ করছে, সেটা নিশ্চিত করল ও। অল্প গতিতে এগোল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসাথে কোন ফাইটার স্কোয়াড্রনের মতো এগোতে লাগল

ওরা। সন্তুষ্ট হয়ে গতি বাড়াল গ্রে, ঘণ্টায় ছয় মাইলের একটু নিচে রাখল। বিশ মিনিটের মাঝে দুই মাইল দূরের সৈকতে পৌঁছবে ওরা।

পালুর দুই জ্ঞাতি ভাই কাটামারানটাকে অল্প গতিতে নিয়ে যাবে কিছুটা দূরে। ভাব এমন ধরবে, যেন দূরে চলে যাচ্ছে। দ্বীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে, তবে একটা চোখ রেখেছে অন্যদের উপরে। কষ্টই হচ্ছে কাজটা করতে। নাইট ভিশন স্কোপটার সাহায্যে দেখতে পাচ্ছে চারপাশ। মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের সবগুলো প্রাণ নিজেদের মতো করে উজ্জ্বলতা পেয়ে গিয়েছে।

সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে।

অদ্ভুত সব দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছে। শৈবালে ভরে থাকা নোঙরের অর্ধেকটা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা প্লেনের উপর গড়ে ওঠা শৈলশিরা; এমনকি একটা পুরাতন বো-গানের ব্যারেলও দেখা যাচ্ছে। মিডওয়েতে ঘটা বীভৎস সেই যুদ্ধের সাক্ষী ওগুলো।

এগিয়ে যাচ্ছে গ্রে। যতই এগোচ্ছে, ততই অন্ধকার বেড়ে যাচ্ছে চারপাশে। এমনকি শৈবালগুলোরও আর দেখা নেই, সেগুলোর স্থান করে নিয়েছে বালু। অচিরেই দেখা গেল, সমুদ্র তলটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেই সাথে ও নিজেও।

দ্বীপের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওরা।

লাইট এবং স্কুবা জেট, দুটোকেই বন্ধ করে দিল গ্রে। অন্ধকার ধূসরে ভরে গেল ওর চারপাশ। কম্পাস আর জিপিএসের সাহায্য নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল ও। অন্যদেরকে পানির নিচেই থাকার ইঙ্গিত দিয়ে, নিজে উঠে গেল উপরে।

অন্ধকার ছায়া দেখে বুঝতে পারল, ওটা একটা গুহা। পালু আগেই গুহাটার অবস্থান জানিয়েছে ওকে।

ওর আগমনে কোন অ্যালার্ম বেজে উঠল না দেখে, অন্যদেরকে এগোবার ইঙ্গিত দিল সে। ইঙ্গিত পেয়ে পানি থেকে উঠে এল সবাই। ট্যাঙ্ক এবং ভেস্ট খুলে ফেলল। গুহার অন্ধকারে রেখে দিল সবগুলো, তবে ভেজা স্যুটগুলো পরে আছে। অন্ধকার পোশাকটা ক্যামোফ্লাজের কাজ করবে।

'অসাধারণ অভিজ্ঞতা,' দম বন্ধ করে বলল গ্রে, এখনও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

'এবার কিন্তু কাজ কঠিন হয়ে যাবে।' সাবধান করে দিল গ্রে। 'এখন থেকে পশ্চিম দিকে এক মাইল দূরে অবস্থিত পুরনো ওই কোস্ট গার্ড স্টেশন। আমাদের ধরে নিতে হবে, সৈকতটার উপর নজর রাখবে শত্রুতা। তাই চুপচাপে ওই পাহাড়টা পার হতে হবে আমাদের। ভেতরের হ্রদটার পূর্ব দিকে পৌঁছতে হবে আমাদের।'

‘আমরা ওটাকে ডাকি মেক লুয়াউই বলে।’ ফিসফিস করে বলল পালু। ‘মানে, মৃত্যুকূপ।’

‘নামটা পছন্দ হলো না।’ বিড়বিড় করে বলল কোয়ালস্কি।

শ্রাগ করল পালু। ‘হ্রদটা আসলে খুব লবণাক্ত, পানি পান করা যায় না।’

হাওয়াইয়ান লোকটা গুহার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। এক মুহূর্ত আগে, গ্রের অনুমতি নিয়েই লাইটার জ্বালিয়েছে সে। ছোট্ট আগুন শিখাটাকে সামলাচ্ছে হাত দিয়ে। হাল্কা আলোয়ে দেখা যাচ্ছে গুহার দেয়ালের পেট্রোগ্লিফগুলো। নানা আকৃতিতে আঁকা হয়েছে নানা ছবি। পালুর কাঁধ ঝুঁকে আছে দুঃখে।

কোয়ালস্কি বিশালদেহী লোকটার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে আচমকা একটা পেট্রোগ্লিফের দিকে ইঙ্গিত করল। গর্বিত কণ্ঠে বলল, ‘দেখ, একটা তিমি!’

‘কোহোলা, দোস্ত,’ বলল পালু, হাসি ফিরে এসেছে মুখে। ‘আমরা ওদেরকে এই নামেই ডাকি। সম্মান দেখাও। আমাদের পরিবারের দেবতা সে।’ গর্বে ভরে উঠল ওর বুক। থাবা দিয়ে বলল, ‘এজন্যই সম্ভবত আমরা, কেইকিকানেয়ারেরা এত বড় হই!’

ঘুরে তাকাল কোয়ালস্কি, মাথাটা বাড়ি খেল গুহার ছাদের সাথে। মাথা ডলল সে। ‘কোলাকে আমারও দেবতা বানাতে হবে দেখি।’

‘কোহোলা,’ ওকে সাবধান করে দিল পালু।

‘বুঝতে পেরেছি, কোলা।’

‘চলবে, দোস্ত।’

বিশালদেহী দুইজনকে কাছে ডেকে, পরিকল্পনাটা জানাল গ্রে। ‘হ্রদে পৌছবার পর, আবার পানির নিচ দিয়ে এগোব। তবে এবার কোন আলো জ্বালাব না।’

কিন এবং আইকোর দিকে তাকাল সে, ওদের আপত্তি আছে কিনা দেখার জন্য। দুইজনেই মাথা নেড়ে জানাল, আপত্তি নেই। তবে কিনকে ভয়ার্ত দেখাচ্ছিল।

দোষ দেয়া যায় না।

‘আশা করি, ধরা না পড়েই আমরা লক্ষ্যে পৌছতে পারব।’

শেইচান ওর পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর... আচমকা আঁকড়ে ধরল ওর বাঁ পাশ। ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকে আছে।

মেয়েটার কনুই ধরল ও। ‘ঠিক আছ?’

‘মাংসপেশিতে টান লেগেছে,’ হাত সরিয়ে নিল শেইচান। ‘এই তো।’

দুশ্চিন্তা নিয়ে কিনের দিকে তাকাল গ্রে। লোকটাকে আরও বেশি ভীত দেখাচ্ছে।

প্রথম ইনস্টার

ক্রিম রঙা লার্ভাটা অন্ধের মতো এগিয়ে যাচ্ছে মাংসপেশির ভেতর দিকে। ওটার দশটা খণ্ডের প্রতিটাই কাটা-যুক্ত। রগ এবং মেদ ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলোর সাহায্যে। রক্ত এবং মাংস খেয়ে ধীরে সুস্থেই এগোচ্ছে।

ডিম ভেঙে বেরিয়েছে কয়েক ঘণ্টার বেশি হয়নি। তবে আকারে বেড়েছে আগের চাইতেও কমপক্ষে দশ গুণ। দৈর্ঘ্যে এখন প্রায় অর্ধ মিলিমিটার লম্বা ওটা। ইলাস্টিক চামড়ায় অবস্থিত সংবেদী নেটগুলো এই অকস্মাৎ আকৃতি বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। হরমোন স্রোতের মতো বইছে ওর দেহে। পুরনো চামড়ার নিচে তৈরি হচ্ছে নতুন চামড়া। পরবর্তী পরিবর্তনের জন্য তৈরি হচ্ছে।

তবে তার আগে দরকার খাবার: দৈর্ঘ্য বাড়াবার জন্য চিনি, প্রস্থের বিস্তৃতির জন্য প্রোটিন এবং ভবিষ্যতের জন্য ফ্যাট।

এই ক্ষুধার কোন সীমা নেই... নেই কোন শেষ।

আরও ভেতরে গেল ওটা, কৌশিক জালিকা ছিঁড়ে ফেলল। খণ্ডগুলো যেন গোসল করল রক্তে। হিমোগ্লোবিন থেকে রক্ত শুষে নিচ্ছে। নতুন করে শক্তি পেয়ে, নব উদ্যমে এগোল সামনের দিকে।

পেছনে রেখে গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা, সেই সাথে রাসায়নিক যৌগ।

এদের মাঝে ছিল কিছু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালও। যেন ওর পেছনে ফেলে আসা পথে ইনফেকশন না হয়ে যায়।

পোষককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে... বাঁচাতে হবে খাবারকে।

ওসব কণার কয়েকটা মাঝে রয়েছে এমনসব বায়োকেমিক্যাল, যেগুলো পোষক দেহে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে। পোষকের দেখে নেটওয়ার্ক ভেসেলগুলো অন্যান্য লার্ভাদের কাছে তথ্য পাঠাচ্ছে।

জানাচ্ছে, কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে না।

অচিরেই যে চামড়া ভের করে বেরোবে, সেটায় অবস্থিত স্নায়ু সংবেদী হয়ে উঠল শব্দ পেয়ে। সামনে যে মাংসপেশি আছে, সেটা এই পোষককে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রতিক্ষণেই হচ্ছে শব্দটা।
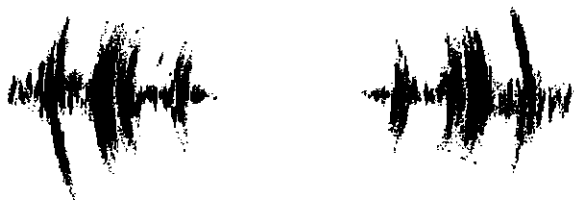
চার হাজার লার্ভার প্রতিটাই দূরে থাকতে শব্দের উৎস থেকে। জানে, এখান থেকে খাবার আরোহণ করা যাবে না।

পোষককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে... বাঁচাতে হবে খাবারকে।

ধপধপ করতে থাকে শব্দটা থেকে দূরে সরে রইল লার্ভাটা। আরও ভেতরে ঢুকছে ওটা, এমন সময় সরু একটা স্নায়ুর সাথে ঘষা গেল। ওদিকের মাংসপেশিগুলো সাথে সাথে হয়ে গেল সংকুচিত। বেঁকে গেল লার্ভা, সরে এল জায়গাটার কাছ থেকে।

উপর থেকে নিচে নেমে আসছে ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়ালের ঢেউ।

লার্ভাটা আবারও বুঝতে পারল, ওখান থেকে সরে যেতে হবে। কারণ একটাই।

পোষককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে... বাঁচাতে হবে খাবারকে।

সামনের পথ খোলাই আছে, তাই আরও ভেতরে ঢুকল সে।

আরেকটা কৌশিক জালিকা ছিঁড়ে ফেলল খণ্ডের কাঁটাগুলো, তৈরি হলো নতুন একটা সতর্কবাণী। অন্যান্য লার্ভা এই পোষকের দেহে নতুন একটা স্পন্দনের উপস্থিতি টের পেয়েছে। সেখান থেকে স্নায়বিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণও দেখা যাচ্ছে।

এই লার্ভা-অন্য লার্ভাদের মতোই-নতুন এই বার্তা মেনে চলছে। সহস্রাব্দের শিক্ষা ভোলে কী করে?

লক্ষ্য তার খুব সাধারণ এবং প্রাচীন।

খাও এবং বেড়ে ওঠো...
তবে... বাঁচিয়ে রাখতে হবে পোষক, তথা খাবারকেও।
শেষ এই সতর্কবাণীটা কেবল এখনকার জন্য।

অধ্যায় বিশ

৮ মে, দুপুর ২:০৮
টালিন, রিপাবলিক অফ এস্টোনিয়া

ডিরেক্টর টামের দেহের উপর ঝুঁকে আছে ক্যাট। ওর আঙুলের ফাঁক গলে ঝরে পড়ছে উষ্ণ রক্ত। যথাসম্ভব চাপ দিয়ে আছে গলার ক্ষতে। পাথুরে মেঝেতে মাথা আছড়ে পড়ায়, জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। তবে শ্বাস নিচ্ছে এখনও।

কিন্তু আর কতক্ষণ নেবে?

ডিরেক্টর-কন্যা, লারা, এখনও চমক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ইলেনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্যাম, দেখতে দিতে চাইছেন না দৃশ্যটাকে। একই সাথে ফোন নিয়েও ব্যস্ত তিনি। পুরু দরজায় এসে আছাড় খাচ্ছে বুলেট। বাইরের দিকে লাগানো ইস্পাতে বাড়ি খাচ্ছে। গুলির আওয়াজ নেই, নিশ্চয়ই সাইলেন্সার লাগানো আছে অস্ত্রে।

'সিগন্যাল পাচ্ছি না,' বললেন স্যাম, ফোনটাকে আরও উঁচুতে ধরে রেখেছেন।

পাথরের পুরু দেয়ালের জন্য হচ্ছে সমস্যাটা, ভাবল ক্যাট।

অথবা কেউ জ্যামার ব্যবহার করছে।

দরজার দিকে তাকাল সে। মোদ্দাকথা, সাধারণ চোর নয় আক্রমণকারীরা।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গুলি, আরও বেশি আতঙ্কের জন্ম দিল ব্যাপারটা। শত্রুপক্ষ সম্ভবত দরজা উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে! একই চিন্তা খেলে গেল মঙ্কের মাথাতেও। দরজা এখনও আটকে ধরে আছে ও। ল্যাচ নামিয়েছে বটে, তবে তাতে খুব একটা কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ঘরের সাজের সাথে মিল রাখার জন্যই কেবল ওটার অবস্থান। 'দরকারের সময় আর গোপন পথ পাওয়া যায় না!'

একবার ভাবল ক্যাট, ভারি টেবিলটা দরজার সামনে এনে রাখলে, সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত টিকে থাকা যাবে কিনা। পরক্ষণেই বাদ দিল সেই চিন্তা। ওই কাজটা করলে ডিরেক্টর তো মরবেই, আরও দুই-একজন তার সঙ্গী হতে পারে।

অন্য কোন পথে এগোতে হবে।

ক্যাট এবং মঙ্ক, দুইজনের কাছেই সাইড আর্মস আছে। সিগ সয়্যার পি২২৬ মডেলের, জ্যাকেটের নিচেই আছে অস্ত্রগুলো। কিন্তু লাইব্রেরীতে গোলাগুলি শুরু করে পার পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ঘরের একমাত্র জানালার দিকে তাকাল সে। খানিক আগে বাইরের দৃশ্য দেখেছে ওটা দিয়ে। খাড়া আট তলা নিচের পার্কিং লট। দালানটার বাইরের দিকটা, লাইমস্টোনের ইট দিয়ে এমনভাবে বানানো যে আঙুল পর্যন্ত ঢোকে না। দুই তলা নিচে অবস্থা সৌন্দর্যের জন্য সরু একটা তাক।

হিসাব করে নিল সে।

মঙ্কের সাহায্য নিয়ে হয়তো...

স্ত্রীর মনোযোগের লক্ষ্যবস্তু নজর কাড়ল মঙ্কেরও। মেয়েটার পরিকল্পনা বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না ওর।

'পাগলামি, পুরোই পাগলামি।' বলল মঙ্ক। 'কিন্তু এই একটা কারণেই তো তোমাকে বিয়ে করেছি।'

দুপুর ২:১০

লারার সাথে লাইব্রেরি টেবিলের নিচে বসে আছেন ইলেনা। ওদের পাশেই আছেন স্যাম, সাথে টামের অনড় দেহ। ক্যাটের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন তিনি, চাপ দিয়ে ধরে রেখেছেন ডিরেক্টরের গলার ক্ষত।

সময় নেই বেশি।

ক্যাটও একই কথা ভাবল, তবে ভিন্ন কারণে। বন্ধ দরজাটার সাথে কান লাগিয়ে রেখেছিল, এখন সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'কিছু একটা করছে বলে মনে হচ্ছে।'

'সম্ভবত বোমা বসাচ্ছে।' সাবধান করে দিল মঙ্ক।

'তাহলে চলো, শুরু করা যাক।' দৌড়ে টেবিলের কাছে চলে এল সে।

প্রাচীন একটা বর্ম তোলার কাজে ব্যস্ত ছিল মঙ্ক। ওটাকে অবশেষে কাঁধে তুলতে পারল। স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো জানালার কাছে। ওজনের চাপে গুঙিয়ে উঠল তারপর।

সেই আওয়াজের সঙ্গী হলো কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ।

লুকানো জায়গা থেকে বের না হয়েও ইলেনা বুঝতে পারলেন, জানালা ভেঙে পার্কিং লটের দিকে ছুটে যাচ্ছে বর্মটা।

'জলদি!' তাড়া লাগাল ক্যাট।

ভাঙা জানালা দিয়ে, ভেতরে প্রবেশ করছে গানের সুর। নিশ্চয়ই টালিনের পুরনো অংশের উৎসব থেকে ভেসে আসছে আওয়াজটা। 'জলদি... জলদি... জলদি!' আবার তাড়া দিল ক্যাট।

তীব্র দুটো বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠলেন ইলেনা। ঘুরে, দরজার দিকে নজর দিলেন তিনি। ধোঁয়া উড়ছে, আচমকা একটা ধাতব বস্তু ছুটে এল ঘরের ভেতর। পাথুরে মেঝেতে এমনভাবে লাফ খেল যেন ওটা কোন পাথরের টুকরা, পানির তলে ছুঁড়ে মারা হয়েছে!

বিশাল দরজাটা ভেতরের দিকে পড়েছে, কেঁপে উঠল যেন ঘরটা। ওটার উপর শোনা গেল বুটের আওয়াজ। চারজন মানুষ ভেতরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ল।

পেটের উপর শুয়ে পড়ে, জানালার দিকে তাকালেন ইলেনা।

মঙ্কের হাত জানালার নিচের ধারটা ধরে আছে। নড়ছে আঙুলগুলো, আরও শক্ত করে ধরার প্রয়াস পাচ্ছে যেন। সমস্যা হলো, আপ্রাণ এই চেষ্টা আরও একজনের নজর কেড়েছে। চিৎকার করে উঠল কেউ কেউ। জাপানিজ ভাষায়... সম্ভবত আরবিতেও।

মুখোশ পড়া দুইজন মানুষ অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। টেবিলের দুই দিক দিয়ে দু'জনে ছুটে গেল জানালার দিকে। হাত দিয়ে মাথা ঢাকল ইলেনা। কেবল মাত্র একটা হাত দেখে দুইজনের চেহারায় কেমন বিস্ময় ফুটে উঠবে, সেটা ভাবছে।

প্রত্যাশিতই ছিল বিস্ফোরণটা, তারপরও আঁতকে উঠতে বাধ্য হলেন তিনি। আগেই মঙ্কের কাছে শুনেছেন, নকল হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখা আছে এক প্যাকেট সি-ফোর। বিস্ফোরণের ধাক্কায়, ঘরের উল্টো দিকে আছড়ে পড়ল লোক দু'জন। এমনকি টেবিলটাও সরে গেল দুই ফুট। চেয়ার এবং বইয়ের কথা না হয় বাদই থাক।

শত্রুদের সামলে নেবার সুযোগ না দিয়ে, দুইপাশের তাকের উপরে অবস্থান নেয়া মঙ্ক এবং ক্যাট গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

কাজে লেগেছে ফন্দিটা।

দুইজনের গুলির তোপে, মেঝেতে আছড়ে পড়ল দুই মুখোশ-ধারী। সাথে সাথে মেঝেতে নেমে এল দুই সিগমা এজেন্ট। বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে দৌড়ে গেল দরজার দিকে। একই সাথে দোরগোড়া পার হলো ওরা, ক্ষণিকের জন্য থেমে গড়ান দিয়ে চলে এল হলওয়েতে। পরস্পরকে সুরক্ষা দিচ্ছে।

'কেউ নেই, বেরিয়ে আসুন।' বলল ক্যাট।

বুকে হেঁটে সামনের দিকে এগোলেন ইলেনা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বাবার ক্ষত ধরে রাখার ভার মেয়ের হাতে তুলে দিলেন স্যাম। 'আমি দুঃখিত।' বললেন তিনি। সান্ত্বনা দিলেন ইলেনাও। লারার হাত ধরে বললেন, 'মেডিক্যাল টিম পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এছাড়া আর কিছু করারও নেই। মেয়েটাকে একা ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না তার। কিন্তু ক্যাট যখন বলল, আরও আততায়ী থাকলে এখানে ওদের উপস্থিতি মৃতের সংখ্যা বাড়াবে, তখন আর কিছু করার ছিল না।

পালাতে হবে ওদের... তবে সদর দরজা দিয়ে না।

লারার স্টাফ ব্যাজটা নিয়ে নিয়েছেন ইলেনা। হলওয়ের অন্যপাশে অবস্থিত এলিভেটরটা এখন কাজে লাগানো যাবে। আপাতত ওটা ধরে বেজমেন্টে যাওয়ার পরিকল্পনা ওদের। কর্মচারীদের পার্কিং লট হয়ে বাইরে বেরোবে। আশা করা যায়, ওদিকে কারও নজর থাকবে না।

স্যামকে সাথে নিয়ে পালাতে পালাতে, একবার পেছন ফিরে চাইলেন ইলেনা। ধোঁয়া উড়ছে ঘরের ভেতরে। ভাঙা পুতুলের মতো ইতস্তত পড়ে আছে মরদেহ। কিন্তু এসব না, তার নজর স্থির হলো উড়তে থাকা কাগজগুলোর উপর। স্মিথসনের ইতিহাস...

...আর নেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাটকে অনুসরণ করলেন তিনি। সবার সামনে ছুটছে মেয়েটা, পেছনেই আছে মঙ্ক। চশমার সাথে ঝুলতে থাকা ক্রুশ দুটোকে আঁকড়ে ধরলেন তিনি। প্রার্থনা করলেন, স্মিথসনের পথে চলতে গিয়ে যেন আরও রক্তের সম্মুখীন হতে না হয়।

আশা করতে তো আর দোষ নেই, তাই না?

দুপুর ২:৪৪

উজ্জ্বল বিকালের আলোয় লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে, ওল্ড টাউনের ভিড় ঠেলে দলকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাট।

একটু আগের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে এখন আর দু:স্বপ্নের চাইতে বেশি কিছু বলে মনে হচ্ছে না। উৎসবে উপস্থিত কেউ টের পায়নি, সম্ভবত বিশাল ওই দালানের পেছন দিকে সব ঘটনা ঘটেছে বলে।

বেজমেন্টে পৌঁছেই ক্যাট কর্তৃপক্ষকে সব জানিয়েছে। ডিরেক্টরের অবস্থা সম্পর্কে ওখানে উপস্থিত কয়েকজন কর্মচারীকেও জানিয়েছে। লারাকে সাহায্য করার অনুরোধ করেছে ক্যাট। প্রথমে নিজেদের মাঝে এই দলটার উপস্থিতিতে সন্দেহ হয়েছে কর্মচারীদের; কিন্তু ওর হাতের অস্ত্রটা দেখার পর, আর কোন প্রশ্ন করার সাহস পায়নি।

বাইরে বেরোবার পর, সরাসরি উৎসবের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে ক্যাট। পার্ক করা সেডানের কাছে যাবার কথা ভুলেও ভাবেনি। সন্দেহ নেই, নজর রাখা

হচ্ছে ওটার উপর। তারচেয়ে বড় কথা, ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেলে, অনুসরণকারী ধোঁকা খেয়ে যাবে। আপাতত ওর লক্ষ্য-লাইব্রেরির সাথে যথাসম্ভব দূরত্ব বাড়ানো। তারপর নাহয় ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

ফোনের জিপিএস ম্যাপের দিকে তাকাল সে। মধ্যযুগীয় রাস্তার এই গোলকধাঁধায় যেন হারিয়ে যেতে নাহয়, সেজন্যই। বাঁ দিকে অবস্থিত পরবর্তী রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাট। 'ওই দিকে।'

পেছন ফিরে তাকানো মাত্র মাথা নাড়লেন ইলেনা এবং স্যাম। তবে চেহারা বিকৃত হয়ে আছে। স্বামীর চোখে চোখ পড়ল ক্যাটের। মঙ্কও এই দু'জনের অবস্থা বুঝতে পারছে। তাই সাবধান করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

মাথা নাড়ল ক্যাট। বুঝতে পেয়েছে মঙ্কের ইশারা। দুই গবেষকের পক্ষে আর বেশিক্ষণ সহ্য করা অসম্ভব।

এই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হয়েছে। সময় হয়েছে ট্যাক্সি ধরে বিমানবন্দরে যাবার।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ক্যাট মোটরসাইকেলের আওয়াজ শুনতে পেলেও, অগ্রাহ্য করল। দৃশ্যটা স্বাভাবিক। ওল্ড টাউনের এই সরু রাস্তায় কেবল বাইক, ভেসপা আর ছোট ইউরোপিয়ান দুই সিটের গাড়ির চলার সাহস করে।

তারপরও ঘুরে দাঁড়াল কেন যেন, ঘাড়ের উপরের ছোট ছোট পশমগুলো খাড়া হয়ে গিয়েছে। এই সতর্কতাকে সম্মান দিতে শিখেছে সে। জানে, মন বিপদ ধরতে পারার আগেই ওর শরীর বিপদের উপস্থিতি জানান দেয়। দুইজন আরোহী বসে আছে মোটরসাইকেলে, দু'জনই হেলমেট পরা। কিন্তু এরা উৎসবে অংশ নিতে আসেনি, দেহভঙ্গিতে সামরিক হাব-ভাব।

আফসোসের কথা, এক মুহূর্তের ভগ্নাংশ পরিমাণ বেশি সময় তাকিয়ে রইল ক্যাট।

বোকা...

মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন যেন গর্জে উঠল। হোলস্টারে পুরে রাখা অস্ত্রের দিকে হাত গেল ওর। মঙ্ক দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে পাশে সরে দাঁড়াল, ওর হাতও চলে গিয়েছে অস্ত্রের বাঁটে।

দু'জনেই দেরি করে ফেলেছে।

অস্ত্র বের করার আগেই পৌঁছে গিয়েছে মোটরসাইকেল। মঙ্কের দিকে লাথি হাঁকাল ড্রাইভার, বেচারা আছড়ে পড়ল একটা দেয়ালের উপর। ক্যাট অস্ত্র বের করতে সক্ষম হলো বটে, কিন্তু সাইকেলটা ততক্ষণে যেন ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। বিন্দুমাত্র গতি কমাল না ড্রাইভার, আর পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে দিল

আরোহী। ইলেনার কোমর আঁকড়ে ধরে কোলের উপর নিয়ে এলো মহিলাকে, কালক্ষেপণ না করে গলায় ঢুকিয়ে দিল সিরিঞ্জ।

রাস্তায় গর্জন তুলে ঘুরে গেল মোটরসাইকেলের চাকা।

বের করে আনা অস্ত্র তুলে ধরল ক্যাট। কিন্তু ততক্ষণে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে বাহনটা। গুলি করার সুযোগ নেই। তাই দৌড়ে গেল গলি মুখে, ওটার ভেতর দিয়েই উধাও হয়েছে ওটা।

ভিড়ের মাঝে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে মোটরসাইকেলটা। তারচেয়ে বড় সমস্যা হলো, গলিটার একপাশ ধরে খালি দোকান আর দোকান। সবগুলো পর্দা টানা, ফলে তাদের নিচে তৈরি হয়েছে অন্ধকার একটা টানেল।

ক্ষণিকের জন্য অপহরণকারীদের হারিয়ে ফেলল সে।

ওর কাছে দৌড়ে গেল মঙ্ক।

ঘুরে দাঁড়াল ক্যাট। 'আমাকে উপরে তোল।'

প্রশ্ন করার ঝামেলায় গেল না মঙ্ক। ক্যাট যা বলে, তাই করল। পর্দার উপর গিয়ে পড়ল মেয়েটা, টানটান কাপড়ের উপর পা রেখেই ছুটতে শুরু করল।

পুরোটা পথ দৌড়ে গেল ক্যাট, মাঝেমাঝে লাফিয়ে পার হলো পর্দা না থাকা জায়গাটুকু। ভিড়ের কারণে গতি কমাতে বা হারাতে হলো না ওকে। মনে মনে প্রার্থনা করল, বাহনটা যেন ভিড়ের কারণে গতি হারিয়ে ফেলে। নইলে ওদের ধরার আর কোন উপায় নেই।

ইঞ্জিনের আওয়াজের জন্য কান খাড়া করে রাখল সে।

শুনতেও পেল।

বড়জোর আর বিশ গজ দূরে।

দৌড়াতে শুরু করল ও, দূরত্বটা কমিয়ে আনতে চাইছে।

কপাল মন্দ ওর, গলির শেষ মাথায় চলে এসেছে। এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত, টাইল করা ব্রিজ দেখা যাচ্ছে সামনে। মধ্যযুগীয় শহরের দেয়ালে অবস্থিত দরজা ওটার নিচে। অপহরণকারীরা ওল্ড টাউন থেকে বেরোতে পারলে, ওদেরকে আর ধরা সম্ভব হবে না।

দৌড়াবার গতি বাড়িয়ে দিল ক্যাট, প্রায় সাথে সাথেই দেখতে পেল সমস্যাটা।

ছোট্ট একটা চত্বর আছে দরজাটার সামনে। ক্যানোপির সারি গিয়ে শেষ হয়েছে প্লাযার খানিকটা সামনে। দৌড়াবার পথ আর বাকি নেই বেশি।

তারপরও গতি কমাল না ক্যাট।

একদম কাছে এসে, মোটরসাইকেলটা দেখতে পেল সে। চত্বরের ভেতর দিকে যাচ্ছে। উপস্থিত জনসাধারণ সরে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে। তবে একজন পারল না,

বাহনের সামনে গিয়ে পড়ল। রণপা পরে আছে লোকটা। দুই পায়ের একটা খুলে গেল। কপালকে ধন্যবাদ জানালো ক্যাট, বেল্টে ঢুকিয়ে রাখল অস্ত্রটা।

একেবারে শেষ প্রান্তে এসে, লাফ দিল সে। খুলে আসা রণপাটাকে পোল-ভল্টের স্টিক হিসাবে ব্যবহার করল মেয়েটা। এক লাফে পার হয়ে গেল মোটরসাইকেল, ওকে আসতে দেখে আঁতকে উঠল উপস্থিত লোকজন। দুই পায়ের উপর নামার আগেই দেহটাকে মুচড়ে দিল ক্যাট। বাইকের দিকে মুখ করেই মাটিতে নেমে এল তাই।

সরাসরি ওর দিকে ছুটে এল মোটরসাইকেল।

বেল্টে গোঁজা অস্ত্র বের করে, এক হাতে তাক করল ক্যাট। লম্বা শ্বাস নিয়ে গুলি ছুঁড়ল।

সাথে সাথে হেলমেটের কাঁচে ধরল ফাটল।

একপাশে পড়ে গেল বাহনটা। ক্যাটের বাঁ পাশ দিয়ে ছিটকে চলে গেল। আরোহী একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়েছে। ওকে উঠতে দেখে সেদিকে নল তাক করল ক্যাট। কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে হা করে দৃশ্য গিলতে থাকা মানুষগুলোর দিকে ছুট লাগাল আরোহী।

ক্যাট পিছু নিল।

লাফ দেবার সময়, ইলেনাকে ছেড়ে দিয়েছে আরোহী। উঠে বসার চেষ্টা করলেন তিনি। তবে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ঘোরের মাঝে আছেন। তাকে সাহায্য করল ক্যাট। 'আপনি ঠিক আছেন?'

নিজের হাত-পায়ের দিকে তাকালেন ইলেনা, তারপর সামনে দাঁড়ানো ভিড়ের দিকে। 'ম... মনে হয়।'

হর্নের জোরালো আওয়াজে গলির দিকে ফিরে গেল তাদের নজর। ছোট একটা সবুজ মিনি কুপার এসে ঢুকেছে চত্বরে। এরিমধ্যে পথ ছেড়ে দুইপাশে সরে যাচ্ছে উপস্থিত জনতা।

ইলেনার সামনে দাঁড়িয়ে সিগটা তুলে ধরল ক্যাট। পরক্ষণেই হুইলের পেছনে মঙ্ককে দেখতে পেয়ে নামিয়ে নিল। ওদের পাশে গাড়িটা নিয়ে এল মঙ্ক, একবারে থামিয়ে বলল, 'উঠে পড়ো।'

পেছনের দরজা খুলে দিলেন স্যাম।

ইলেনাকে উঠতে সাহায্য করল ক্যাট। 'যাও!'

সাথে সাথে ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ শক্তি নিংড়ে নিল মঙ্ক। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, গাড়িটা ওল্ড টাউন থেকে বেরিয়ে এসেছে। চলন্ত অবস্থাতেই পেছন থেকে সামনের সিটে চলে এল ক্যাট।

মঙ্ক ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'আমরা যে এখানে এসেছি, তা শত্রুরা জানল কী করে?'

প্রশ্নটা ক্যাটেরও!

তবে একটা উত্তরও ভেবে ফেলেছে মেয়েটা। সিগমার হাতে গোণা কয়েকজন জানে এই ট্রিপের ব্যাপারে। এর বাইরে জানে কেবল জাপানিজ ইন্টেলিজেন্স।

তাদের মধ্যে কেবল একজনকেই সন্দেহ হয় ওর।

আইকো হিগাশি।

জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল সে। 'পেইন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।' স্যাটেলাইট ফোনটা খুঁজতে খুঁজতে বলল।

'কেন?'

'গ্রে-কে সাবধান করে দেয়া দরকার।'

'কোন ব্যাপারে?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে মঙ্কের দিকে তাকাল ক্যাট। 'ছেলেটা সম্ভবত ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে।'

অধ্যায় একুশ

৮ মে, রাত ১:৩৪
ইকিকাউও দ্বীপ

সব যন্ত্রপাতি নিয়ে, অন্ধকার পানিতে ডুব দিল গ্রে।

দ্বীপের কেন্দ্রে অবস্থিত হ্রদটার পূর্ব তীরে এসে পৌঁছতে প্রায় বিশ মিনিট হাঁটতে হয়েছে ওদের। পথে পড়েছে ঘন বনওয়ালা পাহাড়। নাইট ভিশন ব্যবহার করে, আস্তে আস্তে এগোতে হয়েছে। গাছের ডালে বাসা বাঁধা পাখিগুলো যেন বিরক্ত না হয়, সেদিকেও রাখতে হয়েছে নজর।

হ্রদে নামার সময় মনে মনে প্রার্থনা করে নিল গ্রে-কেউ যেন ওদের আগমন টের না পায়। লুয়াওয়াই হ্রদটা প্রস্থে পৌনে এক মাইল, দৈর্ঘ্যে তার দ্বিগুণ। হ্রদের উপরের বাতাসে লোনাপানির গন্ধ, ছোট ছোট মাছিও আছে অনেক। তবে পানির নিচেও জীবন আছে। সেটার প্রমাণ দেয়ার জন্যই যেন অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠছে মাছ।

'পা দেখে ফেলো,' সাবধান করে দিল গ্রে। 'পাড় আচমকা খাড়া নেমে গিয়েছে।'

মাত্র দুই মিটার এগোতেই গলা পর্যন্ত ডুবে গেল ওর। ভেজা স্যুটের ভেতর দিয়েও বুঝতে পারছে, সমুদ্রের চাইতে উষ্ণ এই লেকের পানি। তবে আরামদায়ক না, লবণাক্তটা সমুদ্রের চেয়েও তিন গুণ বেশি। তাই অস্বাভাবিকভাবে ভাসছে দেহটা।

ডুব দেবার আগে, তীরের অন্য প্রান্তের দিকে আরেকবার নজর দিল গ্রে। নাইট-ভিশন গগলসে ধরা পড়ল হালকা একটা আভা। ওটাই লক্ষ্য ওদের।

সন্তুষ্ট হয়ে ডুব দিল সিগমা কমান্ডার।

সবাই ওর সাথে যোগ দিলে, গতি বাড়াল ও। পঞ্চাশ গজ পর্যন্ত সাঁতরেই গেল। তারপর স্কুবাজেটের সাহায্য নিল। এবার মাত্র দশ ফুট নিচ দিয়ে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় কোন সমস্যা হচ্ছে না দেখতে।

গ্রে-র অবশ্য এই আলোরও দরকার ছিল না। শুধু কম্পাস ব্যবহার করেই এগোতে পারত ও। কিন্তু দলের বেসামরিক লোকদের কথাও তো ভাবতে হবে।

এই হালকা আলোতেও একে-অন্যকে দেখতে কষ্ট হবে না ওদের। তাই ভীত হবার সম্ভাবনা কম।

তবে সত্যটা হলো, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কেবল বেসামরিক লোকগুলোর প্রতি দুশ্চিন্তাই কাজ করছে না।

ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকাল গ্রে। হেঁটে আসার সময় শেইচান অনেক চেষ্টায় ব্যথাটাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পেরেছে। কিন্তু গ্রে-র নজরকে পুরোপুরি ফাঁকি দিতে পারেনি। আস্তে আস্তে বেড়েই চলছে শেইচানের কষ্ট। ব্যথার চোটে দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরে ছিল মেয়েটা। এতটাই যে লেকের পাড়ে ওর চোয়ালের শক্ত হয়ে আসাটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল গ্রে।

প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছে না বলে, দুশ্চিন্তা আরও বাড়ছে। পালুদের সাথে পেছনের দলে ছিল ও। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আরও পিছিয়ে গিয়েছে মেয়েটা। নিজের উপরেই রাগ হলো তার।

আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল আমার। ওকে মাউই-তে রেখে আসা উচিত ছিল।

তবে মেয়েটাকে চেনে বলে জানে, পিছু নেয়ার একটা না একটা উপায় বের করেই ফেলত শেইচান। হানায় ওর চেহারার কাঠিন্য গ্রের নজর এড়ায়নি। একই কাঠিন্য আগেও অনেকবার দেখেছে। তবে এবার তাতে মিশে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। হয়তো নিজের ভেতরে আরেকটা জীবন বয়ে চলছে বলেই।

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়বে মেয়েটা, এই বিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে ফিরল ও। আরেকটু হলেই ধাক্কা খাচ্ছিল একটা দেয়ালের সাথে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এক পাশে সরে গেল। দেয়ালটা আসলে একটা নিমজ্জিত বিমানের পাখা।

অন্যদের চোখেও ধরা পড়েছে ওর সরে যাওয়াটা। কিন এবং আইকো তাই দুই পাশে সরে গেল। সাথে সাথে ওদেরকে হারিয়ে ফেলল গ্রে। কোয়ালস্কিকে আইকোর পিছু নেবার ইঙ্গিত দিয়ে, নিজে চলে গেল কিনের দিকে। আলট্রা ভায়োলেট লাইট জ্বালিয়ে দিল বাড়তি সতর্কতা হিসাবে।

সামনেই দেখা গেল কিনকে। স্কুবাজেটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি, আলোও দেখতে পেয়েছেন। প্রফেসরের কাছে গেল গ্রে, জানতে চাইল সব ঠিক আছে কি না। বুড়ো আঙুল দেখালেন প্রফেসর, তবে কেন যেন তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে। দুইজনে মিলে আইকো আর কোয়ালস্কি যেদিকে আছে সেদিকে এগিয়ে গেল।

সাবধানতার সাথে এগোচ্ছে গ্রে। আলট্রা ভায়োলেটের আলোয় চারপাশে দেখতে পাচ্ছে যেন কোন গোরস্থান। চারটা কি পাঁচটা বিমানের ধ্বংসাবশেষ পড়ল নজরে। একটা প্রপেলারের অর্ধেক ডুবে আছে মাটিতে। ফিউজিলাজ আছে হাঁ হয়ে, ভাঙা পাখার কোন অভাব নেই।

এসব কিছু উপরে জন্মেছে শৈবাল।

তবে, বিমানের ডিজাইন চিনতে কষ্ট হলো না গ্রের। এগুলো দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত, জাপানিজ টর্পেডো বম্বার, নাকাজিমা বি৫এন-এর।

আচমকা ওর চোখে ধরা পড়ল দুটো অন্ধকার অবয়ব। একটা ক্ষুদ্র, আরেকটা বিশাল।

আইকো এবং কোয়ালস্কি।

গ্রের লাইট অনুসরণ করে আসছে ওরা।

বৃত্তাকারে পেছনে তাকাল গ্রে। পালু আর শেইচান কোথায়?

আইকোদের সামলাতে গিয়ে, ওদের উপর থেকে নজর সরিয়ে নিয়েছিল গ্রে। দলের অন্যদের সাথে পেছনে আছে তো ওরা? নাকি আগেই এই জায়গা পার হয়ে গিয়েছে?

জানার উপায় নেই কোন। তবে সমস্যা নেই, হারিয়ে গেলে কীভাবে এক জায়গায় মিলিত হতে হবে, তার পরিকল্পনা করাই আছে।

উপায়ান্তর না দেখে, সামনে এগোবার ইঙ্গিত দিল সবাইকে। সাথে যোগ করল আরেকটা নির্দেশ, সবাইকে একত্রে এগোতে হবে। আর কাউকে খোয়াতে চায় না ও।

গোরস্থানটাকে পেছনে ফেলে এগোল ওরা। খাড়া নেমে গিয়েছে হ্রদের তল, গ্রে-র আলো থই পাচ্ছে না। নিজেকে আচমকা অরক্ষিত মনে হলো ওর। তাই নিভিয়ে দিল আলো। তবে তার আগে একবার পেছনে তাকিয়ে নিল। হয়তো আলোটাকে লক্ষ্য করে এদিকে এগিয়ে আসবে শেইচান এবং পালু।

যদি পেছনে থেকে থাকে তো আর কি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই নিচের গহীন থেকে ভেসে এল চোখ ধাঁধানো আলো। সাথে সাথে নাইট-ভিশন গগলস চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিল সে। আরও দুই মিনিট পর, দৃষ্টি ক্ষমতা ফিরে পেল। অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল কমপ্লেক্স। এখান থেকে দেখে ওটাকে সার্কিট বোর্ড বলে মনে হচ্ছে। কাচের গম্বুজাকৃতি চেম্বারগুলোর মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী টানেল পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সেই সাথে আছে অনেকগুলো কালো জায়গা। ওগুলো ইস্পাতের দেয়াল সম্বলিত ঘর।

কী দেখতে, তা বুঝতে পারছে গ্রে।

ভূ-গর্ভস্থ ল্যাব।

ওটার লক্ষ্যও বুঝতে পারছে পরিষ্কার-কোন বিপদজনক জীবাণু নিয়ে কাজ করার এরচেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে?

তবে, আলোর প্রধান উৎস কিন্তু উজ্জ্বল ল্যাবটা না।

আলো আসছে একটা সাবমারসিবলের নাক থেকে, ঠিক ওদের উপর এসে পড়ছে। দ্রুতগামী যানটাকে গতিতে পরাজিত করা সম্ভব না বুঝতে পেরে, দলের অন্যদের জড়ো করল গ্রে। সবাই চমকে গিয়েছে, ভয় পাচ্ছে।

উপরের দিকে ওঠার ইঙ্গিত দিল গ্রে।

কিন্তু উপরেও আলো দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম তীর থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে সেই আলো। সেই সাথে ইঞ্জিনের কেঁপে ওঠা টের পাচ্ছে সে নিজেও।

নৌকা...

উপর এবং নিচ, দুই দিক থেকেই চাপের মুখে আছে দলটা।

পানির উপরে উঠে, মুখ থেকে মাস্ক সরাল গ্রে। অন্যরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। তিনটা বোট এদিকেই ছুটে আসছে। ওটার আরোহীদের হাতে দেখা যাচ্ছে অ্যাসল্ট রাইফেল।

দেখামাত্র গুলি করা হচ্ছে না ওদের, এটাই যা সান্ত্বনা। তবে অবাক হচ্ছে না ও। দ্বীপের মালিক অনুপ্রবেশকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবে।

কিন্তু সেজন্য অন্যদেরকে দরকার নেই।

দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে জোরালো বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল।

একসাথে ঘুরে তাকাল সবাই, দেখতে পেল-কালো আকাশ ভরে উঠেছে আগুনের গোলায়। অন্ধকারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল কোয়ালস্কি। বিস্ফোরণের সম্ভাব্য উৎস কী হতে পারে তা দুইজনেই বুঝতে পারছে।

কাটামারানটা।

পালু এখানে নেই ভেবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল গ্রে। অন্ধকার হ্রদের উপর নজর বুলালো ও, কোথায় যে শেইচানকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল বিশালদেহী হাওয়াইয়ান-তা ভাবছে। একটু আগে ভয় পাচ্ছিল, এখন ওদের অনুপস্থিতি আশা যোগাচ্ছে।

এসবে আটকে পড়েনি অন্তত!

কিছু একটা নড়া-চড়া করে পানির দিকে ফিরিয়ে আনল ওর মনোযোগ।

অনেক নিচ থেকে, উজ্জ্বলতার একটা রশ্মি ওদের দলটার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কিছু নিচে নামার পরবর্তী, ডানে-বায়ে যাচ্ছে ওটা। বিমানগুলোর গোরস্তানে আলো ফেলে কিছু একটা খুঁজছে সাবমারসিবল।

অন্যদের জন্য প্রার্থনা করল গ্রে-ওরা যেন লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হয়।

রাত ১:৫২

ফিউজিলাজটা হাত পা দিয়ে আঁকড়ে ধরল শেইচান। জাপানিজ বম্বারটা মাটিতে আছড়ে পড়ার সময় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ককপিটের দিকে পিঠ দিয়ে আছে ও, পাইলটের লাশটা এখনও ওখানেই।

মৃত্যুকূপ-নামটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন ওখানে আছে লাশটা।

আশা করি, আমাদেরও একই দশা হবে না।

বিমানটার অ্যাফট-এন্ড এবং ওর মাঝে দুই মিটার দূরত্ব। তার মাঝেই নিজেকে ঢুকিয়ে রেখেছে পালু। কয়েক মুহূর্ত আগে, এই গোরস্তানের ভেতরে প্রবেশ করে ওরা। পিছিয়ে পড়েছিল সামনের দলটা থাকে। আসলে সেজন্য দায়ী শেইচান নিজেই। পালু ওকে ছেড়ে যায়নি। সম্ভবত গ্রে-র নির্দেশ পালন করছে হাওয়াইয়ান।

স্কুবা জেট নিয়ে সমস্যায় পড়েছে শেইচান। যন্ত্রটা ওর কথা শুনতেই চাইছে না। যতটা দ্রুত এগোতে চাচ্ছিল, ততটা গতি না পেয়ে বাধ্য হয়ে সাঁতারও কাটতে হচ্ছে ওকে।

এমনিতে এতে খুব একটা সমস্যা হবার কথা না।

তবে এই মুহূর্তে ওর অবস্থাকে স্বাভাবিক বলা যায় না।

এখনও মনে হচ্ছে, ধারালো ছোরা দিয়ে কেউ খোঁচাচ্ছে মাংসে। হাতগুলো কাঁপছে। পিঠের প্রতিটা মাংসপেশিতে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ।

গিল্ডের প্রশিক্ষণ মনে পরে গেল মেয়েটার। মন শান্ত করে, অস্বস্তিকে পাঠিয়ে দিল একটা দেয়ালের পেছনে। লম্বা করে শ্বাস টানল একবার। ওকে শেখানো হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে দেহকে আগুয়ান বিপদের ব্যাপারে সাবধান করার পদ্ধতি। ব্যথা হওয়া মানেই, শরীরে কোন ক্ষতি হয়ে গিয়েছে-তা না। দেহ প্রতিক্ষণে ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেও, শক্তি বা সক্ষমতা কমেনি এক বিন্দু।

এখনও পর্যন্ত।

'এখন' নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে।

গ্রে-সহ দলের অন্য সবাই বিপদে আছে।

পালুকে সাথে নিয়ে গোরস্তান পার হলো শেইচান। আচমকা সামনের দুনিয়া ভরে উঠল উজ্জ্বল আলোয়। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শৈবাল ঢাকা জঞ্জালে। মুখোশের গগলসের কারণে আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিল চোখে। মনে হলো যেন দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

তারপরও চোখের সামনে থেকে সরায়নি গগলস। অবচেতনভাবেই সরে গিয়েছিল অন্ধকারে, ওখানেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে মেয়েটা। আশ্রয় খুঁজে নিয়ে পালুকে ডেকে নিল কাছে। এই জায়গাটা খুঁজে বের করেছে তখনই।

কপাল ভালো।

লুকানো যায়গায় পৌঁছে দেখে, তলদেশ থেকে উঠে আসছে একটা সাবমারসিবল। দুই জন আরামসে বহন করতে পারে ওটা। নির্গত আলোতে বোঝা যাচ্ছে, যন্ত্রটা উঠে আসছে উপরে।

গ্রে-দের কী হবে...

এর কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল উজ্জ্বল কিছু নৌকা। পানির নিচের দুনিয়ার ছাদে যেন উড়ছে ওটা। শিকার ফাঁদে পড়েছে বুঝতে পেরে, এদিক-ওদিক খুঁজতে শুরু করল যন্ত্রটা।

আমাদেরকেই খুঁজছে? নাকি এটা ওদের বাড়তি সাবধানতা?

যা-ই হোক না কেন, যন্ত্রটাকে সাঁতরে এড়াতে পারবে না। ওটা যখন গোরস্তানে প্রবেশ করল, তখন শত্রুকে মন দিয়ে দেখতে লাগল শেইচান। দুই আরোহীর বাহনটাকে ওয়েট সাব নামেও ডাকা হয়। এসব যানের আরোহীরা সবাই স্কুবা গিয়ার পরাই থাকে। সামনের দিকটা ঢেকে রাখে একটা লেক্সান কাচ। পেছনটা যদিও খোলা। পাইলট বসে থাকে হুইলের পাশে, আরোহী তারও পেছনে। পা গুছিয়ে বসে আছে আরোহী। মাথা নিচু করে রাখা।

এই ধরনের সাবমারসিবলগুলো ব্যবহার করে সেনাবাহিনী, নিজেদের সৈন্যকে শত্রুপক্ষের সীমানায় চুপিচুপি নামিয়ে দেয়ার জন্য।

এই সাবটাকেও তেমন কাজের জন্য বানানো বলেই মনে হলো। শেইচান দেখতে পেল, পেছনের আরোহীর কাঁধের উপর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা স্পিয়ারগান।

আরও অবাক হয়ে খেয়াল করল, নাকের আলোক-উৎসের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে ইস্পাতের দুটো বর্শা। এই সাবের তাহলে নিজস্ব অস্ত্র আছে!

সাবটা গোরস্তানে ঢোকামাত্র, আরোহী নেমে পড়ল বাহন থেকে। নিচু হয়ে সাঁতরাতে থাকল সে, তবে যন্ত্রটা এগিয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে। আরোহী সম্ভবত খুঁজতে নেমেছে ওদের... অথবা কোন সম্ভাব্য হুমকিকে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মাত্র চারটা বা পাঁচটা প্লেন আছড়ে পড়েছে হ্রদে। তাই লুকাবার জায়গা নেই বেশি। আরোহীর নড়া-চড়া দেখে মনে হলো, এলাকাটা সে ভালোভাবে চেনে। সরাসরি একটা বিধ্বস্ত বিমানের কাছে এল লোকটা। স্পিয়ারগানের সাথে লেগে থাকা আলো ফেলল ককপিটের ভেতর দিকে।

ভেতরে কেউ লুকিয়ে নেই বুঝতে পেরে, এবার শেইচানদের বিমানের দিকে এগোল লোকটা। শেইচান এবং পালু, দুইজনই আরও ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। হালকা আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল ও হাওয়াইয়ানের চেহারা। ইঙ্গিতে বোঝাল পরিকল্পনা, বোঝাল যে কড়া আলিঙ্গনে বাঁধতে হবে আক্রমণকারীকে। মুখ কুঁচকে ফেলল পালু। লোকটা বুঝতে পেরেছে কি না, কে জানে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চারপাশ, এমন সময় অস্ত্র তৈরি করল শেইচান। পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে বিমানটাকে, দুই হাতে তুলে নিয়েছে দুই অস্ত্র। স্পিয়ারগানের কালো ইস্পাতের মাথাটা দেখা মাত্র, ছুঁড়ে দিল প্রথম অস্ত্রটা।

একেবারে ঠিক সময়েই ছুঁড়েছিল, ঠিক গিয়ে আরোহীর মুখে গিয়ে আঘাত হানল অস্ত্রটা...

অস্ত্র বলতে পাইলটের খুলি... ঠিক শত্রুর মুখোশে।

মানুষের সহজাত অভ্যাস দেখা গেল আরোহীর মাঝে। অপ্রত্যাশিত আক্রমণ এবং আক্রমণের অস্ত্র দেখে হকচকিয়ে গেল বেচারা। আঁতকে উঠে সরে গেল ডাইভার। স্পিয়ারগানটাকে শেইচানের দিকে তাক করল এরপর।

কিন্তু বর্শা ছোঁড়ার আগেই, পুরু একজোড়া হাত পেছন থেকে আঁকড়ে ধরল ওকে। যেন কোন পোকাকে লুফে নিয়েছে মাকড়সা।

পালু বুঝতে পেরেছে তাহলে।

ককপিটের সিটে লাথি পেরে বাইরে বেরিয়ে এল শেইচান। ঝুঁকি নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য উপরের দিকে তাকাল। সাবের আলো ওর বাঁ দিকের ধ্বংস স্তূপের দিকে সরে গেল।

ভালো।

পালুর সাথে যোগ দেবার মানসে এগিয়ে গেল সে। আক্রান্ত ডাইভারের বুকে ঠেকাল তার সিগ সয়্যার। ব্যারেলটাকে উপরের দিকে তাক করে ছুঁড়ে দিল গুলি। আওয়াজ কমে গেলেও, একেবারে মিলিয়ে গেল না। সেটা নিয়ে অবশ্য চিন্তিত হলো না সে, সাবের ইঞ্জিনের গুঞ্জন ওই শব্দটাকে ঢেকে দেবে। পানির নিচে গুলি করা সমস্যার ব্যাপার-একবার গুলি ছুঁড়েই নষ্ট হয়ে যায়। তারচেয়ে বড় কথা, মাত্র দুই ফুট থাকে গুলির কার্যকারিতা। সেজন্যই অবশ্য গুলি ছোঁড়ার সাহস করেছে শেইচান। ডাইভারের দেহেই যেন থাকে গুলিটা।

পানির নিচে ড্যাগার ব্যবহার করাই বেশি যুক্তিযুক্ত, তবে ভয় পাচ্ছিল মেয়েটা-যদি ওর টার্গেট বেশি নড়া-চড়া করে? বিশাল কোন ক্ষত থেকে বেরোতে থাকা রক্ত, উপরে থাকা শিকারির জন্য সিগন্যালের কাজ করতে পারে।

তাই গুলি করে সাথে সাথে সরিয়ে ফেলল ও ব্যারেল। পরক্ষণেই চিমটি দিয়ে ধরল রাবার স্যুটের ফুটো। ডাইভার মারা গিয়েছে নিশ্চিত হবার পর কাজে নামল শেইচান। স্পিয়ারগান থেকে খুলে নিল ফ্ল্যাশলাইট। পালুর হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়ে, সাবের দিকে ইঙ্গিত করল।

ডাইভার হবার ভান করো, মুখে বলতে পারল না। তবে মনে মনে বলল।

ইঙ্গিতে বোঝার ভান করল পালু। ওকে পার হয়ে মাটির দিকে ডাইভ দিল। সামনে ধরে রেখেছে লাইটটা। ডাইভারের মতোই আকার পালুর। তাই ধোঁকাটা ধরা পড়ার কথা না।

পালু সরে যাবার পর, শেইচান খুলে ফেলল মৃত লোকটার মাস্ক। একটা রেডিও হেডপিস আছে কানের সাথে। ওটাকে খুলে নিয়ে নিজের কানে লাগাল, পাল্টে নিল মুখোশ।

অবশেষে লুকাবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এল শেইচান, অন্ধকার পানিতে হারিয়ে গেল। ব্যথায় কেঁপে উঠছে দেহটা, কিন্তু আঁধারে নিজেকে শান্ত বলে মনে হচ্ছে। আচমকা ওর কানে কথা বলে উঠল কেউ, তাও আবার জাপানিজে। সাবের পাইলট তার সঙ্গীর খবর জানতে চাইছে। 'টার্গেটের কোন হদিস আছে?'

জাপানিজ ভাষাতেই উত্তর দিল শেইচান, তবে কর্কশ সুরে। 'অরুকুরিয়া।'

অল ক্লিয়ার।

উপরে উঠতে শুরু করল শেইচান। আস্তে আস্তে পিছাতে থাকা সাবটার বরাবরে আসার আগে থামল না। তারপর এগোতে থাকল ওটা লক্ষ্য করে। প্রতিবার পা নাড়ার সাথে সাথে ব্যথা চাগিয়ে উঠছে। কিন্তু সাবের দিকে এগোচ্ছে নিশ্চিত ভঙ্গিমায়।

পালু এখনও ভান চালিয়ে যাচ্ছে। একটু পর পর থামছে, ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে দেখার জন্য। সাবটাও তাই অলস ভঙ্গিতে নড়ছে।

পাইলটকে দেখতে পেল শেইচান, হুডের তলে বসে আছে। যানের আলোর প্রেক্ষাপটে কেবল অবয়ব দেখা যাচ্ছে ওর। আরও জোরে লাথি মারল সে পানিতে। ব্যথার আগুন জ্বলে উঠল দেহের জায়গায় জায়গায়। অনেকক্ষণ পর রেডিওতে ফিসফিস করে কথা বলল সে, নিখুঁত জাপানিজে। 'পাঁচ মিটার সামনে নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি। তুমি কিছু দেখছ?'

সাড়া দিল পাইলট। 'এখানে কিছু নেই।'

পাইলটের মন নিচের দিকে আছে ধরে নিয়ে, যানটার পেছন দিকে গেল শেইচান। চুরি করা স্পিয়ারগানটা তাক করে, বর্শা ছুঁড়ল।

পেছনের খোলা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকল বর্শা, আঘাত হানল পাইলটের ঘাড়ে। আরেকটু হলে পুরো মাথাটাই কেটে নিত। রক্তে ভরে উঠল লেক্সান নির্মিত গম্বুজের ভেতরদিক। পাইলটকে হারিয়ে নিচের দিকে খসে পড়তে লাগল সাবটা। পেছনে রেখে গেল খয়েরী এক ট্রেইল।

এখান থেকে কেউ ট্রেইলটা দেখতে পাবে বলে মনে হচ্ছে না। তারপরও সাবের দিকে ছুটে গেল ও। পাইলটকে সিট থেকে সরিয়ে, দেহটাকে পেছন দিকে ছুঁড়ে দিল। কন্ট্রোল বুঝে নিল শেইচান। এই ধরনের যান চালানোর কিছু অভিজ্ঞতা

থাকলেও, মরচে পড়ে গিয়েছে সেই জ্ঞানে। তারপরও কয়েকবারের চেষ্টায় সে সফল হলো সাবটাকে পালুর দিকে নিয়ে যেতে। পাইলটের রক্তাক্ত দেহের নিচে নেমে যাওয়া বিশালদেহীর নজর এড়ায়নি। তাই অপেক্ষা করছে ওখানেই।

সাবটা কাছে গেলে, ওর সাথে এসে যোগ দিল পালু। প্রশ্নের ভঙ্গিতে উপরের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

মাথা নেড়ে মানা করল শেইচান, দেখাল নিচের দিকে।

স্থানীয়দের মুখ-দর্শন দিয়ে আসা যাক।

এগোবার আগে মনে মনে হিসাব করে নিল মেয়েটা। দেহের সবখানে রেখেছে ড্যাগার, একটু আগে চালানো সিগটাও এতক্ষণে সয়ে যাবার কথা। অস্ত্রের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও, চালিয়ে নিতে পারবে। গিল্ডের কাছে শেখা সব চালাকি ছাড়াও, পেটের সন্তানের বাবা কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে সে। লোকটা মাথা খাটাবার ব্যাপারে ছোটখাটো মাস্টার বলা চলে।

গ্রে-কে বাঁচাতে হলে, ওর মতো করেই চিন্তা করতে হবে।

আচমকা ব্যথার একটা দমকা স্রোত বয়ে গেল ওর দেহ জুড়ে। চোখের দৃষ্টি কমে আসতে চাইছে। হুইলের উপর ঝুঁকে পড়ল শেইচান, তীব্র ইচ্ছা খাটিয়ে ব্যথাটাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। নাহ, নিজের দেহ থেকে না... ওর ভেতরে বেড়ে উঠতে থাকা দেহটা থেকে।

লম্বা শ্বাস নিল একটা; এত কষ্ট সত্ত্বেও, অক্সিজেনে মিটারের কাঁটা যে লাল দাগের কাছে আছে তা লক্ষ্য করতে ভুল হলো না।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সোজা হয়ে বসল ও, নিচের দিকে নামিয়ে দিল সাবের নাক।

প্রতিজ্ঞা করল একটা। গ্রের কাছে... নিজের কাছে... জন্ম না নেয়া সন্তানের কাছে।

আমি ব্যর্থ হব না।

তবে একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই ওর মনের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এই প্রতিজ্ঞাটা রাখার জন্য, কতটুকু উৎসর্গ করতে রাজি আছি আমি?

অধ্যায় বাইশ

৮ মে, সকাল ৮:৫৫
ওয়াশিংটন ডিসি

এখন কী?

সিগমার হেডকোয়ার্টার থেকে লিফটে করে স্মিথসনিয়ান ক্যাসেলের প্রথম তলায় উঠছেন পেইন্টার ক্রো। মিউজিয়াম কিউরেটর, সাইমন রাইটের সাথে দেখা করার কথা। কি যেন দরকারের কথা বলেছেন ভদ্রলোক। পেইন্টারের হাতে নষ্ট করার মতো সময় নেই... তবে ব্যাপারটা নাকি খুব জরুরি।

আর কিছু না হোক, অন্তত পা দুটোকে তো একটু খেলিয়ে নেয়া হচ্ছে।

সারারাত নিচেই ছিলেন ডিরেক্টর। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বাদানুবাদ চালিয়েছেন একের পর এক বিশ্বের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর প্রধানের সাথে। একজন ফোন ছাড়ে তো আরেকজন ধরে, এই হলো অবস্থা।

লিফট থামার সাথে সাথে ফোন বেজে উঠল। দরজায় দাঁড়ানো গার্ডের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন পেইন্টার। লোকটা এখানে পাহারা দেয়। এছাড়াও সিগমার লোগো ছাপা বিশেষ কার্ড ছাড়া খোলে না চেম্বারের দরজা।

কলটা রিসিভ করে একপাশে সরে গেলেন তিনি। 'হ্যাঁ বলো, ক্যাট, ড. ডেলগাডোর কী অবস্থা?'

'সিডেটিভের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে।'

টালিনের রাস্তা থেকে লাইব্রেরীয়ান অফ কংগ্রেসকে অপহরণের চেষ্টার কথা শুনেছেন পেইন্টার। মহিলা বেঁচে গেলেও, হাঙ্গামা বেঁধেছে এস্টোনিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে হামলায়।

বলে চলেছে ক্যাট। 'টারমাকে মেডিকেল টিম পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। মঙ্ক ইলেনার ব্লাড প্রেসার নিয়ে চিন্তায় ছিল। তবে এখন সব ঠিকঠাক। কিন্তু ডিরেক্টর টামের কথা ভিন্ন। শুনেছি, সার্জারিতে আছেন। তার এবং তার মেয়ের সাহায্য না পেলে...'

কথার মাঝখানে আটকে দিলেন পেইন্টার। 'তাহলে তাদের অবদানকে কাজে লাগাও। গেডানস্কে কখন যাচ্ছ?'

'পাঁচ মিনিটের ভেতর রওয়ানা হব। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার বেস হয়ে যেতে চাচ্ছি। দেখতে চাই আপনি অথবা জেসন টালিনের হামলাকারীদের ব্যাপারে কিছু সুরাহা করতে পেরেছেন কি না।'

মেয়েটার কণ্ঠে অস্বস্তি টের পেলেন পেইন্টার। সাধারণত হেডকোয়ার্টারে বসে তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধানের কাজই ওর সবচেয়ে পছন্দ। তবে এবার সরাসরি মাঠে নামতে হলো। 'জেসন ব্যাপারটা দেখেছে। নিজের কাজ ভালই বোঝে ছেলেটা। তুমি বরং স্মিথসন কোত্থেকে নিদর্শনটা পেয়েছিলেন, সেদিকে মনোযোগ দাও। উত্তর চাই আমাদের। হাওয়াইয়ের পরিস্থিতি গুরুতর।'

'কী খবর ওদিকের?'

'এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা দুইশোরও বেশি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়াদের অবস্থা ক্রমে খারাপ হচ্ছে। অর্ধেক কোমায় আছে আক্রান্তরা।'

'হালেয়াকালা থেকে গ্রে যে চারজনকে উদ্ধার করেছে, ওদের মতো নাকি?'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন পেইন্টার। 'সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে আক্রান্তদের সংখ্যা। মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা হন্যে হয়ে উত্তরণের পথ খুঁজছেন। কাজ হয়নি। কোয়ালস্কির বান্ধবী, মারিয়াও একটা টাস্কফোর্স নিয়ে হানায় এসেছে।'

'কোয়ারেন্টাইনের কী অবস্থা?'

'এখনও পর্যন্ত শুধু গুজব আর গণ্ডগোল ছড়াচ্ছে। হনুলুলুতে ন্যাশনাল গার্ড একটা দাঙ্গা সামলেছে। সৈন্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানুষজনকে নেস্টিং এরিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু ক্রমে দূর থেকে দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে বোলতার ঝাঁক। ওই এলাকা দিয়ে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আশপাশ দিয়ে জলযান চলাচলেও। কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেয়া হচ্ছে না।'

'এতে কাজ হবে বলে মনে হয় না,' কুর্ট বলল। 'এরকম বড় এলাকা কোয়ারেন্টাইন করা সম্ভব না। কেউ না কেউ, কিছু না কিছু অবশ্যই রোগটা মূল ভুখণ্ডে বয়ে আনবে।'

পেইন্টার জানেন, কথা সত্যি। কিনের সতর্কবার্তার কথা ভাবলেন তিনি।

আপনাদের নিউক্লিয়ার বোমা মারতে হবে ওই দ্বীপে।

তিনি প্রার্থনা করলেন, আসলেই যেন কাজটা করতে না হয়। তবে এ ব্যাপারেও ভেবে রাখা হয়েছে। দরকার পড়লে সাগর এবং আকাশপথে আটশো মাইল দূরবর্তী জনসন দ্বীপে সরিয়ে নেয়া হবে লোকজনকে। তারপর বোমা ফেলা হবে হাওয়াইতে।

কিন্তু এখানেও সমস্যা আছে। জনসন দ্বীপটা আকারে মাত্র তিন হাজার একর। হাওয়াইয়ের সব মানুষ ওখানে আঁটবে না। তাছাড়া লোকজন নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে যেতে চাইবে কেন? আর তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। কী করা হবে ওদের নিয়ে?

'একটা না একটা উপায় ঠিক খুঁজে পাব,' বিড়বিড় করে বললেন পেইন্টার।

'আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি,' সায় দিল ক্যাট। 'গ্রে-র খবর কী?'

পেইন্টার জানেন, মেয়েটা আশঙ্কা করেছিল-আইকো হিগাশির মাধ্যমে ফাঁদে পড়তে চলেছে ওদের দলটা। টালিনে হামলার শিকার হওয়ার পর মেয়েটার মনে বদ্ধমূল ধারণা, জাপানি ইন্টেলিজেন্সের কেউ তাদের গতিবিধি শত্রুপক্ষের কাছে ফাঁস করছে।

'অনেকক্ষণ যাবত কোন খবর পাইনি,' জবাব দিলেন পেইন্টার। 'তবে দ্বীপে অভিযান চালানোর আগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখারই কথা। জেসন তার চোখকান খোলা রেখেছে।'

'আশা করি ও কিছু একটা খুঁজে পাবে।'

ঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর। 'রাখতে হবে এখন। সাইমন রাইট আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। গেডানস্কে পৌঁছে জেসনের সাথে যোগাযোগ করো।'

'কিউরেটরের সাথে কেন?'

'সেটা দেখা হলে জানা যাবে।' বলে ফোন কাটলেন পেইন্টার। তারপর এগোলেন দরজার দিকে। মিউজিয়াম ঘণ্টাখানেক আগে খুলেছে। কিছু দর্শনার্থী দেখা যাচ্ছে এদিক-সেদিক। তবে কেউ তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না।

প্রবেশপথের বামদিকে একটা চ্যাপেলে সাইমনের সাথে দেখা করার কথা। সেদিকে এগোলেন পেইন্টার। ওখানে স্মিথসনের স্মৃতিস্তম্ভ আর সমাধিগৃহ রাখা। বিগত বছরগুলোতে অগনিতবার এখানে এসেছেন তিনি। জায়গাটা তার খুব পছন্দ।

চ্যাপেলের সামনে দাড়িয়ে আছেন সাইমন রাইট। পরনে নেভিব্লু স্যুট। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। কপালে চিন্তার রেখা।

'মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেখা করার জন্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর। তবে আশা করি সময়টুকু উসুল হবে।'

'কী দেখাতে চাইছিলেন আমাকে?'

স্মিথসনের কবরের দিকে ইশারা করলেন সাইমন।
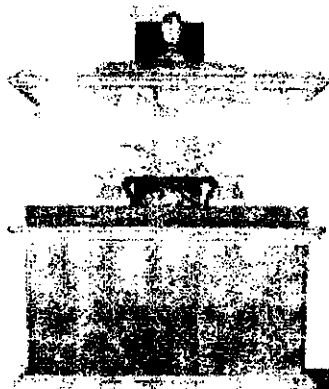
বড় আকারের একটা সাদা পাথর একটা মার্বেলের সারকোফ্যাগাসের উপর রাখা। সেটা আবার বসে আছে আরও বড় আকারের চারকোনা কেসের উপর। এটার ভেতরেই এখন আছে স্মিথসনের দেহাবশেষ।

'অগনিতবার এটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি আমি,' সাইমন বললেন। 'তবে এখন মনে হচ্ছে, স্মিথসন আমাদের কিছু একটা বলতে চাইতেন। এই পাথরগুলোর মাধ্যমেই।'

'কী?'

পিছিয়ে গেলেন সাইমন। 'কবরে কী লুকানো ছিল, সেটার ব্যাপারে।'

ভ্রূকুটি করলেন পেইন্টার। 'বুঝলাম না।'

'ইতালি থেকে আলকজান্ডার গ্রাহাম বেল স্মিথসনের দেহাবশেষ নিয়ে আসার এক বছর পর, গোটা সমাধিগৃহটাই পাঠিয়ে দেয়া হয় এখানে। এটাই সেই কবর।'

পেইন্টার কথাটা জানেন।

বলে চলেছেন সাইমন। 'স্মিথসনের ভাতিজা-হেনরি জেমস হাঙ্গারফোর্ড-চাচার কবরের জন্য এই জিনিসটা বানান। তবে এতে খোদাই করা চিহ্নগুলো এখনও এক রহস্য। কারো কারো মতে, স্মিথসন নিজেই চিহ্নগুলোর প্রবক্তা। কারুকাজগুলো লক্ষ্য করুন।'

সায় দিলেন পেইন্টার। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যগত জিনিস স্থান পেয়েছে পাথরটায়।

সাইমনের কথা এখনও শেষ হয়নি। 'এই লরেল গাছের ডাল জীবনবৃক্ষকে নির্দেশ করে। পাখিটা স্বর্গের প্রতীক। ঝিনুকের খোলস জড়িত সাগরের সাথে, যা অনন্তের বহিঃপ্রকাশ। কিংবা পুনরুত্থানের।'

এবার ব্যাপারটা সিগমা ডিরেক্টরের মাথায় ঢুকল। 'আপনি বলতে চাইছেন, স্মিথন ঝিনুকের খোলসের মাধ্যমে এটা বোঝাতে চেয়েছিলেন-তার কবর এমন কিছু একটা ধারণ করে আছে, যা আবারও পুনরুত্থান ঘটাতে সক্ষম?'

'সম্ভবত,' বলে কবরটার একপাশে ইশারা করলেন কিউরেটর। 'ঢাকনাটার নিচে দেখুন। এখানে ঝিনুকের সাথে আরও তিনটা জিনিস আছে। আবারও সেই ঝিনুক। অসীম সাগরের প্রতীক।'

কাছ থেকে ছবিটা দেখে আঁতকে উঠলেন পেইন্টার। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ঠাণ্ডা স্রোত।

এটা আগে কেন আমার চোখে পড়ল না!

ঝিনুকের খোলসের পাশে তিনটা প্রতিকৃতি। একটা সাপ, এক টুকরো পাথর এবং একটা মথ।
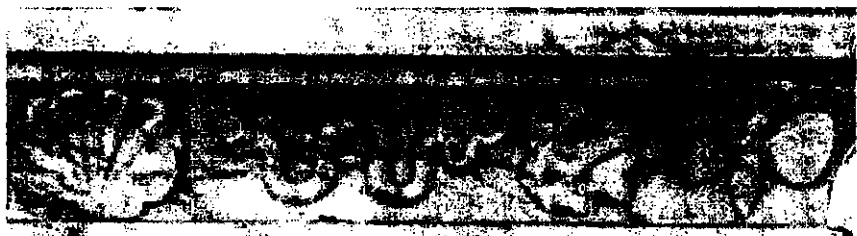
'আপনি বলতে চাইছেন,' মাঝের পাথরটার গায়ে হাত বুলালেন পেইন্টার। 'এটা হচ্ছে সেই অ্যাম্বারের টুকরো। সাপটা হলো তার ভেতর আটকা পড়া সরিসৃপ এবং অন্যদিকের মথটা...'

'অনেকের বিশ্বাস, এটা মথই,' সায় দিলেন সাইমন। 'কিন্তু ব্যাপারটার কিন্তু অন্য অর্থও থাকতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন পেইন্টার। 'অ্যাম্বারে আটক থাকা সরিসৃপের হাড় থেকে জন্ম নেয়া বোলতা।'

পিছিয়ে গেলেন সাইমন। 'যদি তিনি আসলেই সতর্কবার্তাটা তার কবরে খোদাই করার ব্যবস্থা করে গিয়ে থাকেন, তাহলে আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায়–'

'আর কী লিখেছেন উনি এখানে?'

ছবিটার উপর স্থির হলো পেইন্টারের নজর। আসলেই কি এখানে কোন উত্তর লুকানো আছে? প্রতিকার না হোক, অন্তত নিদর্শনটার উৎসের ব্যাপারে কিছু...

কিউরেটরের কাঁধে চাপড় দিলেন ডিরেক্টর। 'সাইমন, মনে হচ্ছে আপনাকে সিগমায় ঢুকিয়ে নিতে হবে।'

'ধন্যবাদ, ডিরেক্টর। তবে বর্তমান কাজটাই আমার বেশ পছন্দ। অন্তত এখানে গুলি খাওয়ার ভয় নেই।'

কবরের দিকে ইঙ্গিত করলেন পেইন্টার। 'আপনার কোন কর্মচারীকে দিয়ে একটা কাজ করাতে পারবেন? জিনিসটার সবগুলো দিক থেকে ছবি তুলে আমাকে পাঠাতে হবে।'

'আমি নিজেই করছি।'

'ধন্যবাদ।'

ঘুরে দাঁড়ালেন পেইন্টার। ক্যাটকে পাঠাতে হবে ছবিগুলো। হয়তো ওর কাজে সাহায্য হবে। গ্রে-কেও দেখানো দরকার ছিল। কিন্তু ওর তো কোন খবরই নেই।

কোথায় তুমি, গ্রে?

অধ্যায় তেইশ

৮ মে, রাত ২:২২
ইকিকাউও দ্বীপ।

এলিভেটরে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন কিন। গায়ে সুইমিং ট্রাঙ্ক। কাঁপুনির কারণ ঠাণ্ডা নয়, ভয়। জাপানি চার গার্ড অস্ত্র তাক করে রেখেছে তাদের বুকে।

আইকো পাশেই আছে। পরনে সুইমস্যুট। আছে কোয়ালস্কি আর গ্রে-ও। তবে ওদের পরনে শুধু সুইমিং শর্টস।

ধরা পড়ার পর দ্বীপের পশ্চিম অংশে নিয়ে আসা হয়েছে দলটাকে। এখানে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে ভাঙাচোরা কোস্টগার্ড ভবনগুলো। উল্টোদিকে একটা এয়ারস্ট্রিপ। রানওয়েতে পার্ক করা একটা ছোট জেট এবং একটা পেটমোটা ট্যাংকার বিমান।

সবচেয়ে বড় কোস্টগার্ড ভবনের দিকে রওয়ানা হয়েছিল সবাই। একটা সাদা রঙের নৌকা এসে লেকের পাড়ে ভিড়তে দেখা যায় তখন।

কিন বুঝতে পেরেছেন, কোত্থেকে এসেছে বাহিনীটা। এবং কী করে এসেছে।

দক্ষিণে, যেখানে ওদের ক্যাটামারানটা দাঁড় করানো ছিল, ওখানে কেবল ধোঁয়ার কুণ্ডলি তখন।

ভবনের ভেতর ঢোকার পর, একটা শাফটে নিয়ে যাওয়া হয় সবাইকে। খুলে নেয়া হয় অতিরিক্ত জামাকাপড়। ফ্রেমে ঝুলছে একটা ফ্রেইট এলিভেটর। জিনিসটা এক গাড়ি রাখার সমান গ্যারেজ আকৃতির। উপরের দিক খোলা। গরাদ লাগানো।

রাইফেলের নল থেকে দেয়ালের দিকে চোখ সরালেন প্রফেসর। চাইছেন যেন পাথর থেকে শক্তি শুষে নিতে। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল এলিভেটরটা। তাল হারিয়ে ধাক্কা খেলেন গ্রে-র সাথে। ধমকে উঠল এক গার্ড।

এলিভেটরের অন্যপাশে দাঁড়ানো আরেক গার্ড খাঁচার মতো দেখতে দরজাটা খুলে দিল। একটা টানেলে বেরিয়ে এল সবাই।

জায়গাটা ভালো করে প্রত্যক্ষ করছে আইকো। 'মাইনিং অপারেশন লুকানোর জন্য এরা কোস্টগার্ড ভবনের আড়াল ব্যবহার করছে।'

কেউ জবাব দিল না কথাটার।

কিনের হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসে আটকেছে। কপালে ঘামের ফোঁটা। বুঝতে পারছেন, তিনি এই দুর্ধর্ষ দলটার সাথে পুরো বেমানান।

গোলাকৃতি একটা স্টিলের দরজার সামনে এসে থেমেছে টানেলটা। দেখতে অনেকটা ব্যাংক ভল্টের মতো। এখন অবশ্য অর্ধেক পরিমাণ খোলা। একে একে সবাই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সামনের দৃশ্য স্তম্ভিত করার মতো। অন্ধকার লেকের তলদেশ হয়ে সামনে এগিয়েছে কাচের তৈরি টানেল। এলইডি বাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে বাঁকা সিলিং। জায়গাটা যেন পুরো আলাদা এক দুনিয়া। একের পর এক নেমে গেছে সাবলেভেল। অনেকটা স্পেস স্টেশনের আদলে দেখতে।

পেছন থেকে তাড়া দিল গার্ড। 'চলতে থাকো।'

এগিয়ে যাওয়ার ফাঁকে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন কিন। কমপ্লেক্সের মধ্যভাগে চলে এসেছেন প্রায়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, মেঝেটা কয়েকটা সেকশনে বিভক্ত। প্রতিটাতে আছে আলাদা আলাদা বাঁকা কাচের ডোম। সম্ভবত কোনো কিছু আটকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয় ওগুলো।

একটা ডোম পার হওয়ার সময় ধারণার সত্যতা মিলল। কালো মেঘের দঙ্গল ওড়াওড়ি করছে পুরোটা জায়গা জুড়ে।

থতমত খেয়ে গেলেন প্রফেসর। 'আ... আমার মনে হচ্ছে, ওগুলো সৈন্য ক্যাটাগরির পতঙ্গ। পেটে লাল-কালো ডোরা দেখতে পাচ্ছি।'

চারদিকে ঘোরাফেরা করছে ল্যাবকোট পরা টেকনিশিয়ানরা। নীল কভারঅল গায়ে পিয়নদেরও দেখা গেল, এদিক-সেদিক ঠেলে নিচ্ছে মেশিনপত্র ভরা ছোট-বড় কার্ট।

'সম্ভবত জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার পাঁয়তারা করা হচ্ছে,' গ্রে বিড়বিড় করে বলল।

প্রমাদ গুনলেন কিন।

তাহলে আমাদের কী হবে!

অস্ত্রের মুখে আরেকটা টানেলে ঢোকানো হলো সবাইকে। এখানে একটা সেন্ট্রাল হাব একেবারে তিনটা সাবলেভেলকে এক সুতোয় গেঁথেছে। উপরে, নিচে যাওয়ার সিঁড়ি দেখা গেল। কিন্তু এরপর তাদের নিয়ে যাওয়া হলো একেবারে গোটা কমপ্লেক্সের কেন্দ্রবিন্দুতে।

ডাবল ডোরের সামনে গিয়ে একটা বোতাম চাপল এক গার্ড। একইসাথে স্পিকারে মুখ নিয়ে কিছু একটা বলল। এতটাই আস্তে, কিন কিছু বুঝতে পারলেন না।

লোকটা পিছিয়ে আসার সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। ভেতরে গোলাকৃতি একটা অফিসঘর। মাঝখানে আছে প্রশস্ত ডেস্ক। পেছনে একজন মানুষ বসা।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল লোকটা। বয়স ত্রিশের বেশি হবে না। পরনে বিজনেস স্যুট। স্বাস্থ্যবান শরীর। কালো চোখে ক্ষুরধার দৃষ্টি। চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখে রাগের ছাপ স্পষ্ট।

সবার আগে মুখ খুলল আইকো। 'কোনিচিওয়া, মাসাহিরো ইতো।'

শক্ত হয়ে এল লোকটার ঠোঁটজোড়া। বোঝা গেল, এরকম ধাক্কা পেয়ে অভ্যস্থ নয়।

'মিস হিগাশি!'

'হাই,' জাপানিজে জবাব দিল আইকো। 'আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি হলেন মাসাহিরো ইতো, ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

ডেস্কের পেছনে দেয়ালে সাঁটা লোগোটা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন কিন। আগুনের ডানাওয়ালা একটা পাখিকে ঘিরে রেখেছে আগুনের বৃত্ত। ফিনিক্স পাখি। চোখের জায়গায় মূল্যবান রুবি বসানো। ফেনিকুসুর প্রতীক এটা।

আবারও মাসাহিরোর দিকে ফিরল আইকো। 'আপনার দাদা কেমন আছেন?'

আস্তে করে চেয়ারে বসল লোকটা। নড়াচড়ায় ব্যবসায়ী ছাপ। 'ভালো।'

'শুনে খুশি হলাম,' মাথা ঝাঁকাল আইকো। 'তো আশা করছি হাওয়াইয়ের দ্বীপে কেন হামলা করল আপনাদের পরিবার, এখন আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন আপনি।'

প্রতিক্রিয়া দেখাল না মাসাহিরো। 'তার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না। তবে একটা কথা বলছি, সব আমার দাদার ইচ্ছাতেই ঘটেছে এবং ঘটবে।

গ্রে-র দিকে স্থির হল লোকটার নজর। 'আপনার সঙ্গী কোথায়?'

কোয়ালস্কির দিকে শ্রাগ করল গ্রে। 'এই তো, আমার পাশেই।'

'ও না... ওই মেয়েটার কথা বলছি। আপনার বান্ধবী। কেইজের ধংসের জন্য দায়ী যে।'

গ্রে-র কানে ফিসফিস করল কোয়ালস্কি। 'শেইচানের কথা বলছে, বস।'

আবারও শ্রাগ করল সিগমা কমান্ডার। 'মাউইতে। তোমরা শুয়োরের বাচ্চারা ওখানে যা ছেড়েছ, তাতে আক্রান্ত হয়ে সবার থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় আছে এখন।'

গ্রে-র চোখে চোখ রাখল মাসাহিরো। কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করতে চাইছে। 'তাহলে বলা যায়, মাউইর আক্রমণটা পুরোপুরি বৃথা যায়নি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল-মেয়েটাকে যন্ত্রণাকর এক মৃত্যু উপহার দেয়া।'

গ্রে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

এমন সময় পেছন থেকে শীতল একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'বন্দী মিথ্যা বলছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন কিন। কয়েকজন অস্ত্রধারীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক মেয়ে। চুলের মতো চেহারাও পুরোপুরি সাদা। মুখের একপাশে উল্কি আঁকা। নীল চোখজোড়া গ্রে-র উপর স্থির।

মেয়েটাকে গ্রে-ও চিনতে পেরেছে।

রাত ২:৩৪

ভালিয়া মিখাইলভ...

আফ্রিকায় গত বছর ঝামেলা হওয়ার পর গ্রে বুঝতে পেরেছিল, এক আততায়ী এখনও জীবিত। মেয়েটার ভাই তখন মারা যায়। ছেলেটার মুখে ছিল ভালিয়ার মুখে আঁকা উল্কির বাকি অংশ। সিগমা কমান্ডার ভালো করেই জানে, ভায়ের মৃত্যুর জন্য কাকে দায়ী করেছে মেয়েটা।

মাসাহিরোর সাথে কথা বললেও, ভালিয়ার নজর গ্রে-র মুখ থেকে সরেনি। 'মেয়েটা নৌকায় ছিল না। আমরা ভালোভাবে চেক করেছি।'

দরজার ওপাশে দু'জন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। পালুর দুই ভাই-মাকাইও আর টুয়া।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রে। যাক, লোক দুটো মরেনি তাহলে।

বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে ভালিয়ার দিকে তাকাল মাসাহিরো। 'তাহলে মনে হয় ও মাউইতেই আছে।'

'না,' জোর দিল রাশিয়ান। 'ও এখানে, এই দ্বীপে।'

'কীভাবে নিশ্চিত...'

'এখানেই,' মুখ ঝামটা মারল ভালিয়া। তারপর তাকাল গ্রে-র দিকে। 'ও আমাদের বলবে-কোথায়।'

বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে মাসাহিরোকে। 'এসবের কি দরকার? আমরা তো দ্বীপটা ছেড়েই যাব। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে যাব সব।'

'আপনার দাদা-জোনিন ইতো-মেয়েটার মৃত্যুর খবর শুনতে চান। বিশেষ করে আপনার আগের ব্যর্থতার পর।' বলে গ্রে-র দিকে ফিরল ভালিয়া। 'তাছাড়া ওকে মচকানোর জন্য চল্লিশ মিনিট আমার কাছে অনেক সময়।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে। কথাটায় পাত্তা দিল না।

পারলে মচকাক।

নীরব চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল ভালিয়া। মাসাহিরোর উদ্দেশ্যে বলল, 'যেখানে ইচ্ছা, নিয়ে যান ওদের। তবে আমার আর একজনকে চাই। একে দিয়ে সিগমা কমান্ডারের মুখ খোলানো হবে।'

আইকোর দিকে স্থির হলো রাশিয়ানের দৃষ্টি। 'একটা মেয়ে হলে ভালো...'

দাঁড়িয়ে পড়ল মাসাহিরো। 'না। মিস হিগাশি আমাদের অনেক কাজে আসবেন।'

'তাহলে একজন সিভিলিয়ান।'

'আবারও না। প্রফেসর মাতসুই নিজের কাজে খুব দক্ষ। বোলতা প্রজাতিটার জন্য তার দেয়া নাম-ওডোকুরোর খুব প্রশংসা করেছেন আমার দাদা। সম্ভবত সবকিছু বুঝতে পারলে উনি আমাদের সাথে কাজ করতে রাজি হবেন।'

'তাহলে তো আমার হাতে আর কোন উপায় রইল না,' বলে কোয়ালস্কির দিকে তাকাল ভালিয়া। 'নিয়ে যাও ওকে।'

গুঙিয়ে উঠল সিগমা এজেন্ট। তবে পাঁজরে রাইফেলের গুঁতো খেয়ে বাধ্য হলো সামনে এগোতে।

এক পা আগে বাড়ল গ্রে। 'কোথায় নিচ্ছ ওকে?"

সরু হয়ে এল রাশিয়ানের ঠোঁট। 'নিজেই দেখতে পাবে।'

রাত ২:৫৮

গ্রে-র পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন কিন। আইকোও পাশেই আছে। পেছনে দুই অস্ত্রধারী। সবার আগে পথ দেখাচ্ছে বিবর্ণ রাশিয়ান।

মাসাহিরো ইতো তার পাশে। প্রতিটা কদম মেপে মেপে ফেলছে। ল্যাব কমপ্লেক্সের উপরতলায় উঠতে উঠতে বার দুয়েক ঘড়ি দেখল।

টানেলের গোলকধাঁধা পেরোনোর পর, মাঝখানে কাচের দেয়ালওয়ালা একটা স্টিলের ঘরে নিয়ে আসা হলো সবাইকে। কাচের ওপাশে বেড়িতে বাঁধা তিন বন্দী-মাকাইও, টুয়া এবং কোয়ালস্কি।

গ্রে-র দিকে ফিরল ভালিয়া। 'সত্যি কথা বলতে তিনটা সুযোগ পাবে। আবারও করছি প্রশ্নটা-শেইচান কোথায় আছে? এটা প্রথম সুযোগ। সহযোগিতা করলে প্রাণে বেঁচে যাবে তোমার বন্ধুরা।'

শ্রাগ করল গ্রে।

'তবে তাই হোক।' বলে কাচের দেয়ালের পাশে একটা বোতাম চাপল রাশিয়ান।

কিন লক্ষ্য করলেন, জুতা খুলে নেয়া হয়েছে তিন বন্দীর পা থেকেই।

কী করা হবে ওদের সাথে?

জবাব মিলল এক মুহূর্ত পরই। কাচের দেয়ালের উল্টোদিকে আরেকটা চেম্বারের মুখ খুলে গেল। অন্ধকার একটা স্রোত বেরিয়ে এল খোলা মুখটা দিয়ে।

কিন বিস্মিত চোখে দেখলেন-মেঝে ঘষটে ঘষটে বন্দীদের দিকে এগোচ্ছে স্রোতটা। এই বোলতাগুলোর পাখা নেই। আকারেও একটু ছোট। তবে তাই বলে নৃশংসতায় কম যায় না।

গুঙিয়ে উঠলেন প্রফেসর। পিঠে রাইফেলের গুঁতো খেয়ে চুপ হতে হলো সাথে সাথে।

আবারও মুখ খুলল ভালিয়া। 'এটা দ্বিতীয় সুযোগ। শেইচান কোথায়?'

তাকে অগ্রাহ্য করে কিনের দিকে ফিরল গ্রে। 'কী এগুলো?'

কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে জবাবটা দিলেন প্রফেসর।

'হার্ভেস্টার ওডোকুরো।'

হার্ভেস্টার

নামের মতো এদের কাজটাও জবরজং।

অ্যান্টেনা বাগিয়ে আগে বাড়ছে বোলতাগুলো। এগোনোর ক্ষিপ্রতায় পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছে একে অন্যকে।

খেলা শুরু হবে।

প্রত্যেকের শরীর খাটো পশমে আবৃত। পালের ভেতর যোগাযোগের মাধ্যম এগুলো। পশমের গোড়াগুলো দিয়ে ক্রমাগত নিঃসারিত হচ্ছে ফেরোমোন। সংকেত আদান প্রদান করছে একে অন্যের সাথে।

ওরা আলাদা, আবার একও।

চোখের মাঝখানে থাকা একটা গ্রন্থিতে আছে অবশকারী এক ধরণের কেমিক্যাল। বিন্দু বিন্দু আকারে এগুলো ঝড়ে পড়ছে মুখে। চোয়ালগুলো খুব একটা শক্তিশালী না। কিন্তু পালের সাথে থাকলে কুপোকাত করে ফেলতে পারবে যে কোন প্রাণীকে।

লালায় আছে এক ধরণের পাচক রস। যা যে কোন শক্ত টিস্যু গলিয়ে নরম করে ফেলতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক আমলে, যখন চামড়ার বর্ম পরা অবস্থায় থাকত তাদের শিকার... তখন এই রসটা খুব কাজে লাগত।

যাই হোক, আপাতত নতুন শিকারের ব্যাপারে একে অন্যের সাথে তথ্য আদান প্রদান করছে পতঙ্গগুলো। শিকারের সংখ্যা একাধিক। তবে গুচ্ছাকারে কারা কোনটাকে আক্রমণ করবে, বেছে নিতে বেগ পেতে হলো না।

লক্ষ্যবস্তুর আকার স্পষ্ট।

এগোনোর সাথে সাথে বাড়ছে প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুধা।

খাবার চাই তাদের... খাবার।

শিকারের গায়ের হাড়, মাংস, রক্তপ্রবাহের স্রোত ইত্যাদি এখন আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারছে পতঙ্গগুলো। মস্তিষ্ক থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে সংকেত।

সবচেয়ে মাংসল শিকারটার দিকে এগোল ঝাঁকের সামনে থাকা বোলতাটা। মনে ইচ্ছা, হাড় ছাড়া আর কিছুই বাদ দেবে না।

পায়ে পায়ে লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে গোটা ঝাঁক।

কেউ থামাতে পারবে না তাদের।

কেউ না।

চতুর্থ পর্ব

ভরা জোয়ার

$\sum$

অধ্যায় চব্বিশ

৮ মে, বিকাল ৪:০০ টা
গেডানস্ক, পোল্যান্ড

খোলা প্রাঙ্গণের উপর থেকে হাতে-পায়ে বেড়িবেষ্টিত একটা লোক ঝুলছে।

'হায় হায়... এসব কী!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মঙ্ক বলল।

ক্যাটের নজর অবশ্য উপরে নয়, চারপাশে। টালিনে হামলার শিকার হওয়ার পর থেকে সতর্ক চোখ বুলাচ্ছে সবদিকে।

ছবি তোলা শেষ হতেই হেসে উঠল বেড়িতে ঝুলতে থাকা বন্দী। হাসছে ফটোগ্রাফারও। দু'জনেই পর্যটক, ঘুরতে এসেছে মিউযেয়াম হিস্টোরিযনেগো মিয়াস্টা গেডানস্কায়। গেডানস্কের মধ্যযুগীয় আমলের বিভিন্ন নিদর্শন এই মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। আছে এমনকি চোদ্দ শতকের একটা বিশাল ভবনও। মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র, নির্যাতনের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কোন অভাব নেই। মিউজিয়ামের একটা টাওয়ার সাজানো হয়েছে তৎকালীন জেলখানার আদলে।

তবে ক্যাটের দলটার বর্তমান গন্তব্য অবশ্য ওদিকে নয়।

উপর থেকে ঝুলতে থাকা মধ্যযুগীয় এসব বেড়ি-ফেরির পরই একটা পাঁচতলা ভবন। পুরনো উত্তুল আর্চওয়ের উপর নাম খোদাই করা 'মিউযেয়াম বার্জটাইনু'।

'অ্যাম্বারের জাদুঘর,' আর্চওয়ে দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ইলেনা লেখাটা অনুবাদ করলেন। ক্ষয়ে যাওয়া একটা ধাপে পা দিয়ে টলমল ভাব করতেই, মহিলার হাত ধরে ভারসাম্য রক্ষা করালেন স্যাম।

গেডানস্কে পা রাখার পর থেকে তার উপর বিশেষ নজর রাখছেন পতঙ্গবিদ। ইলেনা অবশ্য বিফল অপহরণ চেষ্টায় শরীরে ঢোকা সিডাটিভের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন বলেই মনে হচ্ছে। তবুও স্যাম সতর্কতায় বিন্দুমাত্র ঢিল দিচ্ছেন না। ফলাফল তো চোখের সামনেই দেখা গেল।

চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে ক্যাটও। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য। পথের দুই পাশে পুরনো বাড়িগুলো কালের বিবর্তনে দোকানপাটে রূপান্তরিত হয়েছে। বুটিক হোটেল আর ক্যাফেও আছে এন্তার। তবে বেশিরভাগ বাড়ির সেলারগুলো পরিণত

হয়েছে জুয়েলারি শপে। অ্যাম্বারের রাজধানী হিসেবে বিশ্বের সামনে গেডানস্কের সাবেক সুপরিচিতিকে ধরে রাখার প্রয়াস যেন।

প্রবেশপথ পেরিয়ে দলটাকে একটা ঢালু সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেল ক্যাট। প্রথম তলায় কাচের তাকের ভেতর, সারি সারি অ্যাম্বারের শিল্পকর্ম সাজানো। বিস্মিত চোখে দলের বাকিরা এগুলো দেখছে, কিন্তু ক্যাটের দৃষ্টি এখনও বিপদের আভাস খুঁজছে চারপাশে। একটা তাকে অ্যাম্বারের পাতাওয়ালা একটা গাছ দেখা গেল, পাশেই আছে মধ্যযুগীয় একটা জাহাজ... এটাও অ্যাম্বারের তৈরি। পরিষ্কার কাচের পাশাপাশি পরিমিত উজ্জ্বল আলোয়, জিনিসগুলো স্বর্গীয় সৌন্দর্য ধারণ করেছে।

বেদীতে রাখা একটা বড় আকারের অ্যাম্বারের ডিম দেখতে পেয়ে থামলেন ইলেনা। জিনিসটার উপরের অংশ সোনা দিয়ে তৈরি। কব্জার মাধ্যমে খুলে রাখা মুখ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ভেতরদিকের পালিশ করা উজ্জ্বলতা। বোঝা গেল, ভেতরেও সোনার কারুকাজ।

'অসাধারণ!' নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

পাশে ঝুঁকে এলেন স্যাম। 'সম্ভবত সাত রাজার ধনের চেয়েও বেশি মূল্যবান।'

কাঁধ দিয়ে পতঙ্গবিদকে আলতো গুঁতো দিলেন ইলেনা। 'কথাটা অনেকাংশেই সত্যি। জিনিসটা যারের তরফ থেকে উপহার হিসেবে এসেছে। পূর্বের মতো আজও রাশিয়ার অ্যাম্বারের সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে।'

'আর নিজের মহাদেশীয় যাত্রায় জেমস স্মিথসন যেদিকে রওয়ানা হয়েছিলেন আর কি,' স্যাম যোগ করলেন।

'মাঝপথে থেমে যাওয়ার আগপর্যন্ত,' ক্যাট বলল, ভেবে মনে মনে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ইলেনা। 'রুশদের মাইনিং অঞ্চলটা বর্তমানে কালিলিনগ্রাদ অবলাস্ট নামে পরিচিত। তবে আগে জায়গাটা লোকে চিনত কোনিংসবার্গ নামে, শব্দটার অর্থ হচ্ছে রাজ-পর্বত।'

পিঠে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন স্যাম। 'তাহলে তো ডিমটার সাথে রাজ-রাজড়াদের ইতিহাস আসলেই জড়িত।'

'রাশিয়ান যারেরও অনেক আগে ছড়িয়ে আছে এর ইতিহাস,' ডিমটার ভেতরে ইঙ্গিত করলেন ইলেনা। 'ভালো করে দেখলে, অ্যাম্বারের ভেতর ভাসতে থাকা একটা মাছি চোখে পড়বে। জিনিসটা নিজের উৎপত্তিস্থলের প্রতিনিধিত্ব করছে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং জৈবিক... সবদিক থেকেই।'

'তবে হাওয়াইয়ের ক্ষেত্রে,' মঙ্ক বলল। 'ব্যাপারটা আসলেই ভারী পড়ে যাচ্ছে।'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ক্যাট। 'আমাদের এগোনো উচিত,' বলে সামনের সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'এই পথে।'

টালিন থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে এখানকার মিউজিয়ামের ডিরেক্টরের সাথে ওর কথা হয়েছে। এখানেও শুনিয়েছে আগের গল্পটাই-জেমস স্মিথসনের হারানো খনিজ সংগ্রহশালা পুন:স্থাপনের কাজে নেমেছে তার দল। প্রকল্পের শুরু হবে এই অঞ্চল থেকে পাওয়া বড় আকারের একটা অ্যাম্বারের খণ্ডের সাথে। খুশি মনেই সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন ডিরেক্টর। তবে তার পেছনে রিসার্চ টিমে ইউএস লাইব্রেরিয়ান অফ কংগ্রেসের জড়িত থাকাও বিশেষ একটা কারণ।

সে যাই হোক... ক্যাট মনে মনে আশা করছে, অন্তত এই লোকের পরিণতি যেন টালিনের ডিরেক্টর টামের মতো না হয়। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, তার সার্জারি শেষ হয়েছে। কিন্তু বিপদ এখনও কাটেনি। লারা বাবার বিছানার পাশেই আছে।

সিঁড়ি বাইতে বাইতে তিক্ততায় ছেয়ে গেল ক্যাটের মন। সাধারণ লোকজনের জীবন হুমকির মুখে ফেলে, এমন কোন কাজ তার পছন্দ না। কিন্তু হাওয়াইতে লাখ লাখ মানুষের প্রাণ বিপন্ন, এই অবস্থায় হাতে আর কোন উপায়ও নেই।

দলটা উপরতলায় পৌঁছে গেছে। এই ফ্লোরটা অ্যাম্বারের ইতিহাস সংক্রান্ত। ডানপাশের দেয়ালে ঝুলছে বিশাল আকারের এক পুরনো মানচিত্র। লারা যেমনটা দেখিয়েছিল, অনেকটা সেরকম। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে গেডানস্ক, বাল্টিক উপকূল ধরে এগিয়েছে একটা বাণিজ্যিক গতিপথ। তারপর পোল্যান্ড হয়ে দক্ষিণে গিয়ে থেমেছে ইতালিতে।

দ্য অ্যাম্বার রোড।

এই পথের কোন এক অংশ থেকেই জিনিসটা পেয়েছিলেন স্মিথসন।

কিন্তু কোথায়?

চেম্বারের বিপরীত দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মঙ্ক। 'ও ব্যাটা মনে হয় তোমাকে কিছু বলতে চায়।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাট দেখল, বেঁটেখাটো একটা লোক এগিয়ে আসছে। ছোটখাটো শরীরের মাঝের অংশটা ড্রামের মতো দেখতে। যে কোন সময় কোটের বোতাম ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে মেদ ভুঁড়ি। ইনিই এই মিউজিয়ামের ডিরেক্টর। সম্ভবত ইলেনা ডেলগাডোকে চিনতে পেরেছেন। চেঁচিয়ে বলা তার পরবর্তী কথাতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো।

'ড. ডেলগাডো, দেখে খুশি হলাম!'

আশেপাশের পর্যটকরা বিরক্ত দৃষ্টিতে দলটার দিকে তাকাল।

আঁতকে উঠল ক্যাট। তাদের আগমনের ব্যাপারটা গোপন রাখতে ভদ্রলোককে অনুরোধ করেছিল সে। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, ডিরেক্টরের কণ্ঠ শহরের বধির

মানুষজনের কানেও পুনঃজাগরণ ঘটাবে। দলবল নিয়ে তাড়াতাড়ি লোকটার দিকে এগোলো সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

'খুব খুশি হলাম,' আবারও বললেন ডিরেক্টর। 'ভাবতেই পারছি না, লাইব্রেরিয়ান অফ কংগ্রেস আমাদের প্রতিষ্ঠানে পায়ের ধুলো রেখেছেন।'

অভ্যর্থনায় মুচকি হাসলেন ইলেনা। ডিরেক্টরের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরে আলতো ঝাঁকি দিলেন তারপর। 'সাহায্য করতে রাজি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর বস্কো।'

'সাহায্য' শব্দটার প্রয়োগ ক্যাটের মন আরেকটু খারাপ করে দিল।

ডিরেক্টর বস্কো অবশ্য মাথা নাড়লেন। 'অযিউইশি... অবশ্যই। এদিকে আসুন। ভেতরে বিস্তারিত কথা হবে।'

লোকটার পিছু নিয়ে পার্শ্ববর্তী চেম্বারে ঢুকল সবাই। জায়গাটা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা, কয়েকটা ডিসপ্লে কেস সম্পূর্ণ খালি। ঘরটা সম্ভবত নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে চেম্বারের একেবারে পেছনে চলে এলেন ডিরেক্টর। এখানে টেবিলে কিছু জিনিস রাখা আছে, সবই অ্যাম্বারের তৈরি।

'সম্ভবত এগুলো আপনাদের অনুসন্ধানে সাহায্য করবে,' বস্কো বললেন।

ভ্রূকুটি করল ক্যাট। টেবিলে কোন কাগজপত্র, জার্নাল বা বই দেখা যাচ্ছে না। 'আপনাদের শহরে জেমস স্মিথসনের আসার কোন নথি খুঁজে পাননি?'

মাথা নাড়লেন বস্কো। 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, না। স্মিথসনের জাহাজ ভাড়া করে টালিনে যাওয়র সময়কার সব কাগজপত্র খুঁজে দেখেছি আমরা। কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। তবে আশা করছি, আরও সময় দিলে অন্তত কিছু হলেও পাব।'

এই সময়টাই তো হাতে নেই!

ক্যাটের মনে আশঙ্কা দানা বাঁধছে, শুধু শুধু এখানে আসা হলো না তো?

'এদিকে দেখুন,' স্যাম বললেন। দৃষ্টি টেবিলে রাখা একটা নিদর্শনের উপর নিবদ্ধ। 'দারুণ তো!'

সামনে এগোলো সবাই। টেবিলে হাতের মুঠো আকারের একটা অ্যাম্বারের দলা সাজানো। উপরিতল ভেতরের জিনিসটা দেখার পক্ষে যথেষ্ট পরিষ্কার।

'এটা তো একটা সরিসৃপ,' ইলেনা বললেন।

'আমাদের সংগ্রহশালার ছোট্ট একটা নমুনা,' সায় দিলেন বস্কো। কণ্ঠে গর্বের ছাপ। 'জিনিসটা খুবই বিরল। কোন জীবের একেবারে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত অ্যাম্বারে সংরক্ষিত থাকা খুব একটা পাওয়া যায় না।'

কথা সত্যি। ক্যাটও মনে মনে সম্মত হলো।

'আপনারা যখন জেমস স্মিথসনের পাওয়া ওই জিনিসটার কথা বললেন- অ্যাম্বারে সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক কোন সরীসৃপের কঙ্কাল-সাথে সাথে এই

নিদর্শনের কথা মনে পড়ে আমার।' বলতে বলতে চোখ বড় বড় করলেন ডিরেক্টর বস্কো। 'আর সম্ভবত আপনাদের ওই উৎস খুঁজে পাওয়ার একটা উপায়ও।'

'কীভাবে?' ক্যাট জানতে চাইল।

নিদর্শনটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ডিরেক্টর। 'আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুর বয়স বত্রিশ মিলিয়ন বছর, যা এই এলাকায় পাওয়া অ্যাম্বারের বয়সের সমতুল্য। রাশিয়া এবং বাল্টিক সাগরের তীরের অ্যাম্বারের বয়স কিন্তু আরও কম। ওগুলোর জন্ম হয় টারশিয়ারি যুগে। ত্রিশ মিলিয়ন বছরের মতো হবে। তবে আসল কথা হচ্ছে, আমাদের এই অ্যাম্বার কিন্তু এখনও পুরোপুরি তৈরি নয়।'

টেবিলে রাখা জিনিসটা ভালোভাবে লক্ষ্য করল মঙ্ক। 'আপনি বলতে চাইছেন, এটা এখনও শক্ত হচ্ছে?'

'ঠিক তাই,' বস্কো হাসিমুখে সায় দিলেন। 'তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি, স্মিথসনের ওই অ্যাম্বার আমাদের বাল্টিক উপকূলের নয়।'

ক্যাটের শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল।

তবে কি এতক্ষণ ধরে আমরা ভুল সূত্রের পেছনে ছুটছি?

বস্কো বলে চলেছেন, 'আসল ও আদি অ্যাম্বারের খোঁজে আপনাদের অন্য কোথাও দেখতে হবে। সারা বিশ্বে ছড়ানো ছিটানো আছে অ্যাম্বারের খনি। এমনকি আপনাদের দেশ কিংবা স্পেনে। দুইশো মিলিয়ন বছরের পুরনো অ্যাম্বারও খুঁজে পাওয়া যায় ওখানে।'

'কিন্তু এসবের মানে কী?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে থাকায় কথা ক্যাটের মুখ দিয়ে একটু জোরেশোরেই বেরোল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন বস্কো। 'আমি দুঃখিত। ফোনে বলেছিলেন, স্মিথসনের অ্যাম্বারে সংরক্ষিত হাড়গুলো একটা ডাইনোসরের বলে মনে করা হচ্ছে।'

'ঠিক তাই।'

'তাহলে স্মিথসন সাহেব অবশ্যই টুকরোটা বেশ প্রাচীন কোন খনি থেকে পেয়েছেন, পরবর্তী ক্রেটাসিয়াস যুগে যখন ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। সেক্ষেত্রে জিনিসটা সম্ভবত আশি থেকে একশো মিলিয়ন বছর আগেকার হবে। বাল্টিক সাগরে পাওয়া অ্যাম্বারের বয়সের তুলনায় যা দ্বিগুণেরও বেশি।'

বাইরের দেয়ালে ঝোলানো মানচিত্রের কথা মনে করল ক্যাট। 'তাহলে জিনিসটা অ্যাম্বার রোড থেকে পাওয়া নয়?'

বিড়বিড় করে গাল বকল মঙ্ক। টালিনে হামলার পর নতুন লাগানো প্রস্থেটিক হাত দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকছে। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে সবসময় সাথে একটা বাড়তি প্রস্থেটিক রাখে ও। ব্যাপারটা তার কাছে জুতো বদলানোর মতো।

'আমি সেটা বলছি না,' বস্কো শুধরে দিলেন। 'শুধু বললাম, জিনিসটা আমাদের এখানকার নয়। এক সময় প্রাগৈতিহাসিক টেথিস সাগরের নিচে ছিল পোল্যান্ডের গোটা দক্ষিণাংশ। তখন টেথিসের উপকূলে থাকা পাইন বনের রজন শক্ত হয়ে অ্যাম্বারে পরিণত হয়।'

এখন যুক্তিটা বুঝতে পেরেছে ক্যাট। 'তার মানে, যত দক্ষিণে যাওয়া হয়... তত পুরনো হয় অ্যাম্বার।'

সায় দিলেন ডিরেক্টর। 'ডাইনোসরের হাড় সংরক্ষণ করে রাখার মতো পুরনো।'

কিন্তু জায়গাটা কোথায়!

'আপনারা সম্ভবত হন্যে হয়ে উৎসটা খুঁজছেন,' যোগ করলেন বস্কো। যেন ক্যাটের মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, দেখতে সার্কারের জোকারের মতো দেখালেও লোকটা ঘটে যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন। টেবিলের দিকে ইশারা করলেন তারপর। 'এখানে নতুন থেকে পুরনো, সব ধরনের অ্যাম্বারই সাজিয়েছি আমি। দেখুন কালের বিবর্তনে কীভাবে পরিবর্তিত হয় জিনিসটার রঙ। পরিণত হয় গাঢ় লালচে-বাদামীতে। এমন দেখতে বেশিরভাগ পুরনো অ্যাম্বারই এসেছে নীল-পৃথিবী থেকে।'

ভ্রূ কুঁচকালো মঙ্ক। 'নীল কি? পৃথিবী?'

'বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলতে গেলে সামুদ্রিক গ্লুকোনাইটিক বালু। আরও সহজ ভাষায়, লবণাক্ত বেলেপাথর যা কিনা পিছু হটতে থাকা সাগরের উপকূল থেকে আসে।'

মাথা ঝাঁকাল মঙ্ক। 'টেথিস সাগরের শুকিয়ে যাওয়ার মতো আর কি।'

'অনেকটা এরকমই। আর সবচেয়ে প্রাচীন এবং গভীর নীল-পৃথিবী হচ্ছে দক্ষিণ পোল্যান্ডে।'

'অ্যাম্বার রোডের গতিপথে পড়ে এই এলাকাটা,' ক্যাট যোগ করল।

হঠাৎ মানচিত্রটা দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে তার। কিছু একটা মাথায় এসেছে, কিন্তু মুখে আসছে না।

আরও চওড়া হলো বস্কোর মুখের হাসি। 'এজন্যই আমি...'

ঠং করে বিকট একটা আওয়াজ সবার মনোযোগ কেড়ে নিল। আঁতকে উঠে ঘরের প্রবেশমুখের দিকে তাকাল দলটা। ধাক্কা দিয়ে পথের পাশের একটা ধাতব স্ট্যান্ড ফেলে দিয়েছে কেউ। পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ওদিক থেকে।

মুহূর্তের ব্যবধানে অস্ত্রের বাঁটে স্থির হলো ক্যাটের আঙুলগুলো।

বিকাল ৪:২০

মঙ্ক আর ক্যাট পিস্তল বের করতে করতে টেবিলের দিকে সরে গেলেন ইলেনা। স্যাম তার পাশেই।

অস্ত্র দেখে লাফিয়ে উঠলেন ডিরেক্টর বস্কো। সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠলেন হাত তুলে। 'গুলি করবেন না। এই ব্যাপারটাই সবেমাত্র বলতে যাচ্ছিলাম।'

পার্টিশনের ওপাশ থেকে লম্বা একটা অবয়ব দৃশ্যপটে এল। হাড় জিরজিরে কাঁধ থেকে পরনের কোটটা এমনভাবে ঝুলছে, যেন ওটা একটা পতাকার খুঁটি। লোকটার বুকে একটা ব্যাগ আঁকড়ে ধরা। বয়স সম্ভবত চল্লিশের মতো হবে। তবে উদ্যত অস্ত্র দেখে বিন্দুমাত্র ভড়কালো না। যেন আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়েছে, তার উপর হামলা হবে।

'এ হচ্ছে ড. ডেমিয়েন স্লাস্কি,' বস্কো পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'আমার সহকর্মী। ক্রাকভে সদ্য উদ্বোধন হওয়া অ্যাম্বার মিউজিয়ামের হয়ে কাজ করে। আপনাদের ফোন আসার আগেই ডেমিয়েন এখানে পৌঁছায়। নিজের জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য আঠারো শতকের অ্যাম্বারের কিছু নিদর্শন ধার করতে এসেছে।'

'অ্যাম্বারের মিউজিয়াম মোট কয়টা?' মঙ্ক জানতে চাইল।

'কোপেনহেগেনে একটা, ডমিনিকান রিপাবলিকে একটা, আরেকটা উত্তরে... কালিলিনগ্রাদে।'

সহকর্মীকে শুধরে দিলেন স্লাস্কি। 'লিথুয়ানিয়ার প্যালাঙ্গাতেও আছে একটা। তবে ওটা লিথুয়ানিয়ান আর্ট মিউজিয়ামের শাখা।'

আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসার প্রয়াস পেল ক্যাট। 'ডিরেক্টর বস্কো, আপনি সম্ভবত আমাদের সাহায্য করার জন্য ড. স্লাস্কিকে ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' সায় দিলেন ডিরেক্টর। 'পুরনো অ্যাম্বারের উৎস খোঁজার ক্ষেত্রে আমার এই বন্ধু-ডেমিয়েন একটা প্রতিভা।' বলতে বলতে সহকর্মীর কাঁধে আলতো চাপড় দিলেন।

ইলেনা বুঝতে পারলেন, সহকর্মীর পাশাপাশি বন্ধুত্বেরও একটা সম্পর্ক আছে দু'জনের মধ্যে।

'ওই জাদুঘরে অ্যাম্বারের ল্যাবরেটরির দেখভাল করে ডেমিয়েন,' বস্কো যোগ করলেন। 'গোটা ক্রাকভে অ্যাম্বারের নির্ভেজালত্ব প্রমাণের জন্য একমাত্র স্পেকট্রোমিটার ওর ল্যাবেই আছে। অ্যাম্বারের বয়স প্রমাণে ডেমিয়েনের তুলনা বর্তমানে ও নিজেই।'

শ্রাগ করলেন স্লাস্কি। যেন বন্ধুর প্রশংসা গায়ে মাখার কোন ইচ্ছাই নেই।

‘পোল্যান্ডের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে ক্রাকভ খুব একটা দূরে নয়। টেথিস সাগরের রেখে যাওয়া নীল-পৃথিবীর বেশ পুরনো স্তর ওখানে পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরে পাওয়া যায় প্রাচীন বিরল অ্যাম্বারের শিরাও।’

‘কিরকম বিরল?’ ক্যাট জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন ইলেনা। যদি এই শিরা আসলেই ‘বিরল’ হয়, তাহলে তাদের খোঁজাখুঁজির সীমা অনেকটা কমে আসবে।

জবাবটা স্লাস্কির মুখ থেকে এল। ‘ওরকম প্রায় সব ধরণের আবিষ্কারের তথ্য আমার অফিসের কম্পিউটারে আছে। কাজটা সম্ভব হয়েছে কারণ, ক্রাকভের বাইরের একটা আর্ট মিউজিয়ামে অনেক মাস ছিলাম আমি। ওদের কাছে এ-সংক্রান্ত বেশ ভালো সংগ্রহ রয়েছে। কিছু মানচিত্র তো একেবারে চোদ্দ শতকের অ্যাম্বারের শিরাগুলোও চিহ্নিত করেছে।’

‘সেই তথ্যগুলো জানতে পারলে,’ ক্যাট বলল। ‘স্মিথসন কোথায় তার নিদর্শনটা পেয়েছিলেন, এই ব্যাপারে ধারনা পাব হয়তো।’

‘অন্ততপক্ষে আমাদের সামনে একটা সীমারেখা পড়বে,’ ইলেনা যোগ করলেন।

‘নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না এতে কাজ হবে,’ জবাব দিলেন স্লাস্কি। ‘দক্ষিণ পোল্যান্ডে এরকম তিনশোরও বেশি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছি আমি।’

দমে গেল ক্যাট, তবে সূত্রটার ব্যাপারে হাল ছাড়তে চাইছে না। ‘অ্যাম্বার রোড ধরে স্মিথসনের ভ্রমণ অনুযায়ী জায়গাগুলো নিশ্চিত করতে পারলে হয়তো আমরা...’

মাথা নাড়লেন স্লাস্কি। ‘ওই ঝামেলায় যাওয়ার কোন দরকার নেই। আমি ইতিমধ্যে জেনে গেছি, স্মিথসন কোথেকে তার সেই অ্যাম্বারের টুকরোটা পেয়েছিলেন। তড়িঘড়ি করে আমার এখানে আসার পেছনে কারণ এটাই।’

চোখ পিটপিট করল ক্যাট। ‘কীভাবে?’

গর্বভরে দুই হাত একত্রে ঘষলেন বস্কো। মুখে তৃপ্তির হাসি। ‘আগেই তো বলেছিলাম, ডেমিয়েনকেই খুঁজছেন আপনারা!’

বিকাল ৪:৩২

‘এটা কি?’ ক্যাট জিজ্ঞেস করল।

সে বুঝতে পারছে না, স্লাস্কির দাবীর সাথে এই জিনিসটার মিল কোথায়। এই মুহূর্তে ডক্টরের ব্যাগ থেকে বের করা একটা ল্যাপটপের মনিটরে ঝুঁকে আছে দলের সবাই। স্ক্রিনে ভাসছে বহু প্রাচীন এক মানচিত্র।
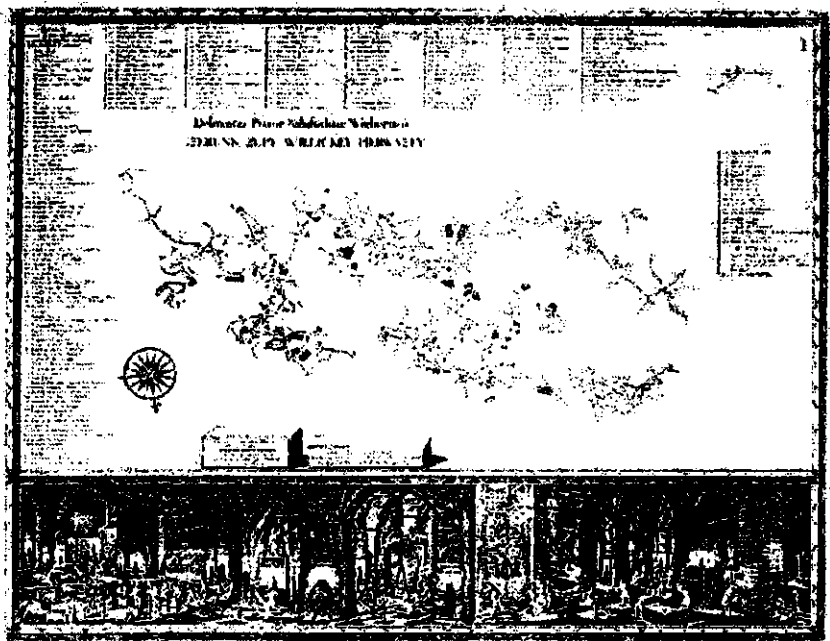
'এটা মিউজিয়ামের মানচিত্র ডিভিশন থেকে পাওয়া। ষোলশো পঁয়তাল্লিশ সালে উইলেম হন্ডিয়াস ছবিটা আঁকেন। অবশ্য মানা হয়ে থাকে, তিনি এই কাজটা সারেন পূর্ববর্তী মানচিত্র বিশারদ মার্সিন জার্মানের একটা চিত্র অনুসারে।'

'বুঝলাম,' ক্যাট জোর দিল। 'কিন্তু এটার মাহাত্ম্য কী?'

'এখানে দুটো অ্যাম্বারের প্রাপ্তিস্থান চিহ্নিত আছে। তবে আপনাদের দেখানোর একমাত্র কারণ তা নয়।' বলে ক্যাটের দিকে ফিরলেন স্লাস্কি। 'আপনাকে বুঝতে হবে, পোল্যান্ডের অ্যাম্বার সাইটগুলো খুবই দুস্প্রাপ্য। আকারে ছোট, আর ছড়ানো ছিটানো। তাই বিশেষত শুধু অ্যাম্বার উত্তোলনের উদ্দেশ্যে খনি খোঁড়া হয় না।'

ল্যাপটপের উপর থেকে সোজা হলো মঙ্ক। 'আপনি বলতে চাইছেন, অ্যাম্বারের শিরা অন্য কোন মাইনিং অপারেশনের সময় বের হয়?'

'আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশের জার্নালেও তো তাই পাওয়া যায়,' ক্যাট সায় দিল। 'স্মিথসন বলেছিলেন, কিছু মাইনার নাকি দুর্ঘটনাবশত ওই খনিতে ঢুকে পড়ে।'

গল্পের বাকি অংশটা এড়িয়ে গেল সিগমার অ্যানালিস্ট। তারপরই মুক্ত হয় খনিতে লুকানো বিভীষিকা। হুলধারী পতঙ্গবাহিত মারাত্মক সেই রোগ।

আসল ঘটনাটা আন্দাজ করতে পেরেছে ক্যাট। অ্যাম্বারে সংরক্ষিত, অডোকুরোর ক্রিপ্টোবায়োটিক সিস্টে ভরা হাড়গুলো উন্মুক্ত করে খনি শ্রমিকরা। তারপর কোনভাবে লোকগুলোর ভেতরে ঢুকে পড়ে ওই স্পোর। এরপর জীবন্ত অবস্থায়

তাদের খেতে শুরু করে স্পোর ফুটে বেরনো লার্ভা। এক সময় পোষকের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

তৎকালীন লোকেরা যে শ্রমিকসমেত টানেলটা উড়িয়ে দেবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী!

স্লাস্কি অবশ্য এসবের কিছুই জানেন না, তবে উনি নিজের মতো একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। 'আগেই ভেবেছি, এই অ্যাম্বারের আবিষ্কার হচ্ছে দুর্ঘটনার ফসল। স্মিথসন সাহেবের সময় পোল্যান্ডে প্রচুর সক্রিয় খনি ছিল। তামা, সালফার, রূপা ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর। তবে দক্ষিণ পোল্যান্ডে যে জিনিসটার খনি ছিল সবচেয়ে বেশি, তা হচ্ছে লবণ।'

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফুটে থাকা মানচিত্রের দিকে ইশারা করলেন ভদ্রলোক। 'হন্ডিয়াসের আঁকা এটার মতো। ছবির নিচের অংশে খনিটার কাজের বেশ কিছু দৃশ্যও আঁকা আছে।'

'কোন খনি এটা?' ইলেনা জিজ্ঞেস করলেন।

'পোল্যান্ডের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ খনিগুলোর ভেতর এটা একটা। ওয়াইলিযকা লবণ খনি। তেরো শতকে উৎপত্তির পর থেকে এখানে দু'হাজার সাত সাল পর্যন্ত লবণ উৎপাদন জারি ছিল। তারপর ইউনেস্কো জায়গাটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে।'

ভ্রূকুটি করল মঙ্ক। 'পুরনো একটা খনি... বিশ্বের অন্যতম দর্শনীয় বস্তুর সম্মান পেল কেন?'

জবাবটা দিলেন বস্কো। 'দেখলে বুঝতে পারতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শ্রমিকরা ওখানে কাজ করেছে। টানেলগুলোকে কারুকাজের মাধ্যমে খোদাই করেছে নিজেদের মতো। বেশিরভাগই ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারস্যাপার। মানে ঈশ্বর যেন তাদের অশুভের হাত থেকে রক্ষা করেন আর কি।'

'বছরের পর বছর ধরে পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে এই খনি,' স্লাস্কি যোগ করলেন। 'প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস, পোলিশ সুরকার ফ্রেডরিক কোপিন... আধুনিককালের ইউএস প্রেসিডেন্ট কিংবা হাল আমলের পোপ, কেউ বাদ যাননি।'

আগের কথার খেই ধরল ক্যাট। 'তো এমন সুনাম অনায়াসে পার্শ্ববর্তী অ্যাম্বার রোড ধরে চলতে থাকা খনিবিশারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।'

'অবশ্যই,' হাসিমুখে সায় দিলেন ডক্টর। 'এজন্যই আমি ওখানে গিয়ে স্মিথসনের ভ্রমণ সময়কার পর্যটকদের নামের তালিকা দেখতে চাই।'

'তার নাম পেয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন সাস্কি।

মানচিত্রের দিকে তাকাল ক্যাট। 'আর তার পুরনো দলিল অনুযায়ী, ওখানে আগেও অ্যাম্বার পাওয়া গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ। লবণ খনিতে প্রায়ই অ্যাম্বারের শিরা পাওয়া যায়।'

ক্যাট বুঝতে পারল, তারা লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন স্যাম। পতঙ্গবিশারদ হিসেবে এসব ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে তার বলার কিছু নেই। কিন্তু এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন।

'কী?' জানতে চাইল ক্যাট।

'প্রফেসরের মাতসুইয়ের রিসার্চ নোটে আমি দেখতে পাই...' দুই পোলিশ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কথা অসমাপ্তই রেখে দিলেন স্যাম।

হাতে সময় খুব কম। এই পরিস্থিতিতে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করার মানে নেই। ক্যাট জোর দিল। 'বলুন।'

'প্রফেসর মাতসুই এই বোলতাগুলোর অন্য জীবের স্বভাব নিজেদের মাঝে আত্মীকরণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। যাকে তিনি বলেছেন জীবনের কৃষ্ণবস্তু। ওই ল্যাযারাস মাইক্রোবদের মতো, যারা শত-সহস্র বছর সুপ্তাবস্থায় থেকেও অনুকূল পরিবেশে পুনরায় জীবনধারণ করতে পারে।'

'তো?'

'নিজের নথিতে ওরকম অনেক ল্যাযারাস মাইক্রোবের কথা উল্লেখ করেছেন প্রফেসর মাতসুই। ন্যাট্রোনোব্যাকটেরিয়াম, ভিগরিব্যাসিলাস, হ্যালোরুব্যাকটেরিয়াম, ওশেনোব্যাসিলাস ইত্যাদি। এদের সবাইকে ক্রিস্টাল অবস্থা থেকে আবিষ্কার করা হয়। এবং সবাইকে পাওয়া যায় একই ধরণের ক্রিস্টাল, অর্থাৎ খনিজ থেকে।'

ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল ক্যাট। 'লবণ।'

সায় দিলেন স্যাম। 'এই লবণ-লোভী বিশেষত্ব বোলতাগুলো আত্মীকরণ করেছে ওই ল্যাযারাসদের জিনোম থেকে। সময়ের সাথে ল্যাযারাসদের জিন মিলেমিশে গেছে বোলতাদের সাথে, তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে ক্রিপ্টোবায়োসিস অর্থাৎ ওরকম সুপ্তাবস্থায় থাকার ক্ষমতা।'

এক কথায়, মৃত্যুকে কাঁচকলা দেখানো অমরত্ব...

'যদি আপনার ধারণা সত্যি হয়ে থাকে,' ক্যাট বলল। 'তাহলে সঠিক পথে এগোচ্ছি আমরা। তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় একটাই।'

গোছগাছ করে উঠে পড়ছে সবাই। এমন সময় ডক্টর স্লাস্কি এগিয়ে এলেন। 'আজ আমার ক্রাকভে ফিরে যাওয়ার কথা, চাইলে আপনাদের সাথে আসতে পারি।'

প্রস্তাবটা নাকচ করে দিতে চাইছিল ক্যাট। ডিরেক্টর টামের আহত হওয়ার দৃশ্যটা এখনও তার চোখে ভাসে।

কিন্তু স্লাস্কি জোর করলেন। 'খনি কর্মীদের সাথে আমার চেনাজানা আছে। অনুসন্ধানের কাজে আপনাদের সহায়তা করতে পারব।'

এবার আর দ্বিমত করল না ক্যাট। মঙ্কের দিকে মতামতের উদ্দেশ্যে তাকাতে, শ্রাগ করল সে। বোঝা গেল, আপত্তি নেই।

'ধন্যবাদ, ড. স্লাস্কি। আপনি সাথে থাকলে উপকার হবে।'

এরপর ডিরেক্টর বস্কোকে ধন্যবাদ দিয়ে মিউজিয়ামের বাইরে বেরিয়ে এল দলটা। পার হতে শুরু করল ডিলুগা স্ট্রিটের জুয়েলারি দোকান আর ক্যাফেগুলো। রাস্তায় বেজায় ভিড়।

আরেকটা বিষয় মনে পড়তে স্বামীর দিকে ফিরল ক্যাট। 'মনে হচ্ছে, ভুল বোঝার জন্য আইকো হিগাশির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

'সম্ভবত,' মঙ্কও সায় দিল।

আগের দিন টালিন থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে পেইন্টারকে বলা হয়েছিল, জাপানি ইন্টেলিজেন্সের সামনে একটা মুলা ঝুলিয়ে রাখতে। যেন তাদের বলা হয়, দলটা অ্যাম্বার রোড ধরে সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। জাপানি সংস্থাটায় কোন ফাঁক থেকে থাকলে, ওরা এখন তাদের উত্তর রাশিয়ায় খুঁজছে।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরই বোঝা গেল, ব্যাপারটা তা নয়!

অনুসরণ করা হচ্ছে ওদের!

'কয়জন?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্যাট।

'আপাতত পাঁচ।'

চলার উপর রইল ক্যাট। বুঝতে পারছে না কী করবে। ফেউ খসাবে, নাকি ওদের বুঝতে দেবে না-অনুসরণের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। দুটো পথই লাভ-ক্ষতির আশঙ্কায় মোড়া। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। টালিনে অসফল হওয়ার পর এবার আর কোন ধরণের ছাড় দেবে না প্রতিপক্ষ।

কিন্তু ওরা জানল কীভাবে, ক্যাটের দল গেডানস্কে এসেছে?

অবশেষে নিশ্চিতভাবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ক্যাট।

ডি.সি.তে হোক বা এখানে...

তাদের ভেতর একজন বিশ্বাসঘাতক আছে।

অধ্যায় পঁচিশ

৮ মে, রাত ৩:৩৩
ইকিকাউও দ্বীপ

তিন বন্দীর চারপাশে বৃত্ত রচনা করা কালো স্রোতটা দেখছে গ্রে। বিস্ময়ে ঝুলে পড়েছে অসহায় সিগমা কমান্ডারের চোয়াল। যা ঘটতে যাচ্ছে, তা কোনভাবেই ঠেকানোর ক্ষমতা তার নেই।

ডানাবিহীন এই বোলতাগুলোকে প্রফেসর মাতসুই হার্ভেস্টার নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এখন এরাই তিন বন্দীর ভাগ্য নির্দিষ্ট করবে।

আগে বাড়ল এক হার্ভেস্টার। কিন্তু পরমুহূর্তে চ্যাপ্টা হয়ে গেল কোয়ালস্কির ভারী পায়ের চাপে। কিন্তু ততক্ষণে আরেক পায়ে উঠে পরেছে আরেকটা পোকা। সাথে সাথে কাজে নামল ওটার ক্ষুরধার চোয়াল।

রক্তের ফোঁটা গড়াল বিশালদেহী সিগমা এজেন্টের পা বেয়ে।

পালুর দুই ভাই-মাকাইও আর টুয়া-ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। তারাও পা নেড়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে ঘিরে থাকা পালটাকে দূরে রাখার। কিন্তু কতক্ষণ আর পারবে?

'দয়া করুন! এরকম করবেন না!' অনুনয় করলেন কিন। গ্রে-র পাশেই, অস্ত্রের মুখে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর। পেছনে তিন গার্ডের ছোট বাহিনী।

'তাহলে যা জানতে চাচ্ছি, বলে দিন,' বড় একটা সবুজ বোতাম দেখিয়ে ভালিয়া বলল। 'তাহলে অন্তত আসন্ন বিপদ থেকে বন্দীরা বেঁচে যাবে।'

অনুমতির আশায় গ্রে-র দিকে তাকালেন কিন।

না-বোধক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিগমা কমান্ডার।

এবা আইকোর উপর স্থির হলো ভালিয়ার নজর। 'চাইলে আপনিও বলতে পারেন কিন্তু।'

গ্রে-র মানা করা খেয়াল করেছে ও। তাই চুপ রইল। প্রাণপণে চেষ্টা করছে জানালা থেকে চোখ সরিয়ে রাখতে।

বিফল হয়ে অগত্যা হাত দিয়ে ইশারা করল ভালিয়া। 'তবে তাই হোক।'

আড়াআড়িভাবে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মাসাহিরো। বোঝাই যাচ্ছে, ভালিয়ার এসব কর্মকান্ডে যথেষ্ট বিরক্ত। 'মনে হয় মেয়েটা এখানে নেই।'

'আসলেই নেই,' সায় দিল গ্রে। 'মাউইতে আছে শেইচান। শুধু শুধু লোকগুলোকে কষ্ট দিচ্ছেন আপনারা।'

ভালিয়ার দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে ঘড়িতে সময় দেখল মাসাহিরো। 'দ্বীপটা খালি করতে হবে,' বলে জানালার দিকে ফিরল। 'ওই তিনজনের প্রতি দাদার কোন আকর্ষণ নেই। এরা এভাবেই থাক। বাকিদের নিয়ে আমরা রওয়ানা হই।'

কঠোর দৃষ্টি হানল ভালিয়া। 'শেইচানকে ছাড়া কোনমতেই না।'

আর কোন উপায় না দেখে বিড়বিড় করে গাল বকল মাসাহিরো। 'বাকা মেসু...'

পাত্তা দিল না মেয়েটা। নিজের কাজে মনোযোগ দিচ্ছে।

খুব বেশিক্ষণ লাগবে না।

চেম্বারের ভেতর স্রোতটা নড়তে শুরু করেছে। সম্ভবত কোয়ালস্কির পা বেয়ে গড়ানো রক্ত আকর্ষণ করছে প্রাণীগুলোকে।

বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টুয়া। তার ভাই মাকাইও আরেক কাঠি সরেস। দুই পা-ই উপরে তুলে, ঝুলে আছে হাতে বাঁধা শিকলে ভর ছেড়ে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর শিকল মাংসে কেটে বসায় হাল ছাড়তে হলো। সাথে সাথে পা বেয়ে উঠতে শুরু করল হার্ভেস্টারের দঙ্গল।

টুয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্রতি কামড়ের সাথে সাথে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে দুই ভাই। তবে কাচের পার্টিশন থাকায় এপাশে চিৎকার শোনা যাচ্ছে না।

নিজের পা দুটোকে ঝাড়ুর মতো ব্যবহার করছে কোয়ালস্কি। চেষ্টা করছে বোলতাগুলোকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু বেশিক্ষণ সফল হতে পারল না। বিকৃতভাবে হাঁ করে চেঁচাতে দেখা গেল তাকেও।

গ্রে জানে, পরিস্থিতি উত্তরোত্তর খারাপ হবে।

দল বেঁধে বন্দীদের পা বেয়ে উঠে যাচ্ছে হার্ভেস্টাররা। কামড়ে তৈরি করছে নিত্যনতুন ক্ষত। কোয়ালস্কির পা ঝাড়ার সাথে সাথে রক্তের ছিটে এসে জানালার কাচে লাগছে।

আর সহ্য করতে পারল না আইকো। মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বুজল।

আর কতক্ষণ!

গ্রে-র মনের কথা ধরতে পেরে যেন মুখ খুললেন কিন। 'হার্ভেস্টাররা হচ্ছে লার্ভাগুলোর মতো। এরা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো থেকে দূরে সরে থাকে। খাদ্যের উৎসকে যতক্ষণ সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মাংস খেতে খেতে ঢুকতে থাকে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে।'

ব্যথিত চোখে বন্দীদের দিকে তাকাল গ্রে। প্রফেসরের মুখ থেকে কথাগুলো না বেরোলেই ভালো হত।

কিন্তু তার বলা এখনও শেষ হয়নি। 'হার্ভেস্টারদের মুখে এক ধরণের অবশকারী বিষ থাকে। প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হলে ফলাফলও হয় মারাত্মক।'

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল আইকো। 'অবশকারী বিষ কি ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে?'

'না,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'বরং উল্টো। নড়াচড়া করার অবস্থা হারায় শিকার। জ্যান্ত ভক্ষণ হতে থাকার অনুভূতি অনুভব করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না তখন।'

রক্তে ভেজা কাচের উল্টোদিকে এখনও লড়াই করছে তিন বন্দী। কিন্তু প্রফেসরের কথা সত্যি হয়ে থাকলে, শীঘ্রই সবকিছুর সমাপ্তি ঘটবে।

গ্রে-র দিকে ফিরল ভালিয়া। 'বলেছিলাম তিনটা সুযোগ দেব। এটাই কিন্তু শেষ সুযোগ।'

তারপর ইঙ্গিত করল সবুজ বোতামের দিকে।

এবারও চুপ করে রইল গ্রে। সাথে সাথে আরেকটা কাজ করল রাশিয়ান। এগিয়ে গিয়ে জানালার পাশের একটা বোতাম টিপতেই, জ্যান্ত হয়ে উঠল লুকানো স্পিকার। বন্দীদের তীব্র চিৎকারে প্রকম্পিত হলো চারপাশ।

গ্রে-র মনে হতে লাগল যেন রক্ত মিশে আছে ওই চিৎকারের সাথে।

আর সহ্য করতে পারল না সিগমা কমান্ডার। 'শেইচান এখানে।'

ঝট করে মাসাহিরোর দিকে তাকাল ভালিয়া। 'এবার শুনলে?'

'শেইচান অসুস্থ,' আবার বলল গ্রে। 'প্যারাসাইটে আক্রান্ত, তোমাদের আগে যেমনটা বলেছিলাম। কিন্তু এই দ্বীপেই আছে ও।'

'কোথায়?'

'জানি না,' গুঙিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার। 'লেকে হারিয়ে গেছে। দুর্বল শরীরে হয়তো সাঁতরে পার হতে পারেনি।'

চোখ সরু করে তাকাল ভালিয়া। কথাটা বিশ্বাস করেনি।

'এটাই সত্যি!' কিন জোর দিলেন।

আইকোও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

সতর্ক দৃষ্টিতে সবার উপর চোখ বুলাল মেয়েটা। 'বিশ্বাস করলাম,' বলে বোতাম থেকে সরিয়ে নিল হাতের তালু। 'কিন্তু খবরটা খুব একটা ভালো নয়।'

জানালার সামনে থেকে সরে এসে অস্ত্রধারীদের দিকে ইশারা করল ভালিয়া। 'এখানকার কাজ শেষ। ওদের বিমানে নিয়ে যাও।'

ওদিকে চেম্বারের ভেতর নিস্তেজ হয়ে আসছে শিকলে ঝোলানো তিন বন্দী। যেন কসাইয়ের দোকানে ঝুলতে থাকা মাংসের তাল। এখনও কানে আসছে কাতর কণ্ঠে চিৎকার।

অস্ত্রের মুখে বাধ্য হয়ে ঘুরে দাঁড়াল গ্রে। বন্দীদের ব্যাপারে আর কিছু করার নেই তার। কিন্তু নতুন একটা সংকল্প মনে দানা বাঁধছে।

ভালিয়ার দিকে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করল সিগমা কমান্ডার।

তোকে মারার সময় আরও জোরে চিৎকার করিয়ে ছাড়ব...

রাত ৩:৫৫

পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে গেল...

ভাবতে ভাবতে ব্যালাস্ট ছেড়ে চুরি করা সাবমারসিবলটা স্টেশনের ডকিং চেম্বারে তুলে আনল শেইচান। ধাতব মেঝেওয়ালা কাচের ডোমটা কমপ্লেক্সের সবচেয়ে নিচু অংশ।

পাশেই আরও দুটো ডোম দেখা গেল, সেই সাথে আকারে বড়ও একটা আছে। বড় ডকে উঁকি মারছে একটা বড় আকারের সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার। বাহনটার দৈর্ঘ পেরিয়ে নিজের সাবমেরিনের আলোয় একটা টানেলের মুখ দেখতে পেল শেইচান। সম্ভবত খোলা সাগরে বেরিয়েছে এটা।

ডকিং চেম্বারের মাঝের পুলে উঠে এসেছে সাবেক আততায়ী। ডোমের ভেতরকার বাতাসের চাপ লেকের পানিকে স্টেশনে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে।

পাইলটের সিটে বসে, কন্ট্রোল কলামের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রেখেছে শেইচান। বাহনের সামনের কাচের উপর থেকে পানি সরে যাওয়ার পর, আবছাভাবে এক কর্মচারীর অবয়ব নজরে পড়ল। ভেবেছিল জায়গাটা ফাঁকা পাবে। আশার গুড়ে বালি।

লোকটা হাত তুলে ইশারা করল তার দিকে। 'হায়াকুসিরো!' নিজেদের লোক ভেবে ফেরার তাড়া দিচ্ছে।

শেইচান আর পালু দু'জনেই সাবমেরিনের দুই অস্ত্রধারীর ফেসমাস্ক মুখে চড়িয়েছে। অর্থাৎ লোকটার ভুল করাই স্বাভাবিক। রেডিও হেডপিসের দিকে ইশারা করে জাপানিজ ভাষায় হড়বড়িয়ে উঠল সে। 'এইমাত্র তৈরি হওয়ার আদেশ এসেছে। পনেরো মিনিটের ভেতর স্টেশন খালি করতে হবে।'

সাব থেকে বেরিয়ে পুলের প্রান্তে উঠে এসেছে পালু। দাঁড়িয়ে আছে, যদি শেইচানের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

ডক-কর্মী এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। 'এয়ারলকের দিকে যাও।'

তবে পালু তো আর জাপানিজ ভাষা জানে না। ততক্ষণে ড্রাইভারের আসন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে শেইচান। খুলে ফেলেছে নিজের স্কুবা গিয়ার।

তাকে দেখতে পেয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল লোকটার। কিন্তু তার আগেই নড়ে উঠেছে সাবেক আততায়ী। ছুরি বেরিয়ে এসেছে হাতে। নিখুঁত টানে দু'ভাগ হয়ে গেল লোকটার গলা। রক্তের ধারা মেঝে বেয়ে পুলে নামছে।

সময় নষ্ট না করে পালু নিজের যন্ত্রপাতি খুলে এয়ারলকের দিকে এগোল। ফ্রেমের উপর একটা সবুজ বাতি জ্বলছে। সম্ভবত বোঝাচ্ছে ডকিং ডোমের ভেতর বাতাসের চাপের স্থিতিশীল অবস্থা।

সদ্য খুন করা লাশটা মেঝেতে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল শেইচান। সাথে সাথে যেন আগুন ধরে গেল সারা গায়ে। দুর্বল হয়ে এসেছে পা-জোড়া। নাক দিয়ে বাতাস ঢুকতে চাইছে না।

কাছে ঘেঁষে এল পালু। 'তাড়াতাড়ি!'

কথায় কাজ না হওয়াতে এবার মেয়েটার কোমর ধরে এয়ারলকের দিকে এগোল হাওয়াইয়ান। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আবার আটকে দিল হ্যাচ।

তিন মিনিটের সময়সীমা। এর মধ্যে এয়ারলকের চেম্বারের সাথে প্রধান স্টেশনের বাতাসের চাপের সমন্বয় ঘটবে। এত দেরি কেন! মনে মনে গাল বকল শেইচান। প্রতি মুহূর্তে ঝুঁকি বাড়ছে।

ছোট ফোঁকরটা দিয়ে বাইরে তাকাল তারপর। ডোম থেকে কাচের একটা টানেল ভেতরে ঢুকেছে। তবে কপাল ভালো, জায়গাটা খালি।

কিন্তু সৌভাগ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

কান ফাটানো শব্দে বেজে উঠল সাইরেন। বোঝা গেল না, এটা কি স্টেশন খালি করার উদ্দেশ্যে... নাকি তাদের আগমনের খবর ফাঁস হয়ে গেছে।

ডকিং ডোমের ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল পালু। ওখানে একটা ক্যামেরা আটকানো। ব্যথার আতিশয্যে শেইচান ব্যাপারটা খেয়াল করেনি।

ফোঁকর দিয়ে উল্টোদিকে তাকাল সাবেক আততায়ী। দৃশ্যপটে তিনজন অস্ত্রধারীর আগমন ঘটেছে। পায়ে পায়ে এয়ারলকের দিকে এগোচ্ছে তারা। হাতে উদ্যত রাইফেল।

আরও দুই মিনিট বাকি।

নিজে নিজেই ফাঁদে ঢুকে পড়েছে অনাহূত অতিথিরা।

পালুর সাথে নি:শব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল শেইচান। এই দৃষ্টির অর্থ একটাই।

তৈরি তো?

শ্রাগ করল বিশালদেহী হাওয়াইয়ান। এছাড়া আর উপায় কী!

ভোর ৪:০৪

সাইরেন বাজা শুরু হয়েছে। টানেলের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন কিন। বাকিরাও আছে তার পাশে। কোথাও গোলমাল হয়েছে ঠিকই, তবে এতে উদ্যত অস্ত্র তাদের সামনে থেকে সরেনি।

আওয়াজের ফাঁকে কানে আসছে বন্দীদের চিৎকার। এখনও ওদের পায়ে আর কোমরে জট পাকিয়ে আছে হার্ভেস্টার বোলতা। তবে সময়ের সাথে সাথে কমে এসেছে আহতদের নড়াচড়ার গতি।

রাগে থমথম করছে গ্রে-র মুখ।

নতমুখে পায়ের দিয়ে তাকিয়ে আছে আইকো। মুখে রা নেই।

কয়েক গজ দূরে রেডিও হাতে পায়চারি করছে ভালিয়া আর মাসাহিরো। গোলমালের কারণে কী বলছে, তা বোঝা যাচ্ছে না যদিও... কিন্তু কথার ফাঁকে বারকয়েক গ্রে-র দিকে শীতল চোখে তাকিয়েছে ফর্সা রাশিয়ান। শক্ত হয়ে পরস্পরের সাথে সেঁটে ছিল ঠোঁটজোড়া।

অবশেষে সাইরেন থামল।

দলটার দিকে ফিরল ভালিয়া। 'মনে হচ্ছে, আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের কোন দরকার ছিল না।'

'শেইচান এসে গেছে,' গ্রে বলল।

'ভালোই হয়েছে। এবার ওকে বাক্সে ভরে মাসাহিরোর দাদার কাছে নিয়ে যাব।'

কথাটাতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না সিগমা কমান্ডার। রাশিয়ানের দিকে ফিরিয়ে দিল পাল্টা শীতল দৃষ্টি। 'আমার তা মনে হয় না।'

ভোর ৪:০৭

পোর্টহোলের ফোঁকর দিয়ে অস্ত্রধারীদের এগিয়ে আসা লক্ষ্য করছে শেইচান। মাথার উপর শেষ সময়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে টাইমার। আর কয়েক সেকেন্ড পরই স্টেশনের দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে।

পালু পাশেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো।

অবশেষে সবুজ রঙে পরিণত হলো টাইমারের লাল দাগ।

সময় শেষ।

বাইরে অবস্থান নিয়েছে তিন অস্ত্রধারী। দু'জন একটু পেছনে, অন্যজন সরাসরি দরজার মুখে। 'মাথার উপর হাত তোলো!'

যেই কথা সেই কাজ। হাত উপরে তুলল শেইচান আর পালু।

'দরজা খোলার পর অপেক্ষা করবে। বেরোতে বলার পর সামনে বাড়বে। ঠিক আছে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল সাবেক আততায়ী। সময়ের সাথে সাথে ব্যথা বাড়ছে। কেউ যেন গলিত লাভা ঢেলে দিয়েছে ওর মাংসের ভেতর।

দরজা খুলল এক অস্ত্রধারী। পাল্লাটাকে নিজের কভার হিসেবে ব্যবহার করছে। 'আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসো। মাথার উপর থেকে হাত এক চুল নড়বে তো মরবে।'

বাইরে বেরোলো শেইচান। স্টেশনের ভেতরের বাতাস বাইরের তুলনায় ঠাণ্ডা। চাপেও খানিকটা তারতম্য টের পাওয়া গেল। তাকে অনুসরণ করছে পালু।

দরজার সামনে থেকে দু'জনকে কভার দিচ্ছে অস্ত্রধারী। 'এগোতে থাকো। আস্তে আস্তে।'

আর কোন উপায় না থাকায়, বাধ্য হয়ে টানেল বেয়ে এগিয়ে চলল ওরা। সাবেক আততায়ির মাথার ভেতর অবশ্য আরেকটা টাইমার টিকটিক করছে। গিল্ডের কাছ থেকে পাওয়া এই প্রশিক্ষণ-কাজকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করা।

টানেল এখানে প্রধান সেকশনে মোড় নিয়েছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যাথার তোড়। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে শেইচানের। কাঁপছে দুই পা।

'এগোতে থাকো,' পেছন থেকে চেঁচাল অস্ত্রধারী।

তাকে থামানোর প্রয়াস পেল পালু। 'ও অসুস্থ, সেই সাথে গর্ভবতী। একটু সুস্তঘির হওয়ার সময় দাও, ভাই।'

গার্ডও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। হাতের অস্ত্র দিয়ে ইশারা করল সে। 'দশ সেকেন্ড।'

সাথে আরও দুই সেকেন্ড যোগ করতে হবে, মনে মনে বলল শেইচান। মাথার ভেতর ঘুরতে থাকা টাইমারের কাঁটা গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে। দেয়ালের দিকে সরতে সরতে আলতো ঝাঁকিতে, কব্জির ভেতর থেকে একটা ছুরি খুলে হাতে নিয়ে এল সে।

এমন সময় বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে এল।

হতবুদ্ধি গার্ডরা নড়ে ওঠার আগেই বাতাসে ডানা মেলল শেইচানের দেহ। সামনে থাকা লোকটার গলায় ছুরি বসিয়ে কেড়ে নিল হাতের অস্ত্র, তারপর ট্রিগার টিপল পেছনের জনকে লক্ষ্য করে। পালুও কিন্তু বসে নেই। একের পর এক বেদম ঘুষিতে তৃতীয় গার্ডের চেহারা-সুরত আলুভর্তা করার কাজে নেমেছে হাওয়াইয়ান।

কাজ সেরে স্টেশনের দিকে অস্ত্র তাক করল সাবেক আততায়ী। 'যান!'

ডকিং চেম্বারে ভেসে উঠেই স্টেশনের গোটা কাঠামো মাথায় গেঁথে নিয়েছিল শেইচান। সাথে প্রয়োগ করেছে আরেকটা কৌশল। পুরনো জিনিসকে নতুনভাবে ব্যবহার করার এই জ্ঞানটুকু অবশ্য গিল্ডের নয়... গ্রে-র কাছ থেকে পাওয়া।

লেকের নিচে, জাপানি বোমারু বিমানের কবরস্থান থেকে উঠে আসার আগে, বালুতে মুখ গুঁজে থাকা একটা আনকোরা পুরনো টর্পেডো তুলে আনে ওরা। জিনিসটা চুরি করা সাবমেরিনের সাথে লম্বালম্বিভাবে বেঁধে আনতে কোন অসুবিধা হয়নি। সেই সাথে নাকের নিচে জোড়া দেয় এক টুকরো সি-ফোর এক্সপ্লোসিভ, সঙ্গে ডেমোলিশন টাইমার।

দু'জনের কেউ জানত না। আদ্যিকালের এই বোমা আসলেই কাজ করবে কি না।

উত্তর মিলেছে হাতেনাতে।

পেছন থেকে গুঞ্জন কানে এল। পুরো লোডিং ডক না হোক, অন্তত এয়ারলকের দরজা যে ভেঙেছে-এটা নিশ্চিত। বাতাসের চাপ কমে গেছে। অর্থাৎ, স্টেশনে ঢুকতে শুরু করেছে পানির তোড়। তারই আওয়াজ এটা।

'শেইচান!' ভয়ার্ত গলায় সতর্ক করল পালু।

দশ গজ সামনে, টানেলের মুখে একটা স্টিলের দরজা আছে। সম্ভবত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে হ্যাচটা।

ব্যথা অগ্রাহ্য করে দরজাটার দিকে এগোল শেইচান। তারপর মাথা গলিয়ে দিল ফোকর দিয়ে।

পালু...

তার গতির সাথে তাল মেলাতে পারেনি বিশালদেহী হাওয়াইয়ান। সামনে পেছনে পানির ধারায় যেন আটকে গেছে লোকটা। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পানির স্তর। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইমারজেন্সি হ্যাচ।

সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারছে শেইচান।

একই সাথে পালু নিজেও।

তাদের পক্ষে সময়মতো ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়...

অধ্যায় ছাব্বিশ

৮ মে, ভোর ৪:১৮
ইকিকাউও দ্বীপ

গোলমাল হচ্ছে সুযোগের অপর নাম।

আর্মি রেঞ্জার আর সিগমা ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে কাটানো গত কয়েক বছর, এই একটা ব্যাপার গ্রে-র রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিস্ফোরণে গোটা স্টেশন কেঁপে ওঠার সাথে সাথে চট করে আগে বাড়ল সে। কাছে থাকা গার্ডের অস্ত্রের ব্যারেল ধরে ঠেলে দিল উপরে, চেহারা বরাবর।

নিজ হাতে নিজের নাক ভেঙে লোকটার কেমন অনুভূতি হয়েছিল, তা জানার জন্য গ্রে অপেক্ষা করেনি। রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে পটাপট দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল ভাঙা নাকওয়ালা এবং সামনের আরেক আস্ত নাকওয়ালার মাথা বরাবর। এত কাছে থেকে ফসকানোর সুযোগ নেই। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

ততক্ষণে অবশ্য বসে নেই আইকোও। লাফিয়ে উঠে বেদম লাথি হাঁকিয়েছে তৃতীয় গার্ডের চোয়ালে। তারপর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গুলিও করে দিয়েছে।

পাশার দান ঘুরে গেছে। হাঙ্গামাটুকু ঘটতে সময় লেগেছে মাত্র তিন সেকেন্ড। কিন্তু সময়টা কাজে লাগাতে ভুল করেনি অ্যালিয়া। এক হাতে কিনের ঘাড় ধরে টেনে নিয়েছে নিজের সামনে, মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে প্রফেসরকে। আরেক হাতে কপালে ঠেকিয়েছে পিস্তল। মাসাহিরো আছে দু'জনের পেছনে।

কোনার দিকের একটা শাখা টানেল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই।

'দাঁড়ান,' আইকোর দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। 'আমাকে কভার দিন।'

'হুম,' সায় দিয়ে টানেলের দিকে অস্ত্র তাক করল জাপানিজ। সিগমা কমান্ডার ঢুকল পেছনে ফেলে আসা চেম্বারে। যেখানে বোলতার ঝাঁকের সামনে ছেড়ে রাখা হয়েছে তিন বন্দীকে।

জানালার কাছে পৌঁছে দেখা গেল, নিস্তেজ ভঙ্গিতে ঝুলছে সবগুলো দেহ। সারা গায়ে হার্ভেস্টার বোলতার মোচ্ছব। দেরি না করে সবুজ বোতামে থাবা মারল সিগমা কমান্ডার। সাথে সাথে সিলিং-এর শত শত ফুটো বেয়ে নামল ফোমের

স্প্রে। সম্ভবত জিনিসটা কোন ধরণের কীটনাশক। তিন বন্দীর শরীর স্পর্শ করার সাথে সাথে ধুয়ে নামিয়ে দিতে লাগল বোলতার ঝাঁককে।

পোকা তো মরছে... তবে দেখা গেল, মুহূর্তের ব্যবধানে রক্তে ভিজে লাল হয়ে যাচ্ছে সাদা ফোম। এখনও কোন সাড়া নেই বন্দীদের দেহে। কয়েক সেকেন্ড পর ধারা থামল। একই সাথে থামল সাইরেনের আওয়াজও।

দরজার দিকে নজর দিল গ্রে। লকিং হুইল খুলতে খুলতে মনে উঁকি মারছে একটাই চিন্তা।

খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি তো?

ভোর ৪:২২

'তাড়াতাড়ি!' তাড়া দিল শেইচান।

পায়ে পায়ে পানির স্রোত পেরিয়ে হ্যাচের দিকে এগোচ্ছে পালু। সাবেক আততায়ী দরজাটা বন্ধ হওয়া ঠেকিয়েছে হাতের রাইফেল ফাঁকে ঢুকিয়ে। তবে কতক্ষণ আটকে রাখা যাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাচের মেকানিজমের চাপে এই কয়েক সেকেন্ডেই বাকতে শুরু করেছে অস্ত্রের ব্যারেল।

অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছাল বিশালদেহী হাওয়াইয়ান। শরীর গলিয়ে দিল হ্যাচের ফাঁক দিয়ে। এবার দু'জনে মিলে অস্ত্রটা ফোকর থেকে ছাড়িয়ে আনার প্রয়াস পেল। দরজা বন্ধ করতে না পারলে পানি ঢুকে পড়বে এপাশে।

কিন্তু প্রাণপণে টেনেও কাজ হলো না। খুলল না রাইফেলটা। বেশ ভালোভাবেই আটকেছে।

এদিকে চলে এসেছে পানির বিশাল এক তোড়। প্রবল বেগে আছড়ে পড়ল দরজার গায়ে। দুর্বল শরীর নিয়ে শেইচান টিকতে পারল না। শরীড় গড়িয়ে দিল পানির সাথে।

ভেসে টানেলের ভেতরদিকে যেতে যেতে সাবেক আততায়ী লক্ষ্য করল-পালু এখনও যুঝছে হ্যাচের সাথে। কয়েক সেকেন্ড পর ধাতব ক্ল্যাং আওয়াজের সাথে ছুটে এল হাওয়াইয়ানের হাত। কমে এল পানির ধারা। এখনও আসছে, তবে পরিমাণে অনেক কম।

কোনমতে উঠে দাঁড়াল শেইচান। 'ক... ক... কীভাবে?'

হাতের ভাঙা অস্ত্রটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলল পালু। 'আমি না। উল্টোদিক থেকে বিশাল এক স্টিলের টুকরো আঘাত করেছে হ্যাচে । তার চাপেই মাঝখান থেকে ভেঙে ছুটে গেছে অ্যাসল্ট রাইফেল।'

মন্দের ভালো আর কী!

বন্যাকবলিত অংশের চাপে মড়মড় আওয়াজ করছে বিধ্বস্ত স্টেশন। ইমারজেন্সি হ্যাচের ওপাশের ব্যালাস্ট সম্ভবত খুলে গেছে।

মানসচোখে ডকিং চেম্বারের ডুবে যাওয়া কল্পনা করল শেইচান।

এখানে আর থাকা যাবে না।

একই কথা আন্দাজ করেছে পালুও। 'কোথায় যাব?'

জবাব না দিয়ে সামনের দিকে হাঁটা ধরল সাবেক আততায়ী। এই মুহূর্তে উত্তর দেয়া, না দেয়া সবই সমান।

কোথায় যাবে, এ সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।

ভোর ৪:৩৩

বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে হ্যাচ খুলল গ্রে। চেম্বারের ভেতরের বাতাস নাকে আসার সাথে সাথে গা রি-রি করে উঠল। পচা মাংসের সাথে কেমন মিষ্টি একটা গন্ধ। শিকলে ঝুলতে থাকা তিন বন্দীর গা বেয়ে নামছে ফোম আর রক্তের মিশ্রণ। দূর থেকে বোঝা গেল না, ক্ষয়ক্ষতি কতটুকু।

বোলতার ঝাঁক পায়ে মাড়িয়ে আগে বাড়ল সিগমা কমান্ডার। পোকাগুলোর গায়ে যেন ধাতব বর্ম পরানো আছে, এতটাই শক্ত। পায়ের নিচে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন মার্বেলের উপর হাঁটছে। কিন্তু মারা গেলেও চোয়ালের ক্ষুরধার বিশেষত্ব কিন্তু ম্লান হয়নি। তাই সাবধানে পা ফেলল গ্রে।

কোয়ালস্কির সামনে যেতেই, দুর্বলভাবে নড়ে উঠল একটা হাত। যেন বন্ধুকে চলে যাওয়ার ইশারা করছে। স্বস্তির পরশ লাগল গ্রে-র গায়ে। পালুর দুই ভাইয়ের বুকও নিঃশ্বাসের তালে মৃদু ওঠা-নামা করছে।

এখনও জীবিত... কিন্তু কতক্ষণ থাকবে?

হাতের বেড়ি খুলে সবাইকে মেঝেতে শুইয়ে দিল গ্রে। জানালার ওপাশে আইকো টানেল পাহারা দিচ্ছে। যে কোন সময় শত্রুপক্ষ চলে আসতে পারে। একা হাতে জাপানিজ ওদের বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না। তার আগে যেভাবেই হোক, এদের নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নিতে হবে।

দেয়ালে একটা ফার্স্ট এইড বক্স আটকানো। বোলতার চেম্বারের সাথে ওষুধের বাক্স...নিশ্চয়ই কিছু না কিছু মাহাত্ম্য আছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে বক্সের ডালা খুলল গ্রে। ভেতরের অর্ধেক জায়গায় সাজানো আছে সেলফ-ইনজেক্টর। ভেতরের তরলটা দেখতে এপিনেফ্রিনের মত।

সিগমা কমান্ডার জানে, মাউইতে ডিমধারী বোলতার কামড়ের চেতনানাশক প্রভাব কাটাতে এপিনেফ্রিন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই একমুঠো ইনজেক্টর হাতে বন্দীদের কাছে ফিরে এল ও।

প্রথম ডোজটা দিল কোয়ালস্কির ঘাড়ে। তারপর পালাক্রমে মাকাইও এবং টুয়া। ওষুধ দিতে দিতে লক্ষ্য করল, মনে হচ্ছে যেন মানুষগুলোর হাত-পা থেকে এবড়ো-খেবড়োভাবে ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে কেউ। আরেকটু কাছে ঘেঁষতে বোঝা গেল,

চামড়া আসলে ঠিকই আছে। তবে আক্রান্ত জায়গায় অগুনতি মটর দানা আকারের ছোট ছোট ক্ষত। অবিরত রক্ত গড়াচ্ছে।

বুক, ঘাড় আর মাথায় ক্ষত তুলনামূলক কম। গ্রে মনে করতে পারল, প্রফেসর কিন বলেছিলেন-বোলতাগুলো শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে দূরে থাকে। যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখে শিকারকে।

কিন্তু তবুও, আক্রান্ত তিনজনকে নিরাপদ বলা যাবে না। এত বেশিসংখ্যক কামড় থেকে মারাত্মক কিছু হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এদের হাসপাতালে নিতে হবে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে প্রত্যেকে।

কোয়ালস্কির মুখ থেকে বের হওয়া আওয়াজে গ্রে-র সম্বিত ফিরল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল বিশালদেহী সিগমা এজেন্ট। উঠেও বসল কয়েক মুহূর্ত পর। চোখে ঘোরলাগা ভাব। সিরিঞ্জে সম্ভবত এপিনেফ্রিনের চাইতেও কার্যকর কোন ওষুধ ছিল।

কয়েক সেকেন্ড পর স্পন্দন দেখা গেল বাকি দু'জনের দেহেও।

'আ... আমার মাথা ঘুরছে,' কোয়ালস্কি বলল।

'ব্যথা লাগছে?'

ক্ষতবিক্ষত পায়ের দিকে তাকাল সিগমা এজেন্ট। 'ক... কই? খুব বেশি তো না।'

বোঝা গেল, সিরিঞ্জে আসলেই শক্তিশালী কোন ওষুধ ছিল। সম্ভবত ওপিঅয়েড ব্যথানাশক।

'দাঁড়াতে পারবে?' গ্রে জানতে চাইল।

'দরকার পড়বে?'

এক পশলা গুলির আওয়াজ সিগমা কমান্ডারের হয়ে জবাব দিয়ে দিল।

জানালার দিকে তাকাল গ্রে। টানেলের দিকে গুলি ছুঁড়ছে আইকো। শত্রুপক্ষ এসে গেছে।

উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল কোয়ালস্কি। কিন্তু ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন মাতাল গরুর পায়ে কেউ রোলার স্কেট লাগিয়ে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে।

এভাবে কাজ হবে না।

টানেলে আরও তিন রাউন্ড গুলি পাঠাল আইকো। তারপর উঁকি দিল খোলা দরজায়। 'আমাদের যেতে হবে... এখুনি!'

আক্রান্ত তিনজনের দিকে চোখ ফেরাল গ্রে।

আমি এদের ছেড়ে যাচ্ছি না...

ভোর ৪:৪৪

স্টেশনের মধ্যভাগে, সিঁড়ি বেয়ে নামছেন কিন। হাত ধরে তাকে টেনে নিচ্ছে ভালিয়া মিখাইলভ। মেয়েটার অন্য হাতে শোভা পাচ্ছে কালো পিস্তল। আদেশ না

মেনে উপায় কী! সাথে যোগ দিয়েছে বডি আর্মার আর হেলমেট পরা নতুন একজোড়া গার্ড। মাসাহিরোকে কভার দিচ্ছে ওরা।

পুরো স্টেশনে গোলমাল। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে ল্যাবের টেকনিশিয়ান আর কর্মীরা। দ্বীপের প্রধান টানেলে জড়ো হয়েছিল সবাই। ফেঁসে গেছে ওখানেই। এতে করে হাঙ্গামা আরও বেড়েছে।

এক গার্ডের দিকে ইশারা করল ভালিয়া। 'আমাদের জন্য রাস্তা বের করো। প্রয়োজনে গুলি করবে।'

সায় দিয়ে মাসাহিরোকে রেখে আগে বাড়ল দুই অস্ত্রধারী।

'থামো,' হাত তুলে আদেশ দিল মাসাহিরো। 'কোন ঝুঁকি নেয়া যাবে না। আমাকে অনুসরণ করো।'

সবাইকে নিয়ে নিজের অফিসে চলে এল জাপানিজ। ডেস্কের পেছনের দেয়ালে সাঁটা আগুনরঙা ফিনিক্স পাখির উপর স্থির হলো কিনের নজর। ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজের লোগো এটা। প্রফেসর আন্দাজ করতে পারছেন, এই হামলা থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে কোথায় নেয়া হবে তাকে। সাহায্য না করার পরিণাম হবে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

মাসাহিরোর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ভালিয়া। 'সময় নষ্ট করছ কেন?'

'ফেইল-সেইফ,' ডেস্কের পেছনে ইঙ্গিত করল জাপানিজ।

'ফেইল-সেইফ মানে?'

'শত্রুদের অভ্যাগমন ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ডিযাইন করা,' বলতে বলতে ফিনিক্স পাখির নিচে একটা চারকোনা কাচে তালু ছোঁয়াল মাসাহিরো। স্পর্শ করার সাথে সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠল দেয়ালের অংশটা।

'আমাকে এটার ব্যাপারে জানানো হয়নি কেন?'

হাতের ছাপ স্ক্যান হতে হতে বিতৃষ্ণার ছাপ খেলে গেল মাসাহিরোর চেহারায়। 'এটা আমার ফ্যাসিলিটি। দাদা হয়তো তোমাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তবুও সবকিছু আমি তোমার মতো একজন গাইজিনকে জানাতে বাধ্য নই।'

শক্ত হয়ে এল ভালিয়ার চোখ-মুখ।

কিন জানেন-অ্যালবিনিজমের কারণে ভালিয়াকে সবসময় গাইজিন অর্থাৎ বহিরাগত হিসেবেই গণ্য করা হয়। পাশাপাশি মেয়েটা জাপানিজ নয়। জাপানে এই ধরণের মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। নিজের আধা জাপানি-আধা জার্মান বিশেষত্বের জন্য কিয়োটোর কোন কোন সহকর্মীরা তাকে তাচ্ছিল্য করত। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই অমানবিক ঐতিহ্য।

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বরাবরই নিচু পদে আসীন হতে দেখা গেছে ভালিয়াকে। জাপানি উচ্চপদস্থরা কখনোই তাকে প্রাপ্য মর্যাদা দেয়নি। নইলে এই মুহূর্তে মাসাহিরোর অপমানের শিকার হতে হত না তাকে।

মাসাহিরোর হাতের ছাপ স্ক্যান শেষ হলে একটা লুকানো প্যানেল উদয় হলো। লাল একটা বোতাম আছে ওখানে।

'আমাদের হাতে সময় চার মিনিট,' সতর্ক করল মাসাহিরো। 'এর ভেতর স্টেশনের ব্লাস্ট ডোর পেরিয়ে যেতে হবে।' বলে টিপে দিল লাল বোতাম।

গার্ডদের রাস্তা পরিষ্কার আদেশ দেয়ার আর কোন দরকার নেই। ইতিমধ্যে প্রায় খালি হয়ে এসেছে সেন্ট্রাল হাব। লম্বা টানেল ধরে পালাচ্ছে কর্মীরা।

কিন্তু রওয়ানা হতেই বোঝা গেল, এখানে ওরা একা নয়।

উপরের লেভেল থেলে এক পশলা গুলির আওয়াজ কানে এল। গ্রে আর আইকোকে ঘায়েল করতে একটা দল পাঠিয়েছিল ভালিয়া। ওদের সংঘর্ষই এই গোলাগুলির কারণ।

ঘাড় বাঁকা করলেন কিন। পরক্ষণে মনে পড়ল ফিনিক্স পাখির লাল বোতামের কথা। কতক্ষণ সময়ই বা আছে হাতে!

চার মিনিটেরও কম।

উপরে তাকাল ভালিয়াও। এই নড়াচড়াই মেয়েটার জীবন বাঁচাল। কিন লক্ষ্য করলেন-তার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে একটা গুলি। জ্বালা করে উঠল চোয়ালের নিচের অংশ। হতভম্ব ভাব কাটতে দেখা গেল-টানেল ধরে ছুটে আসছে শেইচান।

হাতে উদ্যত পিস্তল।

ভোর ৫:০২

ও এখানে কীভাবে?

ডাইনির উল্কি আঁকা মুখটা দেখে প্রথম এই কথাটাই এল শেইচানের মনে। ট্রিগার টিপেছে সাথে সাথে। কিন্তু ভাগ্যের জোরে হোক বা ভালিয়ার দক্ষতার কারণেই হোক, ফস্কে গেছে গুলিটা।

সহজাত প্রবৃত্তির বশে তাৎক্ষণিক নড়াচড়ার শিক্ষা তারা দু'জনেই পেয়েছে গিল্ডের কাছ থেকে। অস্ত্রের মাজল ঘুরিয়ে এবার এক অস্ত্রধারীকে লক্ষ্য বানাল শেইচান। কাঁধে আঘাত হানল গুলি। বেদম ধাক্কায় এক পাক ঘুরে গেল লোকটা। রাইফেল ছুটে গেছে হাত থেকে।

স্যুট পরা এক জাপানিজকে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী শাখা টানেলে ঢুকে পড়ল অন্য গার্ড। মাথার ভেতর গেঁথে নেয়া মানচিত্র অনুযায়ী শেইচান জানে, এই প্যাসেজটা স্টেশন হয়ে দ্বীপের দিকে এগিয়েছে।

পলায়নরতদের বাদ দিয়ে ভালিয়া মিখাইলভের দিকে মনোযোগ স্থির করল সাবেক আততায়ী। মেয়েটা এখনও কিন মাতসুইকে মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। সাবধানে আরও দুটো গুলি পাঠাল শেইচান, চায় না প্রফেসরের গায়ে

আঘাত লাগুক। তবে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালিয়াকে এক্সিট টানেল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। যাতে পালাতে না পারে।

পাল্টা গুলি ছুঁড়ল রাশিয়ান। শেইচানও সেটাই চাইছে। মেয়েটার মনোযোগ তার উপর স্থির থাকুক। চোখের কোনা দিয়ে দেখল, সিঁড়ি বেয়ে উপরের লেভেলে উঠে যাচ্ছে পালু।

কয়েক মিনিট আগে এদিকে আসার সময়, উপরতলা থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পায় শেইচান। বুঝতে পারে, গোলাগুলির কারণ গ্রে না হয়ে যায় না। তাই প্রাণপণে স্টেশনের মাঝ বরাবর চলে এসেছে ওরা। এবং এসেই দেখা পেয়েছে অতীত থেকে উদয় হওয়া এক সাদা ভূতের।

আর পালু এখন যাচ্ছে গ্রে-দের সাহায্য করতে।

অবস্থা বেগতিক দেখে কিনকে মেঝেতে ফেল দিল ভালিয়া। তারপর দু'হাতে লক্ষ্য স্থির করে আবার ট্রিগার টিপল। পরপর দুই বার। শেইচানের মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল এটা গুলি। আরেকটা আলতো পরশ বুলিয়ে গেল নিতম্বে।

ব্যথা অগ্রাহ্য করে পা চালাল শেইচান।

প্রায় পৌঁছে গেছি...

সে পেছনের অফিসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ততক্ষণে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে ভালিয়া।

এবার খেলা জমবে।

কিন্তু পরক্ষণে যেন অবশ হয়ে এল সাবেক আততায়ীর দুই হাঁটু।

ব্যথার তোড়ে যেন পায়ের মাংসপেশি পাথরে পরিণত হয়েছে। মগজের নির্দেশ মানতে চাইছে না শরীর। কাতরোক্তি করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল শেইচান।

পতনের ধাক্কায় পিস্তল ছুটে গেছে হাত থেকে। হাচড়ে-পাচড়ে আবারও অস্ত্রটা আবারও নাগালে পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে। কিন্তু এক মুহূর্ত পর, শরীরের উপর নেমে এল একটা ছায়া।

আবারও কিনকে তুলে নিয়েছে ভালিয়া। এক হাতে খামচে ধরেছে চুলের মুঠো। প্রফেসরের কানের ক্ষত বেয়ে রক্ত ঝরছে অবিরাম।

শেইচানের দিকে অস্ত্র তাক করল রাশিয়ান। 'কত কাল ধরে এই মুহূর্তটার প্রতিক্ষায় ছিলাম আমি। গত কয়েক মাস যাবত অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে ট্র্যাক করেছি তোমাদের। মাঝে হারিয়েও ফেলেছিলাম দুই বার।'

ব্যথা অগ্রাহ্য করে মেয়েটার চোখে চোখে রাখল সাবেক আততায়ী।

তাহলে এভাবেই মাউইতে আমাদের খোঁজ পেয়েছে ওরা...

পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসছে ভালিয়ার আঙুল।

গুঙিয়ে উঠলেন কিন। 'না... ও গর্ভবতী!'

কথাটা শুনে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল ভালিয়া। তারপর হেসে উঠল গলা ছেড়ে। 'বেশ তো... খুব ভালো। আমার আশারও অতীত ব্যাপারটা।'

সজোরে শেইচানের কপালে পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল মেয়েটা।

জ্ঞান হারানোর আগে রাশিয়ানের শেষ কথাগুলো অবশ্য শুনে যেতে পারল শেইচান।

'যদি শেষ সময় পর্যন্ত টিকে যেতে পারো, হয়ত আমি বাচ্চাটাকে নিজের জন্য রাখব।'

ভোর ৫:১৮

টানেল বেয়ে এক্সিটের দিকে এগোচ্ছেন কিন। কান বেয়ে রক্ত গড়ানো থামেনি। পেছন পেছন আসছে মাসাহিরোকে নিয়ে পালানো সেই অস্ত্রধারী। দায়িত্ব পালন শেষে লোকটা ফিরে এসেছে।

আগে আগে পথ দেখাচ্ছে ভালিয়া। শেইচানের অচেতন দেহ বয়ে আনছে দুই কর্মচারী।

বিশ কদম সামনে, একটা ব্লাস্ট ডোরের সামনে এসে থেমেছে কাচের টানেল।

মাসাহিরো ওখানে দাঁড়ানো। 'বিশ সেকেন্ড,' বলে সবাইকে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তারপরই এই দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।'

কিন বুঝতে পারলেন, মাউইতে শেইচানের কাছে ঘোল খেয়েছে মাসাহিরো। তাই এখন অপেক্ষা করছে মেয়েটাকে বাগে পাওয়ার। নইলে হয়ত আগেই চলে যেত।

মনে মনে সময় গুনছেন প্রফেসর। বিশ সেকেন্ড পর, পেছনে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে কিন দেখলেন, স্টেশনের জায়গায় জায়গায় আগুনের ঝলক। ডানের শাখা টানেল থেকে কাচের টানেলে ঢুকছে ধোঁয়ার সারি। একটা বাঁকা স্টিলের দরজা নজরে এল তারপর।

'এদিকে যাও,' মাসাহিরো নির্দেশ দিল।

বাকিদের সাথে টানেল বেয়ে এগোলেন কিন।

কিছুক্ষণ পর নজরে এল বিস্ফোরণের আসল উদ্দেশ্য।

ধোঁয়ার সারির পেছনে কালো আরও একটা দঙ্গল দেখা যাচ্ছে। এখানে পৌঁছানোর পর প্রথমে দেখা টেস্ট চেম্বারই সেই কালচে বিস্তৃতির উৎস। তার মনে পড়ল, জায়গাটা ভরা ছিল সৈন্য বোলতায়। হাঙ্গামা আর বিস্ফোরণে এখন ছত্রভঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসছে পতঙ্গ-পাল।

'এখনই...' আবারও চেঁচাল মাসাহিরো।

বিস্ফোরণে সম্ভবত সবগুলো কাচের ডোমের দরজা খুলে গেছে। অবশেষে মুক্ত হয়েছে কুখ্যাত ওডোকুরো।

কিন্তু এই পতঙ্গগুলোই এখন আতঙ্কের একমাত্র কারণ নয়।

ক্রমাগত কাঁপছে গোটা স্টেশন। টেস্ট চেম্বার থেকে টানেলে ঢুকছে পানির ধারা।

সত্যিটা উপলব্ধি করতে পারলেন কিন।

ধ্বসে পড়ছে সব...

অধ্যায় সাতাশ

৮ মে, ভোর ৫:২৮
ইকিকাউও দ্বীপ

বিস্ফোরণের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেছে।

টর্চার চেম্বার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এসেছে গ্রে। কজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে হার্ভেস্টার বোলতাদের আটকে রাখা হ্যাচ। বেশকিছু পোকা আগের মোচ্ছবে যোগদান করেনি। ওগুলো বেরিয়ে এল এবার। কিন্তু ফোমের সংস্পর্শে আসতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

ভাগ্য ভালো, কোয়ালস্কিসহ বাকি দুই বন্দীও বিস্ফোরণের আগে হলে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ওষুধের গুণে প্রাথমিক ধকল সামলে উঠেছে ওরা। বর্তমানে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো সক্ষম। রক্ত জমাট বেঁধে ক্ষতের মুখগুলো এখন প্রায় বন্ধ।

ঘরের উল্টোদিকে আইকো হিগাশি অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো। টানেলে পড়ে আছে তার দুই শিকার। মেয়েটা না থাকলে শত্রুপক্ষ এতক্ষণে এখানে এসে সবাইকে নিকেশ করে দিত।

আঙুল উঁচু করে সংকেত দিল আইকো-তার রাইফেলে আর মাত্র এক রাউন্ড বুলেট বাকি।

গ্রে প্রার্থনা করল, এই এক রাউন্ডই যেন ওদের বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয়। ওদিকে বিস্ফোরণের পর থেমে গেছে উল্টোদিকের গুলি। বোঝা যাচ্ছে না-অস্ত্রধারীরা পালিয়েছে নাকি ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

হার্ভেস্টারদের চেম্বার থেকে বলকে বলকে পানি বেরোচ্ছে। সম্ভবত বিস্ফোরণের ফলে ফাটল ধরেছে কাচনির্মিত ছাদে। ভাঙা অংশ বেশিক্ষণ চাপ নিতে পারবে বলে মনে হয় না।

গ্রে-র দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করল আইকো।

কী করব আমরা?

টানেলে পায়ের শব্দে সম্বিত ফিরল। শেষ হামলা করতে আসছে শত্রুপক্ষ।

হাঁটু গেড়ে বসে আইকো অস্ত্র তাক করল। সম্বল বলতে মাত্র একটা বুলেট। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগমুহূর্তে পায়ের মালিককে দেখতে পেল মেয়েটা।

পালু।

'শেইচান কোথায়?' গ্রে জানতে চাইল।

হাঁপাচ্ছে হাওয়াইয়ান। 'নিয়ে গেছে... শত্রুরা... এখানে আসার পথে... প্রফেসরও... ওদের সাথে...'

উঠে দাঁড়াল গ্রে। 'চলো, ওদের আনতে হবে।'

হাত তুলে থামতে ইশারা করল পালু। 'পারবে না।'

অস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে সায় দিল আইকো। 'অন্তত রসদহীন এমন অবস্থায় না।'

'আরও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পারব আমরা। সময় পেলে হয়তো জায়গাটা সিল করে দেয়ার আগে...'

বুমমম...

আওয়াজের তীব্রতায় সিগমা কমান্ডারের কণ্ঠে ছেদ পড়ল। হার্ভেস্টারদের ডোম থেকে বিপুল বেগে পানির ধারা নেমেছে। চাপের মুখে ভেঙে পড়েছে কাচের ছাদ।

পানির তোড়ে সামনের দিকে ভেসে এল কোয়ালস্কিসহ বাকিরা। জ্ঞাতি ভাইদের দেখে ভ্রূকুটি করল পালু। কাটামারানে হামলা হয়েছে, ব্যাপারটা ওর জানা ছিল না।

ব্যাখ্যা করার মতো সময় হাতে নেই। সামনের দিকে ইশারা করে তাড়া দিল গ্রে। 'ঠিক আছে। সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। আগে বের হতে হবে এখান থেকে।'

আবারও হাত তুলে তাকে থামাল হাওয়াইয়ান। 'ওদিকে নয়।'

'তাহলে?'

এবার নিচের দিকে ইশারা করল পালু। 'বের হওয়ার রাস্তা একমাত্র এদিকে।'

ভোর ৫:৩০

ব্লাস্ট ডোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাসাহিরো। চুপচাপ দেখছে-অজ্ঞান শেইচানকে বয়ে আনছে ভালিয়ার লোকেরা। মেয়েটার বামপাশের কপালে রক্ত। সম্ভবত পিস্তলের বাট দিয়ে মেরে অজ্ঞান করা হয়েছে।

ঠিকই আছে...

মনে মনে ভাবল মাসাহিরো-সাদা রাশিয়ানটাকেও এভাবে মারতে পারলে মন্দ হত না। শেইচানকে হস্তগত করার পুরো কৃতিত্ব নিজে নেবে বেটি।

'বন্ধ করে দাও,' ব্লাস্ট ডোরের দিকে ইঙ্গিত করে গার্ডদের বলল মাসাহিরো। 'এখানকার কাজ শেষ।'

আসলেই কি শেষ?

দুই গার্ডের উদ্দেশ্যে আলতো করে মাথা নাড়ল ভালিয়া। নির্দেশ আগেই দেয়া আছে।

কোটের ল্যাপেল ধরে মাসাহিরোকে মাথায় তুলে নিল এক গার্ড। তারপর ছুঁড়ে ফেলল ব্লাস্ট ডোর দিয়ে স্টেশনের ভেতর। কাজ শেষে বন্ধ করে দিল দরজার পাল্লা।

'না!' চেঁচাতে চেঁচাতে উঠে বসার প্রয়াস পেল মাসাহিরো। পতনের ধাক্কায় বাজেভাবে আঘাত লেগেছে কোমরে। হাড় ভেঙেছে কি না বুঝে ওঠার আগেই, গালে কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেল জাপানিজ।

পরমুহূর্তে এল তীব্র ব্যথার ধাক্কা।

কাতরানোর ফাঁকে দরজার হ্যাচ বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখল মাসাহিরো। পাল্লা আটকানোর আগে অবশ্য এক পলকের জন্য ওপাশে দেখা দিয়েছে ভালিয়ার বিবর্ণ মুখ। মেয়েটার চোখের তারায় বিজয়ের বুনো উল্লাশ।

জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে নিজের সবচেয়ে বড় ভুলটা উপলব্ধি করল মাসাহিরো। পুরোটা সময় রাশিয়ান মেয়েটার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অবহেলা করেছে ও। জীবন দিয়ে এখন তার মাশুল চুকাতে হবে।

ধুকপুক করতে থাকা হৃৎপিণ্ডের চিৎকার ছাপিয়ে, কানে এল ডানার ফরফর আওয়াজ। মাথার উপর ভিড় জমিয়েছে ওডোকুরোর দঙ্গল। কয়েক সেকেন্ডের ভেতর সামনে, পেছনে, ডানে, বামে ছেয়ে গেল কালো এক পর্দায়।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস টের পেয়ে চোখ বন্ধ করল মাসাহিরো। বোলতার ঝাঁক তাকে ছেঁকে ধরেছে। মাথায়, গলায়, হাতে, কয়েকটা হুল ফুটতেই গলা থেকে বেরিয়ে এল অমানুষিক চিৎকার।

সাথে সাথে মুখ দিয়ে ঢুকতে শুরু করল মৃত্যুদূত।

এবার হুলের লক্ষ্য জিভ, তালু... গলার ভেতর দিক।

অগ্নি-সমুদ্রে স্নান করতে করতে এক সময় সব ব্যথার উর্ধ্বে চলে গেল মাসাহিরোর অনুভূতি।

ভোর ৫:৩৮

স্টেশনের মাঝের অংশ দিয়ে ছুটে চলেছে গ্রে-সহ দলের বাকিরা। মাঝপথে থেমে পড়ে থাকা লাশের পাশ থেকে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। গোটা স্টেশন মৃগিরোগীর মতো কাঁপছে।

সবগুলো ডোমের কাচ ভেঙে গেছে। প্রবল বেগে পানি ঢুকছে স্টেশনের ভেতর। সেই সাথে জায়গায় জায়গায় আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী তো আছেই।

কিন্তু এগুলোই ভয়ের একমাত্র কারণ নয়...

ছুটতে ছুটতে ক্রিকেট ব্যাটের মতো রাইফেলের বাঁট দিয়ে একটা বোলতাকে সরিয়ে দিল গ্রে। নিচের লেভেলের সিঁড়ির মুখের উপরে ভিড় করেছে একপাল পতঙ্গ। পাখার সম্মিলিত গুঞ্জনে মনে হচ্ছে যেন জেট বিমান নেমে এসেছে চেম্বারে।

তবে পালানোর পথ একমাত্র এটাই।

'দৌড়াও,' বাকিদের সতর্ক করল গ্রে। 'থেমো না।'

সবার আগে আইকো এবং পালু। মাকাইও-কে ধরে নিচ্ছে দু'জন। তারপর টুয়া আর কোয়ালস্কি। সবার পেছনে সিগমা কমান্ডার। সিঁড়ির কাছে পৌঁছাতেই হামলে পড়ল বোলতার দঙ্গল।

কামড় খেতে খেতে হাচরে-পাচরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সবাই। হাত এবং পায়ের খোলা অংশে কম করে হলেও পাঁচ-ছয়টা হুলের খোঁচা খেয়েছে গ্রে। সারা গায়ে বইছে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত। কোয়ালস্কির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সম্ভবত ওষুধের প্রতিক্রিয়াই লোকটাকে এখনও সচল রেখেছে।

ভাগ্য ভালো, নিচের লেভেল থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে উপরের লেভেলে। এই ধোঁয়াই বোলতাদের নিচে নেমে আসতে বাধা দিচ্ছে। সিঁড়ি শেষ হতে দেখা গেল, এখানে হাঁটু সমান পানি জমে আছে।

ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে হুলের ব্যথা যেন খানিকটা কমল।

'এদিকে,' হাত তুলে ইশারা করল পালু। বামদিকের একটা টানেলের দিকে তার মুখ।

পানিতে ভাসছে অগুনতি বোলতার মৃতদেহ। উপর থেকে পানির ধারার সাথে নেমে এসেছে আর কি। 'শেষ মাথা দিয়ে বের হতে পারার কথা,' টানেল বেয়ে ছুটতে ছুটতে পালু বলল।

এদিকে কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে পানির স্তর। অবশেষে টানেলের মুখে একটা হ্যাচ নজরে পড়ল।

সেই এয়ারলক...

আসার পথে পালু সবাইকে বলেছে, কীভাবে এদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে ও আর শেইচান। এয়ারলকের বাইরে ছোট একটা সাবমেরিনও নোঙর করা দেখেছে ওরা। সম্ভবত বাহনটা রসদ আনা নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হত।

এই মুহূর্তে এটাই তাদের একমাত্র আশা।

কিন্তু একমাত্র তাদেরই নয়...

এয়ারলকের সামনে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের তিনজন কর্মচারি। ভেজা ইঁদুরের মতো দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। রাইফেল তাক করে জাপানিজ ভাষায়

তাদের পরিচয় জানত চাইল আইকো। কথা শেষে দলের বাকিদের জানাল, ওরা ওই সাবমেরিনের ক্রু।

স্বস্তির নি:শ্বাস ছাড়ল গ্রে। এতক্ষণয যাবত মনে মনে ভাবছিল, বাহনটা চালাবে কীভাবে। সমস্যাটার একটা সমাধান পাওয়া গেল।

কিন্তু আইকোকে অতটা খুশি দেখাচ্ছে না। কারণটাও ব্যাখ্যা করল এরপর। 'বের হওয়ার চেষ্টা করেছে ওরা। কিন্তু এয়ারলকের হ্যাচ আটকে গেছে।'

পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল গ্রে। পুলে দাঁড়ানো একটা সাবমেরিনের কনিং টাওয়ার চোখে পড়ছে।

কত কাছে... তাও কতই না দূরে!

ভোর ৫:৪৯

দ্বীপের এয়ারস্ট্রিপ থেকে সবেমাত্র ডানা মেলেছে বিমানটা। কার্গো হোল্ডে বসে আছেন কিন। হালের ভেতর সাঁটা লেখা থেকে বোঝা গেল, বাহনটা সম্ভবত রাশিয়ান কিংবা সার্বিয়ান মিলিটারির। খুব সাধারণ ডিজাইন। দরজার ওপাশে ফ্লাইট ডেক। দেয়ালে আটকানো কয়েকটা সিট, হোল্ডের বাকিটা অবশ্য খোলাই বলা যায়।

খোলা, কিন্তু খালি নয়।

নানা ধরণের ক্রেট, বাক্স ইত্যাদিতে বোঝাই হয়ে আছে জায়গাটা। স্টেশন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সব।

এখনও অজ্ঞান হয়ে আছে শেইচান। কপালের রক্ত শুকিয়ে গেছে যদিও। তারপরও ঝুঁকি নিচ্ছে না শত্রুপক্ষ। মেয়েটার হাত-পায়ে বেড়ি লাগানো হয়েছে। বেঁধে রাখা হয়েছে সিটের সাথে। পাশে পিস্তল হাতে এক গার্ড।

দরজার শব্দে কিনের সম্বিত ফিরল।

ফ্লাইট ডেক থেকে বেরিয়ে এসেছে ভালিয়া। দুই গার্ডের দিকে ইঙ্গিত করল তারপর।

কিন বুঝে গিয়েছেন, মেয়েটার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে কর্মীরা সবাই পরিচিত। মাসাহিরোকে স্টেশনে ফেলে আসার সিদ্ধান্তে কেউ বিন্দুমাত্র প্রশ্ন তোলেনি। পাশের কোস্ট গার্ড ভবনে গিয়ে দেখা যায়, জায়গাটাকে ইতিমধ্যে কসাইখানায় পরিণত করেছে ভালিয়ার আজ্ঞাবহ লোকজন। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশ। রাস্তা পরিষ্কার করে মৃতদেহগুলোকে জড়ো করে রাখা হয়েছে রক্ত দিয়ে ভরা একটা পুলের ভেতর।

গার্ডের দিকে ইঙ্গিত করল ভালিয়া।

পরমুহূর্তে বিমান কেঁপে ওঠা বিস্ফোরণে এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারলেন কিন। জানালা দিয়ে দেখলেন, আকাশে উঠে গেছে কোশট গার্ড ভবনের ছাদ। নিচে আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ড।

নিজের ছাপ মুছে ফেলছে মেয়েটা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রাশিয়ানের ইঙ্গিতে বিমানের কার্গো হ্যাচ খুলে দেয়া হলো। পেছনে রাখা একটা বিশাল আকারের ব্যারেল গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে ফেলল দুই গার্ড।

দ্বীপের মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে আবারও যেন বিস্ফোরণের তোড়ে কেঁপে উঠল পৃথিবী। পরপর কয়েকটা চক্কর চলাকালীন আরও কয়েকটা ব্যারেল নিচে ফেলা হলো। পুরো দ্বীপ ঢাকা পড়ে গেল ধোঁয়া আর আগুনে।

কিন বুঝতে পারলেন, কুইমাডা গ্রান্ডের মতো এই দ্বীপটাকেও ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে।

আবারও ইশারা করল ভালিয়া। খোলা জায়গা দিয়ে ঢুকতে থাকা বাতাসের তোড়ে বলা কথাগুলোর শুধুমাত্র শেষটা প্রফেসরের কানে ঢুকল।

'... মিযুমি।'

আঁতকে উঠলেন কিন। মেয়েটার পরিকল্পনা ধরতে পেরেছেন।

আদেশে সাড়া দিতেই যেন বৃত্ত রচনা করে ঘুরল বিমানটা। আবারও দ্বীপের উপর ফিরে আসছে শেষ হামলার জন্য।

জাপানিজে 'মিযুমি' শব্দটার অর্থ হচ্ছে 'লেক'!

ভোর ৫:৫৫

'মজার খেলা,' কাজের ফাঁকে মুখ টিপে হাসল কোয়ালস্কি।

গ্রে কোন উচ্চবাচ্য করল না। যা করছে করুক। বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে সিগমার এই বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞের অন্যতম প্রধান শখ।

উপড়ে আসা মেঝের একটা অংশে স্টিলের পাতের আড়াল নিয়েছে দলের বাকিরা। জায়গাটা এয়ারলকের প্রায় বিশ কদম পেছনে। কাজ শেষ করে তাদের সাথে যোগ দিল কোয়ালস্কি আর পালু। হাওয়াইয়ানের কাছে থাকা সি-ফোর এক্সপ্লোসিভের শেষ টুকরোটা আটকে দিয়ে এসেছে তোবড়ানো হ্যাচের সাথে।

বিস্ফোরণে হয়তো ডকিং চেম্বারের পুরোটাই উড়ে যাবে। অথবা ধ্বসে পড়তে পারে টানেলটাও। কিন্তু আপাতত এই ঝুঁকি নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

'তৈরি হও,' সতর্ক করল কোয়ালস্কি। 'সময় শেষ।'

পানির স্তর কোমর ছাড়িয়ে উঠে এসেছে। নি:শ্বাস আটকে ডুব দিল সবাই।

বুমমম...

মাথা তুলতে দেখা গেল, কাজটা সফলভাবেই সমাপ্ত হয়েছে। উড়ে গেছে এয়ারলকের পাল্লা, তবে টানেলটা এবং বাইরের ডকিং চেম্বার পুরোপুরি অক্ষত।

গ্রে প্রার্থনা করল, বের হওয়া পর্যন্ত যেন বাতাসের চাপ বজায় থাকে।

'যাও!'

সাবমেরিনে উঠে দরজার হ্যাচ খুলে দিল এক কর্মী। সাথে সাথে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল বাকিরা। সবার শেষে গ্রে। টাওয়ারের মাথায় আরেক কর্মী দাঁড়িয়ে আছে। শত্রু পরিণত হয়েছে বন্ধুতে।

পানিতে নড়াচড়া দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গ্রে। কমলা রঙের একটা ব্যারেল পড়েছে উপর থেকে।

আঁতকে উঠে লোকটাকে নিয়ে কনিং টাওয়ারের ভেতর শরীর গলিয়ে দিল সিগমা কমান্ডার। একইসাথে মাথার উপর টেনে নামিয়ে দিয়েছে দরজার হ্যাচ। বাকিদের গায়ের উপর হুড়মুড় করে পড়তে পড়তেই শোনা গেল বিস্ফোরণ।

দুলে উঠল সাবমেরিন। বাড়ি খেল পুলের পাড়ের সাথে।

'এখুনি...' শোয়া অবস্থাতেই চেঁচিয়ে আদেশ দিল গ্রে।

পাইলট নিজের আসনে বসে ততক্ষণে ইঞ্জিন চালু করেছে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র রওয়ানা হলো। পড়িমড়ি করে নিজেদের অবস্থানে স্থির হলো বাকি দুই ক্রু।

সোজা হয়ে দাঁড়াল গ্রে। বাহনটা চিনতে পেরেছে। যুগোস্লাভ নেভির তৈরি ইউনা-ক্লাস সাবমেরিন। স্পেশাল ফোর্সের রেঞ্জারদের জায়গামতো আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় এগুলো। এখানে খানিক কাটছাঁট করে ব্যক্তিগত কাজে লাগানো হত। নিরেট নোজ কোনের জায়গায় লাগানো হয়েছে পলিমারের গ্লাস।

পাইলটের সাথে যোগ দিল সিগমা কমান্ডার। উপর থেকে ফেলা ডেপথ চার্জ পুলের একাংশ ধ্বসিয়ে দিয়েছে। পানিতে বাতাসের বুদবুদ। স্বাভাবিক আলো তো আগেই নিভেছে, এবার চেম্বারের ইমারজেন্সি লাইটও উধাও হয়ে গেল।

সাবের আলো জ্বালাল পাইলট। সামনে খোলা সাগরে বের হওয়া একটা টানেলের মুখ দেখা যাচ্ছে।

বাহনটা পুরোপুরি টানেলে ঢুকে যাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রে। এখন আর ডেপথ চার্জের ভয় নেই। তারপর ফিরে তাকাল পাইলটের দিকে। 'ব্যাটারিতে ফুল চার্জ আছে তো?'

বুড়ো আঙুল দেখাল লোকটা। সৌভাগ্যবশত, প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার মতো সংক্ষিপ্ত ইংরেজি তার জানা আছে। 'এখান থেকে বের হলে... মিডওয়ে দ্বীপ... সর্বোচ্চ গতি।'

খুশিমনে সামনের দিকে চোখ ফেরাল সিগমা কমান্ডার। কালো টানেলে যেন ভেসে আছে শেইচানের চেহারা।

তোমাকে বাহুডোরে ফিরে পাওয়ার আগে আমি থামব না...

অধ্যায় আটাশ

৮ মে, সকাল ৬:১৮
প্যাসিফিক সাগরের উপর

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরছে, সেই সাথে ফিরছে ব্যথাও।

টনটন করছে শেইচানের কপাল। কিন্তু হাত-পায়ের ব্যথার কাছে এই অনুভূতি বলতে গেলে কিছুই না। মাংসপেশীতে যেন আগুন জ্বলছে। পিটপিট করতে থাকা চোখ দিয়ে প্রবেশ করা আলোকরশ্মি যেন হাতুড়ি পিটছে মগজে।

কাতরোক্তি করে চোখে হাত চাপার প্রয়াস পেল মেয়েটা। সাথে সাথে টের পেল, হাত বেড়িতে আটকানো। পায়েরও একই হাল।

বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল-ও আসলে একটা কার্গো প্লেনে আছে। পাশেই আছেন কিন।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।

প্রশ্নটা পাত্তা না দিয়ে শুকনো জিভে কয়েকটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারল শেইচান। 'গ্রে... দলের বাকিরা...'

বাঁধা হাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন কিন। 'জানি না। এখনও নিচে। ভালিয়া বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে গোটা দ্বীপ। ভূ-গর্ভস্থ স্টেশন ধ্বংস হয়ে গেছে।'

ঘাড় বাঁকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শেইচান। সূর্য পুরোপুরি উঠে গেছে। আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। বিমানের পেছনে ধোঁয়া উড়তে থাকা দ্বীপটা নজরে পড়ল সহজেই।

শেইচানের বিশ্বাস হলো না-গ্রে আর নেই। সামনে ঝুঁকতেই আবারও হামলা চালাল ব্যথার তোড়। চেঁচিয়ে উঠে চোখ মুদল মেয়েটা। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানে না। চোখ খুলতেই ভালিয়ার উল্কি আঁকা চেহারা দেখতে পেল সামনে।

'তাহলে জ্ঞান ফিরেছে?'

উত্তর দেয়ার ধার ধারল না সাবেক আততায়ী।

জবাব না পেয়ে কিনের দিকে ফিরল রাশিয়ান। 'আপনি তো এসবের বিশেষজ্ঞ। বলুন, ওর কি অবস্থা।'

শেইচানের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'হিসাব অনুযায়ী লার্ভাগুলো এখন দ্বিতীয় ইনস্টার দশায় রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে।'

'তার মানে, আসল যন্ত্রণা এখনও শুরু হয়নি।'

বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল শেইচানের মন। হাত খালি থাকলে ঘুষি বসাত লোকটার মুখে।

প্রফেসর বলে চলেছেন। 'ওর হাতে আর একদিন সময় আছে। তারপর তৃতীয় ইনস্টারগুলো হাড়ে বাসা বাঁধতে শুরু করবে।'

শেইচানের পেটের দিকে তাকাল ভালিয়া। 'আর ওর বাচ্চা?'

মাথা নাড়লেন কিন। 'জানি না।'

শেইচানকে আগা-গোড়া মেপে নিল রাশিয়ানের নিল চোখজোড়া। 'তাহলে জাপানে নামার পর পরীক্ষা করে দেখব। মনে হচ্ছে, দু'য়ের পরিবর্তে তিনটা পুরস্কার হাতে ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজে ফিরতে চলেছি আমি।'

কথা শেষ করার সাথে সাথে বিমানের পেছন দিক থেকে এক ক্রু এগিয়ে এল। 'স্পটাররা একটা সাবমেরিন শনাক্ত করতে পেরেছে। দ্বীপ থেকে বের হয়ে অগভীর মগ্নচড়া পার হচ্ছে বাহনটা।'

মুঠি পাকাল ভালিয়া। 'জানতাম... জানতাম ইঁদুরটা বেরোনোর কোন না কোন গর্ত ঠিক খুঁজে নেবে।'

একটা বিট মিস করল শেইচানের হৃৎপিণ্ড। বুঝতে পেরেছে, কোন ইঁদুরের কথা বলছে ভালিয়া।

গ্রে...

'আমাদের লোকও হতে পারে ওরা,' সতর্ক করল বিমানের ক্রু।

'ব্যাপার না,' কার্গো হোল্ডের দিকে ইঙ্গিত করল রাশিয়ান। 'কয়টা ব্যারেল বাকি?'

'দশটা।'

'বাঁক ঘুরে আসতে বলো পাইলটকে। এখন পাঁচটা ব্যারেল ফেলবে। বাকি অর্ধেক পরের কিস্তিতে।'

'ঠিক আছে,' সায় দিয়ে চলে গেল গেল লোকটা।

আবারও শেইচানের দিকে ফিরল ভালিয়া। 'দ্বীপের চারপাশে, সাগরের প্রায় পুরোটাই অগভীর এলাকা। কোথা পালাবার পথ পাবে না তোমার রসিক নাগরের সাবমেরিন।'

কথাটা শুনে কর্পূর হয়ে উবে যেতে শুরু করল শেইচানের মনে উদয় হওয়া আশা।

সাবেক আততায়ীর মনের কথা যেন ধরতে পেরেছে ভালিয়া। 'তবে চিন্তা কোরো না। সন্তানের বাবার মৃত্যু একেবারে সামনের আসনে বসে দেখতে পাবে তুমি।'

সকাল ৬:৩২

নতুন ভোরের আলোকে অভিশাপ দিচ্ছে গ্রে।

সাগরতল জুড়ে ছড়ানো প্রবাল প্রাচীরের গা ঘেঁষে সামনে এগোচ্ছে সাবমেরিন। দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় মাছের ঝাঁক। ইউনা-ক্লাস সাবমেরিন এই ধরণের অগভীর পানিতে চলার জন্যই বিশেষভাবে তৈরি। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন।

'কতখানি গভীরে আছি আমরা?'

ইংরেজিতে জবাব দিল পাইলট নাকামুরা। 'ত্রিশ মিটার।'

গ্রে জানে, নিরাপদে চলতে হলে তাদের কমপক্ষে দুইশো মিটার গভীরে চলে যেতে হবে। নইলে উপর থেকে চিহ্নিত হওয়ার ভয় আছে।

তার ভাঁজপড়া কপাল দেখে পাইলটও ব্যাপারটা বুঝতে পারল। 'দশ কিলোমিটার সামনে গভীর খাদ আছে। আমরা ওখানে লুকাতে পারব।'

'তাহলে ইঞ্জিনের পুরো ক্ষমতা লাগাও।'

'ঠিক আছে,' সায় দিয়ে স্টিয়ারিং কলামে মন দিল নাকামুরা।

আইকো গ্রে-র পাশেই দাঁড়ানো। হাতে রাইফেল... তবে নলটা পাইলটের দিকে নয়, মেঝের দিকে তাক করা। নিজেদের লোকের হামলার শিকার হয়ে দলবদল করেছে জাপানিজ সাবমেরিন কর্মীরা।

পালু এদিকে গজ-ব্যান্ডেজ নিয়ে ব্যস্ত। বিগত ত্রিশ মিনিট ধরে দুই জ্ঞাতি ভাই আর কোয়ালস্কির ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করছে ও।

'কী অবস্থা সকলের?' আইকো জানতে চাইল।

'প্রচুর রক্ত হারিয়েছে প্রত্যেকেই। টুয়ার অবস্থা বেশি খারাপ। বাকি দু'জনের মতো শক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।'

গ্রে-র দিকে ফিরল জাপানি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। 'মিডওয়ে দ্বীপ এখনও আশি মাইল দূরে। সর্বোচ্চ গতি পেলেও ওখানে পৌঁছাতে আমাদের সাত-আট ঘণ্টা লেগে যাবে।'

আহতরা এতক্ষণ না-ও টিকতে পারে।

কথার বাকি অংশটুকু গ্রে-র কাছে পরিষ্কার। 'বিপজ্জনক এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা অ্যান্টেনা তুলতে পারব। আশা করি তখন মিডওয়ে স্টেশনে বিপদ সংকেত পাঠানো সম্ভব হবে। আকাশপথে সাহায্য পাঠাতে রাজি করা যাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল পালু। 'সেক্ষেত্রে সাগরে খুব বেশি সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।' নোজ কোন পেরিয়ে ওর চোখ চলে গেছে প্রবাল প্রাচীরে। 'এদিকটা অবশ্য বেশ সুন্দর। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পাপাহানাউমোকুয়াকিয়ার জলসীমায় পৌঁছে যাব।'

দ্বীপগুলোর আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকার কথা মনে পড়ল গ্রে-র। কিন্তু মাথার উপর দিয়ে একটা কালো ছায়া পেরিয়ে যাওয়ায়, চিন্তায় ছেদ পড়তে বেশিক্ষণ লাগল না।

খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ছায়াটা... ভাসমান মেঘ হতে পারে না।

ওর হাত আঁকড়ে ধরল আইকো। 'বিমান!'

ঝাঁকি খেয়ে পাইলটের দিকে ফিরল সিগমা কমান্ডার। 'বামে... তাড়াতাড়ি।'

সাথে সাথে সাড়া দিল নাকামুরা। তীব্র গতিতে বামে ঘুরল সাবমেরিনের নাক। আরেকটু হলেই ভেতরের আরোহীরা চিৎপটাং হত।

নোজ কোন দিয়ে উপরদিকে তাকাল গ্রে। বাহনটা যে একটা বিমান, তাতে সন্দেহ নেই।

শত্রুপক্ষের নয় তো?

পানিতে ভারী কিছু পড়ার আওয়াজে প্রশ্নের উত্তর মিলল। ফেনা কাটতে চোখে পড়ল কমলা রঙের ব্যারেল।

'নিজেদের সামলাও!' চেঁচিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার।

আরোহীরা নড়ে বসার আগেই বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সাবমেরিন। এক উল্টো গড়ান খেয়ে, আগাছার প্রাচীরের সাথে ঘষটে ঘষটে থামল। যেভাবে এসেছিল, তেমনিভাবে এক মুহূর্তে যেন কমে গেল ধাক্কার তীব্রতা।

স্বস্তির নি:শ্বাস ছাড়ল গ্রে।

তবে বিপদ কিন্তু কাটেনি। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কাচের নোজ কোন আর সাবমেরিনের ধাতব খোলের সিল দুর্বল হয়ে পড়েছে। চুঁইয়ে পানি ঢুকতে দেখা গেল। পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে যেন কাচে দেখা গেল সরু একটা ফাটল। আপাতত টিকে গেছে। কিন্তু আবার হামলা হলে...

আশেপাশে চোখ বুলাল গ্রে। স্টারবোর্ড সাইডের সাগরে আগাছা আর বালু-কাদার মেঘ জমেছে। যে কোন সময় আবারও ফিরে আসতে পারে হামলাকারীরা। কোন দিক দিয়ে আসবে তা জানে না সিগমা কমান্ডার, কিন্তু জানে-আসবে।

'খাদে পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে?' পাইলটকে জিজ্ঞেস করল আইকো।

'অনেকক্ষণ। আট কিলোমিটার বাকি।'

হামলাকারীরা ফিরে আসার আগে কোনমতেই লুকোনোর জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না ওরা।

নাকামুরার কাঁধে হাত রাখল গ্রে। 'খাদের কথা ভুলে যাও। সর্বোচ্চ বেগে দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোতে থাকো।' পরমহূর্তে নড করল পালুর দিকে তাকিয়ে। আসার পথে লোকটার বলা কথাগুলো এখন পালাবার পথ দেখাবে।

বিশালদেহী হাওয়াইয়ানও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। মুখে হাসি। 'আগেই বলেছিলাম... তুমি একটা আস্ত শুয়োর!'

সকাল ৬:৪৯

'কী করছে ওরা?' ভালিয়া জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটার অস্বস্তি দেখে মজা পাচ্ছে শেইচান। পাশার দান ঘুরে গেছে। বিমানটা আকারে বড় হওয়ায় পাক খেয়ে ঘুরে আসতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে। ততক্ষণে দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়েছে সাবমেরিনের কাঠামোটা। বিস্ফোরণের চিহ্ন বলতে পানিতে ডেপথ চার্জ ফেলার জায়গায় ঘোলা একটা ভাব।

বিমানটাকে আবারও ঘুরে আসার নির্দেশ দিল ভালিয়া। মনে আশা-সম্ভবত সাবমেরিনটার সলিল সমাধি ঘটেছে। সেক্ষেত্রে ওদের নাম-নিশানা চোখে না-ই পড়ার কথা।

এবারও কোন ধরণের আভাস পাওয়া গেল না।

'একজন গেল,' শেইচানের উপর ঝুঁকে এল রাশিয়ান। নজর সাবেক আততায়ীর পেটের দিকে। 'আর দুটো বাকি।'

এমন সময় স্পিকারে শোনা গেল পাইলটের কণ্ঠ। 'টার্গেট দেখা গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে এগোচ্ছে।'

বিমান ওদিকে ঘোরার ফাঁকে আবারও জানালার দিকে চোখ ফেরাল ভালিয়া। 'করছেটা কী ওরা!'

ঘুরে তাকাল শেইচানও। রাশিয়ানের দুশ্চিন্তা ওকে ব্যথার বাপারটা সাময়িকভাবে মাথা থেকে সরিয়ে রাখতে সহায়তা করছে। কিনের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল এক পলক। প্রফেসরের মুখেও আশার ছাপ।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ভালিয়া। ক্রু-কে ডাকল সাথে সাথে। 'পাইলটকে বলো নিচু হতে। যত কাছে যাওয়া সম্ভব হয়, যেতে বলো। তাড়াতাড়ি!'

বিমানের হ্যাচের দিকে এগোতে এগোতে রাশিয়ান ভাষায় গাল বকল মেয়েটা। দরজার পাশে এখনও রয়ে গেছে পাঁচটা কমলা রঙের ব্যারেল। 'ওদেরকে ওখানে যেতে দেয়া যাবে না।'

'দেখো!' উত্তেজিত ভঙ্গিতে শেইচানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কিন।

পরক্ষণে নিজেই দেখতে পেল ব্যাপারটা।

এক মাইল-মতো সামনে একাট্টা হয়ে আছে নানা ধরণের হাবিজাবি জিনিস। ভাসছে ঢেউয়ের উপর ভর করে... একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে থেকে থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে ছোট ছোট দ্বীপ।

অবাক গলায় প্রশ্ন করল শেইচান। 'ওগুলো কী!'

সকাল ৬:৫৪

এখানে আসার পথে পালুর মুখে এদিকের সামুদ্রিক অঞ্চলের এক মুর্তিমান বিভীষিকার কথা শুনেছিল গ্রে-সাগরে ভাসতে থাকা বিশাল আবর্জনার স্তূপ। যা কিনা দ্বীপ এবং জলজ পরিবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক হুমকিস্বরূপ।

কিন্তু এখন এই আবর্জনাই তাদের জীবন বাঁচাবে।

গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে সাবমেরিন। পানিতে দেখা যাচ্ছে নানা ধরণের দূষণকারী পদার্থ। বাতিল টায়ার, পলিথিন, ছেঁড়াফাড়া জাল ইত্যাদি। তবে আসল মেলা আরও খানিকটা সামনে।

জিনিসটাকে ডাকা হয় 'গ্রেট প্যাসিফিক গার্বেজ প্যাচ' নামে। আয়তনে টেক্সাসের আকারের দ্বিগুণ। সাগরে ভেসে ভেসে এখানে এসে একাট্টা হয়েছে আশেপাশের যত আবর্জনা। মাঝে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ। তাদের চারধারে ভাসমান জিনিসপত্রের তালিকা করতে গেলে সারাদিন লেগে যাবে। প্লাস্টিকের বোতল, ব্যাগ, স্টাইরোফোমের কাপ, তেলের ব্যারেল, জাহাজ থেকে ফেলা পুরনো ক্রেট ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে পরিবেশের জন্য আসল ঝামেলা ভাসছে আরেকটু নিচে। কয়েক মিটার পুরু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার স্তর-মাইক্রোপ্লাস্টিক।

জায়গাটা পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলেও, বর্তমানে তাদের জন্য আশ্রয়।

'প্রায় পৌঁছে গেছি,' বিড়বিড় করে আইকো বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' সুর মেলাল পালুও।

আবর্জনাভরা গাঢ় কালো পানির নিচে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রে। ময়লার দঙ্গলের ফাঁক গলে যেটুকু সূর্যের আলো এখানে পৌঁছায়, তার বেশিভাগ খেয়ে নেয় মাইক্রোপাস্টিকের কণা। ফলে ছায়া ছায়া হয়ে থাকে এলাকাটা।

তবে বিস্ফোরণের আওয়াজে সাবমেরিন কেঁপে উঠতে টের পাওয়া গেল, বিপদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

পাইলটের সিটের পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গ্রে। 'স্টারবোর্ড সাইডে... জলদি... পূর্ণগতি!'

স্টিয়ারিং-এর দক্ষ মোচড়ে পরবর্তী আরও কয়েকটা বিস্ফোরণের তীব্রতা সামলে নিল নাকামুরা। বোঝা গেল, বিমানের আরোহীদের চোখে আপাতত ওরা অদৃশ্য। আন্দাজে বোমা ফেলছে হামলাকারীরা।

কয়েক মুহূর্ত পর শান্ত হয়ে এল সাগর।

সামনের বিশাল একটা আবর্জনার স্তূপের নিচে ইঙ্গিত করল গ্রে। লুকানোর জায়গা দরকার। 'ওখানে থামাও।'

আদেশ পালন করল পাইলট। দেখা গেল, স্তূপের নিচে জালে আটকে আছে বিশাল একটা সিলের আধপচা মৃতদেহ। নোজ কোনে দৃশ্যটা দেখে শিউরে উঠল আইকো।

'ভুতুড়ে শিকার,' ব্যাখ্যা করল পালু। 'এরকম শত শত পরিত্যক্ত জাল ভাসতে ভাসতে গার্বেজ প্যাচে জমা হয়। আসার পথে জড়িয়ে ধরে আনে মাছসহ হাজারও জলজ প্রাণী। জালে আটকে অবশেষে হাঁসফাঁস করতে করতে মারা যায় সব।'

সিলের বেরিয়ে থাকা হাড়ের দিকে তাকাল সিগমা কমান্ডার।

'প্রার্থনা করো, আমাদেরও যেন এমন অবস্থা না হয়।'

সকাল ৭:১২

ভালিয়ার উদ্বিগ্নতা পুরোপুরি উপভোগ করছে শেইচান। পেছনের হ্যাচটা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ব্যারেলের মজুদ শেষ।

পাশের সিট থেকে প্রশ্ন করলেন কিন। 'কী মনে হয়? ওরা বাঁচতে পারবে?'

'ভালিয়ার গোমড়া মুখ দেখে তাই ধারণা করছি,' পাল্টা ফিসফিস করে জবাব দিল শেইচান।

ক্রু-র দিকে ফিরল রাশিয়ান মেয়েটা। 'পাইলটকে বলো বিমানের নাক ঘুরিয়ে নিতে। সন্ধ্যা নামার আগে টোকিওতে অবতরণ করতে চাই আমি।'

শেইচানের দিকে ঝুঁকে এলেন কিন। 'ওরা কি হাল ছেড়ে দিচ্ছে নাকি!'

'এছাড়া আর উপায় কী!'

তেতে উঠল ভালিয়া। 'আর একটা কথা মুখ থেকে বের হয়েছে তো জ্যান্ত পুঁতে ফেলব দু'জনকে।'

শ্রাগ করল শেইচান। 'তোমার কথায় ভুল ছিল।'

'কোন কথা?'

'ওই যে বলেছিলে, একটা গেল... আর দুটো বাকি।' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল সাবেক আততায়ী। 'আদতে গণনাটা হবে-শূন্য।'

আর থাকতে পারল না ভালিয়া। থাপ্পড় বসাল শেইচানের মুখে।

পিছিয়ে গিয়ে হালে বাড়ি খেল শেইচান। ঠোঁটে রক্তের স্বাদ। চিনচিনে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে মুখে। কিন্তু শরীরের অন্যান্য অংশের ব্যথার তুলনায় এটা কিছুই না। রক্তভেজা ঠোঁটে হাসল সে।

রেগেমেগে ফ্লাইট ডেকের দিকে রওয়ানা হলো ভালিয়া।

শেইচান হেসেই চলেছে। জানে, নিচের আবর্জনার স্তূপ থেকে উঠে আসবে প্রতিশোধের আগুন।

ওখানে যে লুকিয়ে আছে তার সন্তানের বাবা!

সকাল ৮:২২

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' কোয়ালস্কি জানতে চাইল।

পেরিস্কোপ থেকে চোখ সরাল গ্রে। হামলাকারীদের নাম-নিশানা মিটে যাওয়ার পরও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে সে। তারপর সাহস করে সাগরতলে তুলেছে পেরিস্কোপ।

'আকাশ পরিষ্কার,' জবাব দিল সিগমা কমান্ডার। 'রেডিও অ্যান্টেনা তোলা যাক এবার।'

পালু আর মাকাইও, দু'জনেই চিন্তিত চোখে তাকিয়ে আছে তাদের জ্ঞাতি ভাই টুয়ার দিকে। কাঁপছে লোকটা। অবস্থা ভালো না। রক্ত হারিয়েছে প্রচুর। বিবর্ণ হয়ে এসেছে গায়ের রঙ। বাকি কাজ সেরেছে আতঙ্ক আর ভয়।

কম্বল গায়ে জড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে কোয়ালস্কি। আইকো তার পাশেই।

'এদের তো মিডওয়ের হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কিন্তু তারপর আমরা যাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল জাপানিজ।

গ্রে মনে মনে গন্তব্য ঠিক করে নিয়েছে আগেই। আইকোর উপর স্থির হলো তার শীতল দৃষ্টি।

'যুদ্ধে।'

অধ্যায় উনত্রিশ

৯ মে, ভোর ৫:০৫
ফুজিকাওয়াগুচিকো, জাপান

'আমি দুঃখিত, জোনিন ইতো।'

টেবিলের উপর উবু হয়ে আছেন তাকাশি। টেবিলের নিচে রাখা কয়লার আগুনের আরামদায়ক উষ্ণতা এখন আর অনুভূত হচ্ছে না। সিদ্ধ বাদামী চালের ভাতের সাথে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে সকালের চা। এক মুহূর্ত আগে ল্যাপটপে ভাসতে থাকা রাশিয়ানের কথা যেন ছুরি বসিয়েছে তার হৃৎপিণ্ডে।

আপনার নাতিকে খুন করেছে ওই নরাধম।

কথাটা হজম করার জন্য নিজেকে সময় দিচ্ছেন তাকাশি। এই ফাঁকে গত রাতে হওয়ার হামলার ব্যাপারে তাকে সব খুলে বলল ভালিয়া। কীভাবে দ্বীপে এসে হাজির হয় কেইজের ধ্বংসের সাথে জড়িত ওই দু'জন... তাদের সাথে লড়ার সময় কতখানি সাহসের পরিচয় দেয় মাসাহিরো... তারপর কীভাবে যুবক লোকটার হাতে মারা যায়।

কিন্তু তাকাশি কথাগুলো কানে নিলেন না। বিবরণে আর কিছু যায়-আসে না। ফলাফলটাই গুরুত্বপূর্ণ।

এর আগেও বেশ কয়েকবার নিজেকে বলা কথাটা মনে মনে পুনরাবৃত্তি করলেন বৃদ্ধ।

আমি কি অভিশপ্ত?

স্ত্রী মিয়ুকে হারিয়েছেন টানেলে গোলাগুলির সময়... আঁধারের গহীন নিরুদ্দেশে। তার কয়েক বছর পর, একমাত্র ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় তার পরবর্তী স্ত্রী। কষ্ট বুকে চেপে তাকাশি ছেলের নাম রাখেন আকিহিকো। শব্দটার অর্থ হচ্ছে 'দীপ্ত রাজপুত্র'।

ভেবেছিলেন পোড়া কপাল নিয়ে পৃথিবীতে আসা বাচ্চাটার ভাগ্যের দুর্ভোগ হয়তো নামের বদৌলতে কেটে যাবে। তারপরের বেশ কিছু বছর কাটে শান্তিতেই। মা এবং বাবা-দু'জনের আদরে ছেলেকে বড় করেন তাকাশি। এক সময় বিয়ে করে

আকিহিতো। ঘর আলো করে আসে এক সন্তান। কিন্তু কে জানত, পরিবারটার ভাগ্যে সেটাই ছিল সর্বশেষ সুখ!

এক বছর পর স্ত্রী-সমেত গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় আকিহিতো।

আবারও মনের দুঃখ মনে রেখে, আরেকটা বাচ্চা লালন-পালনের দায়িত্ব মাথায় তুলে নেন তাকাশি। কোলে-পিঠে করে মানুষ করেন নাতি মাসাহিরোকে। কিন্তু সবসময়ই তার মনে একটা খেদ ছিল। কেন যেন নাতির সাথে নিজেকে সেভাবে বন্ধনে বাঁধতে পারেননি।

তবে তাই বলে ভালবাসায় কিন্তু কমতি থাকেনি।

অবশেষে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন তাকাশি। চুমুক দিলেন কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে।

প্রতিদিন ভোর চারটায় তার ঘুম ভাঙে। তারপর চা হাতে নিয়ে সূর্যোদয় দেখেন। মেডিটেশনের মাধ্যমে গোটা দিনের জন্য প্রস্তুত করেন নিজেকে। আজকেও তাই করেছেন। বসন্তের সকালটা বেশ ঠাণ্ডা। ফুজি পাহাড়ের বরফে প্রতিফলিত হচ্ছে ভোরের সূর্য। যেন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে শীতলতায়।

শব্দ দুটো তাকাশির হৃদয়ে শিহরণ জাগাল।

বরফ এবং আগুন।

রক্তে আগুন জ্বলতে থাকা সত্ত্বেও মন শান্ত রাখছেন বৃদ্ধ। কাপ ঠোঁটে ধরা অবস্থাতেই মুখ খুললেন। 'ওই পশু... আমার নাতিকে যে খুন করেছে, সে কোথায়?'

'জানি না,' জবাব দিল ভালিয়া।

বুকে জ্বলতে থাকা আগুনের খানিকটা দু'চোখে প্রতিফলিত হতে দিলেন তাকাশি, যেন ভিডিও কলের ওপ্রান্তে থাকা রাশিয়ান মেয়েটাও দেখতে পায়।

কাজ হলো এতে। আলতো করে মাথা নাড়ল রাশিয়ান। 'তবে কোথায় আসবে, জানি। ওর বান্ধবী এখন আমার জিম্মায়... সেই সাথে অনাগত সন্তানও।'

হাতের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন তাকাশি। মিয়ুর ছবি মনে ভেসে উঠেছে। হাসছে মেয়েটা। ঠোঁট রেখেছে তার ঠোঁটে। 'তাহলে সে ওদের নিতে আসবে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ভালিয়া। 'মেয়েটা আবার অসুস্থ। হাওয়াইতে মাসাহিরোর ছাড়া ওই পোকা দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে।'

সোজা হয়ে বসলেন তাকাশি। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠছে মন।

ভালিয়ার কথা এখনও শেষ হয়নি। 'অর্থাৎ, বান্ধবী আর সন্তানের পাশাপাশি অসুখের প্রতিকার খোঁজাও লোকটার একটা উদ্দেশ্য।'

'পাবে না,' কাপের হাতল স্পর্শ করে জবাব দিলেন তাকাশি। কথাটা এমনকি মাসাহিরোকেও এতদিন বলেননি তিনি। বহু বছর গবেষণা করে কোন ফল আসেনি।

'এ রোগের কোন প্রতিকার নেই।'

পঞ্চম পর্ব

গুটিপোকা

Σ

অধ্যায় ত্রিশ

৯ মে, রাত ১২:০৮
ওয়াইলিযকা, পোল্যান্ড

'এসব মধ্যযুগীয় ভবনে ঘোরাফেরা করতে হলে বরং-' মঙ্ক বলল, 'আমি লোহা দিয়ে একটা বর্ম বানিয়ে নিই।'

হেসে ফেলল ক্যাট। মুঠো পাকিয়ে স্বামিকে ঘুসি দেখাল কৌতুকের ছলে। ছোটোখাট একটা রিসার্চ লাইব্রেরীতে বসে আছে ওরা। ঘরটার অবস্থান তেরো শতকের একটা ভবনের উত্তরদিকের টাওয়ারে। টেবিলের চারদিকে গজিয়ে রেখেছে উঁচু উঁচু বুকশেলফ। যেন চেয়ারে বসা লোকগুলোর ঘাড়ের উপর দিয়ে টেবিলে রাখা মানচিত্রে উঁকি দিচ্ছে।

ক্লান্ত চোখদুটো ডলে নিল ক্যাট।

সময় মধ্যরাত... ঘুম হয়নি কারো। গেডানস্কের কাজ সেরে, বাল্টিক উপকুল ছেড়ে পোল্যান্ডে এসে উপস্থিত হয়েছে দলটা। ক্রাকোভে অবতরণ করেছে চার ঘণ্টা আগে। বিমানে থাকাকালীন ওয়াইলিযকা লবণ খনির সাথে যোগাযোগ করেছেন ড. ডেমিয়েন স্লাস্কি। গোলকধাঁধাটা বন্ধ হওয়ার পর ভেতরে ঢোকার অনুমতিও জোগাড় করা গেছে।

মজার ব্যাপার হলো, এরকম আবেদনের ক্ষেত্রে তারাই একমাত্র প্রথম না। স্লাস্কি জানতে পেরেছেন, খনির ভূগর্ভস্থ একটা চেম্বার-চ্যাপেল অফ সেইন্ট কিঙ্গা-ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভাড়া করা হয়েছে। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত কিছু না। প্রতি রবিবার ওখানে চার্চের আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ভাড়াও দেয়া হয় বিয়ে, কনসার্ট ইত্যাদি ধরণের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্যও।

আজকের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জানতে পেরে স্লাস্কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ব্যাপারটা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য প্রথমে ক্যাট এই কথার বিরোধিতা করে। এমন সময়ে দেরি করা ঠিক হবে না। তাকে প্রবোধ দিতে কিছুক্ষণ আলোচনা করার প্রস্তাব দেন স্লাস্কি।

ক্যাট ব্যাপারটার গুরুত্ব এখন উপলব্ধি করতে পারছে।

ক্রাকভে অবতরণের পর, মাইন কমপ্লেক্সে পৌঁছাতে বিশ মিনিট সময় লেগেছে। সরাসরি টুরিস্ট অফিসে যাওয়ার বদলে স্লাস্কি তাদের নিয়ে এসেছেন শহরের ঐতিহাসিক জাদুঘরে। শত শত বছর ধরে খনির ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে মধ্যযুগীয় এই 'দ্য মিউযেয়াম যুপ ক্রাকভস্কিচ ওয়াইলিযকা'। শুধুমাত্র ওয়ালিযকা খনিই নয়, পার্শ্ববর্তী বসনিয়া লবণ খনিরও দেখভাল করে ক্যাসেল।

তৎকালীন সময়ে লবণ ব্যবসার খুব কদর ছিল। স্লাস্কির হিসাব অনুযায়ী, পোলিশ সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ খাজনা আসত এসব লবণ খনি থেকে। বেতনের ইংরেজি সমার্থক শব্দ স্যালারি-র আগমন ঘটে ল্যাটিন স্যালারিয়াম শব্দটা থেকে, যার অর্থ ছিল- একজন সৈনিকের লবণ কিনতে যে অর্থ ব্যয় হত, তার পরিমান।

টেবিলে ছড়ানো মানচিত্র আর চার্টের উপর ক্যাটের নজর স্থির হলো। এদের মধ্যে কিছু আছে একেবারে খনির উৎপত্তির সময়কার। মিউজিয়াম থেকে এগুলো যোগাড় করে এনেছেন স্লাস্কি। প্রায় চার হাজারের মতো মানচিত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। স্লাস্কি নিজের মিউজিয়ামের অ্যাম্বার বিষয়ক পড়াশোনাও এখানে বসেই সারতেন।

'নতুন একটা জিনিস দেখাচ্ছে,' বলে একটা মানচিত্র টেনে নিলেন ডক্টর। 'এটা আমার বন্ধু মারিউশ শেলেরিউইচ-এর আঁকা। লবণ খনির অভ্যন্তরে কি কি আছে, এটা দেখলে খানিকটা পরিষ্কার ধারণা পাবেন।'

কমপ্লেক্সের গভীরে ছড়ানো গোলকধাঁধার দিকে নজর দিল ক্যাট। চশমা চোখে চেপে সামনের দিকে ঝুঁকলেন ইলেনাও। পরিশ্রান্ত লাইব্রেরিয়ানের হাবভাবে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। চোখের তারায় ঝিলিক দিচ্ছে অজানাকে জানার আগ্রহ।

স্যামের অবস্থা পুরোপুরি বিপরীত। টেবিলের উল্টোদিকে বসে আছেন তিনি, ঘুম দূরে সরিয়ে রাখতে যেন যুদ্ধ করছেন নিজের সাথে। পতঙ্গবিদ হিসেবে এসব ঐতিহাসিক ব্যাপারস্যাপারে তার আগ্রহ কম।

মানচিত্রে আঙুল রাখলেন ইলেনা। 'মনে হচ্ছে, এখানে হারিয়ে যাওয়া খুবই সহজ!'

'অবশ্যই,' স্লাস্কি সায় দিলেন। 'আর এই চার্টে শুধুমাত্র খনির উপরের একশো মিটারের মতো অংশ দেখানো হয়েছে। শুধুমাত্র এই জায়গাগুলোতেই টুরিস্টদের ঘোরাফেরা করার অনুমতি আছে। নিচের অংশটুকু আয়তনে এর তিনগুণ বড়।'

বিস্ময়সূচক আওয়াজ করলেন ইলেনা। 'তার মানে প্রায় এক হাজার ফুট।'

স্লাস্কির পরের কথাটা তাকে আরও অবাক করল। 'এছাড়াও ভূমিধ্বস আর বন্যায় খনির বেশ কিছু জায়গা এখন পরিত্যক্ত।'

'বন্যা?' ভ্রূকুটি করল ক্যাট।

সায় দিলেন ডক্টর। 'নিচের দিকে খুঁড়তে খুঁড়তে পানির স্তর অতিক্রম করেছে খনিটা। নিচের দিকে বেশিরভাগ জায়গাই ছোট-বড় লেক আর পুলে ভর্তি।'

ইলেনার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল ক্যাট।

একের পর এক ঝামেল বেড়েই চলেছে...

স্লাস্কির কথা এখনও শেষ হয়নি। 'খনির টুরিস্ট রুট চার কিলোমিটার গভীর। কিন্তু এই চার কিলোমিটারে থাকা টানেলের মোট দৈর্ঘ্য হিসেব করলে দাঁড়াবে চারশো কিলোমিটার। যা কিনা পুরো খনির একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মঙ্ক। 'কপালের নাম গোপাল!'

হতাশায় মাথা নাড়লেন ইলেনাও। 'তাহলে এত বিশাল জায়গায় আমরা স্মিথসনের ওই নিদর্শনের উৎস খুঁজব কীভাবে?'

কিন্তু ক্যাট হাল ছাড়তে নারাজ। 'মোট কতগুলো চেম্বার হবে?'

'দুই হাজারের বেশি।'

চোখ বন্ধ করল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। কি যেন একটা মাথায় আসছে, কিন্তু মুখে আসতে চাইছে না। গেডানস্কেও একই রকম অনুভূতি হয়েছিল।

মানচিত্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন স্লাস্কি। 'দেখতেই পাচ্ছেন, প্রতিটা টানেল এবং রুমের আলাদা আলাদা নাম্বার অথবা নাম দেয়া আছে। শুধু যদি স্মিথসন সাহেব একটা মাত্র নিশানা রেখে যেতেন...'

সাথে সাথে সোজা হয়ে বসল ক্যাট। এতক্ষণে মাথায় এসেছে ব্যাপারটা। স্যাটেলাইট ফোন বের করে পেইন্টারের পাঠানো স্মিথসনের কবরের ছবিটা বের করল তারপর। একটা সরিসৃপ, পাথর আর মথের ছবি খোদাই করা আছে ওখানে।

ক্রাকভে আসতে আসতে এগুলোর পাশে থাকা ঝিনুকের খোলসের মাহাত্ম্য অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিল ক্যাট। স্মিথসন জিনিসটা ওখানে খোদাই করানোর পেছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল। ব্যাপারটা শুকিয়ে যাওয়া টেথিস সাগরের সাথে মিলে যায়। খনিটা ওই সাগরের জায়গাতেই অবস্থিত। বিলুপ্ত একটা সাগরের চিহ্ন হিসেবে ঝিনুকের খোল...

স্লাস্কির বলা নাম এবং সংখ্যায় চিহ্নিত চেম্বারের ব্যাপারটা আরেকটা সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে। দুই হাজারেরও বেশি ঘর আছে খনিতে। সেই সাথে স্মিথসনের কবরফলকে মারাত্মক একটা ভুল...

ফলকের ছবিটা বের করল ক্যাট।

জেমস স্মিথসনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে,
লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য,
মৃত্যুবরণ করেন জেনোয়াতে,
২৬ জুন, ১৮২৯ সালে,
পঁচাত্তর বছর বয়সে।

'এটা দেখুন,' ছবিটা সবাইকে দেখাল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। ইঙ্গিত করছে শেষ তিনটা লাইনের দিকে। 'মৃত্যুবরণ করেন জেনোয়াতে... ২৬ জুন, ১৮২৯ সালে... পঁচাত্তর বছর বয়সে।'

'তো?' স্যাম জানতে চাইলেন।

ইলেনা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন। 'এখানে তো ভুল তথ্য দেয়া। যতদূর জানি, জেমস স্মিথসন জন্মগ্রহণ করেন ৫ জুন, ১৭৬৫ সালে।'

মঙ্ক মনে মনে হিসাব করল। 'তার মানে, মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল চৌষট্টি বছর... পঁচাত্তর নয়।'

ভ্রূকুটি করলেন স্যাম। 'তো এই এগারো বছর কোথায় হাপিশ হলো?'

'ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, স্মিথসনের ভাতিজা ভুল করে চাচার কবরে এই তারিখ লিখেছিলেন। কিন্তু আদৌ যদি ব্যাপারটা ভুল না হয়? যদি ঝিনুক, সরিসৃপ, পাথর আর মথের মতো এই লেখাটাও স্মিথসনের আদেশেই ঘটে থাকে?'

'নিশানা হিসেবে,' সায় দিল মঙ্ক।

স্লাস্কির দিকে ফিরল ক্যাট। 'খনিটা বন্ধ হওয়ার সময় ওখানে দু'হাজার পর্যন্ত চেম্বার গণনা করা হয়। আমার ধারণা- স্মিথসন যখন এখানে আসেন, তখন খননকৃত চেম্বারের সংখ্যা দু'হাজারের আশেপাশেই ছিল।'

'ঠিকই ধরেছেন আপনি।'

এবার মঙ্কের কাছে সব পরিষ্কার। 'তো ক্যাট, তুমি বলছ-স্মিথসন নির্দিষ্ট চেম্বারের চিহ্নিতকারী সংখ্যাটা তার কবরে লিখে রাখার ব্যবস্থা করে গেছেন। যেখান থেকে তিনি ওই নিদর্শনটা খুঁজে পান।'

সায় দিল মেয়েটা। 'তার মৃত্যুর তারিখ থেকে পঁচাত্তর বাদ দিলে আমরা পাই ১৭৫৪, যা কিনা তার জন্মতারিখ ছিল না। অন্তত এই একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।'

সমর্থন করলেন ইলেনা। 'হতে পারে এটা সেই ঘর অথবা টানেলের নাম্বার।'

সবাই একযোগে তাকাল স্লাস্কির দিকে।

'১৭৫৪ নাম্বার চেম্বারের কোন ছবি দেখাতে পারবেন?'

'অবশ্যই,' ল্যাপটপের দিকে ঝুঁকলেন গবেষক। 'আমার কাছে সমস্ত তথ্য তালিকা করা আছে। এক মুহূর্ত সময় লাগবে শুধু।' বলে ল্যাপটপের পর্দায় একটা ছবি ফুটিয়ে তুললেন।

'এটা তো আগেও দেখিয়েছেন,' ইলেনা বললেন। 'গেডানস্কে।'

'হ্যাঁ। এটা উইলেম হন্ডিয়াসের আঁকা সেই মানচিত্রে ছিল। এটাই ১৭৫৪ নাম্বার চেম্বার।'
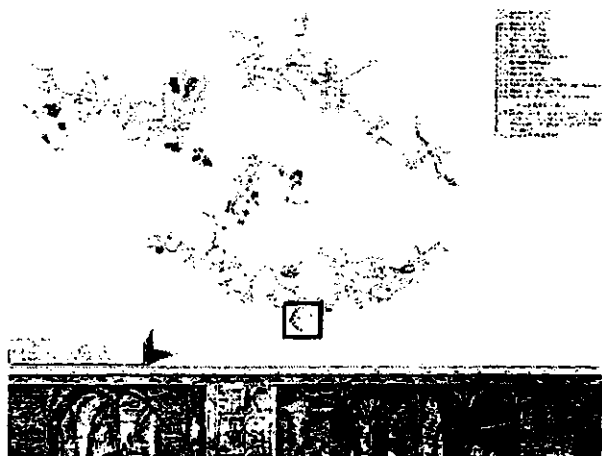
মানচিত্রের মার্জিনে লেখা নোটগুলোর দিকে ঝুঁকলেন স্লাস্কি। 'খনির এই অংশটার একটা নামও আছে দেখতে পাচ্ছি।'

‘কি নাম?’

‘কাপলিকা মাযলি... শব্দ দুটো পোলিশ। অর্থ হচ্ছে-ঝিনুকের চ্যাপেল।’

শিউরে উঠল ক্যাট। স্মিথসনের কবরে আঁকা নিশানার সাথে মিলে যাচ্ছে।

মানচিত্রে আঁকা অংশটা জুম করলেন ডক্টর। ‘এই নামের একটা কারণ আছে।’
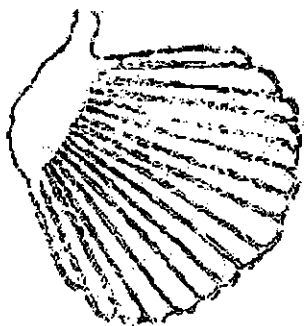
বড় একটা অংশ থেকে ঝিনুকের খোলসের মতো সামনের দিকে ছড়িয়েছে কতগুলো টানেল।

‘এটাই সেই জায়গা,’ ক্যাট বিড়বিড় করে বলল।

স্যামকে অবশ্য অতটা নিশ্চিত দেখাচ্ছে না। ‘টানেলগুলো এভাবে খোদাই করা হলো কেন?’

শ্রাগ করলেন স্লাস্কি। ‘গেলেই বোঝা যাবে।’

‘তাহলে চলুন যাই,’ বলে ঘড়ির দিকে তাকাল ক্যাট। ‘একটা বেজে গেছে। অনুষ্ঠান শেষ সম্ভবত।’

হাত তুলে তাকে থামালেন স্লাস্কি। ‘তার আগে সতর্ক হোন সবাই। ঝিনুকের এই চ্যাপেল হয়তো ছবিতে খুব ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে... কিন্তু আদতে জায়গাটা বিশাল। বেশ কয়েক কিলোমিটার হবে। আর বন্যা এবং ধ্বসের ফলে কিছু জায়গা পুরোপুরি পরিত্যক্ত। বিশাল লেকও থাকতে পারে।’

‘তবুও যেতে হবে,’ জোর দিল ক্যাট।

সায় দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই।

কিছুক্ষণ পর দলটাকে পার্শ্ববর্তী পার্কের গাছের ফাঁক দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে সামনের লাল টালি ছাওয়া হলদে ভবনটা। উপরে একটা লম্বা টাওয়ার। মাথায় থাকা স্টিলের লম্বা ফ্রেম ঝুলে আছে দানিলোউইশ শাফটের উপর। ওখান থেকে খনির গভীরে ঢোকানো হয়েছে জিনিসটা।

পার্কটা বেশ ঠাণ্ডা। সবাইকে জ্যাকেট পরে নিতে হয়েছে। পেছনে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে ক্যাট। গেডনস্কের অনুসরণকারীদের কাউকে এখানে আর দেখা যায়নি। তাছাড়া তাদের পোল্যান্ডে আসার ব্যাপারটা শুধুমাত্র পেইন্টার আর জেসন জানে। ডিরেক্টরকে কথাটা এমনকি ইউএস ইন্টেলিজেন্সের কাছেও চেপে যেতে অনুরোধ করেছে সে।

হয়তো এভাবেই ফেউ খসানো গিয়েছে।

তবুও সতর্কতায় ঢিল দেয়নি ক্যাট। ফোনে হাওয়াইয়ের বর্তমান পরিস্থিতি পেইন্টার তাকে জানিয়েছেন। আপাতকালীন উদ্ধার অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিমান এবং নৌপথে ওই এলাকার লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হবে। কাজ শুরু হবে আজই। শুনতে যেমন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি জটিল। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

স্ত্রী-র দুশ্চিন্তার কারণ উপলব্ধি করতে পারছে মঙ্ক। 'যদি আসলেই কোন প্রতিকার থাকে, আমরা অবশ্যই সেটা খুঁজে বের করব।'

অবশ্যই করব... খুব তাড়াতাড়ি।

অধ্যায় একত্রিশ

৯ মে, সকাল ৮:১০
ফুজিকাওয়াগুচিকো, জাপান

এটাই সেই জায়গা...

ব্যাথার তীব্রতা উপেক্ষা করে গন্তব্যের দিকে চোখ রেখেছে শেইচান। ফুজি বেল ২০৪-বি হেলিকপ্টারের পেছনে বসে আছে এখন। সামনে দেখা যাচ্ছে ফুজি পাহাড়ের বরফঢাকা গা। নিচে একটা লেক।

লেক কাওয়াগুচিকো-চিনতে পারল সাবেক আততায়ী। এর তীরই আপাতত তাদের গন্তব্য। শহরটার নাম মনে আসছে না যদিও। অবশ্য হেলিকপ্টার রোটরের তীব্র আওয়াজ মন দিয়ে ভাবতেও দিচ্ছে না।

শহর থেকে বেরিয়ে পেছনের পাহাড়-চূড়ার দিকে এগিয়েছে একটা কেবল কারের লাইন। উপর থেকে সাংঘাতিক সুন্দর দৃশ্য দেখা যাওয়ার কথা। একই পাহাড়ের ঢালে গাছের মাথা ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে বহুতল বিশিষ্ট প্যাগোডা। কাচের দেয়ালে প্রতিফলন ঘটাচ্ছে সূর্যরশ্মির। যেন কাঠামোটা একই সাথে আগুন আর বরফের তৈরি।

হেলিকপ্টারের গতিপথ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটাই বাহনটার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। আশেপাশে দৃষ্টি বুলালো শেইচান। প্যাগোডার চারদিকে বেশ কিছু ভবন আছে। কোনটাই দুই তলার বেশি উচ্চতার হবে না। যেন মাথা নত কুর্নিশ করছে মধ্যমণি প্যাগোডাটাকে।

হেলিপ্যাডের উপর বৃত্ত রচনা করছে যান্ত্রিক ফড়িং। পেছনে একটা বাগান, জাপানিজ প্রথাগত সাজসজ্জা। খাঁড়ি আছে, ছোট আকারের জলপ্রপাত আছে। আছে পদ্মফুল ঢাকা পুকুর। মাঝে একটা দ্বীপ। পাড়ের সাথে ছোট্ট ভূখণ্ডটার সংযোগ ঘটিয়েছে কাঠের তৈরি ব্রিজ। দ্বীপের মাঝে লিলিপুট আকারের টি-হাউজ। বাগানের অন্যান্য অংশের সৌন্দর্যবর্ধন করছে ম্যাপল, চেরি আর পাম গাছ। বাঁশও বাদ যায়নি। এক কোনায় পাথরের বেদির উপর আছে কিছু বনসাই।

জায়গাটার স্নিগ্ধতা শেইচানকে মোহনীয় করল। তবে বাস্তবতা তাতে বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। এখনও ফাটা ঠোঁটে লেগে আছে রক্তের স্বাদ। ভালিয়া পাইলটের সাথে

সামনে বসা। পাঁচ ঘণ্টা ভ্রমণে তাকে আর বিরক্ত করতে আসেনি রাশিয়ান। ভালোই হয়েছে। খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পেরেছে শেইচান। জাপানে ঢোকার পর, টোকিও থেকে এখানে আসতে সময় লেগেছে মাত্র বিশ মিনিট।

পাশের সিটে বসে শেইচানের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন কিন মাতসুই। আক্রান্ত হওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এতক্ষণে হাজার হাজার লার্ভা পরিণত হয়েছে দ্বিতীয় ইনস্টারে। আরও চব্বিশ ঘণ্টায় তৃতীয় ইনস্টার হওয়ার পর শুরু হবে আসল যন্ত্রণা। শেইচানের অস্থি-মজ্জায় ঢুকিয়ে দেবে নিজেদের জেনেটিক ক্লোন।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা...

অবতরনের ঠিক আগমুহূর্তে এক পশলা বাতাস বাহনটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। সাথে সাথে যেন ডাকে সাড়া দিল শেইচানের দেহমধ্যস্থ লার্ভার দল। ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে গেল মেয়েটার সারা গায়ে। জ্ঞান হারাল সাথে সাথে।

চেতনা অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরই ফিরল। খেয়াল করল, একটা স্ট্রেচারে শুয়ে আছে। বৃষ্টির ফোঁটার সাথে মাথার উপর আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। অনাগত ঝড়কে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে শীতল বাতাস।

র‍্যাম্প বেয়ে একটা ভূগর্ভস্থ টানেলে নিয়ে আসা হলো শেইচানকে। সিলিং-এ জ্বলছে উজ্জ্বল ফ্লোরোসেন্ট বাতি... ঠিক যেন তার অন্তরাত্মার মতো। গাল বেয়ে পানির ধারা নামল।

মন অন্যদিকে সরানোর চেষ্টা করল শেইচান। খেয়াল করতে লাগল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। সম্ভবত ওই প্যাগোডার দিকে। কিনের কণ্ঠ কানে এল তারপর।

'ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শেইচান। তার স্ট্রেচার বামদিকে মোড় নিচ্ছে। কিনের হাত ধরে তাকে ডানে নিয়ে যাচ্ছে ভালিয়া। আলাদা করে ফেলা হচ্ছে ওদের।

'মেডিকেল ওয়ার্ডে,' ভালিয়া জবাব দিল। 'গর্ভের অবস্থা চেকআপের জন্য। আমাদের জন্য ও খুব মূল্যবান গিনিপিগ এখন।'

আবারও ফিরে এল ব্যথার ধাক্কা। সেই সাথে আছে তীব্র ভয়। নিজের জন্য না... অনাগত সন্তানের জন্য। এ মুহূর্তে শেইচান নিজেও চায়, তার চেকআপ হোক।

বাচ্চাটা এখনও জীবিত আছে তো?

উত্তরটা জানতেই হবে।

স্ট্রেচার লিফটে তোলার সময় আবারও জ্ঞান হারাল সাবেক আততায়ী।

চেতনা ফেরার পর বুঝতে পারল না কোথায় আছে... কতক্ষণ সময় পেরিয়েছে। দেখা গেল, একটা হাসপাতালের বেডে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ফ্রেমের সাথে হাত-পা বাঁধা। কাপড় পাল্টে গাউন পরানো হয়েছে। ওটাও আপাতত বুক পর্যন্ত গোটানো।

সার্জিক্যাল মুখোশে মুখ ঢাকা একজোড়া ডাক্তার-নার্স বেডের পাশে দাঁড়ানো। তার পেটে বরফের মতো শীতল কিছু একটা মালিশ করছে নার্স। সম্ভবত এই অনুভূতিই জ্ঞান ফেরার কারণ। ডাক্তারের হাতে আল্ট্রাসাউন্ডের রড ধরা।

'আহ... মনে হচ্ছে আমাদের রোগীর জ্ঞান ফিরেছে,' বলে উঠল লোকটা। 'দ্বিতীয় লেভেলের ব্যথার ধকল কোন ধরণের ওষুধ ছাড়াই সামলে নিয়েছে ও।'

শেইচান প্রশংসাটা গায়ে মাখল না। ভালো করে তাকাল ডাক্তারের দিকে। লোকটা বেঁটে। নাকের নিচে চিকন গোঁফের সারি। এক থাপ্পড়ে দুইবার অজ্ঞান করতে পারবে ও। অবশ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীতে এই লোকটাকেই তার সবচেয়ে বেশি দরকার। প্রশ্নের উত্তরটা জানতে হবে।

'ফেনটানাইল দেব নাকি?' জানতে চাইল নার্স। 'রোগীর গায়ের তাপমাত্রা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। সম্ভবত ব্যথার প্রভাব।'

'আপাতত লাগবে না,' ডাক্তার জবাব দিল। 'এই অবস্থায় কোন ধরণের ওপিওয়েড দেয়া ঠিক হবে না। আগে দেখা যাক, ফলাফল পজিটিভ কি না।'

'ঠিক আছে, ডা. হামাদা।'

আল্ট্রাসাউন্ড রড হাতে ঝুঁকে এল লোকটা। 'ব্যথা লাগবে কিন্তু।'

'নিজের কাজ করুন,' শেইচান জর দিল।

'খুব ভালো,' বলে নার্সের দিকে ইঙ্গিত করল ডা. হামাদা। মহিলা একটা সুইচ চেপে মেশিন চালু করল।

প্রথমে পেটের উপর হালকা একটা চাপ অনুভব করল শেইচান। পরমুহূর্তে কুঁকড়ে গেল ব্যথায়। যেন আল্ট্রাসাউন্ড রড না, কেউ একটা ধারালো ছুরি দিয়ে তার পেট ফালা ফালা করে কাটছে। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা গলা ছেড়ে।

'লার্ভাগুলো শব্দ তরঙ্গের প্রতি সংবেদনশীল,' ডাক্তার বলল। 'তরঙ্গের গতিপথ থেকে পালানোর চেষ্টা করছে প্রাণীগুলো। ব্যথাটা এজন্যই।'

তবে এসব ব্যাখ্যা কানে নেয়ার মতো অবস্থা শেইচানের নেই।

'বিরতি দেব?' জানতে চাইল লোকটা।

জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শেইচান।

না...

অতএব পরীক্ষা জারি রাখল ডাক্তার। 'তবে তাই হোক।'

আরও কয়েক মুহূর্ত পর যেমনভাব এসেছিল, তেমনিভাবে উধাও হয়ে গেল পেটে জ্বলতে থাকা আগুন। বাতাসের জন্য খাবি খেতে শুরু করল শেইচান। চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করল-স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করে ডাক্তার ইশারা করছে। 'ওই যে আপনার বাচ্চার হৃৎস্পন্দন।'

এখনও বেঁচে আছে...

'আমরা জানি, দ্বিতীয় ইনস্টাররা পোষকের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো এড়িয়ে চলে। যেমন ধরুন হৃৎপিণ্ড, মগজ ইত্যাদি। বাচ্চাটার ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দনও এক্ষেত্রে উৎরে গেছে। অন্তন এখনকার মতো আর কি।'

'মানে?'

'তৃতীয় ইনস্টাররা কিন্তু এত দয়ালু না। একবার অস্থিমজ্জায় নিজেদের ক্রিপ্টোবায়োটিক ক্লোন ঢুকিয়ে দেয়া হলেই, ওরা আর পোষকের বাঁচা-মরার কথা চিন্তা করে না।'

একটা ঘড়ি চালু হয়ে গেল শেইচানের মাথার ভেতর।

চব্বিশ ঘন্টা...

আবারও জ্ঞান হারালো মেয়েটা। কিন্তু তার আগে ঠিকই কানে এসেছে ড. হামাদার বলা শেষ কথাগুলো।

'ভ্রূণটা অক্ষতই মনে হলো... আমাদের গবেষণার পরবর্তী ধাপে ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

সকাল ৮:৩২

ভূ-গর্ভস্থ ল্যাবটা ঘুরে দেখছেন প্রফেসর মাতসুই। জায়গাটা দেখতে অনেকটা তার করনেল ইউনিভার্সিটির ল্যাবের মতোই। শুধু আকারে বেশ বড় আর যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অনেক বেশি।

তার টুর গাইড-ড. ইউকিও ওশিরো-প্রফেসরের তুলনায় এক মাথা উঁচু। কিন্তু প্রস্থের দিক দিয়ে হাড় জিরজিরে। লোকটাকে দেখলে মাকড়শার কথা মনে পড়ে। তার প্রকাশিত পেপারেও অবশ্য মাকড়শার বিষ নিয়ে কাজ করেছে লোকটা।

'পেশীর পুষ্টির অভাব প্রতিহত করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে প্রথম দশার আয়ন-চ্যানেল ব্লকার নিয়ে কাজ শুরু করেছি,' বললেন ড. ওশিরো। 'এভাবে।'

এগোনোর ফাঁকে কর্মরত প্রতিটা বিজ্ঞানী এবং সহকারীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন তিনি। পাল্টা নড ফিরিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকে। চোখে সম্মানের দৃষ্টি।

'অন্যান্য ওষুধ নিয়েও গ্রুপ অনুযায়ী কাজ চলছে। আলফা টিমের কাজ ব্যথানাশক নিয়ে। বেট টিমের দায়িত্ব টিউমার-প্রতিরোধ, গামা গবেষণা চালাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশকের ব্যাপারে। এসব আসলে শুধুমাত্র তল স্পর্শ করার করার মতো। আসল গভীরতায় যাওয়া এখনও ঢের দেরি।'

'এসব যৌগের সবটাই ওই প্রাগৈতিহাসিক পোকা থেকে পাওয়া?'

সায় দিলেন ওশিরো। 'ওডোকুরো থেকে, আপনি যে নাম দিয়েছিলেন আর কি। তাকাশি ইতো আমাদের এই নামটাই ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। সম্ভবত তার চোখে বেশ সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়েছেন আপনি।'

কিন বুঝতে পারছেন, তাকে এখানে আনা হয়েছে প্রজেক্টে যোগদানের জন্য। ওশিরোর হাবভাবে শীতল একটা অনুভূতি আছে। হয়তো তাকে আগ্রহী করার ব্যাপারে লোকটাকে চাপ দেয়া হচ্ছে।

তবে ফ্যাসিলিটিটার তারিফ না করে পারলেন না কিন। নানা ধরণের যন্ত্রপাতিতে ঘরটা ভর্তি। এদের মধ্যে কিছু আবার তার একেবারে অপরিচিত।

কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলেন, জায়গাটা আসলে দুই ভাগে ভাগ করা। বোলতা থেকে পাওয়া বিষ নিয়ে কাজ করছে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ। নিজের জ্ঞান থেকে জানেন-বিষ আসলে হচ্ছে হাজারও রকমের ভিন্ন ভিন্ন কেমিক্যাল এবং অণুর মিশ্রণ।

এক ভাগ কাজ করছে বিষের প্রোটিন এবং পেপটাইড নিয়ে। যন্ত্রপাতির মধ্যে এখানে আছে ম্যাস স্পেকট্রোমিটার, বিশালাকায় জেল ইলেকট্রোফোরসিস মেশিন ইত্যাদি। শেষোক্তটা কাজে লাগে প্রোটিন আলাদা করার ক্ষেত্রে।

তবে অন্য অংশের যন্ত্রপাতির ব্যাপারটা এখনও ধোঁয়াশায় ঘেরা।

ওশিরো হয়তো কথাটা ধরতে পেরেছেন। 'ওদিকে ফ্লো-সাইটোমেট্রি নিয়ে গবেষণা করছে আলফা টিম। উদ্দেশ্যঃ ফেমটো আর পিকো-সেকেন্ড লেজারের মাধ্যমে সুবিধাজনক প্রোটিন সংশ্লেষ।'

'অসাধারণ!' তারিফ করলেন কিন।

'আর প্রয়োজনীয়ও। বুঝতেই পারছেন, কত সীমিত পরিমাণ নমুনা নিয়ে কাজ করতে হয়ে আমাদের।'

সায় দিলেন কিন। সাপ থেকে পাওয়া বিষ হয়, কমপক্ষে কয়েক ফোঁটা। আণুবীক্ষণিক দিক দিয়ে ভাবতে গেলে পরিমাণে প্রচুর। কিন্তু মাকড়শা বা বোলতার বিষ তো সেই তুলনায় অনেক গুণ কম।

ল্যাবের অন্য দিকে নজর দিলেন প্রফেসর। জিন নিয়ে কার-কারবার এদিকে। নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্সার দিয়ে বিষের ডিএনএ এবং আরএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে। জড়ো করা হচ্ছে প্রাপ্ত গাদা গাদা তথ্য-উপাত্ত।

গামা টিম একটা সিকোয়েন্সার নিয়ে ব্যস্ত। সেদিকে ইঙ্গিত করলেন কিন। 'আপনাদের হাতে দেখছি প্রচুর পরিমাণে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আছে। এখানে যে বিষ নিয়ে অ্যানালাইসিসে সাফল্য আসবেই, তাতে আর আশ্চর্যের কী!'

'তা ঠিক,' সায় দিলেন ওশিরো। 'কিন্তু তাই বলে আমরাও যে ব্যর্থ হই না, তা কিন্তু না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গামা টিম একটা আরএনএ ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে এর মধ্যস্থ জিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এটা কোন প্রোটিনকে সংশ্লেষিত করবে, তা এখনও বের করতে পারেনি।'

'মানে একটা ছায়া বন্দী করা... তবে আসলে ওটা কীসের ছায়া, তা খুঁজে না পাওয়া।'

'ঠিক তাই,' মুচকি হাসলেন ওশিরো। এজন্যই আমাদের এখানে দক্ষ কাউকে চাই।'

কিন ইতিমধ্যে উক্ত প্রোটিনের প্রকৃতি ভাবতে শুরু করেছেন। তবে মুখ ফুটে কিছু বললেন না। তাছাড়া মনে হচ্ছে, তাকে এই ল্যাবে কাজ করার জন্য পরোক্ষভাবে আমন্ত্রণ করছেন ওশিরো।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়াস পেলেন প্রফেসর। 'ওদিকটায় কী হচ্ছে?'

ঠোঁটে আঙুল চাপা দিলেন ওশিরো। 'ওটা আমাদের চিন্তার কিছু না। ড. হামাদা-এই গোটা ল্যাবের প্রধান, আমাদের ওদিকে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। শুধু জানি, ওডোকুরোর ইতিহাস সংক্রান্ত কাজ হয় ওখানে।'

'কেন?' ভ্রূকুটি করলেন কিন।

জবাব ওশিরো শুধু শ্রাগ করলেন। যার অর্থ-আমার কাজ না, তাই মাথা ঘামাই না।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিন জানেন, বৈজ্ঞানিকদের অযথা কৌতূহল প্রকাশ করার ফলাফল আদতে ভালো হয় না। কিন্তু তবুও যেন প্রশ্নটা আলোড়ন তুলেছে তার মাথার ভেতর।

লাল দরজার পেছনে হচ্ছেটা কী আসলে?

সকাল ৮:৩৫

নিজের অফিসে বসে, ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন তাকাশি। পর্দায় ভাসছে একটা মেয়ের ছবি। ক্লান্ত, ব্যথায় জর্জরিত। আপাতত অজ্ঞান। ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে। কপালে ঘামের বিন্দু।

তবে অসুস্থতা ছাপিয়েও মেয়েটার সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। চেহারায় এশিয়ান আর ইউরোপিয়ান গোত্রের মিশ্রণ। নিখুঁত ঠোঁট, প্রশস্ত চোয়াল আর কালো চুল যেন বারবার মিছুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

দরজায় নক হওয়ার শব্দে তাকাশির সম্বিত ফিরল। ঘরে প্রবেশ করল তার ব্যক্তিগত সহকারী। সাথে নিয়ে এসেছে ভ্যালেরিয়াকে। ফুজি পাহাড়ের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ের মতো হাজির হয়েছে যেন মেয়েটা।

'চুনিন মিখাইলভ,' নতুন পাওয়া পদমর্যাদা অনুসারে তাকে সম্বোধন করলেন তাকাশি। ইঙ্গিত করলেন ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। 'ওর বাচ্চাটা এখনও বেঁচে আছে?'

সায় দিল রাশিয়ান। 'হ্যাঁ। ডা. হামাদা গর্ভাবস্থার ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছেন।'

'খুব ভালো,' বলে আবারও স্ক্রিনের দিকে ফিরলেন বৃদ্ধ। মেয়েটাকে এখানে আনার চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছে তার নাতি মাসাহিরো। এর উপযুক্ত মূল্য চুকাতে হবে ওকে। কল্পনা করলেন, কী ঘটতে চলেছে বেচারির সাথে।

যুদ্ধের সময়, ঝংমা দুর্গে ইম্পেরিয়াল আর্মির রিসার্চ ক্যাম্পে গিয়েছিলেন তাকাশি। জোরপূর্বক তুলে আনা চাইনিজ গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরে বাচ্চা বের করে আনা হত। তাও কোন ধরণের ব্যথানাশক ছাড়াই। এখনও মেয়েগুলোর চিৎকার তার কানে বাজে। চোখ বুজলে দেখতে পান, কীভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগে রক্তাক্ত হাত দুটো বাড়িয়ে বাচ্চাদের খুঁজত তারা।

এই বীভৎসতা এতদিন কেইজের ভেতর সুপ্তাবস্থায় ছিল।

আবারও একে পুনর্জাগ্রত করব আমি, মনে মনে ভাবলেন তাকাশি।

'আর ওই আমেরিকান?'

'কোন খবর পাইনি,' ভালিয়া জবাব দিল। 'কিন্তু যদি বেঁচে থাকে, তাহলে অবশ্যই বান্ধবীকে নিতে আসবে।' এ পর্যন্ত বলে থামল রাশিয়ান। পরের কথাগুলো জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবছে।

তাকাশি মেয়েটার অস্বস্তি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। 'কী হলো?'

'আপনি তো বলেছেন, এই রোগের কোন উপশম নেই।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন বৃদ্ধ। 'তুমি ভাবছ, তাহলে কেন এমন একটা বিভীশিকা আমরা উন্মুক্ত করলাম, যার কোন প্রতিকার আমাদের হাতে নেই।'

'হ্যাঁ। জোনিন ইতো।'

'এটা কোন পাগলামি না। পুরোটাই সূক্ষ্ম হিসাবের ফলাফল।' তাকাশি বললেন। 'হাওয়াইতে আমরা যা করেছি, এটা মাত্র শুরু বলা যায়। বিশ্বকে ব্যাপারটার ভয়াবহতা জানান দিয়ে তারপর পরবর্তী ধাপের দিকে এগোব।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ভালিয়া। 'পরবর্তী ধাপ?'

'ইকিকাউও দ্বীপই আমাদের একমাত্র নাট্যমঞ্চ না। বাকি ক্ষেত্রগুলো আমার আদেশের অপেক্ষায় আছে। রাশিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়াসহ পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে দেয়া হবে এই ওডোকুরো। দুর্ভাগ্যবশত ব্রাজিলের উপকুলে থাকা এই দ্বীপে হামলায় দক্ষিণ আমেরিকার মজুদ বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিভীষিকা ছড়িয়ে যাবে সর্বত্র।'

বিস্ফারিত চোখে বৃদ্ধকে দেখছে ভালিয়া। 'আপনি তো পৃথিবী ধ্বংসের কথা বলছেন!'

'না,' মাথা নাড়লেন তাকাশি। 'ওই যে বললাম... সূক্ষ্ম হিসাব।'

'কীভাবে?'

'রোগের ক্ষেত্রে ওষুধ প্রদান একমাত্র সমাধান না। এতে এককালীন সাফল্য আসে। কিন্তু ওষুধকারী কোম্পানি চায় লাগাতার ফিরে আসুক অসুখ, যাতে নিজেরা বারবার লাভ করতে পারে।'

'আপনি ওই নীতি এখানে প্রয়োগ করছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন তাকাশি। ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'বিশ্বকে ধ্বংস নয়, তবে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসব আমি।'

'কিন্তু কীভাবে? যদি না এসবে কোন প্রতিকারই না থাকে!'

'হামলার এক বছর পর যখন গোটা পৃথিবীতে হাহাকার রব উঠবে, তখন উপশম নিয়ে হাজির হবে আমাদের কর্পোরেশন। আক্রান্তদের ক্ষেত্রে কোন প্রতিকার নেই, এটা ঠিক। কিন্তু পরিণত বয়সী বোলতাদের দমনের ক্ষেত্রে আমরা এক ধরণের স্প্রে তৈরি করেছি। জিনিসটা খুবই জটিল। নকল করা প্রায় দুরূহ। বিভীষিকাময় পৃথিবীতে আশার আলো হয়ে দেখা দেবে এই স্প্রে।'

এবার ব্যাপারটা ভালিয়ার মাথায় ঢুকেছে। 'বুঝতে পেরেছি। স্প্রে করা হলেও বিশ্ব ওডোকুরো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে না। আক্রান্তদের ভেতর থেকে আবারও উত্থান ঘটবে এদের।'

সায় দিলেন তাকাশি। 'এমন এক রোগ, যেটা দমন করা যায় না। শুধু খানিক সময় পিছিয়ে দেয়া যায়।

'অবশেষে জাপানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে গোটা বিশ্ব। বিশদভাবে বলতে গেলে, আপনার কর্পোরেশনের উপর।'

'আর যদি কেউ ঘাড়ত্যাড়ামো করে,' শ্রাগ করলেন বৃদ্ধ। 'আমরা ওই দেশে স্প্রে করা বন্ধ রাখব। যতদিন না ওরা আবার সোজা পথে আসে।'

'কিন্তু জাপানের কী হবে?'

'আমাদের চারদিকে সাগর ঘিরে রাখায় প্রাকৃতিক সুরক্ষা-ব্যবস্থা আছে। তবুও সংক্রমণ এড়াতে উপকূলে তাৎক্ষণিক স্প্রে-র ব্যবস্থা থাকবে। এক বছরের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করব আমরা। যারা জাপানকে পূজা করবে, তাদের পাশে দাঁড়াব... আর ধ্বংস করে দেব বিরোধীদের।'

মাথা ঝাঁকাল ভালিয়া। 'আর এসবই আপনি করবেন একটাও বুলেট খরচ না করে!'

হাসলেন তাকাশি। 'জীবনের এতগুলো বছরে অন্তত এটা বুঝেছি-অস্ত্র আর সেনাবাহিনী দিয়ে কিছু হয় না। এরা শুধু আসবে যাবে। আসল ক্ষমতা থাকে আবিষ্কারে, তলোয়ার বা বন্দুকের নলের মাথায় নয়।'

জানালার দিকে তাকাল ভালিয়া। বাইরে বয়ে চলা ঝড় যেন তার চোখেও প্রতিফলিত হচ্ছে।

অচিরেই গোটা বিশ্ব নুয়ে পড়বে আমাদের শক্তির সামনে...

অধ্যায় বত্রিশ

৯ মে, রাত ১:৪৪
ওয়াইলিযকা, পোল্যান্ড

'চলো যাই, লবণ খনি দেখে আসি!' আমুদে সুরে বলল মঙ্ক।

লাল রঙা বিশাল এলিভেটরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজে আঁতকে উঠলেন ইলেনা। নাক দিয়ে শ্বাস নেয়ার এবং মুখ দিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন তিনি, অপরা উইনফ্রের কাছ থেকে শিখেছেন এই ব্যায়াম।

সেই ছোটবেলা থেকেই, বদ্ধ জায়গা সহ্য করতে পারেন না তিনি। তার বাবা-মার বিশ্বাস ছিল, টিজুয়ানা থেকে স্যান ডিয়াগোতে আসার সময় টানেল ধরে এগোতে হয়েছিল বলেই এই অসুবিধা। সিনালোয়া কার্টেলের মাদক পরিবহণের পথ ছিল ওটা। সঠিক মূল্য চুকালে, পুরো একটা পরিবারকেও আমেরিকায় পৌঁছে দেয়া হত ওই পথে।

'কোন সমস্যা?' স্যাম জানতে চাইলেন, পৃথিবীর পেটে ঢুকে যাচ্ছে এলিভেটরটা। আস্তে করে মহিলার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

চশমার সাথে ঝুলতে থাকা ক্রুশ দুটোকে স্পর্শ করলেন ইলেনা, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। জোর করে নামিয়ে আনলেন হাত। 'নিজেকে বলছি, ভয় পেয়ো না। ভূ-গর্ভস্থ একটা লাইব্রেরীর বেযমেন্টে যাচ্ছ কেবল।'

'তাহলে তো বলতেই হয়, এই জায়গার বেযমেন্টটা একটু বেশিই গভীরে।' ক্লান্ত হাসি হেসে বললেন স্যাম।

অনুযোগের দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালেন লাইব্রেরীয়ান। যেন বলতে চাইলেন, তোমার কথায় উল্টো ফল হচ্ছে!

'দু:খিত,' বলে একহাত বাড়িয়ে দিলেন স্যাম। 'ধরে নিন ক্ষমা চাইছি।'

মানা করে দিতে চাইলেন ইলেনা; নিজেকে এমন মহিলা হিসেবে উপস্থাপন করতে চান না যে শক্তির জন্য কোন পুরুষের উপর নির্ভর করে!

ধুর ছাই!

হাতটা নিজের হাতে নিলেন মহিলা। শুষ্ক, উষ্ণ মনে হলো হাতটাকে। নির্ভরতা খুঁজে পেলেন যেন লোকটার হালকা চাপ দেয়ায়। লজ্জিত হতে চান না তিনি, এদিকে আবার ভয় লুকোবার চেষ্টাও করছেন না। দরকার হলে খনি ছেড়ে যাবেন।

খাঁচার ওপাশে, দুই প্রহরীর সাথে বসে আছে ক্যাট। খনিতে আসার পর, ডেমিয়েন স্লাস্কি ওদের সাথে খনির গণসংযোগ কর্মকর্তার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। যুবতী, স্বর্ণকেশী মেয়েটার নাম ক্লারা বারানস্কা। ডেমিয়েনের চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, প্রেমাহত বেচারা। ইলেনার ধারণা, শুধু গবেষণার জন্য বারবার জাদুঘরে আসত না লোকটা।

'ড. স্লাস্কি,' বলল ক্যাট। 'কিছুক্ষণ আগে বললেন, হন্ডিয়াসের মানচিত্রে দুটো অ্যাম্বারের সাইট আছে। ওদের কোনটা কি ঝিনুকের চ্যাপেলের কাছাকাছি অবস্থিত?'

ডেমিয়েনের উত্তরের প্রতি মন দিলেন ইলেনা, নিজেকে সামলাবার উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

'নাহ, তা নেই। দুটো সাইটই ছোট এবং মি. স্মিথসন ওখানে যাবার অনেক আগেই মজুদ শেষ হয়ে গিয়েছে।'

সায় দিল ক্লারা। 'এমন একটা আবিষ্কার হলে, কোন খনিই সেটাকে ফেলে দেবে না। অতীতেও দামী ছিল লবণ খনি। কিন্তু অ্যাম্বারের দাম ছিল আরও বেশি। আজও আছে। অ্যাম্বারের মোটামুটি মানের একটা ব্রেসলেট কেনার টাকায়, রোলেক্স ঘড়ি কেনা যায়!'

'এই দামের কারণেই,' স্লাস্কি যোগ করলেন। 'অনেক সাইটেই কৃষ্ণ-খননকারীরা লুটপাট চালিয়েছে।'

নিজেও হিসপ্যানিক মেয়ে বলে, বর্ণবাদী শব্দটা ইলেনার কানে লাগল। 'কৃষ্ণ-খননকারী মানে?'

কথা পরিষ্কার করে বললেন স্লাস্কি। 'এমন অনেক খননকারী আছে, যারা অন্য খনিতে লুটপাট চালায়। অনেকে আবার নিজের খনি থেকেই কিছু না কিছু চুরি করে। তারপর সেগুলো বিক্রি করে কালো বাজারে। সোজা কথায় চোরাকারবারি। সত্যি বলতে কি, আজকাল যে অ্যাম্বার বিক্রি হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশই চোরাই মাল।'

এলিভেটরের ঝাঁকি আলাপচারিতায় বাধা দিল। দরজা খুলে যাওয়া মাত্র, সুর ভেসে এল ভেতরে, বিষণ্ণ এবং গম্ভীর। সুরটা কানে আসা মাত্র কেঁপে উঠলেন ইলেনা। নাহ, খনির ভেতরের ষাট ডিগ্রী তাপমাত্রার জন্য না। কেমন যেন বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয় সুরটা, মনে হয় যেন কোন শেষকৃত্যানুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এলিভেটর থেকে বেরোতে বেরোতে, সুরটার সাধারণ একটা ব্যাখ্যা দিল ক্লারা। 'মধ্যরাতের অনুষ্ঠান সম্ভবত শেষ হলো এই মাত্র, আজ নাকি দেরি করে শুরু হয়েছে।'

স্ত্রীর উদ্দেশে হেসে, মেয়েটাকে অনুসরণ করল মঙ্ক। 'তাহলে তো মধ্যরাতের পরের অনুষ্ঠান বলতে হয়!'

ধাক্কা দিয়ে ওকে এগিয়ে দিল ক্যাট। এদিকে ইলেনাকে বলতে গেলে ধরে ধরে নিয়ে এগোচ্ছেন স্যাম। অল্প একটু সামনেই পড়ল একটা টানেল, ওটা ডানে-বাঁয়ে দুদিকেই চলে গিয়েছে। বাতাসের লবণাক্ত ভাবটা যেন ধাক্কা দিল ইলেনাকে, সেই সাথে আর্দ্রতাও।

লম্বা করে শ্বাস নিলেন তিনি, মনে হচ্ছে যেন ডুবে যাবেন। বেযমেন্ট আছেন-এই ভাবনাটা একেবারে সরে গেল তার মাথা থেকে। কেননা নজর পড়েছে একটা কাঠের সিঁড়ির দিকে। আটশো ধাপ উপরে উঠে গিয়েছে ওটা।

কপাল ভালো, সাধারণ ভ্রমণার্থীদের মতো আমাদের এই সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়নি!

'মাটির মাত্র নব্বই মিটার নিচে আছি আমরা,' বলল ক্লারা।

মাত্র?

অনেক কষ্টে ফুঁপিয়ে ওঠার হাত থেকে নিজেকে থামালেন তিনি।

বাঁ দিকের টানেলে নিয়ে গেল ওদের গাইড। 'এই পথে গেলে পাওয়া যাবে মহান কোপার্নিকাসের প্রতি উৎসর্গীকৃত চেম্বার। সেই সাথে সেন্ট অ্যান্থনির চ্যাপেলও পাবেন, ওটার বয়স অনেক পুরনো; প্রায় চারশো বছর হবে।'

স্লাস্কি অন্যদিকে ইঙ্গিত করলেন। 'তবে আপনাদের ওদিকে যেতে হবে, চ্যাপেলের দিকে সরাসরি পথ আছে।'

মাথা নাড়ল ক্লারা। 'আগেই পাঠিয়েছি তিনজনকে। আপনাদের যাবার পথের ব্যবস্থা হচ্ছে।' হাসল সে। 'আমার তিন বড় ভাই।'

'এখানে দেখি পারিবারিক ব্যবসা খুলে বসেছেন!' ঠাট্টার ছলে বলল মঙ্ক।

ক্লারা ব্যাপারটা নিল গম্ভীরভাবে। 'অবশ্যই, লবণ আমাদের রক্তে আছে। বাবা এবং তার আগে আমার দাদা এই খনিতেই কাজ করেছেন। মানে, যখন চালু ছিল আর কি।' ওদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিল মেয়েটা, যেন কোন শিক্ষক নির্দেশ দিচ্ছে তার ছাত্রদের। 'আসুন, আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।'

ওদের চলার সাথে তাল মিলিয়ে যেন বাড়ছে সুরের আওয়াজ। একসময় শোনা গেল নিচু কণ্ঠের কথা, নিচ থেকে কোরাস ভেসে আসছে। টানেল জুড়ে রয়েছে সারিবদ্ধ কক্ষ, চেম্বার। অধিকাংশই ভরে আছে খনি-জীবনের নানা দৃশ্যে। কিছু ভাস্কর্যও আছে; মানুষের তো বটেই, সেই সাথে ঘোড়ারও।

ওরকম একটা ভাস্কর্যের দিকে এগিয়ে গেলেন স্লাস্কি। মন খারাপ করা সুরে বললেন, 'ঘোড়ারা তাদের সারাটা জীবন এখানেই কাটিয়ে দিত, সূর্যালোকের দেখাও পেত না।'

'প্রথম দিককার কিছু খনি-শ্রমিকের ভাগ্যেও কিন্তু তাই জুটেছিল।'

শ্রাগ করলেন স্লাস্কি, বোঝাই যাচ্ছে তিনি ঘোড়াগুলোর প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল।

অন্য চেম্বারে ঢোকার জন্য কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামলেন তারা। এখনও কর্মক্ষম আছে কিছু মাইনিং ইকুইপমেন্ট। এদের মাঝে আছে একটা বিশাল আনুভূমিক যন্ত্র, শ্যাফট বরাবর মালামাল উপরে-নিচে করার জন্য ব্যবহৃত হত ওটা। সেই সাথে কাজে লাগানো হয়েছে প্রাকৃতিক শক্তিকেও, বিশাল এক ওয়াটার-হুইল ঘুরছে অবিরত। মনে হচ্ছে যেন একটানা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাজ করে যাচ্ছে ওগুলো।

এখনও ইলেনার হাত ধরে আছেন স্যাম, অবশ্য তাতে কোন আপত্তি নেই ভদ্রমহিলার। কে কী ভাবল, তার থোড়াই পরোয়া করেন তিনি। খনির ইতিহাস নি:সন্দেহে আকর্ষণীয়, কিন্তু মাথার উপরে থাকা মাটির আস্তরণ ভুলিয়ে দেবার মতো নয়।

উপরের দিকে তাকালেন স্যাম। তবে তার চিন্তার বিষয় ভিন্ন। 'বুঝলাম না, লবণ কোথায়?'

ইলেনা নিজেও সেটা ভাবছিলেন। এখানকার পাথরগুলোর রঙ ঘন ধূসর!

প্রশ্নটা শুনে হাসল ক্লারা, একহাত নেড়ে বলল, 'আপনার চারপাশেই আছে। যা দেখছেন, তা হচ্ছে লবণের প্রাকৃতিক রূপ। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে, স্বাদ নিয়ে দেখুন।'

স্যামও হাসলেন। 'আমার মা শিখিয়েছেন, দেয়ালে জিহ্বা লাগানো ঠিক না। তাই তোমার কথাকেই সত্যি বলে ধরে নিলাম।'

'এখানকার সব কাঠ সাদা রঙ করা কেন?' জানতে চাইল মঙ্ক।

'যেন খনি-শ্রমিকদের কুপির আলো ভালোভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।' মাথার শক্ত হ্যাটের দিকে দেখাল মেয়েটা, ওতে একটা আধুনিক ব্যাটারিচালিত ল্যাম্প লাগানো। দলের সবার মাথাতেই এই হ্যাট। তবে খনির পরিত্যক্ত এলাকায় যাবার আগে এই ল্যাম্পের দরকার পড়বে না।

আদর করে একটা কাঠের খুঁটিতে হাত বুলাল ক্লারা। 'বছরের পর বছর ধরে, আস্তে আস্তে কাঠের ভেতরে প্রবেশ করেছে লবণ। প্রচন্ড শক্ত করে তুলেছে এটাকে, প্রায় ইস্পাতের মতো! আর তাছাড়া শ্রমিকদের সাথে কথা বলে এই কাঠ।'

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মঙ্ক। 'কথা বলে?'

‘চাপ খুব বেশি হলে, গুঙিয়ে ওঠে এই খুঁটিগুলো। সেটা শুনে কর্মীরা আন্দাজ করতে পারে যে ধ্বস হবার সম্ভাবনা আছে।’ আরেকবার আদর করল সে খুঁটিটাকে। ‘তবে আস্তে আস্তে কমে এসেছে সেই গোঙানো।’

এক দৃষ্টিতে কাঠের খুঁটিগুলোর দিকে তাকালেন ইলেনা, নির্দেশ দিলেন-ওগুলো যেন চুপ থাকে।

যতই গভীরে যাচ্ছে ওরা, তখনই দারুণ সব শিল্পকর্ম নিয়ে দেখা দিচ্ছে ঘরগুলো। লবণ কেটে বানানো ভাস্কর্য দেখা গেল; ওদের মাঝে যেমন ড্রাগন আছে, তেমনি আছে তুষারশ্বেতার সাত বামনও।

একটা চেম্বারের সামনে থমকে দাঁড়াল ক্লারা, হেলমেটের আলো জ্বালাল। অন্ধকারের ভেতরে আলো ফেলল প্রথমে, তাতে দেখা গেল মাথায় মুকুট, আর থুঁতনিতে দাড়ি থাকা একজন মানুষের আবক্ষ-মূর্তি।

‘আমাদের কাসমির দ্য গ্রেটকে সম্মান দেখিয়ে শুরু করা উচিত,’ জানাল ক্লারা। ‘বলা হয়-নইলে দুর্ভাগ্য নেমে আসবে।’

ইলেনার আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না।

‘পিয়াস্ট বংশের শেষ পোলিশ রাজা হচ্ছেন কাসমির। উদারপন্থী শাসক ছিলেন। বিজ্ঞান এবং জ্ঞান সাধনাকে উৎসাহ দিতেন। এমনকি ক্রাকভ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাও তিনিই করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন সেই একমাত্র ইউরোপীয় নেতা, যিনি ইহুদীদেরকে দু’হাত ছড়িয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন।’

স্তিমিত হয়ে গেল ওর গলা। নাৎসি জার্মানরা পোল্যান্ড আক্রমণ করে সেই ইহুদীদের কী দশা করেছিল তা ভেবেই হয়তো। গম্ভীর কণ্ঠে যোগ করল, ‘চলুন, এগোন যাক।’

খাড়া উৎরাই হয়ে একটা লম্বা টানেলে এসে নামল সবাই। তারপরই থেকে থেকে ধাক্কা খেতে হলো মানুষের সাথে। পুরুষদের পরনে কালো স্যুট, আর মেয়েদের পরনে তাল মেলানো পোশাক। প্রথমেই শোনা সুরটা অনেক আগেই থেমে গিয়েছে। সম্ভবত বাড়ি ফিরছে এখন সবাই। লবণাক্ত গুহায়, দূরের আওয়াজও এখন বেশ জোরাল শোনাচ্ছে।

অবশেষে ক্যাটদের দলটা এসে পৌঁছল শব্দের উৎসে। বড় একটা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ওরা, সামনেই তিন তলা পর্যন্ত লম্বা এক খোলা জায়গায়।

‘এই হলো ওয়াইলিযকা খনির সেরা আকর্ষণ,’ ঘোষণা করল যেন ক্লারা। ‘সেইন্ট কিঙ্গা-এর চ্যাপেল।’

অসাধারণ সেই দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ইলেনা। চ্যাপেল না বলে ক্যাথেড্রাল বলাই ভালো। বিশাল বিশাল সব ঝাড়বাতি ঝুলছে ছাদ থেকে।

অনেকটা দূরে, বিশাল এক ক্রুশ দাঁড়িয়ে আছে একটা পাথুরে বেদির উপরে। সবগুলোই লবণ খোদাই করে বানানো। চারপাশে বাইবেলের নানা বর্ণনার চিত্ররূপ।

এখনও অনেক প্রার্থনাকারী অপেক্ষা করছে নিচে, কম করে হলে দুইশো হবে। তবে আরও দুইশো জন হলেও, জায়গার অভাব হত না। কয়েকজন উপরে যাবার জন্য কাঠের সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে।

কী আশ্চর্য, ওদেরকে মাটির উপরের দিকে উঠে যেতে দেখেও ঈর্ষা হলো না ইলেনার। স্যামের হাত ছেড়ে দিলেন তিনি, এগিয়ে গেলেন দৃশ্যটাকে আরও ভালো করে দেখার জন্য।

'এই চেম্বারের নাম দেয়া হয়েছে সেন্ট কিঙ্গা-এর নাম অনুসারে।' শুরু করল ক্লারা। 'কিংবদন্তি আছে: লেডি কিঙ্গা, এক হাঙ্গেরিয়ান রাজকুমারী, ক্রাকভের রাজকুমারের বাগদত্তা ছিলেন। হাঙ্গেরি ছাড়ার আগে, বাগদানের আংটিটা তিনি তার মাতৃভূমির একটা লবণ খনিতে ছুঁড়ে মারেন। এরপর ক্রাকভে পৌঁছে আদেশ দেন একদল খনি-শ্রমিককে, ওরা যেন খুঁড়তে শুরু করে। কী আশ্চর্য! সেখানে শ্রমিকরা খুঁজে পায় লবণের বিশাল বড় একটা টুকরা, তার মাঝে ছিল লেডি কিঙ্গার সেই আংটি। তারপর থেকে তিনি খনি-শ্রমিকদের রক্ষাকর্তা সেইন্টে পরিণত হন।'

'এত ঝামেলা না করে, বীমা কোম্পানির কাছে দাবী জানালেই পারতেন,' ফিসফিস করে বলল মঙ্ক। 'আমরাও এসব ঝামেলার থেকে রেহাই পেতাম।'

ভ্রূ কুঁচকে ওকে তিরস্কার করল ক্লারা। জলে নেমে কেউ কুমিরের সাথে লড়াই করে নাকি!

আগ্রহে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে ক্লারার। ব্যালকনি থেকে সরে এসে ওদের আবার টানেলে নিয়ে এল সে, ঢুকে পড়ল ভেতরে। গুহা, টানেল এবং ভাস্কর্যসহ ঘর পার হয়ে এসে উপস্থিত হলো সবুজ পুলে দিয়ে ভর্তি কিছু চেম্বারে। কাঠের সেতুর সাহায্য পার হওয়া যায় পুলগুলো।

ওগুলোর তলে চকচক করে জ্বলছে একগাদা পয়সা। শত শত বছর ধরে এখানে আসা দর্শনার্থীরা প্রার্থনার সময় ছুঁড়ে দিয়েছে নিচে।

'আমরা কি পানির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি নাকি?' জানতে চাইল ক্যাট। 'সেজন্যই কী ওগুলো ভরা?'

'নাহ। এই পুলের পানি এসেছে বৃষ্টি থেকে। সামনের দিকে এর দ্বিগুণ আকারের লেক পাওয়া যাবে।'

গুঙিয়ে উঠলেন ইলেনা। চেয়েছিলেন নিজেকে বাধা দিতে, কিন্তু বদ্ধ জায়গায় তার আওয়াজ অনেক জোরালো হয়ে শোনা গেল। স্যাম আবার ধরলেন তার হাত। আপত্তি করলেন না মহিলা।

পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিল গেল ক্লারা। পর্যটকদের যাওয়ার পথ ধরে যেতে যেতে পড়ল একটা লম্বা উৎরাই। সামনে মিলিয়ে যাওয়া পথটায় নেই কোন আলো, আছে শুধু হালকা করে জ্বলতে থাকা লবণের ভাস্কর্য। আর আছে কেবল অন্ধকার।

'ল্যাম্পগুলো এখানে কাজে আসবে,' বলে বাতি জ্বালিয়ে দিল ক্লারা। অন্যরা তাকে অনুসরণ করল। বাড়তি হিসেবে হাতে ফ্ল্যাশলাইটও আছে। নিজেরটা শক্ত করে ধরলেন ইলেনা।

ক্লারার পিছু পিছু এগোতে এগোতে, ক্যাটের দিকে ঝুঁকে কী যেন ফিসফিস করে বলল মঙ্ক। দান্তের ইনফার্নো থেকে একটা লাইন শোনালো সে, যেটা লেখা ছিল নরকের দুয়ারে-

'প্রবেশ করো,
তবে সব আশা পরিত্যাগ করে।'

রাত ৩:৪২

প্রশস্ত একটা লেকের তীরে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাট। ওদের হেলমেটের আলোগুলো অন্ধকার পানির উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এখানকার বাতাস কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে, লবণাক্ত। লেকটা এতটাই বড় যে, ওপাশের তীর নজরে আসে না।

লেকের এই আকৃতির কারণ সম্পর্কে জানাল ক্লারা। 'কয়েক বছর আগে এখানে উইন্ডসার্ফারদের আহ্বান জানানো হয়েছিল। অন্ধকার হাওয়ায় ওদের পালের ফুলে ওঠা দেখে মজাই লেগেছে।'

'বাতাস পেল কই?' জানতে চাইল মঙ্ক।

হাসল ক্লারা। 'জেনারেটর চালিত বড় বড় ফ্যানের সাহায্যে।'

'ধোঁকাবাজি করেছে আর কি,' মঙ্ক বলল।

'মাঝে মাঝে অতিথিদের সুবিধার জন্য আমাদের কিছু চালাকি করতে হয়,' ঠিক করে দিল ক্লারা। 'যেমন আজ করলাম।'

হাত দিয়ে দেখাল মেয়েটা। ওর তিন ভাই দাঁড়িয়ে আছে তীরে, সাথে আছে একটা ছোট জোডিয়াক পন্টুন নৌকা। সেই সাথে সি-ডু জেট স্কি। পানিরোধী পোশাক পরে আছে তিনজন; বোনের মতোই স্বর্ণকেশী হলেও, কুস্তিগিরদের মতো মাংসল। খনির অন্য কোন প্লাবিত এলাকা থেকে নৌকা নিয়ে এসেছে ওরা, অপেক্ষা করছে এখানে। বোঝাই যাচ্ছে, এই এলাকাগুলো নানা পুল, লেক এবং নালার মাধ্যমে একে-অন্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

'আমার ভাইরা সাথে করে কিছু খোদাই-যন্ত্রও নিয়ে এসেছে। যদি কিছু পান বা কোন নমুনা নিতে চান, সেজন্য।' ইলেনা ডেলগাডোর দিকে শ্রদ্ধাভরে নড করল ক্লারা।

ঘড়ি দেখে নিল ক্যাট। 'তাহলে আমাদের শুরু করা দরকার।'

প্রায় নব্বই মিনিট লাগল ওদের, খনির অর্ধেক পার হবার জন্য। এই পথগুলোর সংস্কার করা হয় কম, তাই লবণ জমে গিয়েছে। ক্ষয়প্রাপ্ত সিঁড়ি বেয়ে নামতে হলো ওদের। সবকিছু কেমন যেন অক্ষত মনে হচ্ছে, কারণ নিশ্চয়ই বাতাসে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি হওয়া।

চলতে চলতে খনি-শ্রমিকদের শিল্পীমনের পরিচয় পেল ওরা: বাচ্চা কোলে নিয়ে মাতা মেরীর মূর্তি। সেই সাথে দেয়ালে লেখা হয়েছে বাইবেলের কিছু উক্তি। ওদের পথে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মূর্তি, যেগুলো প্রায় ঢেকে আছে সাদা লবণের আস্তরে; যেন ওদেরকে এগোতে নিষেধ করছে।

অবশেষে পন্টুন বোটের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা, যাত্রার এই অংশটা নৌকায় করতে হবে বলে খুশি ক্যাট। ডা. স্লাস্কির মতে, ঝিনুকের চ্যাপেলটা এই লেকের ওই পাড়েই!

ক্লারার ভাই, পিওতর, নৌকাটাকে খুলে স্টার্নে বসে পড়ল। আরেক ভাই, আন্তন, এক টানে জ্যান্ত করল জোডিয়াকের ইঞ্জিন। তৃতীয় ভাইয়ের নাম গেরিক-জেট স্কির দিকে চলে গেল সে।

জেট স্কি এবং জোডিয়াকের ইঞ্জিনের গুঞ্জনে, কেঁপে উঠল নিচু সিলিং।

লেকের উপর দিয়ে যাত্রা শুরু করল দলটা, পন্টুনের বো-এর সাথে লাগানো হয়েছে একটা ল্যাম্প। ওখানে অবস্থান নিল পিওতর, পানির নিচে কোন বাধা আছে কিনা তা দেখছে সামনে থেকে।

চিন্তা এবং ভয়ে ভারী হয়ে ওঠা বাতাসটাকে একটু হালকা করার প্রয়াস পেলেন স্লাস্কি। স্যামের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি জানতে চেয়েছিলেন, খনি-শ্রমিকরা কেন ঝিনুকের চ্যাপেলের মতো বিশেষ এক স্থাপনা বানাবে? দেখলে বুঝতে সহজ হবে আপনার জন্য। এখানে সারা জীবন কাটাবার পর, নিজেদের একটা চিহ্ন রেখে যেতে চেয়েছিল তারা পেছনে।'

সাথে যোগ দিল ক্লারা। 'এই ভাস্কর্য এবং ছবি ছাড়াও আপনি এই খনিতে আরও অনেক চেম্বার দেখতে পাবেন। পরিশ্রম করে খনি-শ্রমিকেরা সেগুলোকে শিল্পে পরিণত করেছে।'

'সেন্ট কিঙ্গার চ্যাপেলের মতো।' বললেন ইলেনা।

'ঠিক ধরেছেন।'

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল আলোচনা, যেন ভারী ছাদের চাপে কেউ ভর্তা করে ফেলেছে কথা-বার্তা নামক ব্যাপারটাকে। আস্তে আস্তে নেমে এসেছে ওটা; ল্যাম্পের আলো যখন অপর পাশের তীরে পড়ল, তখন ওটা এত নিচে নেমে এসেছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারত ক্যাট।

অবচেতন মনেই ঝুঁকে বসল সবাই।

প্রথমে মনে হলো, লেকের এই দিকটা বুঝি একটা নিরেট দেয়ালে লেগে শেষ হয়েছে। কিন্তু পিওতর বাঁ দিকে বোটটা ঘোরাতেই দেখা গেল ভিন্ন দৃশ্য-লেক থেকে বের হয়েছে একটা চ্যানেল। শেষ দেখা যাচ্ছে না ওটার। অচিরেই দেখা গেল, সরু সেই চ্যানেল ধরে চলছে ওরা। ইংরেজি এস-আকৃতির একটা পথ বানিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা, শেষ হয়েছে মসৃণ পাথরে।

পন্টুনের সামনের দিকটা ওটার সাথে বাড়ি খেয়ে, কিছুটা উপরে উঠে এল।

সামনে একটা বিশাল বড় গুহা, যদিও সেন্ট কিঙ্গা চ্যাপেলের এক-চতুর্থাংশ হবে আকারে।

স্লাস্কি দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'কাপলিকা মাযলির প্রবেশ পথ।'

জাদুঘরের ডিরেক্টরের দেখানো ম্যাপটা মনে করল ক্যাট। গুহার এক দিকে ছোট ছোট প্যাসেজের অন্ধকার অবয়ব দেখতে পেল ও।

সাবধানে পৌঁছার স্বস্তিতে, সবাইকে তাড়া লাগাল সিগমা এজেন্ট। নৌকা থেকে নেমে তারা ঢাল বেয়ে উঠে এল গুহায়। খনির এই অংশটার অবস্থা দেখে, ক্যাটের স্বস্তি সব উবে গেল। ল্যাম্পের আলোয় দেখে, সামনের প্রায় অর্ধেক টানেল ভর্তি জঞ্জালে। এমনকী যে প্যাসেজগুলো আস্ত আছে, সেগুলোরও দেয়াল থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে পানি।

স্মিথসনের নিদর্শনের উৎস খুঁজে পাবে কিনা, সেই ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ল ক্যাট। হয়তো এই গুহাধ্বসের ফলে সৃষ্ট পাথরের জঞ্জালের নিচে এরইমধ্যে কবর হয়ে গিয়েছে ওটার।

'খুঁজতে তো হবেই,' যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলল মঙ্ক।

নড করে হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে দিল ক্যাট, হেলমেটের আলোর সাথে মিলে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করল ওটা। অন্যরাও তাই করল।

টানেলের সংখ্যা দেখে ভ্রূ কুঁচকালেন স্যাম। 'উবু, দশ, বিশ গুণে এগোতে হবে বলে মনে হচ্ছে!'

'নাকি কয়েক দলে ভাগ হয়ে যাব?' পরামর্শ দিল মঙ্ক। 'কম সময়ে অনেকটা এলাকা খোঁজা যাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দিলেন ইলেনা। 'ওই পরিকল্পনায় কবে কাজ হয়েছে?'

'ঠিক বলেছেন,' একমত হলো ক্যাট। 'আপাতত আমরা একত্রেই থাকি। কেউ হারিয়ে গেলে, তাকে খুঁজে বের করার মতো সময়ও আমাদের হাতে নেই।'

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল, ডানের টানেলের দিকে রওনা দিল ক্যাট। আন্তন এবং গেরিক রয়ে গেল পেছনে।

অন্ধকার প্যাসেজওয়ে ধরে এগোতে লাগল দলটা। দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারবে, এতটা প্রশস্ত ওটা। তারপরও মাঝে মাঝে সামনে পড়া লবণের স্ট্যালাকটাইট ভেঙে এগোতে হলো। পায়ের নিচে বয়ে চলছে পানি।

চারপাশ খুঁজে দেখল ক্যাট। ফ্ল্যাশলাইট এবং হেলমেটের লাইট, দুটোই উপর নিচ করল। স্মিথসনের এখানে আসার প্রমাণ খুঁজছে।

কিছু খুঁজে পায়নি বটে, কিন্তু টানেল বেছে নেয়াটা বুদ্ধিমত্তার সাথেই করেছে। আধ-ঘন্টার নিষ্ফল অন্বেষণের পর, প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে উপস্থিত হলো ওরা। পৌনে এক মাইল লম্বা হবে প্যাসেজ, ঝিনুকের চ্যাপেলের আকার সম্পর্কিত স্লাস্কির বলা কথা মনে পড়ে গেল ওর।

সম্পূর্ণ এক বর্গ মাইল।

এখন অনেকটা এলাকা খুঁজে দেখতে হবে ওকে।

টানেলটা শেষ হয়েছে একটা পাতলা, গুহার মতো দেখতে আর্কেডে। এখানে এসেই শেষ হয়েছে সবগুলো প্যাসেজ। ছাদটাও এখানে এসে মিলেছে মেঝের সাথে, ঝিনুকের তীক্ষ্ণ অংশটার জন্ম দিয়েছে।

পরবর্তী টানেলটার দিকে এগোল ক্যাট, ওটা ধরে ফিরে যাবে একেবারে শুরুতে। আচমকা ইলেনা বলে উঠলেন, 'দেখো!'

এক হাঁটু গেঁড়ে বসেছেন লাইব্রেরিয়ান, ফ্ল্যাশলাইটটা দিয়ে নিচু হয়ে আসা ছাদের একটা জায়গা দেখাচ্ছেন। টানেলের মতো এখানেও লবণ দিয়ে তৈরি হয়েছে স্পাইক এবং খাম্বা। গুহাটার পেছনের অর্ধেকে যাওয়ার পথ বন্ধ করে রেখেছে ওগুলো। ক্যাট এবং অন্যরা গিয়ে যোগ দিল ইলেনার সাথে।

নিচু ছাদের উপরে যেন উড়ে চলছে ইলেনার আলো। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে একটা দাঙ্গার চিত্র। ক্যাটের দেখা-দেখি সবাই আলো ফেলল ওতে।

লবণ দিয়ে ঢাকা পড়ে গেলেও, খোদাইটা দেখে বোঝা যাচ্ছে-কোন বিশাল যুদ্ধ চিত্রিত করা হয়েছে ওখানে। উপরের অংশে উড়ছে দেবদূত, হাতে তীর এবং বর্শা। নিচের অংশে আছে দানবের দল, পাতাল থেকে উঠে আসাতে চাইছে।

'এটা যে এখানে আছে, জানতেন?' দৃশ্যটার উপর থেকে নজর না হটিয়ে জানতে চাইল ক্যাট।

গুঙিয়ে উঠল স্লাস্কি। 'না...'

ক্লারা কিন্তু অতটা নিশ্চিত নয়। 'আমি শুনেছিলাম যে খনির ভেতরে কিছু নারকীয় ছবি আছে। কিন্তু এতদূর সাধারণত কেউ আসে না। আর পথে যে পরিমাণ লবণ পড়ল তাতে...' মাথা নাড়ল মেয়েটা। '...আমার মনে হয় না গত কয়েক দশকের মাঝে কেউ এসেছে।'

সোজা হয়ে, ঢেউ খেলানো গুহার বরাবর আলো ফেলল ক্যাট। আধ মাইলের মতো লম্বা ওটা। তবে সে জানে, ওদের হাতে আর কোন উপায় নেই।

'পুরোটা খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।'

আপত্তি করল না কেউ।

'চোখ খোলা রাখবেন সবাই, কোন কিছু সাধারণ মনে না হলেই জানাবেন।'

অদ্ভুত এই শিল্পের দিকে তাকিয়ে মুখ কুঁচকালেন স্যাম। 'এসবের কিছুই তো সাধারণ নয়।'

এক লাইনে হাঁটতে শুরু করল ওরা, ক্লারাকে সামনে রেখে। সাত জোড়া চোখ যেন সব কিছু ভালোমতো দেখে-শুনে নিচ্ছে। সমস্যাটা প্রথম ধরা পড়ল ক্যাটের চোখে। আরেকটু হলেই মিস করে যেত। পেছাতে গিয়ে, মঙ্কের সাথে ধাক্কা খেল ও।

মঙ্কও দেখতে পেল জিনিসটা, ফিসফিস করে বলল, 'এই ছোট্ট যন্ত্রণাটাকে আমরা আগেও দেখেছি, তাই না?' অন্য সবাই যোগ দিল সাথে।

দেবদূতদের মাঝে দেখা গেল আরেকটা পাখাওয়ালা অবয়ব। দানব পালের ঠিক উপরেই উড়ছে।

চিহ্নটা দেখা মাত্র চিনে ফেলল ক্যাট। এটাই খোদাই করা আছে স্মিথসনের কবরে।
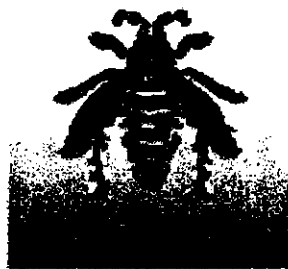
পাখাওয়ালা একটা পতঙ্গ, মথও হতে পারে। কিন্তু এর আসল পরিচয় জানে ক্যাট।

ওটা একটা বোলতা।

'আমাদের আরও কাছ থেকে দেখা উচিত।' বলল ও।

কিছুক্ষণের মাঝেই লবণের চাঁই ভেঙে চিহ্নটার কাছে পৌঁছে গেল দলটা। পুরো দৃশ্যটার মতো এই জায়গাটাও ঢাকা আছে লবণের আবরণে। সবকিছু বোঝা যাচ্ছে না।

পানির বোতলের দিকে হাত বাড়াল ক্যাট, লবণে পানি ঢেলে গলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল পিওতর, এগিয়ে দিল একটা থার্মোস। 'গোরাসা হেরবাটা।'

তিন ভাইয়ের কেউ ইংরেজি জানে না। তাই তার হয়ে জানাল ক্লারা। 'ওর গরম চা নিতে বলছে। ঠাণ্ডা পানির চাইতে সেটা বেশি কাজে আসবে।'

ভালো বুদ্ধি।

একটা রুমাল ভালো করে ভিজিয়ে নিল ক্যাট গরম চায়ে, তারপর ছবিটার উপর চা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি করার জন্য, ভেজা রুমালটা চেপে ধরল চিহ্নে উপরে।

অপেক্ষা করতে করতেই মঙ্কের দিকে ফিরল সে। 'আশা করি লবণের নিচে স্মিথসনের কোন না কোন ম্যাসেজ পাবো। কেবল যদি-'

ক্যাট টের পেল, লবণাক্ত অংশটুকু সরে যাচ্ছে! বোলতাটার খোদাই পড়ে গেল নিচে, মনে হলো অনেক বড় কিছু একটা বুঝি পেছনের দেয়াল থেকে সরে গিয়েছে!

পিছিয়ে এল ক্যাট, রুমালটা ছেড়ে দিয়ে সবাইকে প্রায় ঠেলে সরাল।

ওর সামনেই, ছাদের প্রায় পুরোটা অংশ নেমে এল নিচে। স্ট্যালাকটাইটগুলোকে একেবারে পিষে ফেলল। সেই সাথে ভেসে এল প্রবাহমান পানির আওয়াজ, সঙ্গী হিসেবে সে পেল বিশাল চাকার ঘূর্ণনের শব্দকে।

একটু আগে দেখা বিশাল পানির-চাকাটার কথা মনে পড়ে গেল ওর।

বোঝাই যাচ্ছে, ওটা ছাড়াও আরেকটা কর্মক্ষম আছে।

ছাদের কোনা নেমে মেঝে স্পর্শ করল, সেই সাথে তৈরি হলো উপরে যাবার একটা র‍্যাম্প।

হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকা অন্ধকারের দিকে উঁকি দিল ক্যাট।

'দেখো তো,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল মঙ্ক। 'কী অকাজ করলে তুমি!'

অধ্যায় তেত্রিশ

৯ মে, রাত ১১:৫৪
ফুজিকাওয়াগুচিকো, জাপান

'দুই মিনিট বাকি আছে,' অন্যদের সাবধান করল গ্রে।

একটা ইয়ামাহা পিইএস২ মোটরসাইকেলে বসে আছে ও, যন্ত্রটা শক্তি পায় বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন থেকে। ওর মতো দলের অন্যান্য সদস্যরাও পরে আছে স্মার্ট হেলমেট, প্রতিটার সাথে লেগে আছে একটা করে রেডিও। ফেনিকুসু ল্যাবরেটরীজের রিসার্চ ক্যাম্পাসের পেছনেই থাকা বনের ভেতর লুকিয়ে আছে দলটা।

সিটে বসে টার্গেটের দিকে তাকাল গ্রে। চারপাশে বেড়া দেয়া, কাচ এবং ইস্পাতের তৈরি কোরি নো শিরো, বা বরফ-দুর্গই ওর লক্ষ্য।

সময় এখন মধ্য দুপুর, তবে আকাশ কালো হয়ে আছে। ফুজি পাহাড় থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে একটা ঝড়। বাজ পড়ছে আকাশে, সেটার আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কাচে।

ঝড় আসছে, তাই আড়াল নিয়ে সমস্যা হবার কথা না ওদের। হেলমেটের সাহায্য আক্রমণকারী প্রধান দলের দেখে দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে দলনেতা গ্রে। প্রধান রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ওটা, ঠিক ক্যাম্পাসের সদর দরজার দিকে।

'এক মিনিট,' দলটাকে রেডিওতে বলল সে।

মোটরসাইকেলের এক দিছে ঝুঁকে আছে আইকো, পালু আছে তার বিপরীত দিকে। সাথে আরও দুইজনকে এনেছে জাপানিজ মহিলা-হোগা এবং এন্ডো। এই দুইজনকে সদ্য গঠিত জাপানিজ ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের টাস্ক-ফোর্স থেকে ধরে এনেছে সে। হেলমেটের নিচে আইকো এবং ওর দলের দুইজন পরে আছে কালো মুখোশ, কেবল ওদের চেহারা দেখা যাচ্ছে। আধুনিক নিনজা যেন ওরা তিনজন! হোগা বা এন্ডো দেখতে কেমন, সে ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই গ্রে-র।

শেষ মুহূর্তগুলো গুণতে শুরু করল সিগমা কমান্ডার, কানের কাছে যেন হৃদপিণ্ড ধুকুর-পুকুর করছে। কিছু একটা করার জন্য নিশপিশ করছে ওর হাত, পা।

এমনিতেই এখানে আসতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময় খুইয়ে বসেছে ওদের দল। ডেপথ চার্জগুলোর হাত থেকে বাঁচার পর, সাহায্যের জন্য রেডিওতে জানিয়েছিল ওরা। সাথে সাথে ওদের উদ্ধারের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় হেলিকপ্টার। মিডওয়েতে নিরাপদে ফেরার পর, চিকিৎসার জন্য কোয়ালস্কিসহ পালুর দুই আত্মীয়কে পাঠিয়ে দেয়া হয় ছোট একটা হাসপাতালে। টুয়ার অবস্থা এখনও সঙ্গিন।

অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না গ্রে-র। তাই সাথে সাথে চলে এসেছে জাপানে। আসার পথেই এই আক্রমণের সব ব্যবস্থা করেছে আইকো। কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে, হাওয়াইয়ের আক্রমণে হাত ছিল ফেনিকুসু ল্যাবরেটরীজের। তাকাশি ইতো অবস্থান করছেন বলে এই রিসার্চ বিল্ডিং-এ ঝটিকা আক্রমণ চালাবারে অনুমতি চেয়েছিল। ব্যাপারটা খুব অল্প ক'জন মানুষ জানে, পাছে শত্রুর কাছেও পৌঁছে যায় খবর! আইকোর ভয়, ফেনিকুসু সম্ভবত জাপানিজ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কয়েকজনকে কিনে নিয়েছে!

এর একটু আগের এক আলাপচারিতায় একই সন্দেহের কথা জানিয়েছেন পেইন্টারও। তিনি অবশ্য গ্রে-কে হাওয়াইয়ের অবস্থা সম্পর্কেও জানিয়েছেন। আতঙ্ক এবং বিশৃঙ্খলা-এই দুই শব্দ দিয়েই শেষ করা দেয়া যায় ওখানকার পরিস্থিতি। অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে।

সেটাকে আমলে নিয়ে, বর্তমান এই মিশনের প্রধান উদ্দেশ্যের কথা গ্রে-কে শুনিয়ে দিয়েছেন পেইন্টার: এই হুমকি সামলাবার জন্য, কী পদক্ষেপ নেয়ার কথা ভাবছেন তারা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে গ্রে। দরকার হলে শেইচান বা কিনকেও উৎসর্গ করতে পারো।

শুধু উদ্ধারের দিকে মন দিলেই হবে না। লাখো জীবন এখন হুমকির মুখে।

হেলমেটের ফিডের সাহায্যে জাপানিজ সিকিউরিটি ফোর্সের প্রধান দলটাকে ক্যাম্পাসের সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখল গ্রে। দলটার একেবারে সামনে আছে এক আর্মার্ড অ্যাসল্ট ভেহিক্যাল। মিনি-ট্যাঙ্কটা একটুও গতি কমালো না। ওটার সাথে একটা ব্যাটারিং র‍্যাম লাগানোই আছে। ইস্পাতের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওটা, পেছনে থাকা অন্যান্যদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দিল। সাথে সাথে সাইরেন বাজিয়ে ঢুকে পড়ল মোটরসাইকেল এবং মিলিটারি পুলিশের জীপ।

যেন আওয়াজের সাথে সারা দিয়েই শুরু হয়ে গেল ঝড়। বজ্রপাত হচ্ছে থেকে থেকে; মেঘ চিড়ে এমনভাবে ছুটে যাচ্ছে বজ্র, যেমন মাখন চিরে যায় গরম ছুরি।

'যাও, যাও, যাও...' রেডিওতে বলল গ্রে।

ঝড় এবং প্রধান দলের আক্রমণের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে, গ্রে এবং অন্যরা ক্যাম্পাসের পেছন দিয়ে ঢোকার প্রয়াস পেল। অন্ধকারের গাছের ভেতর দিয়েই ছুটল ওরা, আলো নিভিয়ে অবশই। ঝরতে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা

দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দিয়েছে অনেক। তবে হেলমেটের ভেতরে থাকা নাইট-ভিশনের ফলে সামনের অবস্থা দেখতে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে না। অবশ্য থেকে থেকে চিৎকার করে ওঠা বজ্র সমস্যার সৃষ্টি করছে কিছু। তাই বলে গতি কমালো না কেউই।

এমনকি পালুও না।

আগেই বলেছিল লোকটা, মাউইতে বাইক চালিয়ে অভ্যস্ত সে। বাড়িয়ে যে বলেনি তা এখন বোঝা যাচ্ছে।

পালুকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই বুঝতে পেরে গতি বাড়িয়ে দিল গ্রে। সামনের দিকে সবার নজর থাকায়, ক্যাম্পাসের কেউ ওদের পেছনের বেড়ার কাছে এসে ব্রেক কষাটা লক্ষ্য করল না।

পুরোপুরি থামার আগেই বাইক থেকে নেমে পড়ল হোগা, এক পাশে পড়ে গেল বাইকটা। কোমর থেকে একটা ক্যানিস্টার খুলে নিয়ে তাক করল বেড়ার দিকে। সাথে সাথে কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটা নীলচে আলো বেরিয়ে এল। হাতের এই বৃত্তাকার নড়াচড়াতেই কেটে গেল বেড়া।

সাধারণ কোন অ্যাসিটাইলিন টর্চ না ওটা, আইকোর নতুন প্রতিষ্ঠানের বানানো এক বিশেষ যন্ত্র। গ্রে-র ধারণা, এজেন্সিটা আসলে সিগমারই জাপানিজ রূপ।

তবে আইকো বেটি তা স্বীকার করবে না কিছুতেই।

পথ পেয়ে যেতেই, চুপচাপ ভেতরে প্রবেশ করল দলটা। ক্যাম্পাসের ভেতরে সযত্নে কাটা লন আর সারি বেঁধে লাগানো গাছের আড়াল ধরে ছুটল ওরা। লক্ষ্য- একটা হেলিপ্যাড। আইকোর আনা তথ্য মনে, কাছের একটা দালানেই আছে টানেল। ওটা ধরে প্রধান টাওয়ারের বেযমেন্টে যাওয়া যায়। টাওয়ারের নিচে থাকা ল্যাবগুলোতে পৌঁছানোই ওদের উদ্দেশ্য। তবে শুধু পৌঁছালেই হবে না; এমনভাবে পৌঁছুতে হবে, যেন সম্মুখ আক্রমণের ভয়ে ওরা ল্যাবগুলো সব ধ্বংস করার সময় না পায়।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শেষ একটা দৌড় দিয়ে হেলিপ্যাডের পাশের দালানটায় পৌঁছল ওরা। টাওয়ারের ওপাশ থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে বুলহর্ণে চিৎকার করে দেয়া আদেশের শব্দ।

গ্রে-র নির্দেশ পেয়ে, ছোট হ্যাঙ্গারটার ভেতরে যেন দমকা হাওয়ার গতিতে প্রবেশ করল দলটা। ধূসর জাম্প-স্যুট পরিহিত একজোড়া কর্মচারী আঁতকে উঠল ওদের আকস্মিক আগমনে। বাইরের আওয়াজে এরিমাঝে ওদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা।

অস্ত্র তুলেই সামনের দিকে ছুটল হোগা এবং এন্ডো। চুপচাপ যার যার টার্গেট বেছে নিয়েছে। প্রথমে গুলি ছুঁড়ল হোগা। ছোট ছোট অনেকগুলো ডার্ট গিয়ে বিঁধল

টার্গেটের বুকে। ওগুলো বেঁধা মাত্র দেখা গেল বিদ্যুতের ঝলকানি, খিঁচুনি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল দেহটা।

অন্য জনকে গুলি করল এন্ডো। ছোট ছোট কালো, ইস্পাতের মাকড়সার মতো দেখাল ওই গুলিটাকে। শত্রুর গলায় বসেই দ্রুত কাজ করে এমন সিডেটিভ ঢুকিয়ে দিল ওগুলো দেহে। দুই পা এগিয়ে এসে সহকর্মী মতো এ-ও অজ্ঞান হয়ে গেল।

সব মিলিয়ে তিন দ্বিতীয় লাগল কাজ সারতে।

পতিত দুই শত্রুর পাস দিয়ে যাবার সময়, হোগা এবং এন্ডোর হাতের কাজের দিকে তাকাল গ্রে। অস্ত্রগুলোর প্রশংসা করতেই হয়, সেই সাথে বুঝল-সিগমাকেও এদিকে আরো মনোযোগ দিতে হবে... অথবা বসতে হবে আইকোর ক্রম-উন্নয়নশীল এজেন্সির সাথে আলোচনায়।

নিচের দিয়ে চলে গিয়েছে, এমন একটা র‍্যাম্পের কাছে চলে এল ও, উদ্দেশ্যের দিকে ঢেলে দিল মনোযোগের পুরোটা। একেবারে নিচে পৌঁছে দেখতে পেল একটা টানেল। গতি বাড়িয়ে দিল গ্রে। একটাই প্রশ্ন খেলে যাচ্ছে ওর মনে।

দেরি হয়ে গেল না তো?

দুপুর ১২:০৮

সময় শেষ নিশ্চয়ই।

ডা. ওশিরোকে ঘরের অন্যপাশ থেকে ওর দিকে আসতে দেখলেন কিন। এই মুহূর্তে তিনি গামা দলের কোনায়, ল্যাবের একটা ওয়ার্কস্টেশনে বসে আছেন।

আগুয়ান লোকটার চলনে-বলনে ঝড়ে পড়ছে কর্তৃত্ব। নিজের ছোট্ট রাজত্বে যে তিনিই সর্বেসর্বা তা তার চেহারার কুঁচকানো ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন চাইলেও কালক্ষেপণ করতে পারবেন না।

আমাকে এখুনি উত্তরটা দিতে হবে।

হয় ওদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে, আর নয়তো মরতে হবে।

কিছু সময় পাওয়া জন্য কিন কিছুক্ষণ আগে অনুরোধ জানিয়েছিলেন-তাকে যেন এদের গবেষণা সম্পর্কে একটু ঘাঁটতে দেয়া হয়। তার এই অনুরোধ যে আসলে কালক্ষেপণের জন্য, তা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন ওশিরো। তারপরেও অনুমতি দিয়েছে।

তবে গত দুই ঘণ্টা হলো, থেকে থেকে তার উপর দৃষ্টি দিয়ে তীর হানছেন ওশিরো। যেন সম্ভাব্য কোন কর্মচারীর ইন্টারভিউ নিচ্ছে লোকটা।

হয়তো আসলেই তাই!

যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া চলবে না।

কিছুক্ষণ আগে কিন বুঝতে পেরেছেন, গামা দলের গবেষণা অনেক বড় কিছু একটার সাথে জড়িত। সামনে একটা ফোল্ডার নিয়ে বসে আছেন তিনি। ওতে লেখা-নোরিন-সুইসান-শো, জাপানের কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম ওটা। সেই সাথে মৎস্য এবং বনবিভাগও।

গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন চেয়ে লেখা একটা চিঠি আছে ওখানে, সেই সাথে আছে নতুন এক ধরনের কীটনাশকের আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখানো কিছু কাগজ। ওই কীটনাশকটা আবার বানানো হয়েছে ওডোকুরো বোলতার বিষ থেকে নেয়া একটা পেপটাইড ব্যবহার করে।

কিনের ওয়ার্ক-স্টেশনের পাশে এসে দাঁড়ালেন ওশিরো, হাত দিয়ে রেখেছেন কোমরে। 'গবেষণা সব দেখেছেন নিশ্চয়ই? কিছু বুঝলেন?'

কিন হেলান দিলেন চেয়ারে। 'একটা জিনিসই বুঝেছি-এই গবেষণার কোন ভবিষ্যৎ নেই।'

শক্ত কথা শুনে চোখ যেন কপালে উঠল ওশিরোর। এমনকি গামা দলের অন্যরাও চোখে রাগ নিয়ে তাকাল কিনের দিকে।

'কীভাবে?' জানতে চাইলেন না বলে, ওশিরো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বলাই ভালো।

'ওই 'গোস্ট পেপটাইডের' ডিএনএ অ্যানালাইসিস দেখে।'

দলটা এই নামই দিয়েছে খুঁজে বেড়ানো প্রোটিনটাকে, যেটা দারুণ এক কীটনাশক হলেও হতে পারে। দলটা এমন বেশ কিছু জিন খুঁজে পেয়েছে, যেগুলো অমন এক পেপটাইড তৈরি করতে পারে। কিন্তু ওডোকুরো প্রজাতির বিষথলিতে ওগুলোর একটাও পায়নি।

'গামা দল আসলেই ভুতের পেছনে দৌড়াচ্ছে,' বললেন কিন। 'জেনেটিক অ্যানালাইলিসে কোন সমস্যা নেই। এই জিনগুলোর আসলেই এমন একটা কীটনাশক তৈরি করতে পারার কথা যেগুলো শুধু পতঙ্গদের বিরুদ্ধে কার্যকরী। ওটা কোন লক্ষ্যের দেহে ঢুকলে, ভেতর থেকে গলিয়ে দেবে।'

'ঠিক,' বললেন ওশিরো। 'বুঝতেই পারছেন, কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য একেবারে নিখুঁত একটা কীটনাশক হতে পারে ওটা।'

কিন্তু কথা শেষ হয়নি কিনের। 'কিন্তু একটা কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন-ওডোকুরো শিখেছে, শিকারকে বাঁচিয়ে রাখাই ওদের জন্য উপকারী। গামা দল আসলে জাঙ্ক ডিএনএ-এর একটা অংশ খুঁজে পেয়েছে, যেটা কোন কাজে না আসলেও বোলতার জেনেটিক গঠনের অংশ হয়ে আছে। কখনো ভাবেননি, প্রোটিনটা আবিষ্কার করতে পারেনি কেন ওরা?'

থমকে গেলেন ওশিরো, এত কিছুর ধাক্কা একবারে নিতে পারছেন না। তবে পাত্তা দিলেন না কিন। এমনভাবে কথা বলে উঠলেন, যেন ওশিরো আঘাত পেলেও কিছু যায় আসে না। 'দুনিয়ার প্রায় সব প্রাণীর মতোই, ওড়োকুরোর ডিএনএ আসলে কর্মক্ষম, জাঙ্ক এবং অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া জিনের গোঁজামিল।'

শ্রাগ করলেন ওশিরো। 'কী বলতে চাইছেন?'

'এই গোস্ট পেপটাইড পাওয়া অসম্ভব, কেননা এটার কোড আসলে বিবর্তনের পথে কানাগলি।' গামা দলের একজনকে ইঙ্গিত করলেন কিন। 'আমাকে ওই জিনগুলোর ডিএনএ-এর মিথাইলেশন দেখিয়েছ তুমি; এপিজেনেটিক মার্কার খোঁজার জন্য।'

'হাই,' জাপানিজে সম্মত হলো লোকটা।

'ওই এপিজেনেটিক মার্কার-যেগুলোর সাহায্যে কোন ডিএনএ-কে অন্ধকারে জ্বলা বাতির মতোই উজ্জ্বল দেখে-নির্ধারণ করে কোন কোড প্রকাশ পাবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে-,' দলের সবার উপর নজর বুলিয়ে অবশেষে ওশিরোর উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'এই পুরাতন জেনেটিক কোড কোন সিন্দুকে ভরা হয়ে অনেক আগেই, সেটার চাবিও ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।'

ঢোক গিললেন ওশিরো।

শ্রাগ করলেন কিন। 'সঠিক চাবিটা ছাড়া, এই সিকোয়েন্স আর কখনও কোন প্রোটিন তৈরি করবে না। আর যদি এইরকম একটা চাবি বানাতে চান-তাহলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে।'

চারপাশে কিছু চিন্তিত চেহারা দেখতে পেলেন ওশিরো। কেউই সরাসরি ডিরেক্টরের দিকে তাকাতে পারছে না। 'আপনি যদি ঠিক হন, তাহলে তো...'

'...এই গবেষণা অর্থহীন।' ঘোষণা করলেন যেন কিন।

শক্ত হয়ে গেল ওশিরোর চোয়াল। এমনভাবে কথা বলল যেন প্রতিটা শব্দ ওকে তীব্র কষ্ট দিয়ে গলা থেকে বেরোচ্ছে। 'তাকাশি ইতো হয়তো আপনার ব্যাপারে ঠিকই বলেছেন। আমাদের কাজে আসবেন আপনি।'

প্রহরীর দিকে তাকিয়ে নড করল লোকটা। পরীক্ষায় পাশ করেছেন, বুঝতে পারলেন কিন। এবার তাকে চাকরীর প্রস্তাব দেয়া হবে। ওটাকে না করতে পারবেন না তিনি।

কিন্তু এই দলের হয়ে কাজই বা করব কীভাবে?

ভবিতব্যকে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি।

আচমকা উচ্চস্বরে বাজতে থাকা একটা সাইরেনের আওয়াজে ভরে গেল চারপাশ।

জমে গেল যেন সবাই, মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছে।

একমাত্র কিন-ই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কানের পাশ দিয়ে গেছে রে বাবা!

দুপুরে ১২:২৮

বেযমেন্টের সিঁড়ির উপরে উবু হয়ে বসে আছে গ্রে। ওর মাথার উপরে দেখা যাচ্ছে বিশাল বড় ইস্পাতের দরজা। টাওয়ারের উপরের দিককার লেভেলে ওঠার পথ আটকে রেখেছে ওটা, সম্ভবত অন্যান্য দরজার অবস্থাও একই।

দুর্ভেদ্য করে ফেলছে জায়গাটাকে।

গ্রে-র দলটা কোনক্রমে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে, কিন্তু এখন কী করবে?

আইকোর চাই তথ্য। সে ভয়ে কুঁচকে বসে থাকা একজন ল্যাব টেকনিশিয়ানের দিকে এগিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে থাকা লোকটার গলায় একটা ছোরা ধরল হোগা। ঝড়ের বেগে একগাদা প্রশ্ন করল আইকো, পুরোটাই জাপানিজে। এন্ডো পাহারা দিচ্ছে হলওয়েতে, বাইরে বেরোতে ব্যস্ত অন্যদের দিকে মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে অন্য আরেকটা দরজা খুঁজে নিলেই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

আইকোর দুই লোকই তাদের হেলমেট খুলে ফেলেছে। তবে মুখের উপর মুখোশ রয়েছে এখনও। এখানে আসার পথে বলতে গেলে কোন বাধাই পায়নি দলটা। যেটা আশা করেছিল, সেটাই হয়েছে। সদর দরজার গোলাগুলির দিকে চলে গিয়েছে নিরাপত্তা-কর্মীর নজর।

আচমকা বন্ধ হয়ে গেল অ্যালার্ম। নীরবতাটুকু খুব ভারী হয়ে কানে লাগছে এখন।

অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়াল আইকো, গ্রে-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রফেসর মাতসুইয়ের সাথে মেলে এমন একজনকে লোকটা সাব-বেযমেন্ট চারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'একটা নাকি টক্সিকোলজি ল্যাব আছে ওখানে।'

'আর শেইচান?'

মাথা নাড়ল আইকো। 'বলল, জানে না।'

মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই গ্রে-র, জানে যে আইকো তার সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করেছে। একটাই আশা এখন, কিন এবং শেইচান যেন একসাথেই থাকে। 'চলো যাই।'

আরও তিনতলা নেমে গেল ওরা। পাঁচ নাম্বার সাব-বেযমেন্টে যাবার রাস্তা লাল দরজা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওটা নিয়ে পরে মাথা ঘামাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে, সাব-বেযমেন্ট চারে পা রাখল।

পথ-নির্দেশনা দিল আইকো, একটু আগে তথ্য নিয়ে নিয়েছে। পথে পড়ল অনেকগুলো খালি করিডর। মাঝে-সাঝে কেউ কেউ উঁকি দিল, বন্দুক দেখা মাত্রই ফিরে গেল আবার।

'হলের শেষ মাথায়,' বায়ো-হ্যাযার্ডের নিশানা লাগানো একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল আইকো। 'ওখানেই থাকার কথা ল্যাবটা।'

গতি বাড়িয়ে দিল গ্রে। দরজার কাছে প্রথমে পৌঁছল সে-ই। ভেতরে পা রেখেই দেখা গেল, বিশাল একটা বায়ো-ল্যাব। অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো ওটা। সিগ সয়্যারটাকে নিচের দিকে তাক করে রাখল ও, পিছু পিছু প্রবেশ করল অন্যরা।

জায়গাটাকে তাড়াহুড়ো করে পরিত্যাগ করা হয়েছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে ওয়ার্ক-স্টেশন, মেঝেতে ছড়িয়ে আছে ভাঙা কাচের টুকরা। ধোঁয়া উঠছে একটা কম্পিউটার থেকে, যেন ওটার হার্ড ড্রাইভ জ্বলিয়ে দিয়েছে কেউ।

আইকোর দিকে ফিরল গ্রে, শক্ত হয়ে গিয়েছে পেট।

ওরা এখানে নেই।

দুপুর ১২:৩২

অন্ধকার গলির একটা দেয়াল ধরে ছুটছেন কিন।

কী করছি আমি?

চার মিনিট আগের কথা, আচমকা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। সাইরেন বাজা মাত্র ভয়ে আঁতকে উঠল সবাই। পায়ের নিচে মাড়াই হতে হবে, এই ভয়ে সবার চলার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। ওই মুহূর্তগুলোয়, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো আর কেউ ছিল না। এমনকি ওশিরো নিজের জন্য ডেকে নিয়েছেন সশস্ত্র প্রহরীকে, এগিয়ে গিয়েছেন দেয়ালের সাথে লাগানো একটা লম্বা সেফের দিকে।

বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে কিন সরে যান ল্যাবের পেছন দিকে। ওখানে থাকা লাল দরজা দিয়ে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এখানে তাকে নিয়ে আসার পর থেকেও, ওই দরজার ওপাশের কী আছে, তা দেখতে মন চাচ্ছিল। ওশিরোর কাজ থেকেও কোন গবেষণা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা দেখতে চাচ্ছিলেন।

তবে ওই মুহূর্তে চিন্তা ছিল ভিন্ন।

যেমনটা ভেবেছিলেন, ভেতরে থাকা একজন অ্যালার্মের শব্দ শুনে তাদের মতোই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কিনের ধারণা, এখান থেকে বেরোবার নিশ্চয়ই আরো রাস্তা আছে। কিন্তু গত কয়েক ঘণ্টায় আর কেউ আসেনি বা কোথাও যায়নি। তবে অন্তত একজন টেকনিশিয়ানের জন্য, ওই লাল দরজা সবচেয়ে কাছের এক্সিট হবার কথা।

সেই সুযোগই নিয়েছিলেন কিন, দরজার ওপাশে যেতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওটা। সেই সাথে শুনতে পেয়েছিলেন তালা বন্ধ হবার আওয়াজ। তিনি জানতেন, ওশিরো তার পিছু নিতে পারবেন না; ক্লিয়ারেন্স নেই। কিছুটা নিশ্চিত হয়েই পা বাড়িয়ে দিয়েছেন আরও ভেতরে যাবার জন্য।

করিডর ধরে যাওয়ার সময়, বেশ কিছু শব্দ কানে এল তার। সামনে দরজা খুলে যাচ্ছে, হলে এসে পড়ছে আলো। সতর্কতার সাথে এগোলেন তিনি। যখন সাইরেন বন্ধ হয়ে গেল, তখন মনে হলো যে বুকের ধুকপুকানিও যেন শুনতে পাবে সবাই।

সামনের খোলা দরজাটার কাছে আসার পর, ভেতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখলেন-ছোট একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, দেয়াল জুড়ে সারিবদ্ধ সিঙ্ক। সেই আছে তাক ভর্তি সবুজ গাউন এবং অনেকগুলো গ্লাভসের বাক্স। আয়োডিন এবং সাবানের গন্ধ বেশ করা, এই ঘরটা যে সার্জারির প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তা তাকে কারো বলে দিতে হলো না।

জানালা দিকে পরের ঘরের দিকে গেল তার নজর। উজ্জ্বল একটা ল্যাম্পের আলোতে দেখতে পেলেন গাউন এবং মাস্ক পরা কয়েকটা অবয়ব একটা অপারেটিং টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে। ওদের তাড়াহুড়ো দেখে বোঝা যাচ্ছে, অপারেশনের মাঝখানে শুরু হয়েছে অ্যালার্মের আওয়াজ।

সোজা চলে যেতে চাচ্ছিলেন কিন, যেন কারও চোখে ধরা পড়তে না হয়। ঠিক তখনই দু'জনের মাঝে লম্বা ব্যক্তিটা সরে গেল। টেবিলে শায়িত রোগীকে দেখতে পেলেন কিন।

শেইচান...

ভয়ে প্রফেসর সরাসরি এগিয়ে গেলেন জানালার দিকে, ভেতরের দিকে উঁকি দিলেন আবার।

'কোমায় নিয়ে ওকে প্রস্তুত করার সময় নেই,' সার্জন লোকটা বলল। 'একে টেস্ট সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।'

'হাই, ডা. হামাদা।' উত্তর দিল এক নার্স। 'ভ্রূণের কী হবে?'

'তাড়াতাড়ি করলে, ওটাকে আমরা বের করে নিতে পারব। এমনিতেই ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। অজ্ঞান করা ছাড়াই জরায়ুটা কেটে নেব আমরা। গর্ভাশয় এবং ভ্রূণকে একসাথে সরিয়ে নেব। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হবে না হয়তো, কিন্তু ভ্রূণের স্টেম সেলগুলো দারুণ কাজে আসবে।'

'আমি সব গুছিয়ে নিই তাহলে।'

'তাড়াতাড়ি করো। নিচের বাঙ্কারটা যে কোন সময় বেদখল হয়ে যেতে পারে।'

'হাই।'

অনেকগুলো তাকের দিকে এগিয়ে গেল নার্স, এদিকে রোগীর উপর ঝুঁকে আছেন ডা. হামাদা। তাকে হতাশ মনে হচ্ছে।

'এই সুযোগ হেলায় হারাতে ইচ্ছা করছে না,' নার্সকে বলল লোকটা। 'কিন্তু আশা করি এতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। এমআরআই দেখে বুঝতে পারছি যে মেয়েটার মাংসে আশ্রয় নেয়া দ্বিতীয় ইনস্টারগুলো আস্তে আস্তে পুরু হতে শুরু করেছে। অচিরেই তারা তৃতীয় ইনস্টারে পরিণত হবে। কয়েকটা তো মনে হয় সেই পদ্ধতি শুরুও করে ফেলছে।' শ্রাগ করল তারপর। 'আফসোসের কথা। বেহুদা তাড়া খেলাম। ভ্রূণের উপর ওডোকুরোর প্রভাব জানার আরেকটু সুযোগ পেলে ভালো হতো।'

এসব পরিকল্পনা শুনে ঘৃণায় ভরে গেল কিনের মন। ছোট ঘরটার চারপাশে নজর বুলালেন তিনি, অস্ত্র খুঁজছেন। তবে একটা চোখ ঠিকই আছে অপারেটিং রুমের দিকে। সিল করা একটা প্যাক নিয়ে ফিরে এল নার্স, ওটাকে একটা ইস্পাতের ট্রে-এর উপর রেখে খুলে ফেলল।

সময় শেষ...

হাতের কাছে যা পেলেন, সেটাই নিলেন কিন। তারপর ঢোক গিলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরজার উপর। নার্স ছিল সবচেয়ে কাছে, চমকে লাফিয়ে উঠল সে। হাতে ধরা ফায়ার এক্সটিংগুইশারের নলটা তাক করে মহিলার মুখের উপরেই স্প্রে মেরে দিলেন কিন। হাত দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে পিছিয়ে গেল নার্স। তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর, অস্ত্রটার হ্যান্ডেল ধরে ঘুরিয়ে মারলেন। ডাক্তার লোকটার মাথার পাশে গিয়ে আঘাত হানল ওটা, বীভৎস আওয়াজ হলো একটা। পরক্ষণে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

এবার নার্সের দিকে মন দিলেন কিন। মহিলাটা মোটামুটি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে, মেঝেতে পড়ে থাকা বসকে দেখতে পেল পরিষ্কার। ভয় দেখাবার জন্য এক পা এগিয়ে গেলেন তিনি, কাজ হলো তাতেই। উল্টো ঘুরে দরজার দিকে দৌড় দিল নার্স। তাকে অনুসরণ করার সময় নেই কিনের। বিশৃঙ্খলার উপর ভরসা করলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ কাউকে খুঁজে পেয়ে এখানকার অবস্থা বলতে দেরি হয়ে যাওয়ার কথা।

তারপরও তাড়াতাড়ি শেইচানকে বেঁধে রাখা স্ট্রাপগুলো খুললেন তিনি। ব্যথায় কুঁচকে আছে মেয়েটার চেহারা। এরপর নজর দিলেন আইভি স্ট্রিপের দিকে, ইচ্ছা ছিল খুলে ফেলবেন ওটা। এরপর মেয়েটাকে টেবিলের উপর থেকে নামিয়ে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন।

এখন মনে হচ্ছে, তারপর?

বুঝতে পারছেন তিনি, এই কাজ করলে হয় আবার ধরা পড়তে হবে... আর নয়তো মরতে হবে। তাই ঘুরে দাঁড়ালেন কাছেই থাকা ক্রাশ কার্টের উদ্দেশ্যে। সামনের ড্রয়ারটা খুলে ফেলে নজর বুলালেন ভেতরে থাকা ইমারজেন্সি ওষুধগুলোর দিকে। মরফিনের উপর স্থির হলো তার হাত, ব্যথা নাশক দিলে বাচ্চার কোন ক্ষতি হবে কিনা ভাবলেন।

নাহ, এখন না...

এপিনেফ্রিন বেছে নিলেন তিনি। আশা করা যায়, এটার সাহায্য শেইচানের তন্দ্রাচ্ছন্ন-ভাব কাটিয়ে তুলতে পারবেন। এখান থেকে পালাবার সময়টুকু পেলেই হয়।

একটা সিরিঞ্জ ভরে নিয়ে এগিয়ে গেলেন শেইচানের দিকে, আইভির যে জায়গা দিয়ে ইনজেকশন দিতে হয় সেখানে লাগালেন ওটা। তারপর লাইন বন্ধ করে চেপে ধরলেন প্লাঞ্জার। কতটুকু দিতে হবে, তা জানেন না তিনি। তাই আস্তে আস্তে দিচ্ছেন।

দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

হে, ঈশ্বর! যেন কাজ হয়...

মেঝেতে পড়ে থাকা ডা. হামাদার মুখ থেকে গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল তার, শেইচানের পেটের বাচ্চা এখনও ঝুঁকির মাঝে আছে। মেয়েটার ভেতরের লার্ভা দ্বিতীয় ইনস্টার থেকে তৃতীয় ইনস্টারের দিকে যাচ্ছে।

শেইচানের উন্মুক্ত পেটের দিকে তাকালেন তিনি।

কথাটা যেন মিথ্যা হয়!

দ্বিতীয় ইনস্টার

দুর্দশাগ্রস্ত মাংসপেশির ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে লার্ভাটা। ফুলে আছে ওটার পেট, আর ধরছে না। শেষ ধাপের চাইতে প্রায় দশগুণ বেড়েছে ওটার আকার-এখন প্রায় আধ-সেন্টিমিটার হবে। কিন্তু ওটার বাইরের দেহাবরণ আর বড় হতে পারবে না। আস্তে আস্তে কালো হতে শুরু করেছে দেহের ওই অংশ। অভ্যন্তরীণ এপিডার্মিসের প্রভাবে ওটার মস্তিষ্কের পেছনে থাকা গ্লান্ডগুলো থেকে একডাইসোন নামের একটা হরমোন বেরোচ্ছে। লার্ভাটাকে আরেকবার খোলস পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করছে হরমোনটা।

অল্প করে খাচ্ছে এখন লার্ভাটা, এগোচ্ছে আগের চেয়ে কম গতিতে। কারণ এখন ওটার চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছে, তাই চিবোনো হয়ে পড়েছে কঠিন। পিচ্ছিল এক ধরনের জেল জমতে শুরু করেছে ওটার নরম এপিডার্মিস এবং বাইরে শক্ত কিউটিকলের মাঝে। বুক এবং মাথার গ্লান্ড ফুলে উঠেছে তরল সিল্কে। সময় হলেই একটা বিছানা বানাবে ওটা দিয়ে, ছোট ছোট নখর দিয়ে আঁকড়ে ধরবে সেই বিছানা। তারপর কয়েক ঘণ্টার জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে ওটা, সময় হলেই পুরনো খোলস ছেড়ে মুক্ত হয়ে যাবে।

তবে সেই সময় হয়নি এখনও। আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসছে ওর শরীরে। হালকা সাদা কিছু এলাকা তৈরি হয়েছে পাশে। ওখান থেকেই সামনে কখনও বেরিয়ে আসবে পাখা। রূপালী কিছু সুতাও দেখা যাচ্ছে, শ্বাসনালীতে রূপ নেবে পরবর্তীতে।

পোষকদেহের কলার ভেতর দিকে যেতে যেতে, শক্ত কিছু একটার সাথে আঘাত খেল ওটার দেহ। চোয়াল দিয়ে স্বাদ নিল ওটার, বুঝতে পারল ওটার আকার-আয়তক্ষেত্রের মতো।

সামনে পড়া জিনিসটা যে সিল্কের একটা প্যাকেট, তা ধরলে পারল। বুঝতে পারল ভেতরে কী আছে।

বাঁধাটার পাশ দিয়ে যেতেই, আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল ওটার চোখে। ভেতরে থাকা জিনিসটার পরিবর্তন বুঝতে পারল লার্ভাটা। ওরই এক ভাই আস্তানা গেড়েছে ভেতরে।

এই ভাইটাও চুপচাপ শুয়ে আছে, তবে ওটার বাইরের দিকটাই যা শান্ত। ভেতরে প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে পরিবর্তন। কিউটিকলের নতুন একটা স্তর গঠিত হচ্ছে ওখানে। নতুন এক জোড়া চোয়াল গড়ে উঠছে, পাথর ভেদ করে যেতে সক্ষম।

বাধা পার হয়ে আরও গতি কমিয়ে দিল লার্ভাটা। কিছুটা সামনে গিয়ে নিজেও বানিয়ে নেবে একটা আস্তানা।

সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওটা।

জানে, অপেক্ষার প্রহর ফুরালো বলে।

অধ্যায় চৌত্রিশ

৯ মে, দুপুর ১২:৩৯
ফুজিকাওয়াগুচিকো, জাপান

প্রচণ্ড মাথা ব্যথা নিয়ে জেগে উঠল শেইচান, উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। গিল্ডের নৃশংস প্রশিক্ষণ ওকে এসব সমস্যার জন্যও প্রস্তুত করেছে। মাথা ব্যথা সত্ত্বেও অনড় হয়ে রইল সে। জোর করে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে আনল, জেগেছে যে তার কোন আভাস দিতে রাজি নয় শত্রুকে। প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেলে, চোখ খুলল কোনক্রমে। মাথার উপর উজ্জ্বল আলো ঝুলছে। শক্ত, ঠাণ্ডা একটা টেবিল ওর পিঠের চামড়ায় স্পর্শ করে গেল। নাকে পেল জীবাণুনাশকের তীব্র গন্ধ। দৌড়াচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ড... কিন্তু এত দ্রুত তো দৌড়াবার কথা না।

বাঁ দিকে কেউ যেন বসে মন্ত্র জপছে। 'ঈশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর...'

প্রফেসর মাতসুইয়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল সে, তারপরও চুপ করে রইল। চারপাশের পরিবেশটাকে দেখে নিলে চোখের কোনার সাহায্যে।

আমি একটা অপারেটিং রুমে আছি।

কিন ওর চোখের সামনে চলে এলেন, হাতে একটা সিরিঞ্জ ধরে আছেন। অন্য হাতে একটা কাচের বোতল। 'বেশি দেয়ার ঝুঁকি নিতে পারব না।' নিজেকেই নিজে বললেন, বলতে বলতেই বোতলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন সুৎষই।

আরও একবার নিজের হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক দৌড় টের পেল শেইচান।

এর জন্য দায়ী ওষুধ।

অ্যাড্রেনালিন...

ওকে জাগাতে চাইছেন ভদ্রলোক, বুঝতে পেরে মুখটা ডাক্তারের দিকে ঘোরাল শেইচান। সেই মুহূর্তে দেখতে পেল, কিনের পেছনে একটা অবয়ব উঠে দাঁড়িয়েছে! মানুষটার পরনে সার্জিকাল গাউন, মুখে মাস্ক।

তারপরও লোকটাকে চিনতে কষ্ট হলো না।

ডা. হামাদা...

কিনের গলার দিকে এগিয়ে গেল একজোড়া হাত।

নড়ে উঠল শেইচান।

ব্যথায় শক্ত হয়ে আছে মাংসপেশি, তারপরও লাফ দিল ও। হামাদার উপর থেকে নজর না সরিয়েই হাতে তুলে নিল একটা স্কালপেল। অন্য হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল কিনকে। এক পাক খেয়ে ডাক্তারের পেছনে চলে এল সে, স্কালপেলটা স্পর্শ করার চোয়ালের ঠিক নিচে; লোকটার ক্যারোটিডের উপরে।

এক বিন্দু রক্ত দেখা গেল জায়গাটায়।

'একে কি বাঁচিয়ে রাখা দরকার?' ফেটে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উচ্চারণ করল শেইচান।

নিজেকে সামলাবার এবং ওর প্রশ্নের অর্থ বুঝবার জন্য এক মুহূর্ত সময় লাগল কিনের। 'আমি জানি না... হয়তো...' ঘরটা থেকে বেরোবার দরজা খুঁজতে লাগলেন তিনি। 'সাইরেন বাজল একটু আগে। এর মুখে শুনেছিলাম একটা বাঙ্কারের কথা, ওখান দিয়ে নাকি বেরোনো যাবে।'

'তুমি তাহলে আমাদের সাথে আসছ,' হিসহিস করে ডাক্তারের কানে কানে বলল ও। পায়ে লাথি মেরে ফেলে দিল মেঝেতে। তারপর স্কালপেলটা কিনের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'নজর রাখুন।'

কাঁপা কাঁপা হাতে জিনিসটা নিলেন প্রফেসর, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন অচিরেই।

দৌড়ে মেডিকেল বর্জ্যের চিহ্ন আঁকা একটা বিনের কাছে গেল ও। ওখান থেকে একটা গাউন বের করে নে পরে ফেলল, সামনে লেগে থাকা রক্তটার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। চুলগুলোকে একটা সার্জিকাল বনেটের নিচে ঢুকিয়ে, একটা মাস্ক বেঁধে নিল গলায়; তবে মুখ ঢাকল না। আশা করা যায়, আধা-এশিয়ান বলে এখানকার জাপানিজ কর্মীদের ভিড়ে লুকিয়ে থাকতে অসুবিধা হবে না।

তৈরি হয়ে নিয়ে কিনকেও করতে বলল কাজগুলো। কয়েক মিনিটেই তৈরি হয়ে নিলেন প্রফেসরও।

হামাদাকে দাঁড়াতে বাধ্য করল শেইচান। 'আমাদেরকে এখান থেকে বেরোবার পথ দেখাও। বাঁচলেও বাঁচতে পারো।'

উৎসাহ ভরে মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'হলের শেষ মাথায় একটা এলিভেটর আছে।'

রওনা দিল ওরা; শেইচানের হাতের যে শিরায় পড়ানো ছিল আইভি, সেখান থেকে রক্ত ঝরছে।

কেমন যেন ব্যথাও অনুভব করছে ও-কিন্তু খুবই কম!

কিনের দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'আমাকে কি মরফিন বা ফেনটানাইল কিছু দিয়েছেন?' হামাদার বলা কথাগুলো ওরও মনে আছে। শক্তিশালী ব্যথানাশক ওর বাচ্চার ক্ষতি করতে পারে।

'না,' উত্তর দিলেন কিন। 'শুধু এপিনেফ্রিন, কেন?'

'আগের মতো ব্যথা করছে না।'

কিন এবং হামাদা উত্তর শুনে একে অন্যের দিকে তাকালেন।

'কী হলো?' জানতে চাইল শেইচান, প্রফেসরের চেহারায় দেখা দেয়া চিন্তা ওর নজর এড়ায়নি।

'তৃতীয় ইনস্টারে পরিণত হবার আগে, লার্ভাগুলো স্বল্প সময়ের জন্য চুপচাপ হয়ে যাবে। সম্ভবত সেই ধাপেই আছে এখন। কিন্তু একবার নতুন ইনস্টার বেরোতে শুরু করলে...' স্তিমিত হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

কিন্তু বুঝতে কোন অসুবিধা হলো না শেইচানের।

আর কোন আলোচনা হলো না তাদের মাঝে, কেননা এলিভেটরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে ওরা। হামাদার গলার সাথে ঝুলতে থাকা কী-কার্ড ব্যবহার করে দরজা খুলল শেইচান। খেয়াল করে দেখল, এলিভেটরটা মাত্র এক লেভেল নিচে যায়, উপরের তলে যায় না। কিনকে দিয়ে দরজা ব্লক করাল ও, তারপর স্কালপেলটা ঢুকিয়ে দিল হামাদার গাউনের ভেতর দিকে। ব্যথায় লোকটার নাক-মুখ কুঁচকে ওঠার আগে থামল না।

'ফাঁদ?' জানতে চাইল ও।

'না না,' হামাদার কণ্ঠে ব্যথার ছাপ স্পষ্ট। 'আক্রমণ হলেই বেযমেন্টের সব ল্যাব বন্ধ করে দেয়া হয়। কেবল মাত্র উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই সাব-লেভেল ফাইভে যেতে পারে। নিচের রিসার্চ বাঙ্কারের নিজস্ব পথ আছে বেরিয়ে যাবার। যেন কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের কোন ঝুঁকি না থাকে।'

কিনের দিকে তাকাল শেইচান, যদি প্রফেসর কিছু বলেন। 'আমিও তেমনটাই শুনেছি, কিন্তু এই লোকটা বলছিল-ওই পথটা বেশিক্ষণ খোলা থাকবে না!'

'কথা সত্যি।' সাবধান করে দিল ডাক্তার।

আর কোন উপায় না দেখে, এলিভেটরের ভেতরে ঢুকে গেল মেয়েটা; কিনকেও একই কাজ করতে বলল। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়েছে কি হয়নি, হলঘরের ওপাশ থেকে ভেসে এল একটা জোরালো বিস্ফোরণ। যেন থামাতে চাইছে ওদের।

অনেক দেরি করে ফেলছ, বাছারা...

দুপুর ১২:৪৮

মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে দিল গ্রে। গোলাকার ল্যাবের অর্ধেকটা নিচু হয়েই পার হয়েছে, শক্ত-পোক্ত একটা ওয়ার্কস্টেশনের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে। আইকো এবং পালু আছে ওদের দুই পাশে। দলের অন্য দুই সদস্য-হোগা এবং এন্ডো-বড় লাল দরজার দুই পাশে বোমা বসিয়েছে। ওটার কাছেই আছে ওরা।

গ্রের চোখের সামনেই দরজা খসে পড়ল ভেতরে।

'ওঠো!' পাশের লোকটাকে আদেশ দিল পালু।

এই লোকটার নাম ইউকিয়ো ওশিরো, রিসার্চ ল্যাবের প্রধান। কয়েক মিনিট আগে, এই ল্যাবটাকে নির্জনই পেয়েছিল। আচমকা দৌড়ে ভেতরে এসে প্রবেশ করে লোকটা! জাপানিজে চিৎকার করে বলে, বেযমেন্ট থেকে বেরোবার সব পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠে ছিল আদেশের সুর, নিশ্চয়ই ওদেরকে ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি ইউনিটের সদস্য ধরে নিয়েছে।

লোকটার বুকের দিকে অস্ত্র তাক করে, সেই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়েছিল ওরা। আইকোর আদেশে লোকটা বাধ্য হয়েছিল হাঁটু গেড়ে বসতে।

লোকটার পেট থেকে কথা বের করতে মাত্র দুই মিনিট লাগল আইকোর-পদবী, দায়িত্ব...সব। এমনকি দেয়ালের একটা সেফ খুলে ভেতর থেকে রিসার্চ ফাইলগুলোও বের করতে বাধ্য করল। রেটিনাল আইডি দরকার ছিল সেফটা খোলার জন্য। ওশিরো আপত্তি করায়, এন্ডো ওর চেহারা চেপে ধরেছিল স্ক্যানারের সাথে। এখন ফুলে উঠেছে চোখটা।

সব ফাইল দলটার ব্যাকপ্যাকে রেখে, কেন এবং শেইচানের খোঁজে আবারও নেমে পড়ল ওরা। মেয়েটার ব্যাপারে কিছুই জানেন না ওশিরো, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকানো দেখে বোঝা গেল যে কিন মাতসুই তার অপরিচিত না। যদ্দুর বোঝা গেল, বিশৃঙ্খলার সুযোগে সবার নজর এড়িয়ে পালিয়েছেন প্রফেসর। যে দরজা দিয়ে গিয়েছেন, সেটাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

বুদ্ধিমান...

খসে পড়া দরজার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে। পথে বাধা নেই বলে, সহজেই ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে থাকা এলাকায় প্রবেশ করতে পারল ওরা। ক্লিয়ারেন্স নেই ওশিরোর, তাই এই এলাকায় লোকটা কোন সাহায্যে আসবে না। তারপরও লোকটাকে নিয়ে চলল পালু। এই বৈজ্ঞানিক যা জানে, তার চেয়ে কম বলছে।

এই মুহূর্তে তাই দাম আছে লোকটার।

হলওয়ে ধরে এগোবার সময়, ছোট ছোট মেডিকেল ল্যাব এবং সার্জিকাল স্যুইট পার হয়ে এল ওরা। কয়েকবার কিনের নাম ধরে ডাকল, কিন্তু উত্তর নেই।

চিন্তায় পড়ে গেল গ্রে, জানে যে উদ্ধার কাজ চালাবার খুব একটা বেশি সময় পাবে না সে। ওশিরো এবং ফাইল-দুটোই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। ওদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ওডোকুরোর বিরুদ্ধে কাজে লাগবে।

ব্যাপারটা আইকোও টের পেয়েছে, গ্রের দিকে কড়া চোখে তাকাল একবার। এখনও যে পরিমাণ বিস্ফোরক আছে সাথে, তাতে সহজেই এই বেযমেন্ট থেকে বেরোতে পারবে ওরা। কিন্তু অহেতুক একটা মিনিটও থাকলে, কমে আসবে সেই সম্ভাবনা।

তারচেয়ে বড় কথা, কিন যদি এরিমাঝে মারা গিয়ে থাকেন?

কয়েক গজ সামনে এগিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল হোগা। দুইটা আঙুল তুলে ধরল সে, মাথাগুলো ভেজা এবং অন্ধকার।

রক্ত।

মিশনের সফলতার উপর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, সামনের দিকে ইঙ্গিত করল আইকো। হলওয়েটা শেষ হয়েছে এলিভেটরের সামনে। ওগুলোও লাল রঙ করা, পেছনে ফেলে আসা দরজাগুলোর মতোই। এক পাশে একটা ছোট্ট দরজার দিকে ইঙ্গিত করল এন্ডো, জানালা দিয়ে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু উপরের দিকে যায়নি সেটা।

কিন যদি এতদূর আসতে পারেন, তাহলে কেবল একটা দিকেই গিয়েছেন।

কিন্তু কপাল মন্দ, দরজাটা বন্ধ।

আবার বোমা বসাবার প্রস্তুতি নিল হোগা এবং এন্ডো। সেই সুযোগে ওশিরোর সামনে এসে দাঁড়াল গ্রে। 'নিচে কী আছে?'

মাথা নাড়লেন গবেষক। 'আমি জানি-'

'গুজব-টুজব নিশ্চয়ই শুনেছেন,' ওকে থামিয়ে দিল গ্রে। 'বলুন আমাকে।'

নিচের দিকে তাকালেন ওশিরো।

কলার ধরে ঝাঁকি দিল পালু। 'বল ব্যাটা।'

অনুতাপ-মাখা কণ্ঠে জবাব এল, 'মানুষ... মানুষের উপর পরীক্ষা।'

দুপুর ১২:৫০

'দ্বিতীয় ধাপ শুরু করো,' ফোনে আদেশ দিলেন তাকাশি।

'হাই, জোনিন ইতো।' নরওয়েজিয়ান সাগরে অবস্থিত কোম্পানির দ্বীপ-অফিসের কমান্ডার বলল।

বসে আছেন তাকাশি, মানস চোখেই যেন দেখতে পেলেন-এক ডজন বিমানের বাতাসে ভাসা। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তারা, ইউরোপের সবগুলো বড় বড় শহরে ছড়িয়ে দেবে ওডোকুরোর বীজ।

আদেশ দান শেষ হলে, কলটা কেটে দিলেন তিনি।

সপ্তম এবং শেষ কলটা সারলেন এইমাত্র।

ফেনিকুসু ল্যাবরেটরীজের কেন অন্যান্য দ্বীপ থেকেও এতক্ষণে বিমান উত্তরণ শেষ হয়ে যাবার কথা। অ্যান্টার্কটিক বাদে, আর কোন মহাদেশ রেহাই পাবে না। সন্তুষ্ট চিত্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, হাঁটা-চলার জন্য আজকাল ছড়ির দরকার হয়। ওটার দিকে হাত বাড়ালেন, পাতলা আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন মাথা। আগুনের ভেতর থেকে উঠতে থাকা একটা ফিনিক্স পাখির আদলে বানানো হয়েছে মাথাটাকে।

আজকাল অল্প পরিশ্রমেও ক্লান্ত হয়ে যেতে হয়।

নিজেকে সামলে নিয়ে, কাঠের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন তিনি। অফিসের দেয়ালের কাছে পৌঁছে, সরিয়ে দিলেন একটা পর্দা। ওটার পাশেই অবস্থিত তার ব্যক্তিগত সেফ। ডান হাত দিয়ে ওটাকে খুলতে দুইবার চেষ্টা করতে হলো। নতুন এই সিকিউরিটি সিস্টেম তার নাতির চাপাচাপির ফল।

তাতে লাভটা কি হলো, মাসাহিরো?

আচমকা নিজেকে খুব বৃদ্ধ মনে হলো তার। মোটা দরজাটা সরিয়ে সেফের একমাত্র জিনিসটা বের করে আনলেন তিনি। লুসাইটের ভেতরে সিল করা অবস্থায় আছে অ্যাম্বারের একটা ভাঙা টুকরা, তার ভেতরে আছে এক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ। যুবক বয়সী অ্যারিস্টোসুকাস হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে ওটাকে। ক্রিটাসিয়াস পিরিয়ডের প্রাণী ওটা, মাথা কুমিরের মতো। হাড় এবং মাথা, বোলতার সিস্টে পরিপূর্ণ।

তবে এই নিদর্শনের আদি ও অভিজাত নামটা বেশি পছন্দ তাকাশির।

দ্য ডেমন ক্রাউন।

দেয়ালের সাথে রেখে দিলেন তিনি ছড়িটা, জানেন-এই নিদর্শনকে ডেস্কের কাছে নিতে হলে দুই হাতকেই কাজে লাগাতে হবে। প্রচণ্ড ভারি জিনিসটা, কিন্তু আসলে অনেকদিন আগে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে চুরি করা নিদর্শনের একটা অংশ মাত্র। বাকিটুকু গবেষণার কাজে খরচ হয়ে গিয়েছে।

অবশিষ্ট এই অংশটুকু নিজের কাছে রাখাটা উপভোগ করেন তাকাশি। জাপানে এই নিদর্শনকে আনতে অনেক প্রাণের বলী দিতে হয়েছে। আর আজ... অবশেষে... অনেক বছর আগে করা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে চলেছেন তিনি।

ডেস্কে ফিরে এসে তাকালেন ফেলে আসা ছড়ির দিকে। ফিনিক্সের উপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি, এই বোলতার স্বভাবের এক নিখুঁত প্রতীক বলা চলে ওটাকে। ধ্বংসাবশেষ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ওডোকুরো।

অচিরেই যেমন দাঁড়াবে জাপানিজ সাম্রাজ্য।

মিয়ুর প্রতি এই তার উপহার; মেয়েটার ভালোবাসার জন্য, তার উৎসর্গের জন্য।

এত উপর থেকেও, নিচের গোলযোগের আওয়াজ কানে আসছে তার। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের, অনেক তুচ্ছ কিছু একটার শব্দ। তাই ফুজি পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালেন তিনি। পাহাড়ের উপরে খেলে বেড়াচ্ছে বিদ্যুৎ। অন্ধকার, কালো মেঘকে দেখিয়ে দিচ্ছে যেন। নিচের যুদ্ধটাকে একেবারে খেলো করে দিয়েছে ঝড়টার তীব্রতার।

তারপরও, বেশি অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ফোন তুলে নিয়ে শেষ একটা কল করলেন তিনি। তারপর রওনা দিলেন প্যাগোডার উপরে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে। তাকে একটা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্যই অপেক্ষা করছে যন্ত্রটা। এখানকার কাজ শেষ। জায়গাটা থেকে আর কিছুই পাওয়ার নেই তার।

কেবল একটা জিনিস বাদে...

যেটা শুয়ে আছে তার ডেস্কে...

মিয়ুর ভাঙা হৃদয়ের প্রতীক হয়ে।

ডেমন ক্রাউনের উপর হাত রাখলেন তিনি।

প্রতিজ্ঞা পালন করেছি আমি, হে আমার ভালোবাসা।

যোগাযোগ স্থাপন হবার পরিচিত আওয়াজটা শুনতে পেলে তিনি। সিকিউরিটি প্রধান ধরল ফোনটা। এই কলের জন্যই অপেক্ষায় ছিল লোকটা, তাকাশির শেষ আদেশের অপেক্ষা।

সেটা দিলেন তাকাশি। তার আদেশে দালান জুড়ে লাগানো ইনসেন্ডিয়ারি চার্জগুলো অচিরেই ফাটিয়ে দেয়া হবে।

বরফ-দুর্গের আগুনে পোড়ার সময় হয়েছে।

অধ্যায় পঁয়ত্রিশ

৯ মে, ভোর ৫:৫১
ওয়াইলিযকা, পোল্যান্ড

সকল আশা পরিত্যাগ করে...

খনিতে ঢোকার পথে মঙ্কের মুখ থেকে শোনা দান্তের কথাটার ব্যাপারে ভাবলেন ইলেনা। সামনের গুহার মতো জায়গাটায় প্রবেশের সময় মনে হচ্ছে যেন, এটাই সত্যি।

আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে দলের প্রত্যেকে। ক্লারার ভাই পিওতর প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে রইল। কে জানে, হঠাৎ করে আবার কখন বন্ধ হয়ে যায় এই আলীবাবার গুহা।

আঁধার কেটে এগোচ্ছে সবার জ্বলতে থাকা ফ্ল্যাশলাইট। বামদিক থেকে পানি পড়ার আওয়াজ ইলেনার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওদিকের দেয়ালে একটা কাঠের ওয়াটারহুইল আটকানো। ছাদ থেকে পানির ধারা গড়িয়ে, মেঝের ফুটো দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

মাথার উপর একটা লেকের অস্তিত্ব অনুভব করলেন লাইব্রেরীয়ান। ছাদে থাকা হ্যাচের ফাঁক গলে আসছে এই পানি। সম্ভবত ক্যাট বোলতা আকারের বোতামটা চাপার সময় হ্যাচটা ফাঁক হয়েছে। সচল করেছে প্রাচীন কাঠের চাকা আর সংশ্লিষ্ট মেকানিজমকে।

কালের বিবর্তনে সাদা ছোপ পড়েছে কাঠের গায়ে। মেকানিজম থেকে ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে আসছে মৃদু ক্যাঁচকোচ আর্তনাদ।

আওয়াজটা যেন ইলেনার গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল। অবশ্য ঠাণ্ডা আবহাওয়াও এর একটা কারণ হতে পারে। লবণাক্ততা আর স্যাঁতসেঁতে ভাবের পাশাপাশি, বাতাসে কেমন তেতো একটা গন্ধ ঝুলছে।

পানি ছলকে পড়া কোন ক্যাম্পফায়ারের মতো।

গুহা বেয়ে এগিয়ে চলল দলটা। ছাদ প্রায় তিন তলা সমান উচ্চতায়। সেইন্ট কিঙ্গার চ্যাপেলের সাথে মেলানো যায়... তবে আরও কয়েক কদম যাওয়ার পর বোঝা গেল-এটা কোন সেইন্টের ক্যাথেড্রাল হতে পারে না।

পায়ের নিচের পাথর এদিকটায় কালচে, আগুনে ঝলসানো। মেঝেতে চিহ্ন ফেলেছে কয়েকটা খুঁটির মতো কি যেন।

'পোড়া হাড়,' কাছ থেকে জিনিসগুলো লক্ষ্য করল ক্যাট। তারপর আলো ফেলল আরও কয়েকটা গর্তে। কিছু আছে স্তূপ করা, কিছু আবার ছড়ানো ছিটানো। 'সম্ভবত এখানে আটকা পড়ে যাওয়া শ্রমিকদের দেহাবশেষ।'

'তাদের ঘোড়ারও,' মাথা ঝাঁকিয়ে মঙ্ক যোগ করল।

ব্যাপারটার ভয়াবহতা আঁচ করল ক্যাট। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস মানুষ ও জন্তুগুলো সূর্যের আলো চোখে দেখত না। খনিটা যে অভ্যন্তরীণ গোপনীয়তা গোপনই রাখবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী!

পরিত্যক্ত গো'রস্তানটা পেরোনোর সময় বুকে ক্রুশ আঁকল ক্লারা। এক মুহূর্ত পর তাকে অনুসরণ করলেন ইলেনাও।

একগাদা ছাইয়ের ওপাশে, তেলতেলে কিছুতে ক্যাটের পা পড়ল। 'সম্ভবত জায়গাটাকে বিচ্ছিন্ন করতে প্রথমে কাঠ স্তূপ করা হয়, তারপর সবকিছু ভেজানো হয় তেল দিয়ে, এবং সব শেষে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সিল করে দেয় গুহাটা।'

আটকা পড়া শ্রমিকদের কথা ভাবলেন ইলেনা। দেহাবশেষগুলো যেভাবে আছে, বোঝা যাচ্ছে- মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কেউ ছোটাছুটি করেনি। এগোয়নি প্রবেশপথের দিকে। ক্লারার কাছে থেকে জানা গেছে, তারা সবাই ছিল একটা পরিবারের মতো। সম্ভবত পৃথিবীর ভালোর জন্য নিজেদের বিসর্জন মেনে নিয়েছে সহজভাবেই।

আবারও বুকে ক্রুশ আঁকলেন লাইব্রেরীয়ান। এবার সেই হতভাগ্য লোকগুলোর আত্মার শান্তি কামনায়। তাদের এই আত্মত্যাগই তৎকালীন পৃথিবীকে রক্ষা করেছে।

এরাই এখানকার সত্যিকারের সেইন্ট...

'এদিকে দেখুন!' একপাশ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন স্যাম। এখানে ঢোকার পর তিনি আর স্লাস্কি কবরস্থানের দিকে বিশেষ ধ্যান দেননি। সরে গেছেন পাশের দিকে। দেয়ালের নিচের কিছু অংশ ঝুলকালিতে ঢাকা পড়েছে। আগুনের আঁচে কালো হয়ে গেছে পাথর।

বাকিরা এগোনোর পর, উপরদিকে আলো ফেললেন দুই গবেষক। ফ্ল্যাশলাইটের আলো যেন শুষে নিল দেয়ালটা। নিজের অভ্যন্তর উন্মুক্ত করে দিল সবার সামনে।

'অ্যাম্বার!' বাকিদের উদ্দেশ্যে বললেন স্লাস্কি। 'পুরোটাই অ্যাম্বার।'

সাথে সাথে নিজেদের লাইট উপরে তাক করল সবাই। যেদিকে চোখ যাচ্ছে, সবখানেই শুধু অ্যাম্বার আর অ্যাম্বারের তাল।

'মনে হচ্ছে, রত্নের বুদবুদের ভেতর আছি আমরা,' ইলেনা বিড়বিড় করে বললেন।

'সম্ভবত তাই,' সায় দিলেন স্লাস্কি। কথা বলতে বলতে আঙুল বুলাচ্ছেন দেয়ালে। 'দেখুন কতখানি মসৃণ দেয়ালটা।'

ইলেনাও তাই করলেন। 'যেন অ্যাম্বার গলে গিয়ে ফের ঠাণ্ডা হয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন,' স্লাস্কি সায় দিলেন। 'অ্যাম্বার ১৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নরম হয়। ছাঁচে ফেলা যায় তখন। হাল আমলের জালিয়াতরা রূপা আর ছোট ছোট অ্যাম্বারের টুকরোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। নরম হওয়ার পর, উচ্চচাপে এসবের সাথে পাথরকুচি যোগ করে বড় টুকরোয় পরিণত করে।'

'এখানেও এমন কিছু ঘটেছে নাকি?' ক্যাট বিস্মিত কণ্ঠে জানত চাইল।

'বিশাল পরিসরে। যদি এই গুহাই মি. স্মিথসনের সেই নিদর্শনের উৎস হয়, তার মানে জায়গাটা লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। টেকটোনিক চাপে মহাদেশগুলো বর্তমান অবস্থানে আসারও আগেকার। তখন পাইন বনে ঢাকা টেথিস সাগরের এক অংশ ছিল এদিকটা। তাপ আর চাপ অ্যাম্বারকে সংকুচিত করে এখানে নিয়ে আসে, তারপর গ্যাসীয় চাপের ফলে তৈরি হয় এই বুদবুদ।'

'ভালো তো,' সায় দিল ক্যাট। 'ধরে নিচ্ছি, এটাই সেই উৎস। তাহলে স্মিথসন জিনিসটা ঠিক কোত্থেকে আলাদা করেছিলেন?'

গুহার ভেতরদিকে আলো ফেলল ক্লারা। দেয়াল ওখানে খোঁড়া, ভাঙাচোরা। সেদিকে এগোল সবাই।

সামনে এগোনোর সাথে সাথে দেখা গেল, লোহার তৈরি ঠেকাগাড়ির চাকা আর পুরনো কুড়ালের মাথা বেরিয়ে আছে ছাইয়ের স্তূপ থেকে। সম্ভবত আগুন দেয়ার আগে ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি এগুলো।

দেয়ালে সতর্ক চোখ রাখছেন স্যাম এবং স্লাস্কি। ডেমন ক্রাউন ছাড়াও, আরও নানা ধরণের জীববৈচিত্র নিজের ভেতর সংরক্ষণ করে রেখেছে অ্যাম্বারের এই তাল।

একটা কাঠামো চিনতে পেরে এগিয়ে গেলেন স্যাম। 'হে ঈশ্বর! এটা তো দেখছি পুরোপুরি অবিকৃত সাইলোনিয়াম!'

দলের বাকিরা জমায়েত হলো তার পাশে। অ্যাম্বারের ভেতর হাতের মুঠো আকারের একটা ডানাওয়ালা পতঙ্গ দেখা যাচ্ছে।

'বিশালাকৃতি সিকাডা,' ব্যাখ্যা করলেন স্যাম। 'প্রাথমিক ক্রেটাসিয়াস যুগের প্রাণী।'

বাকিরা পোকাটা ভালো করে দেখার আগেই আরেকদিকে ছুটে গেলেন পতঙ্গবিদ। 'আর এখানে দেখুন... অস্ট্রোরাফিডিয়ার পুরো একটা ঝাঁক... স্নেকফ্লাই এর প্রাগৈতিহাসিক প্রজাতি।'

ভালো করে দেয়ালের ভেতর তাকালের ইলেনা। প্রতিটা মাছি প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। গায়ে আবার দ্বিগুণ আকারের পাখাও আছে।'

এগিয়ে চলেছেন স্যাম। 'কারারিস্কাস, পরবর্তী জুরাসিক আমলের গুবরে পোকা... ইলেপিডোপ্টেরিক্স, প্রাগৈতিহাসিক মথ... প্রোটোলেপিস, প্রথম প্রজন্মের প্রজাপতি...'

ক্রমে দেখা গেল আরও অনেক ধরণের পোকামাকড়: বিশালাকায় পিঁপড়ার সারি, ইলেনার হাতের সমান বড় এক শতপদী, লিকলিকে ঠ্যাংওয়ালা এক মাকড়শা-আকারের দিক দিয়ে যাদের বর্ণনা পাওয়া যায় আফ্রিকান রূপকথায়... মথ, প্রজাপতি, মাছি, পাতাখেকো পোকাসহ আরও কত কি।

তবে এগুলোই শেষ নয়।

ক্যাটের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ফুটবলের আকারের একটা মাথার খুলি ধরা পড়ল। চোয়াল কুমিরের মতো, তাতে হাঙরের মতো লম্বা লম্বা দাঁত। 'সরিয়ান,' বিড়বিড় করে বলল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড।

মাথা ঝাঁকাল মঙ্ক। 'মনে হচ্ছে যেন পুরো জুরাসিক পার্ক সিনেমাটা অ্যাম্বারে সংরক্ষণ করে রেখেছে কেউ।'

'এই জিনিসগুলোর সবই স্মিথসনের সেই নিদর্শনের সমকালীন।' ক্যাট যোগ করল।

সামনে থেকে ইশারা করলেন স্যাম। 'এদিকে আসুন।' কণ্ঠে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে।

সামনে এগোতেই ভয়ের রেশ দেখা দিল ইলেনার চোখে-মুখে। পরিচিত এক ঝাঁক প্রাণী যেন বহুকাল পর আলোর মুখ দেখে, নিজেদের দেহ প্রদর্শনীতে নেমেছে। পেটের দিকে লাল আর কালো ডোরাকাটা দাগ।

'ওডোকুরো...'

সকাল ৬:০৪

তাহলে এটাই সেই জায়গা...

ক্যাটের মনে একইসাথে স্বস্তি এবং ভয়ের ঢেউ খেলছে। গত তিন মিনিট ধরে দেয়ালটা পর্যবেক্ষণ করছে ওরা। প্রতি কদমে উন্মোচিত হচ্ছে অ্যাম্বারের পরতে আটকে থাকা নতুন নতুন প্রাগৈতিহাসিক বিভীষিকা। অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের

পুরুষ থেকে শুরু করে বিশাল ডিমধারী মাদী পর্যন্ত... এক সময় দেখা গেল, আর কোন প্রাণী বাকি নেই অ্যাম্বারে। আছে শুধু ওডোকুরোর ঝাঁক।

কারণটা চোখের সামনেই স্পষ্ট।

'উহ,' স্বগতোক্তি করলেন ইলেনা। এক জায়গায় একটা সরিসৃপ পেট চেরা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। ভেতর থেকে বের হচ্ছে সদ্য জন্মানো বোলতার দঙ্গল। আশেপাশের সমস্ত কিছুর সাথে এই দুর্লভ দৃশ্যটাও বন্দী হয়ে আছে অ্যাম্বারের ফ্রেমে।

স্লাস্কি এবং ক্লারা অবশ্য এসব থেকে খানিক এগিয়ে গেছে। সামনে গিয়ে লোকটাকে ক্লারার সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পোলিশ ভাষায় কথা বলতে দেখল ক্যাট। কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ।

'কী হয়েছে?' ও জানতে চাইল।

'এগুলো এখানকার শ্রমিকদের কাজ নয়,' বলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন গবেষক। এখানকার অ্যাম্বারের কয়েকটা ব্লক গায়েব। করাত দিয়ে কাটা হয়েছে অনেক কাল আগে। ভেতরদিকে পরিষ্কার অ্যাম্বার দেখা যাচ্ছে। 'চোরদের হাত সাফাই।'

ক্যাট বুঝতে পারল। আগুন ধরিয়ে দেয়ার পর এখানে এসেছিল কেউ।

'চোরা-কারবারি,' ক্লারা ব্যাখ্যা করল।

ক্যাটের দিকে ঝুঁকে এল মঙ্ক। 'এবার বোঝা যাচ্ছে, স্মিথসন কোত্থেকে পেয়েছিলেন তার ওই ডেমন ক্রাউন। সম্ভবত চোরদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেয়েটা।

যদি তাই হয়, তাহলে এখানে ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডি সম্পর্কেও হয়তো ওখান থেকেই শুনে থাকবেন তিনি।

এখানে প্রথম আসা লোকগুলোর কথা কল্পনা করল ক্যাট। অ্যাম্বারে আটকে থাকা প্রাগৈতিহাসিক হাড়গুলো উন্মুক্ত করার পরপরই সুপ্তাবস্থায় থাকা ওডোকুরো সিস্ট দিয়ে আক্রান্ত হয় ওরা। নিজেরাও পরিণত হয় বোলতাগুলোর 'জন্মভূমি'তে।

সামনে এগোলেন স্যাম। 'বন্ধুরা, এখানে... এখানে ঝামেলা আছে।'

বাকি সবাই তাড়াতাড়ি তার সাথে যোগ দিল।

দেয়ালে প্রায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পতঙ্গবিশারদ। কয়েকটা বোলতার দিকে নজর। 'আমার ধারণা, অ্যাম্বারে আটকে পড়ার আগেই মারা গিয়েছিল এই বোলতাগুলো।'

'এই ধারণা কেন করলেন?'

‘কাছ থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন, সবগুলো পোকা আসলে বিকলাঙ্গ। এই এটাকে দেখুন, খোলস চেপ্টে আছে। চারপাশের অ্যাম্বারে ছোপ ছোপ দাগ।’

সামনে ঝুঁকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল ক্যাট এবং ইলেনা।

কথা সত্য। আসলেই চেপ্টে গেছে বোলতাটা। অ্যাম্বারে দাগ পড়েছে, যেন মৃত পতঙ্গটার গা থেকে বেরোনো পদার্থ ওগুলো।

‘আমার মনে হয়, এগুলো রক্ত,’ স্যাম বললেন। ‘মৃত্যুর আগে বোলতাটার গা থেকে বেরিয়েছে।’

সামনে এগোল মঙ্ক। ‘হতে পারে না, অ্যাম্বারের চাপে এমনটা হয়েছে?’

‘না,’ মাথা নাড়লেন গবেষক। ‘এখানকার পতঙ্গগুলোই শুধু এমন। আটকা পড়া অন্যান্য প্রজাতিগুলো কিন্তু একেবারে অবিকৃত অবস্থায় আছে। কোন আঘাত নেই বলতে গেলে। অর্থাৎ, যা-ই এই পতঙ্গগুলোকে মেরে থাকুক না কেন, ব্যাপারটা ঘটেছে অ্যাম্বারে আটকা পড়ার আগে।’

মাথা ঝাঁকাল ক্যাট। ‘যদি জানতে পারি, কীভাবে ঘটেছে ঘটনাটা তাহলে হয়তো...’

বাক্যের বাকি অংশটা ইচ্ছা করেই বলল না। এখানে আসার অর্থ মোটামুটি পরিষ্কার। কিছু একটা ছিল, যা প্রাগৈতিহাসিক এই বিভীষিকাকে ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রেখেছে। ওদের সেই প্রশ্নের উত্তরটা চাই।

আগে বাড়ল সবাই। দুই পাশের দেয়ালে আলো ফেলেছে প্রত্যেকের ফ্ল্যাশলাইট। এদিকেও দেখা গেল একই চিত্র। নিজেদের রক্তে অ্যাম্বারের তাল রঞ্জিত করে আটকে আছে ওডোকুরোর ঝাঁক।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই আঘাতের উৎসটা কোথায়?

কয়েক গজ সামনে, একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। পরনের জামাকাপড় প্রায় অক্ষতই আছে বলা যায়। গায়ের রঙ বিবর্ণ। চুল এবং দাঁড়ি, দুটোই কালো। চেহারায় ভয়ার্ত ভঙ্গি। পাশেই পড়ে আছে একটা কুড়াল। লোকটার হাতের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা।

মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট।

এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত লোকটার গলা চিরে রাখা হয়েছে।

পানির মতো পরিষ্কার এই কাজের কারণটাও।

লাশের খানিক সামনে কোমর সমান উচ্চতার একটা অ্যাম্বারের তাল পড়ে আছে। পার্শ্ববর্তী দেয়াল থেকে কাটা হয়েছিল টুকরোটা। তৎকালীন সময়ে জিনিসটার মূল্য ছিল সম্ভবত এক রাজার কোষাগারের সমান।

‘চোরা-কারবারিদের একজন,’ স্লাস্কি নীরবতা ভাঙলেন।

মাথা ঝাঁকাল ক্লারা। ‘উচিত বিচার হয়েছে।’

কাটা পড়া দেয়ালের দিকে ঝুঁকলেন স্যাম। জায়গাটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আছে। তবে এই বিবর্ণতার কারণ সেই আগুন নয়। তারপর গবেষক তাকালেন কেটে আলাদা করা টুকরোটার দিকে। অ্যাম্বারের তালের ভেতর আলো ফেলেই সাথে সাথে পিছিয়ে এলেন ভদ্রলোক। গলা দিয়ে কাতরোক্তি বেরিয়ে এসেছে।

স্যামের ফ্ল্যাশলাইটের নিচে যেন হ্যাজাকের মতো জ্বলছে টুকরোটা। উজ্জ্বলতায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভেতরে সংরক্ষিত মহার্ঘ্য। মারা যাওয়া লোকটা যে এটা চুরি করতে চাইবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন স্যাম। এক মুহূর্তের জন্য চোখ সরাননি জিনিসটা থেকে। গলা দিয়ে যেন আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল, 'প্রফেসর মাতসুইয়ের ধারণা ভুল... ভুল করেছে প্রত্যেকে!'

অধ্যায় ছত্রিশ

৯ মে, দুপুর ১:০৫
ফুজিকাওয়াগুচিকো, জাপান

'অনেক গভীরে চলে এসেছি আমরা,' এলিভেটর থেকে সাবলেভেল ৫-এ নামতে নামতে কিন বললেন। কানে অনুভব করতে পারছেন ভূ-অভ্যন্তরের চাপ। এখানকার তাপমাত্রাও উপরের চেয়ে একটু ঠাণ্ডা।

স্টিলের দরজার দিকে এগোনো করিডোরের দিকে তাকালেন তিনি।

খালি।

শেইচানকে বেরোতে ইশারা করলেন তারপর। পরনে ঢোলা গাউ, মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক। এক হাতে ডা. হামাদার কোমর ধরা, অন্য হাতে একটা ছুরি... সেটাও পেছন থেকে তাক করা বেচারার কোমরে।

'কতখানি গভীরে?' জানতে চাইল সাবেক আততায়ী।

'সত... সত্তর মিটার,' হামাদা জবাব দিল।

ভ্রূকুটি করলেন কিন। 'তার মানে, প্রায় বিশ তলা ভবনের উচ্চতার সমান। এত নিচে কী কাজ তোদের ব্যাটা?'

'প্রজেক্টগুলো গোপন ও নিরাপদ রাখা। বলা হয়ে থাকে, এই লেভেল নিউক্লিয়ার হামলা থেকেও সুরক্ষিত। তবে প্রাকৃতিক উষ্ণতারও একটা ব্যাপার আছে।'

'মানে?' শেইচানের কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা গড়াচ্ছে। থেকে থেকে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে ব্যথা... এমনকি লার্ভাগুলোর শান্ত থাকা অবস্থাতেও।'

'নিজেই দেখতে পাবেন,' বলে স্টিলের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল হামাদা। 'ইমারজেন্সি এস্কেপ স্টেশনের পথ এটা।'

এগিয়ে যেতেই দরজাটা আপনা-আপনি খুলে গেল। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। দেখা গেল, জায়গাটা একটা ল্যাব। তবে বর্তমানে পুরোপুরি খালি। অন্য মাথায় আরেকটা দরজার দিকে জ্বলজ্বল করছে সবুজ তীর চিহ্ন। সম্ভবত হামাদা ঠিকই বলছে।

দরজাটার দিকে এগোতে এগোতে চারপাশে চোখ বোলালেন কিন। পথের দুই দিকে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত ইঁদুর আর খরগোশ।

ওয়ার্কস্টেশনে সারি সারি সেন্ট্রিফিউজ, থার্মোসাইক্লার, অটোক্লেভ ইত্যাদি। তাকে সাজানো কাচের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। সেই সাথে আছে বোতলে রাখা হরেক রকম রাসায়নিক পদার্থ।

দুটো বোতলে পরিচিত লেবেল দেখতে পেয়ে গতি কমালেন কিনঃ সিএএস-৯ এবং ট্র্যাকার-আরএনএ প্লাজমিড। সাথে সাথে ফিরলেন হামাদার দিকে। 'তোরা এখানে "ক্রিস্পার/ক্যাস" অনুশীলন করছিলি, তাই না?'

শ্রাগ করল ডাক্তার।

শেইচানের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে কিন ব্যাখ্যা করলেন। 'এটা জিন প্রকৌশলের বিশেষ একটা মাধ্যম। এই বিকারকের সাহায্যে নিখুঁতভাবে ডিএনএ নির্দিষ্ট জায়গায় কেটে ফেলা যায়।'

'তো এখানে এদের কাজ কী?'

'আমরা বোলতাগুলোর জিন নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম,' জবাব দিল হামাদা। 'বের করতে চাচ্ছিলাম ওদের দীর্ঘায়ুর রহস্য।'

শীতলতা ছেয়ে গেল কিনের মনে। 'তার মানে, ওডোকুরোর দেহে থাকা ল্যাযারাস মাইক্রোব থেকে পাওয়া ডিএনএ নিয়ে গবেষণা করছিলি তোরা! বোলতাগুলো যেসব জিন অনেক অনেক আগে নিজেদের মধ্যে আত্তীকরণ করেছিল।'

সায় দিল হামাদা। 'বিগত কয়েক বছরে আমরা জানতে পেরেছি, বিশেষ উপায়ে জিনগুলো নিজেদের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয় ওডোকুরো। ব্যাপারটা শুধু দীর্ঘায়ু নয়, পুনর্জীবনের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে।'

লোকটার দিকে শীতল চোখে তাকালেন কিন। 'তোরা সব পাগল...'

'আমি প্রসারিত চিন্তাধারায় বিশ্বাসী,' যুক্তি দিল হামাদা। 'তবে এ কাজে ক্রিস্পার/ক্যাসের মতো উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন সময়। তারপরই কেবল আসল পরীক্ষা শুরু করা সম্ভব।' বলতে বলতে পাশের একটা চেম্বারের দিকে ইঙ্গিত করল।

দেহা গেল, কাচের দেয়ালের ওপাশে সারি সারি হাসপাতালের বেড রাখা আছে। মহিলা, পুরুষ, বাচ্চা... খালি নেই একটা বেডও। প্রত্যেকটাকে ঘিরে রেখেছে আইভি লাইন, ইইজি মেশিনসহ নানা ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতি। চেম্বারের একপাশে জমা বরফ বলে দিল, জায়গাটার তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি।

'সবাইকে কোমায় রাখা হয়েছে,' সাফাই গাইল হামাদা। 'আমরা নিষ্ঠুর হতে পারি, তবে দানব নই। পরীক্ষাগারের নমুনার যেন ব্যথা অনুভূত না হয়, সে ব্যাপারে কড়া নজর রাখা হয়।'

কথা বাড়ালেন না কিন। কাচের ওপাশে নিষ্ঠুরতার মাত্রা দেখে তিনি হতভম্ব। বেডে শোয়া একটা লোকের দুটো হাতই পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কালো হয়ে আছে জায়গাগুলো। একজনের পেট পুরোটা চেরা। নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আছে। আরেক মহিলাকে দেখা গেল, শরীরের নিচের অংশ বরফে জমাট বাঁধা। কাটাছেঁড়া, পোড়া, চামড়া ছাড়ানো, রেডিয়েশন... বর্বরতায় কোন অংশে একটার চেয়ে আরেকটা কম যায় না কোন বেড।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, চীনে থাকা জাপানিজ ক্যাম্পের ব্যাপারে এরকম কথা শুনেছিলেন তিনি। অতীতকে যেন বাস্তবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এখানে। শুধু এখানে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নেয়া হয়েছে আর কি।

শেইচানের চোখে-মুখে একইসাথে ভয় এবং আতঙ্কের ছাপ। জানে, তাকেও এখানে এনে পরীক্ষা করার ফন্দি এঁটেছিল হামাদা... বাচ্চাটাসহ।

এগিয়ে চলল ছোট্ট দলটা। দরজা পেরিয়ে দেখা গেল, এপাশে হলওয়ের এক গোলকধাঁধা। কিছু গিয়েছে পার্শ্ববর্তী ল্যাবে, কিছু আবার বিজ্ঞানীদের অফিসে। ইমারজেন্সি এক্সিটের দিকে ইশারা করছে সবুজ তীর চিহ্ন। তাড়াতাড়ি পা চালাল সবাই। সময় ফুরিয়ে আসছে।

হলের শেষ মাথায় লাল একটা দরজা দেখা গেল। খোলাই আছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে ওদিক দিয়ে।

দরজাটা পার হয়ে একটা সাবওয়ে স্টেশনে এসে হাজির হলো ওরা। সামনে টানেলের খোলা মুখ। ক্যাপসুল আকারের কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ক্ষুদে জানালা দিয়ে কয়েকটার ভেতরে মানুষজন দেখা গেল।

সম্ভবত পলায়নরত কর্মচারী...

কাঁধে রাইফেল ঝোলানো কিছু অবয়বও লক্ষ্য করলেন কিন। সাবধানে এগোলেন একটা গাড়ির দিকে। হামাদাকে শক্ত করে ধরে পিছু নিল শেইচান। ছুরিটা লুকিয়ে রেখেছে গাউনের ভাঁজে।

প্ল্যাটফর্ম পেরোতে পেরোতে সামনের গাড়িটা রওয়ানা হলো। বোঝা গেল, বাহনটা বৈদ্যুতিক। তবে রেইল সিস্টেমের পরিবর্তে আন্ডারকারেজের নিচে কাঁটাওয়ালা চাকা, দু'পাশে বড় বড় ধাতব স্কেট আটকানো।

এতক্ষণে কিন ধরতে পারলেন, টানেলটা আসলে মসৃণ বরফের তৈরি। কিছুক্ষণ আগে বলা হামাদার কথাটা মনে পড়ল সাথে সাথে: প্রাকৃতিক উষ্ণতা।

পানির মতো পরিষ্কার হয়ে এল পুরো চিত্র। জায়গাটা আসলে ফুজি পাহাড়ের গভীরে থাকা লাভা টিউবগুলোর একটা। আগেই জানা ছিল, পাহাড়টাকে পনিরের মত ছিঁড়েখুঁড়ে রেখেছে অগুনতি বরফঢাকা টানেল। এবার চাক্ষুষ দেখলেন আর কি।

প্রাকৃতিক সুবিধাটা নিজেদের কাজে লাগিয়েছে ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজ। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এসব লাভা টিউব যাতায়াতের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। সামনে হাঁ করে থাকা টানেলটা সম্ভবত লেক কাওয়াগুচির তলদেশ দিয়ে নিরাপদ কোন জায়গায় উন্মুক্ত হয়েছে।

আমাদেরও ওখানে পৌঁছাতে হবে... ভাবলেন কিন।

দেখতে দেখতে একে একে ছেড়ে দিল সবগুলো কাপসুল। সর্বশেষ বাহনটার দিকে এগোল দলটা। দরজা খুলতেই দেখা গেল, ভেতরের অর্ধেকটা লোক বোঝাই। তাদের তিনজনেরও জায়গা হবে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে-ভেতরকার মানুষগুলো সবাই সশস্ত্র।

এবং সবার সামনে আছে সেই কুখ্যাত ভালিয়া মিখাইলভ...

মেয়েটার পরনে সাদা পারকা। হুড মাথার পেছনে ঝোলানো। সাদা চামড়ার জন্য তাকে দেখাচ্ছে বরফের টানেলের রানীর মতো। মুখে দাম্ভিক হাসি।

হামাদাকে সামনে টেনে আনল শেইচান। মানব-ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে লোকটাকে। 'পিছিয়ে যান।' বলে কিনকে সতর্ক করল তারপর।

নিজের জায়গায় অটল রইলেন কিন। জানেন, এখন আর কোন আশা নেই।

ভালিয়ার পেছনে শক্তমুখো দলটার সবার হাতে উদ্যত অস্ত্র। ইকিত্সুও দ্বীপেরও কয়েকজন আছে দেখা গেল। প্রত্যেকে মেয়েটার নিজের হাতে বাছাই করা... অনুগত এবং বিশ্বস্ত।

এমন সময় কান ফাটানো শব্দে অ্যালার্ম বেজে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে কিন দেখলেন, হলের সবুজ তীর চিহ্নগুলো আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে ভালিয়াও। 'মনে হচ্ছে, আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দলনেতা বিজ্ঞানের প্রতি উৎসর্গকৃত এই প্যাগোডার ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।' বলে অস্ত্র তাক করল শেইচানের দিকে। 'তবে তাতে তোমাদের কিছু যাবে-আসবে না।'

ট্রিগারে চেপে বসল মেয়েটার আঙুল।

দুপুর ১:১১

ব্যাপারটা তো ভালো ঠেকছে না...

বাকিদের নিয়ে নিচের দিকে এগোচ্ছে গ্রে। হোগা এবং এন্ডো চতুর্থ তলার সাববেসমেন্ট লেভেলের লাল দরজার উড়িয়ে দেয়ার পর, শুরু হয়েছে এই অনন্ত যাত্রা। আসার পথে এক ডজনেরও বেশি জায়গায় গোলাগুলির আভাস পেয়েছে

সিগমা কমান্ডার। মড়ার উপ খাঁড়ার ঘা হিসেবে এখন যোগ হয়েছে কান ফাটানো শব্দে সাইরেনের আওয়াজ।

'জলদি!' সিঁড়ির বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বাকিদের তাড়া দিল গ্রে।

আগে আগে চলেছে আইকো। যেন পায়ে পাখনা গজিয়েছে মেয়েটার। পাল্লা দিচ্ছে হোগা আর এন্ডোও। পালু সবার পেছনে, সাথে ড. ওশিরো। লোকটাকে এক হাত দিয়ে কোমরে ধরে প্রায় বয়ে আনছে হাওয়াইয়ান।

তারপর শুরু হলো বুম বুম আওয়াজ...

কেঁপে উঠল গোটা ফ্যাসিলিটি। ধাক্কার তোর সামলাতে না পেরে পরের ল্যান্ডিং এ আছড়ে পড়ল গ্রে। কোনমতে সামলে নিয়ে তাকাল পেছনের দু'জনের দিকে।

হ্যান্ডরেইল ধরে পতন সামলেছে পালু। কিন্তু হাত থেকে ছুটে গেছে বন্দী। উপরের ল্যান্ডিং-এ রয়ে গেছে গবেষক। চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি থাকলেও বুঝতে সময় লাগল না-মুক্ত হয়ে গেছে।

লোকটার মতলব ধরতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল গ্রে। 'না!'

কে শোনে কার কথা! খরগোশের মতো লাফিয়ে একটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে গেল ডক্টর। পালু পিছু নিতে চাইছিল, কিন্তু গ্রে থামাল ওকে।

'ভুলে যাও... হাতে সময় নেই।'

উপর থেকে ওশিরোর চিৎকার কানে এল সাথে সাথে।

'দৌড়াও!'

আবার শুরু হলো ছুটে চলা। এক ল্যান্ডিং থেকে আরেকটায়, বাঁক থেকে বাঁকে। আস্তে আস্তে গরম আর ভারী হয়ে আসছে বাতাস। পেছন থেকে যেন তাড়া দিচ্ছে কোন ড্রাগন।

চলার ফাঁকে গ্রে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, আগুনের একটা দেয়াল ছুটে আসছে ওদের লক্ষ্য করে।

শ্বাসরুদ্ধকর কয়েক মুহূর্তে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছাল দলটা। নেমে এল ছোট্ট একটা হলে।

'চলতে থাকো!' গ্রে চিৎকার করে বলল।

সামনেই স্টিলের খোলা দরজা। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পড়িমড়ি করে দরজাটা পেরোল সবাই। আগুনের দেয়ালটাও প্রায় পৌছে গেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে গর্জনরত ড্রাগনের পথ থেকে সরে যেতে পারল গ্রে।

হুশ...

বাতাস চেটে মিলিয়ে গেল আগুনের ফুলকি। সাথে সাথে বন্ধ হলো স্বয়ংক্রিয় দরজা। ছাদ থেকে পানির ধারা ঝড়তে শুরু করেছে... অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা।

আরাম করার সময় নেই। সবাইকে একসাথে জড়ো করল সিগমা কমান্ডার। 'আমাদের উচিত...'

গুলির আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেল বাকি কথাটুকু। ল্যাবের অন্যদিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

আদেশের তোয়াক্কা না করে সেদিকে ছুট লাগাল দলটা।

প্রতি কদমে শব্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে...

দুপুর ১:১৫

লড়াই করো অথবা মরো।

শেইচানের হাতে একটা সিগ সয়্যার তুলে দিতে দিতে ভালিয়া নির্দেশ করল। সাবেক আততায়ী ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছে না, তবে একটা বিষয় পরিষ্কার... দুই দলের শত্রু এখন একই।

কয়েক সেকেন্ড আগে, ড. হামাদার বুকে ঢুকেছে ভালিয়ার প্রথম বুলেট। তারপরও শেইচান লাশটা নিজের শরীর আড়াল করতে কাজে লাগাবে ভেবেছিল, কিন্তু ভালিয়ার পরের গুলি গবেষকের মাথার অর্ধেক উড়িয়ে দিয়ে সেই আশায় পানি ঢেলে দিয়েছে।

তারপর শেইচানকে আদেশ করেছে ক্যাপসুলের ভেতরে ঢুকতে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সাবেক আততায়ী, কিন্তু হলের উল্টোদিক থেকে আসা গুলির আওয়াজে ভাবনার অবকাশ মেলেনি।

দেখা যায়, দুই ডজনের মতো অস্ত্রধারী ছুটে আসছে তাদের দিকে। ফ্যাসিলিটির সিকিউরিটি ফোর্স এরা। বিজ্ঞানী এবং কর্মচারীদের সুরক্ষা প্রদানই ছিল এদের দায়িত্ব, তবে এখন মত পাল্টে ফেলেছে।

সময় নষ্ট না করে কিনের হাত ধরে টান মারে রাশিয়ান, নিয়ে আসে ক্যাপসুলের ভেতর। সেই সাথে শেইচানের দিকে বাড়িয়ে দেয় পিস্তলটা।

এখন ভালিয়ার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সাবেক আততায়ী। গুলি করছে আগত বিপদ লক্ষ্য করে। নিজের পক্ষের চারজন লোক হারিয়েছে রাশিয়ান। উল্টোদিকের ক্ষয়ক্ষতি দ্বিগুণেরও বেশি। খুঁটির আড়ালে পজিশন নিয়েছে বেঁচে যাওয়া অস্ত্রধারীরা।

প্রতিবার ট্রিগার টেপার সাথে সাথে গাল বকছে ভালিয়া। কারণটা শেইচানের কাছে পরিষ্কার। মেয়েটা সিকিউরিটি ফোর্সকে পাত্তা দেয়নি। এখন তার মাশুল চুকাতে হচ্ছে।

পরমুহূর্তে স্টেশনের দরজা খুলে যেতে দেখা গেল। দৃশ্যপটে উদয় হলো নতুন একটা দল।

এই অবস্থায়ও খুশির আমেজে নেচে উঠল শেইচানের মন। গ্রে আর পালু ছুটে আসছে করিডোর ধরে। সাথে আরও তিনজন। ওদের অবশ্য মুখে মুখোশ পরা। দৌড়ের তালে তালে পজিশন নেয়া সিকিউরিটি ফোর্সের দিকে গুলি করছে প্রত্যেকে।

দ্বিমুখী আক্রমণে পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডে শেষ হয়ে গেল যুদ্ধটা। গ্রে-সহ বাকিরা এসে থামল দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার সামনে।

শেইচানকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির ঢেউ খেলে গেল সিগমা কমান্ডারের চোখে। কিন্তু পাশে ভালিয়াকে দেখে অস্ত্র তুলল তাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু নিজের শরীর দিয়ে রাশিয়ানকে আড়াল করল সাবেক আততায়ী।

'সরে যাও যামনে থেকে,' গ্রে আদেশ দিল।

কিন্তু মাথা নাড়ল শেইচান। 'সময় হয়নি।'

দুপুর ১:১৮

প্রেমিকার কাজ গ্রে-কে অবাক করেছে। এখানে আসার সময় দেখেছে-একই শত্রুর দিকে গুলি ছুঁড়ছে মেয়ে দুটো। তবে বিপদ কেটে যাওয়ার পর এখন পরিস্থিতি ভিন্ন।

ক্যাপসুলের ভেতর থাকা দলটার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে গ্রে-র বাহিনী। একই আচরণ করা হচ্ছে তাদের সাথেও। তবে ভেতরকার দলের অবস্থা করুণ। কেউ আহত তো কেউ একেবারে লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে... মারা গেছে আগেই।

হচ্ছেটা কী এখানে!

নিজের পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল ভালিয়া। তারপর পকেট থেকে ছোট একটা যন্ত্র বের করে বাড়িয়ে দিল গ্রে-র দিকে।

এক হাত দিয়ে পিস্তল ধরা অবস্থায়, অন্য হাতে জিনিসটা লুফে নিল সিগমা কমান্ডার। 'কী এটা?'

'আমি এবং আমার দলকে নিরাপদে এখান থেকে যেতে দেয়ার টিকিট,' বলে ডিভাইসটার দিকে ইঙ্গিত করল রাশিয়ান। 'গ্যাস ক্যানিস্টার ভরা একটা ওয়্যারহাউজের লোকেশন।'

'গ্যাস?'

'কীটনাশক... ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজের উদ্ভাবিত। বোলতাগুলোর বিপক্ষে কাজ করবে। তবে অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও বেশ ক্ষতিকর। পরিবেশের উপরও বিরূপ

প্রতিক্রিয়া ফেলবে, কিন্তু কাজ হবে। বছরের পর বছর এগুলো দিয়ে নিজেদের দেশের উপকূল সুরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা এঁটেছিল ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজ। এখন হাওয়াইতে কাজে লাগবে আর কি।'

মেয়েটাকে ইতিমধ্যে গুলি করে দেয়নি বলে আফসোস হচ্ছিল গ্রে-র। তবে পরের কথাগুলো শুনে অনুভূতিটা ভালো লাগায় পাল্টে গেল।

'ড্রাইভটা লক করা আছে অবশ্য। কোন ধরণের কারিকুরি ফলাতে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। শুধুমাত্র আমি এখান থেকে যাবার পরই কোডটা পাবে তুমি।'

ভ্রূকুটি করল সিগমা কমান্ডার। 'আর আমরা কীভাবে বুঝব, তুমি আসলেই সত্যি কথা বলছ?'

'আমি চাই না পৃথিবী এভাবে ধ্বংস হয়ে যাক। এটাকে নিয়ে আমার আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে। তাই গ্রহটাকে বাঁচানোর জন্য আপাতত আমার তোমাকে দরকার।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো গ্রে-র কাছে।

নিজের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চাইছে রাশিয়ান।

অবশ্য এরকম নেশা আগেই শেইচানের ভেতর দেখেছে গ্রে। একই দল থেকে এসেছে ওরা। নিজেদের ইচ্ছা পুরণের জন্য প্রয়োজনে বাঁকা পথে হাঁটতে দ্বিধা করে না।

ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে জানার পরও কীভাবে মেয়েটাকে যেতে দেব আমি?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সিগমা কমান্ডার। উত্তরটা জানাই আছে।

সময়েরটা সময়ে দেখা যাবে।

নামিয়ে নিল হাতের অস্ত্র। দেখাদেখি দলের বাকিরাও তাই করল।

'সাহায্যের চিহ্নস্বরূপ-,' ভালিয়া আবার বলতে শুরু করল। 'আমি ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে হামলা চালানোর জন্য উদ্যত বিমানগুলোতে অটো-ডেসট্রাক্ট সিগন্যাল পাঠিয়ে দিয়েছি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ওডোকুরো ছাড়ার আগেই এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ওগুলো।'

মাউই দ্বীপে আছড়ে পড়া সেসনাগুলোর কথা মনে পড়ল গ্রে-র।

ভালিয়ার কথা এখনও শেষ হয়নি। 'তো দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদের ঝামেলা বেশ অনেকটা কমিয়ে দিয়েছি আমি। এখন শুধু হাওয়াইয়ের দিকে মনোযোগ দাও।' তারপর শ্রাগ করল শেইচানের দিকে তাকিয়ে। 'তবে দুর্ভাগ্যবশত, আক্রান্তদের উপর কীটনাশকটা কাজ করবে না।'

গ্রে-ও মনে মনে তাই ধারণা করেছে। এগিয়ে গিয়ে শেইচানের হাত আঁকড়ে ধরল ও।

'তার মানে, হাওয়াইতে ছড়িয়ে পড়া আতঙ্ক বারবার ফিরে ফিরে আসতে সক্ষম। গ্যাস প্রবাহের মাধ্যমে ব্যাপারটা দাবিয়ে রাখতে হবে। বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য আপাতত আক্রান্তদের আলাদা রাখার কোন বিকল্প নেই।'

নিস্তেজ হয়ে এল গ্রে-র চোখমুখ। তাকিয়ে দেখল, পালুরও একই অভিব্যক্তি। তিক্ত হলেও রাশিয়ানের কথাটা সত্যি। এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই তাদের।

বাকি গাড়িগুলো আগেই চলে গেছে। অগত্যা শেষ ক্যাপসুলের দিকে ইশারা করল সিগমা কমান্ডার। দলবল নিয়ে উঠে এল ভেতরে।

এক ছাদের সাথে মিলিত হয়েছে সিগমা এবং গিল্ড।

গাড়িটার দরজা বন্ধ হতে হতে ফিরে তাকাল ভালিয়া। 'ওহ, তোমার জন্য আরেকটা উপহার আছে।'

দুপুর ১:২২

নিজের অফিসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাকাশি ইতো। দেখছেন ফুজি পাহাড়ের উপর বইতে থাকা ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য। থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। বজ্রপাতের আওয়াজে কাঁপছে জানালার কাঁচ।

সেই আওয়াজ যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার হৃদয়েও।

কিছুক্ষণ আগেও জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। তবে এখন নিচের ফ্যাসিলিটিতে জ্বলতে থাকা আগুনের তাপে গরম হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বিস্ফোরিত হয়েছে প্যাগোডার স্টিলের কাঠামোতে লুকিয়ে রাখা বোমাগুলো। ভাঙা কাচে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুনের শিখা।

হলওয়ে বেয়ে আসতে থাকা ধোঁয়ার সারির দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। কেউ তাকে নিতে আসেনি। বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন, বিপরীত দিক থেকে দরজা আটকানো।

তার প্রাইভেট সেক্রেটারিসহ, টাওয়ারের উপর থাকা হেলিকপ্টারের পাইলটকেও মেরে রেখে গেছে কে যেন। সর্বনাশের ষোলকলা পুরণ করতে ল্যাপটপে ভেসে আসছে একের পর এক ভিডিও-বিশ্বজুড়ে প্রলয় ডেকে আনার জন্য তৈরি বিমানগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে।

তাকাশি বুঝতে পারছেন, এসবের পেছনে মূল হোতা কে হতে পারে।

চুনিন মিখাইলভ।

এখন মনে হচ্ছে, মেয়েটা হয়তো তার নাতির মৃত্যুর ব্যাপারেও সঠিক তথ্য দেয়নি। সম্ভবত মাসাহিরোকে সে নিজেই মেরেছে। তারপরও রাশিয়ানের সাহস আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার তারিফ না করে পারলেন না তিনি। পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া অবস্থায় দেখতে চায়নি ভালিয়া। মেনে নিতে পারেনি, সবার মাথার উপর ছড়ি ঘোরাবে জাপান।

শাস্তি পাওয়া উচিত ওর।

ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাকাশি। আন্দাজ করতে পেরেছেন, কোন দিকে দিয়ে পালাবে মেয়েটা। ফাঁদ পেতেছেন ওখানেই। কাজে লেগেছে ফ্যাসিলিটির সর্বশেষ ফেইল-সেফ ব্যবস্থা।

সন্তুষ্ট হয়ে জানালা ছেড়ে ডেস্কের দিকে এগোলেন বৃদ্ধ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে গোটা ঘর। শ্বাস নেয়া কঠিন। হাঁটু গেড়ে বসার প্রয়াস পেলেন তাকাশি। কিন্তু পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে।

ব্যথা অগ্রাহ্য করে আবারও উঠে বসলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন ডেস্কের উপর রাখা এক টুকরো কাগজের দিকে। জীবনের শেষ কাজটা করতে হবে।

না তাকিয়েই কাগজটাকে একের পর এক ভাঁজ করতে শুরু করল দক্ষ দুটো হাত... এখন কাঁপছে যদিও। ঝড়ের আওয়াজ কানে আসছে এখনও, কিন্তু মনের ভেতর প্রতিধ্বনিত হওয়া থেমে গেছে।

ভাঁজে ভাঁজে ধীরে ধীরে আকৃতি পাচ্ছে কাগজটা।

খানিকক্ষণ পর ডেস্কে সুন্দর একটা কাগজের পদ্মফুল বসে থাকতে দেখা গেল।

মিয়ুর সবচেয়ে পছন্দের জিনিস...

অরিগ্যামিটা তুলে ডেমন ক্রাউনের অবশিষ্টাংশের উপর রেখে দিলেন তাকাশি। তার জন্য জিনিসটা হচ্ছে প্রিয়তমার স্মৃতির অবশিষ্টাংশ।

পৌঁছে গেছে আগুনের শিখা। চাটছে জানালার কাচ।

আর বেশিক্ষণ লাগবে না...

প্রবলভাবে জ্বলছে তাকাশির ফুসফুস। কিছুক্ষণের ভেতর শরীরটাও হারিয়ে যাবে। পরিণত হবে তার হারানো স্ত্রীর জন্য উৎসর্গ করা সর্বশেষ ধোঁয়ায়।

মিয়ু...

মনে পড়ল ওতাগাকি রেঙেতসুর লেখা উনিশ শতকের সেই কবিতাটা:

ধূপকাঠি বেয়ে ওঠা
একসারি ধোঁয়া,
কোথায় হারিয়ে যায়?
যায় না কো ছোঁয়া।

কাগুজে পদ্মটার দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা শুরু করলেন বৃদ্ধ। কি সুন্দর লাগছে ফুলটাকে। স্বর্গের প্রতিরূপ যেন।

ঠিক আমার মিয়ুর মতো...

শেষবারের মতো তাকাশি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

হে অগ্নিশিখা, আমাকে গিলে নাও... নিয়ে যাও ওর কাছে।

দুপুর ১:৪৩

মাথার উপর ঝুলতে থাকা একটা স্ট্র্যাপ ধরে ভারসাম্য রক্ষা করছেন কিন। বরফে ঢাকা লাভা টিউব ধরে ছুটে চলেছে গাড়িটা। পরিস্থিতির শিকার হয়ে একই বাহন ভাগাভাগি করলেও দুটো দল এখনও পরস্পর থেকে আলাদাই আছে। ভালিয়ারা আছে সামনে, গ্রে-র দলটা পেছনে।

কথা বলছে না কেউ। একমাত্র আওয়াজ বলতে শুধু ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জন। হঠাৎ করে থেমে গেল সেটাও। সেই সাথে নেমে এসেছে অন্ধকার।

পরস্পরের গায়ের সাথে ধাক্কা গেল দুই দলের সদস্যরা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর আলো জ্বাললো সবাই।

'কী হলো?' পালু জানতে চাইল।

গ্রে-র অবশ্য ব্যাপারটা বুঝতে বাকি নেই। 'পাওয়ার কেটে দিয়েছে কেউ।'

'কে?' এবারের প্রশ্নটা বেরোল শেইচানের মুখ দিয়ে।

'তাকাশি ইতো।' জবাব দিল ভালিয়া।

আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করেছে গাড়িটা, তবে এবার পেছনের দিকে। পাওয়ার কেটে যাওয়ায় ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে।

আগে বাড়ল গ্রে। 'দরজা খোলো। বাকি পথ হেঁটেই যাব।'

'পারবে না,' মাথা নাড়ল রাশিয়ান। 'ওই শোন।'

পরমুহূর্তে কানে এল শোঁ-শোঁ গুঞ্জন।

'কী ওটা?'

'লেক কাওয়াগুচির পানি,' ব্যাখ্যা করল ভালিয়া। 'লাভা টিউবেও বোমা বসিয়েছিলেন ইতো। যেন পরবর্তীতে প্রয়োজনে টানেলগুলো ধ্বসিয়ে দিয়ে এখানে তার কৃতকর্মের সব ছাপ মুছে ফেলা যায়।'

'হায় হায়!' কাতরে উঠল পালু। 'এখন কী হবে?'

হায়-হুতাশ করার সময় নেই। মিলেমিশে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে এখন। ভালিয়ার লোকদের দরজা খুলতে আদেশ দিল গ্রে। তারপর ফিরল এন্ডো আর হোগার দিকে। 'কয়টা ডেমোলিশন চার্জ বাকি আছে?'

দুই আঙুল তুলে ইশারা করল একজন, অন্যজন চার।

'এতেই কাজ হবে। তবে তার আগে সবার ওজনের মাধ্যমে গাড়িটা পিছিয়ে যাওয়া থেকে আটকাতে হবে,' গ্রে আদেশ করল।

দ্বিমত নেই কারও। বাইরে বেরিয়ে গা দিয়ে ক্যাপসুল ঠেলতে শুরু করল দুই দলের সবাই। কিন্তু বিধিবাম! সবার ঠেলার পরও পতন থামল না। পিচ্ছিল বরফে ঘষটে ঘষটে এগোচ্ছে ধাতব স্কেট।

এমন সময় কিনের মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

সাথে সাথে মেঝেতে শরীর গড়িয়ে দিলেন প্রফেসর। গাড়িটা তার গায়ের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সময় ঝুলে পড়লেন আন্ডারক্যারেজ ধরে। ব্যস্ত হাতে খুলতে শুরু করলেন একের পর এক ভারী ব্যাটারি প্যাকের রিলিজ হ্যাচ।

প্রায় পনেরোটা চতুষ্কোণা বাক্স আলাদা করার পর ওজন কমে যাওয়ায় অবশেষে থামল বাহনটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সবাই।

পা ধরে টেনে প্রফেসরকে উপরে তুলে আনল পালু। মুখে হাসির রেখা। লোকটার সাহসের তারিফ না করে পারল না গ্রে-ও। 'ভালো বুদ্ধি ছিল।'

'আ... আমার একটা প্রায়াস গাড়ি আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে কিন বললেন। 'তবে ওটার ওজনও এই ব্যাটারির চেয়ে অর্ধেক।'

এদিকে নিজেদের কাজ শেষ করে এনেছে হোগা এবং এন্ডো। টানেলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে ডেমোলিশন চার্জ। সব শেষে সবাইকে নিয়ে আবারও গাড়িতে উঠে এল গ্রে। তবে তার আগে চাকার খাঁজে একটা ব্যাটারি গুঁজে দিতে ভোলেনি, যাতে আবারও পেছনদিকে পতন শুরু না হয়।

দরজা আটকানো হতেই হোগার দিকে ইশারা করল সিগমা কমান্ডার। 'ফাটাও।'

ডেটোনেটরে চাপ দিতেই কানে এল মেঘগর্জনের মতো বিস্ফোরণের আওয়াজ। কয়েক সেকেন্ড পর হুড়মুড় করে পানির ধারা নামতে দেখা গেল টানেল বেয়ে।

ভ্রূকুটি করল ভালিয়া। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এসব করে লাভটা কী হবে?'

মুচকি হাসি দেখা দিল গ্রে-র ঠোঁটে। 'শ্যাম্পেনের বোতলের মুখে কর্কের যে অবস্থা হয়... সেটাই।'

কথা শেষ করার সাথে সাথে নিচ থেকে যেন ফুঁসে উঠল পানির তোড়। উপরদিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল এয়ারটাইট গাড়িটাকে।

কিছুক্ষণ পর ভাসতে ভাসতে একটা কংক্রিটের তৈরি ওয়্যারহাউজে এসে উপস্থিত হলো তাদের 'সাবমেরিন'। পাওয়ার বন্ধ করার আগেই অন্য গাড়িগুলো পৌঁছে গেছে এখানে। এখন অবশ্য খালি বাহনগুলো। ভেতরে থাকা মানুষজন ইতিমধ্যে সটকে পড়েছে।

তারাও তাই করল। বেরিয়ে এল বৃষ্টির মাঝে খোলা জায়গায়।

ঝড় থামেনি এখনও। তীব্রতার শেষ ধাপ অতিক্রম করছে মনে হচ্ছে। ভালিয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল গ্রে, উদ্দেশ্য-মেয়েটার কথা রাখার ব্যাপারটা মনে করিয়ে দেয়া।

পাল্টা নড করল রাশিয়ান। 'এমন পরিণতি হবে, আসলেই ভাবিনি।' বলে তাকাল শেইচানের দিকে। 'একটা বুলেটের মাধ্যমে সবকিছু শেষ হলে মন্দ হত না। তবে অন্তত পরস্পরকে বিদায় জানানোর সুযোগ পাচ্ছ তোমরা।' তারপর চলে গেল নিজের লোকদের নিয়ে।

দলটা উধাও হতে প্রেমিকের কাঁধে মাথা রাখল শেইচান। আসলেই বিদায় জানানোর সময় সমাগত।

ওদের আলাদা থাকতে দিয়ে অন্যদিকে দিকে চোখ ফেরালেন কিন। ফুজি পাহাড়ের ঢালের একটা অংশে আছেন তারা এখন। উপর থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে লেক কাওয়াগুচি। বিস্ফোরণের ফলে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে পানির তল।

তীর ছাড়িয়ে দেখা গেল, নিচু মেঘের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা জ্বলজ্বলে আলো।

বরফ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ...

পুড়তে থাকা কাঠামোটার দিকে ভালো করে তাকালেন কিন। মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। খানিকক্ষণ পর সন্দেহ পরিণত হলো বিশ্বাসে।

একটা ব্যাপার ভুলে গেছি আমরা...

তবে এখন খুব দেরি হয়ে গেছে।

অধ্যায় সাঁইত্রিশ

৯ মে, সকাল ৬:১৮
ওয়াইলিযকা, পোল্যান্ড

বাকিদের সাথে অ্যাম্বারের টুকরোটার উপর ঝুঁকে আছেন ইলেনা। স্যামের ফ্ল্যাশলাইট এখনও আলোকিত করে রেখেছে পিণ্ডটাকে।

'কী এটা?'

দলটাকে এক পাক ঘুরে এলেন স্যাম। কণ্ঠে নাটকীয়তা। 'গুটি বা কোকুন বলা যায়।'

ইলেনাও এটাই আন্দাজ করেছিলেন। আদ্যিকালের রত্নের ভেতর রক্ষিত আছে বিরাট আকারের একটা পিউপা। জিনিসটাকে ঘিরে রেখেছে অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের অ্যাম্বার। যেন পৃথিবীর চোখ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছে।

গুটির একপাশ চেরা। ছোট কুকুরছানা আকারের একটা প্রাণী উঁকি মারছে সেখান থেকে। বাঁকা মাথার সামনের দিকে আছে অ্যান্টেনা। কুতকুতে চোখদুটো যেন উপস্থিত সবাইকে দেখছে। পিঠের উপর ভাঁজ করা লম্বা ডানা। গুটি ছেড়ে বেরিয়ে আছে সামনের একজোড়া পা।

ইলেনা কল্পনা করলেন-প্রাগৈতিহাসিক পাইন রসের স্রোত যখন হামলা করে, প্রাণীটা তখন গুটি ছেড়ে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু সফল হয়নি। চিরকালের মতো বন্দী হয়ে হয়েছে মূল্যবান কয়েদখানায়।

মাথা ঝাঁকাল ক্যাট। 'স্যাম, আমার ধারণা-ইলেনা গুটি থেকে বেরিয়ে আসা প্রাণীটার কথা বলছেন।'

ঘুরে তাকালেন গবেষক। 'অবশ্যই ওডোকুরো। পেটের দিকটা লক্ষ্য করুন। এখান থেকেই কালো আর লালচে রঙের ছোপ দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া চোয়ালের ম্যান্ডিবলগুলো-যা কিনা পতঙ্গজগতের ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে বিবেচিত-ওগুলোও পোকাটাকে ওই প্রজাতির বলে চিহ্নিত করছে। জিন বিশ্লেষণ থেকে পুরোপুরি নি:সন্দেহ হওয়া যাবে... তবে আমি এখনই লিখে দিতে পারি।

গাল চুলকাল মঙ্ক। 'ওডকুরো সম্পর্কে প্রফেসর মাতসুইয়ের ফাইলটা পড়েছিলাম আমি। উনি তো এরকম কিছুর কথা উল্লেখ করেননি।'

'কারণ, এই ব্যাপারটা তার ল্যাবে ঘটেনি।'

'কিন্তু জিনিসটা কী?' জোর দিলেন ইলেনা।

ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকালেন স্যাম। 'আমার ধারণা, আমরা এখন একটা ওডোকুরো রাণীর দিকে তাকিয়ে আছি।'

ভ্রূকুটি করল মঙ্ক। 'যতদূর মনে পড়ে, প্রফেসর মাতসুই তো বলেছিলেন- ওডোকুরোর কোন রাণী হয় না।'

'হতে পারে ব্যাপারটা তার জানা ছিল না। উনি বলেছিলেন, ওডোকুরো হচ্ছে প্রাচীন একাকী এবং দলবদ্ধ বোলতাদেরও পূর্বপুরুষ। যারা প্রয়োজনের তাগিদে দল গঠন করে বাস করে এবং বিভিন্ন আলাদা আলাদা দরকারী কাজে নিয়োজিত করে নিজেদের।'

সায় দিল মঙ্ক। 'তার ফাইলে এটাও ছিল, প্রজাতিটার প্রজনন পদ্ধতি হচ্ছে আদিম একাকী পতঙ্গদের মতো। অর্থাৎ কোন রাণী নয়, এদের জনন ঘটে একদল ডিমধারী মাদীর মাধ্যমে।'

'ভুল হয়েছিল তার,' ক্যাট বলল।

'হয়তো পুরোপুরি নয়,' শুধরে দিলেন স্যাম। 'প্রফেসর মাতসুইয়ের ধারণাও ঠিক। এরা আসলেই একাকী এবং দলগত, দুই ধরণের বোলতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তিনি সম্ভবত ভাবেনই-নি যে এদের বংশধারায় কোন রাণীরও অস্তিত্ব থাকতে পারে। হতে পারে, এই ধরণের প্রাণী শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মায়, কোন ল্যাবে নয়।'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইলেনা। 'পালে এদের ভূমিকা কী?'

'জানি না,' স্যাম মাথা নাড়লেন। 'তবে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে। হতে পারে, সব সমস্যার সমাধান।'

ইলেনার মাথায়ও এটা এসেছে। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বসে থেকে হাঁটু ধরে গেছে একেবারে। দাঁড়াতে গিয়ে তাল সামলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই, কোমর ধরে তাকে আটকালেন স্যাম।

লোকটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি। 'ধন্যবাদ...

কিন্তু গবেষকের অন্য হাতের দিকে চোখ পড়তে মুখের কথা মুখেই থেকে গেল।

একটা পিস্তল ধরা আছে হাতটাতে।

'কেউ এক পা নড়ার চেষ্টা করবে না,' আদেশ করে জাপানিজ ভাষায় দ্রুত কিছু বললেন স্যাম।

সাথে সাথে পেছন থেকে আলোর বন্যা ধেয়ে এল যেন। মেঝেতে বেশ কয়েক জোড়া বুটের আওয়াজ শোনা গেল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোর সাথে অ্যাসল্ট রাইফেলের মাজলে আটকানো লাল লেজার লাইট।

'হাঁটু গেড়ে বসুন,' আবারও আদেশ করলেন স্যাম। 'হাত মাথার পেছনে।'

আগত অস্ত্রধারীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ইলেনা। তারপর চোখ ফেরালেন বাকিদের দিকে। নির্দেশ মেনে একে একে মেঝেতে বসে পড়ছে সবাই। তিনিও তাই করলেন।

বাকি রইল শুধু ক্যাট। স্যামের দিকে খুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। এক মুহূর্ত পর, সে নিজেও বাকিদের অনুসরন করল।

সকাল ৬:২২

'কেন?' তার অস্ত্রটা ছিনিয়ে নেয়ার সময় প্রশ্ন করল ক্যাট।

ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে, সাত সদস্যের এই অস্ত্রধারী দলটা কোন না কোনভাবে মধ্যরাতের অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়েছিল। যেভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে স্যাম ওদের ডাকলেন, তাতে এটা স্পষ্ট-লোকটার ডান কানে একটা সফিস্টিকেটেড রেডিও ডিভাইস রয়েছে। যেটা দিয়ে ট্র্যাক করা হয়েছে ওদের।

'কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন স্যাম। ইলেনা এতক্ষণ তার হাতে ধরা ছিলেন, এবার সামনের দিকে ঠেলে দিলেন মহিলাকে। বসিয়ে দিলেন বাকিদের সাথে। 'প্রতিশোধ... সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ। একজন সৎ ও দায়িত্ববান সরকারী কর্মচারী হিসেবে প্রাপ্য কিছুই পাইনি আমি। মটানায় আমাদের পারিবারিক রানশটা করের দায়ে একটা ব্যাংক জোরপূর্বক দখল নিয়ে নেয়। তাও এমন একটা ব্যাংক, যেটা দেনার বোঝা মিটেছিল আমারই আয়করের টাকায়। তো তাহলে এমন সরকার দিয়ে আমার লাভটা কী?'

দুই অস্ত্রধারী ততক্ষণে অ্যাম্বারের ব্লকটা তুলে নিয়েছে। বেরিয়ে যাবে এখুনি।

ভ্রূকুটি করল ক্যাট।

স্যাম আবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'মাতসুই ব্রাজিলে তার আবিষ্কারের ব্যাপারে আমাকে জানানোর পরপরই ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজ আমার সাথে যোগাযোগ করে। তাকাশি ইতোর হাত অনেক লম্বা। মাতসুইয়ের ব্যাপারটায় সাহায্য চাওয়ার আগেই আমার সমস্ত দেনার টাকা পরিশোধ করে দেন তিনি।' বলে শ্রাগ করলেন। 'আর তারপর ফোন করলেন আপনারা। আরও আকর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেল ফেনিকুসুর সাথে আমার চুক্তি।'

অ্যাম্বারের ব্লকটার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাট। 'এটা থেকে কী পাওয়ার আশা করছেন?'

'তাকাশি ইতোর পরিকল্পনা অনুযায়ীই সব ঘটবে। তবে অবশ্যই পুরো টাকা বুঝে পাওয়ার পর।'

'কী পরিকল্পনা করেছেন উনি?'

স্যাম হেসে ফেললেন। পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করেছেন অ্যাম্বার বয়ে নিয়ে যাওয়া লোক দুটোর পিছু পিছু। 'বিশ্বাস করুন, ওটা জানার পর আপনাদের আনন্দ হবে আজ এভাবে সহজে মরার সৌভাগ্য পাচ্ছেন বলে।' বলে বাকি পাঁচ অস্ত্রধারীর দিকে তাকিয়ে জাপানিজে বললেন, 'আমরা চলে যাওয়ার পর গুলি করবে সবাইকে। তারপর ধ্বসিয়ে দেবে টানেলের মুখ। চাই না এদের লাশ খুব তাড়াতাড়ি জনসমক্ষে আসুক।'

অ্যাসল্ট টিমের দলনেতা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। 'ঠিক আছে।'

জাপানিজে দক্ষ হওয়া প্রতিটা শব্দ ক্যাট পরিষ্কার বুঝতে পারল। অভিযানে নামার আগে পতঙ্গবিদের ব্যাপারে ভালোমতো খোঁজখবর নেয়নি বলে আফসোস হচ্ছে এখন। আসলে সময়টাই এমন ছিল, ন্যাশনাল জু-র একজন কর্মচারীকে অবিশ্বাস করার মতো কোন কারণ চোখে পড়েনি।

অ্যাম্বারের টুকরো বয়ে নেয়া লোক দুটো এবং স্যামকে একত্রে টানেল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখল ক্যাট। তাদের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল, র‍্যাম্পের নিচে একটা লাশ পড়ে আছে।

পিওতর...

মনে মনে আন্দাজ করল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড, লেকে থাকা গেরিক আর আন্তনেরও একই পরিণতি ঘটেছে। তাকাল ক্লারার দিকে। ভাইয়ের এই অবস্থা দেখেছে সে-ও। কাঁপছে থেকে থেকে। গালে পানির ধারা। স্লাঙ্কির চোখেমুখেও ভয়ের রেশ। ইলেনার দৃষ্টিতে হতবিহবল ভাব। ক্যাট জানে, স্যামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন মহিলা। হতভম্ব হয়ে গেছেন এখন লোকটার এমন ভোল পাল্টানো দেখে।

সবাইকে ছাড়িয়ে অবশেষে মঙ্কের দিকে স্থির হলো ক্যাটের নজর। মাথা নেড়ে ইশারা করল স্বামীকে।

স্যাম হয়তোবা অভিযানে যোগদানের ব্যাপারে তাকে ধোঁকা দিতে পেরেছেন... কিন্তু কিছুক্ষণ আগে, ওডোকুরো রাণী আবিষ্কারের আনন্দে অভিভূত হয়ে, মুখ ফসকে দেখিয়েও দিয়েছেন নিজের স্বরূপ। 'প্রফেসর মাতসুইয়ের ধারণা ভুল... ভুল করেছে প্রত্যেকে।' শব্দচয়নের এই ব্যাপারটাতে ক্যাটের মনে খটকা লাগে। 'সবাই' বলতে কী বুঝিয়েছে লোকটা? এই প্রজাতিটার ব্যাপারে তো স্যামের কথা হয়েছে শুধুমাত্র ক্যাটের সাথে।

তারপরও সন্দেহের বশে চুপ ছিল সিগমা এজেন্ট। পতঙ্গবিদের সাথে ঝামেলায় জড়ানোর আগে পুরোপুরি জেনে নিতে চাচ্ছিল আবিষ্কারটার ব্যাপারে। জানে, আগে হদিশ না পাওয়া এই নতুন প্রাণীটার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কোন তাৎপর্য রয়েছে। তবুও একটা ব্যাপার স্থির করে নিতে ভোলেনি ক্যাট।

একটা ব্যাকআপ প্ল্যান...

বাকিদের সাথে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে আছেন ইলেনা। মাথার পেছনে হাত ধরে রাখতে রাখতে কনুইতে খিল ধরে গেছে। খুব ইচ্ছা করছে হাত দুটো নামিয়ে গলায় ঝোলানো ক্রুশ স্পর্শ করতে। শেষবারের মতো প্রার্থনা করতে মেয়ে এবং দুই নাতির জন্য।

স্বামীর দিকে ক্যাটকে মৃদু মাথা ঝাঁকাতে লক্ষ্য করলেন তিনি। অভিযানের শুরু থেকে দেখে আসছেন, একে অন্যকে খুব ভালোবাসে এই দম্পতি। সম্মান করে। ভরসা করে। শুনেছেন দুটো মেয়েও নাকি আছে ওদের। প্রার্থনায় ওই বাচ্চা দুটোকেও সামিল করে নিলেন তিনি।

স্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অস্ত্রধারীদের দিকে তাকাল মঙ্ক। বাকিদের মতো তার হাত দুটোও মাথার পেছনে ধরা। কিন্তু এ কী! ভুল ধরতে পেরে চোখ পিটপিট করলেন ইলেনা। ওখানে তো শুধুমাত্র একটা হাত দেখা যাচ্ছে! টাইটেনিয়ামের রিস্ট কাফে নাচানাচি করছে ওটার আঙুলগুলো। প্রস্থেটিক হাতটা বেমালুম গায়েব।

এবার গোটা ব্যাপারটা ধরতে পারলেন লাইব্রেরীয়ান। অস্ত্রধারীরা আসার আগেই নিজের নকল হাতটা খুলে কোথাও রেখে দিয়েছে মঙ্ক। সিগমা হেডকোয়ার্টার থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে লোকটা দেখিয়েছিল, কীভাবে জিনিসটা দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও।

টালিনে লাইব্রেরীতে হামলার ব্যাপারটাও মনে করলেন ইলেনা।

কিন্তু জিনিসটা গেল কোথায়?

ফিসফিস করে একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করল মঙ্ক। 'বুম!'

সাথে সাথে ইলেনার গায়ের উপর আছড়ে পড়ল ক্যাট। মহিলাকে নিরাপত্তা দিল নিজের শরীর দিয়ে। ওদিকে স্লাস্কি এবং রুসমার সাথেও একই কাজ করেছে মঙ্ক। পরক্ষণে কানে এল বিকট শব্দে বিস্ফোরণের আওয়াজ।

মেঝেতে পড়ে রইলেন ইলেনা। তবে বিস্ফোরণের পর এক মুহূর্ত দেরি করেনি ক্যাট। লাফিয়ে উঠে কেড়ে নিয়েছে কাছে থাকা হতভম্ব অস্ত্রধারীর রাইফেল। পরপর কয়েকটা ট্রিগারের চাপে ফুটো করে দিয়েছে সেই লোকটাসহ আরও একজনের বুক।

সিগমা এজেন্টের দিকে অস্ত্র তাক করল আরেকজন। তবে চোখের পলকে আছড়ে পড়ল বুকে একটা পুরনো কুড়ালের হাতল নিয়ে। এটা সেই খনি চোরের অস্ত্রটা। মঙ্কের হাত থেকে বেরিয়ে, নিখুঁত নিশানায় লক্ষ্যভেদ করেছে।

বাকি দুই অস্ত্রধারী অবশ্য প্রস্থেটিক বিস্ফোরণে পটল তুলেছে আগেই।

তড়িঘড়ি করে দুটো রাইফেল তুলে নিল মঙ্ক। স্লাস্কির দিকে বাড়িয়ে দিল একটা। 'চালাতে পারেন?'

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল লোকটা। তবে আগে বাড়লেন ইলেনা। অস্ত্রটা নিয়ে চেক করলেন কাঁপা কাঁপা হাতে। আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস ফিরতে শুরু করেছে। 'আমার জন্য কোন ব্যাপার না। লস অ্যাঞ্জেলেসের পূর্বদিকে এসব দেখতে দেখতেই বড় হয়েছি।'

হেসে ফেলল মঙ্ক। 'আপনি তো দেখছি খুব কাজের লাইব্রেরীয়ান।'

তবে ক্যাটের মুখ কঠিন। 'আমাদের অনুসরণ করুন। তবে র‍্যাম্পের কাছাকাছি থাকবেন।'

'কী করতে যাচ্ছেন আপনারা?'

স্বামীর দিকে ইশারা করল মেয়েটা। 'কাজ।'

সকাল ৬:৩৯

গুহা বেয়ে এগোতে এগোতে নতুন ফন্দি আঁটল ক্যাট। 'বেরিয়ে যেতে হবে এখানে থেকে। আমি আর মঙ্ক আগে থাকব, আপনারা সবাই আমাদের পেছনে।'

মাথা ঝাঁকালেন ইলেনা। শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন রাইফেলটা। সম্ভবত স্যাম এবং তার দুই সঙ্গী বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারবেন না, আওয়াজটা তার লোকেদের টানেলের মুখ ধ্বসিয়ে দেয়ার ফলে হয়েছে কি না।

থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা টানেল। বিস্ফোরণে সম্ভবত দুর্বল হয়ে পড়েছে বয়সের ভারে জর্জরিত ঝিনুকের খোল।

'তাড়াতাড়ি,' তাড়া দিল ক্যাট।

নাকে লবণের গুঁড়ো ঢুকতে সতর্কতা আরও বাড়াল সিগমা এজেন্ট। ইশারা করল বাকিদের উদ্দেশ্যে। 'পেছনে! পেছাতে হবে আমাদের।'

এক মিনিটেরও কম সময়ে ভেঙে পড়া টানেলের মুখে চলে এল সবাই। তবে পুরো পথ বন্ধ করার বদলে পার্শ্ববর্তী টানেলে উন্মুক্ত হয়েছে গুহামুখ। পানি গড়াচ্ছে মেঝেতে।

'যান,' ক্যাট ইশারা করল। 'তাড়াতাড়ি।'

ভেঙে পড়া লবণের আকরিকে পথ রুদ্ধ থাকায় হাঁটতে বেগ পেতে হচ্ছে। কয়ে মুহূর্ত পর ঝিনুকের কেন্দ্রে চলে এল দলটা। লুকানো অস্ত্রধারীর খোঁজে আশেপাশে তাকাল ক্যাট। একটু পর নিশ্চিত হলো, কেউ নেই। শুধু লেকের পাড়ে পড়ে আছে দুটো লাশ। ক্লারার ভাই।

অস্ত্রে শক্ত হয়ে চেপে বসল ক্যাটের আঙুল। লাশগুলোর পাশে জেট স্কি-টা এখনও আছে, তবে জোডিয়াক পন্টুন গায়েব। একপাশে কয়েকটা স্কুবা ট্যাঙ্কও দেখা গেল। এগুলোর সাহায্যেই গোপনভাবে লেকে ঢুকেছে স্যামের অস্ত্রধারীরা।

বাকিদের বেরিয়ে যেতে ইশারা করল সিগমার সেকেন্ড ইন কমান্ড। 'ইলেনা, ক্লারা এবং স্লাস্কির সাথে থাকুন। যদি কেউ ফিরে আসার চেষ্টা করে তাহলে...'

রাইফেল উঁচু করলেন ইলেনা। 'তাহলে তাকে মূল্য চুকাতে হবে।'

সায় দিয়ে জেট স্কি-র দিকে তাকাল ক্যাট। গেরিকের প্রতি মৃদু নড করে কোমর থেকে খুলে আনল বাহনটার চাবি। তারপর স্বামীকে নিয়ে চড়ে বসল স্কি-তে।

সামনের দিকে ঝুঁকল মঙ্ক। প্রস্থেটিকটা না থাকায় ওর পক্ষে একহাতে কন্ট্রোল সামলানো মুশকিল। ক্যাটকেই করতে হবে কাজটা। 'আ...'

'আমি জানি, সাবধানে চালাব।'

'আরে না,' মাথা নাড়ল সিগমা এজেন্ট। 'বলতে চাচ্ছি, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'ওহ,' মুচকি হেসে কন্ট্রোলের উপর ঝুঁকল ক্যাট। 'আমিও।'

'এখন চলো, কিছু খারাপ লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেই।'

এজন্যই তো ভালবাসি তোমাকে... আমাদের চিন্তাধারা বরাবরই এক...

ইঞ্জিন চালু করল ক্যাট। লাফিয়ে আগে বাড়ল জেট স্কি। এগিয়ে চলল লেক ধরে। বাঁকের মুখেও গতি কমাল না একটুও। সামনে, বেশ খানিকটা দূরে জোডিয়াকের হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। পেছনের আওয়াজে গা করল না আরোহীরা। ভাবছে হয়তো ওদের লোকই আছে বাহনটায়।

তবে খানিকক্ষণ পরই সন্দেহ দূর হলো ওদের। স্কি লক্ষ্য করে গুলি করল এক অস্ত্রধারী। স্টিয়ারিং-এ দক্ষ হাতের মোচড়ে বুলেটগুলো এড়াল ক্যাট। এদিকে পিস্তল নিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছে মঙ্ক। একজনকে ঘায়েল করতে গিয়ে খালি হয়ে গেল পুরো ক্লিপ। তবে কাজ হয়েছে। বুকে একজোড়া বুলেট নিয়ে সলিল সমাধিতে গেল লোকটা।

তারপর তুলে নিল ক্যাটের রাইফেল। কাঁটা হাতের কব্জিতে মাজল রেখে, নিশানা স্থির করে গুলি করল জোডিয়াকের কিনারে। ফুটো করে দিল পলকা কাঠামোটা।

পাল্টা গুলি করছিল অন্য অস্ত্রধারী। বাহুতে গুলি লাগায় ভারসাম্য হারিয়ে বসে পড়ল লোকটা। তারপর বুকে গুলি খেয়ে, একপাক ঘুরে আছড়ে পড়ল পানিতে।

ডুবতে শুরু করেছে জোডিয়াক। স্কি নিয়ে সেদিকে এগোতে এগোতে পানিতে হারিয়ে গেল মহামূল্যবান অ্যাম্বারের টুকরোটা। স্যাম আগেই পানিতে লাফ দিয়েছেন। সাঁতরে এগোচ্ছেন পাড়ের দিকে। যেন জাহাজডুবি থেকে বাঁচতে চাইছে ভেজা বেড়াল।

অ্যাম্বারের কথা ভেবে হায় হায় করে উঠল মঙ্ক। ততক্ষণে পাড়ের দিকে এগোতে শুরু করেছে স্কি। কিন্তু জায়গায় জায়গায় পাথরের টুকরো থাকায় গতি এখন মন্থর।

ওদিকে স্যাম পৌঁছে গেছেন কিনারায়। পড়িমড়ি করে ছুটছেন সামনের দিকে।

স্কি থামিয়ে স্বামীর হাত থেকে রাইফেলটা নল ক্যাট। নিশানা স্থির করে ট্রিগার টিপল। ফস্কে গেল দুটো গুলিই। ছুটন্ত টার্গেটকে এভাবে ঘায়েল করা যাবে না বুঝতে পেরে এবার ভিন্ন পথে হাঁটল সিগমা এজেন্ট। গুলি করল দৌড়াতে থাকা পতঙ্গবিদের মাথার উপর, সিলিং-এ।

কয়েকটা গুলি লাগতেই ধুপধাপ আওয়াজে ঝড়তে শুরু করল ছোট বড় লবণের আকরিকের চাঁই এবং চোখা স্ট্যালাগমাইটের দণ্ড। এক মুহূর্ত পর স্যামের কান ফাটানো চিৎকার শোনা গেল।

সন্তুষ্ট হয়ে স্কি চালানোয় মন দিল ক্যাট। পাড়ে উঠে এল কয়েক মুহূর্ত পর। দেখা গেল, মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছেন পতঙ্গবিদ। একটা লবণের চাঁই বেচারার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে। বুক এবং উরু ভেদ করেছে বড় আকারের দুটো স্ট্যালাগমাইটের বল্লম।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে লোকটা।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে ক্যাট। সদ্য হওয়া ক্ষততে আমূল ঢুকে আছে লবণের টুকরো। এর চেয়ে যন্ত্রণাকর কিছু হতে পারে না। তাকে ওভাবেই থাকতে দিয়ে টানেল ধরে এগোল দুই সিগমা এজেন্ট।

প্রকৃতির রায়ই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট বিচার...

আবারও স্কি-তে উঠতে উঠতে মিলিয়ে গেল পতঙ্গবিদের কান্না। মৃত্যু তাকে মুক্তি দিয়েছে।

আধ-ডোবা জোডিয়াকের সামনে এসে পানি লক্ষ্য করল মঙ্ক। অ্যাম্বারের টুকরোটার কোন নাম-নিশানা নেই। 'ডুবুরি লাগবে।'

'আরে দাঁড়াও,' মুচকি হাসল ক্যাট। বলতে না বলতে খানিকটা সামনে ভেসে উঠল বড় আকারের কিছু একটা। 'অ্যাম্বার পানিতে ভাসে।'

'তাই?' মঙ্কের কণ্ঠে বিস্ময়।

'হ্যাঁ। লবণ পানির তুলনায় জিনিসটার ঘনত্ব কম। এজন্যই বাল্টিকের তীরে সবচেয়ে বেশি অ্যাম্বার পাওয়া যায়। সাগরের পানিতে ভেসে পারে এসে ওঠে।'

'যাক বাবা...' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মঙ্ক। 'তো এখন বল আমাকে।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট। অ্যাম্বারে আবদ্ধ ওটোকুরো রাণীর দিকে নজর। জিনিসটা তো পাওয়া গেল। কিন্তু আসলেই কোন লাভ হলো কী?

স্বামীর অনুচ্চারিত প্রশ্নটাও আন্দাজ করতে পারছে।

কী হবে এটা দিয়ে?

অধ্যায় আটত্রিশ

৯ মে, বিকেল ৪:১৮
টোকিও, জাপান

বরফ দুর্গ ধ্বংসের দুই ঘণ্টা পর, জাপানের পাবলিক সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কনফারেন্স রুমে পায়চারি করছে গ্রে। হেডকোয়ার্টারটা একেবারে টোকিও শহরের মাঝখানে, অনেকটা আমেরিকার ন্যাশনাল মলের মতো। জাপানের ইম্পেরিয়াল প্যালেস নজরে পড়ে এখান থেকে। সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

পেইন্টার ক্রো-র সাথে ভিডিও কনফারেন্সের জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। এখানে কী হয়েছে, সব আগেই ডিরেক্টরকে বিস্তারিত জানিয়েছে গ্রে। টোকিওতে পৌঁছার সাথে সাথে দেখা যায়, ভালিয়া নিজের কথা রেখেছে। পাঠিয়ে দিয়েছে ডিভাইসটা আনলক করার কোড। সাথে সাথে ওখানে মিলিটারি ফোর্স পাঠিয়েছে আইকো। উদ্ধার করা হয়েছে ফেনিকুসু ল্যাবরেটরীজের মজুদ করা গ্যাস ক্যানিস্টারগুলো।

ইতিমধ্যে হাওয়াইয়ের দিকে রওয়ানা হয়েছে এক স্কোয়াড্রন জাপানি ট্যাংকার বিমান। বোলতার ঝাঁকের ক্ষেত্রে মরণফাঁদ হিসেবে কাজ করলেও, দুর্ভাগ্যবশত আক্রান্তদের কোন কাজে আসবে না এই কীটনাশক।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ওষুধটা আর্থ্রোপোডা গোত্রসহ অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও খুব বিষাক্ত। দ্বীপগুলোর ইকোসিস্টেমকে প্রায় ধ্বসিয়ে দেবে বলা চলে। তাছাড়া আক্রান্তদের উপর কাজ না করায়, প্রতিনিয়ত নজর রাখতে হবে ওখানে। আটকে পড়া প্রাণীদের দেহ ফুঁড়ে নতুন পতঙ্গ বেরিয়ে আসার সাথে সাথে আবারও করতে হবে স্প্রে।

অবশেষ কল চলে এল।

ঘরে জমায়েত হওয়া সবাইকে দেখল গ্রে। বিশেষ করে প্রফেসর মাতসুইকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে বলেছেন সিগমা ডিরেক্টর। শেইচান আর পালুও আছে পাশে। চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। জানে, আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা

সময় আছে হাতে। তারপর আগের চেয়ে দশগুণ বাড়ন্ত অবস্থায় ফিরবে ব্যথার ধাক্কা... তৃতীয় ইনস্টার মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে।

দেয়ালে আটকানো বিশাল মনিটরে প্রাণ ফিরে এল। বিস্মিত হলো গ্রে। ভেবেছিল, পেইন্টার নিজেই থাকবেন কলে। কিন্তু পরিবর্তে দেখা যাচ্ছে ক্যাট ব্র্যায়ান্টের চেহারা।

'ক্যাট?' সামনে ঝুঁকল সিগমা কমান্ডার। 'কোথায় তুমি? কী হয়েছে?'

'আমি ক্রাকভে। একটা ছোট্ট অ্যাম্বার মিউজিয়ামে। পেইন্টার এই কলটার ব্যবস্থা করেছেন। খুব গুরুতর বিষয়।'

'কেন?'

'এখানে একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি আমরা। তবে তাৎপর্য বুঝতে পারছি না। যে লোকটা সাহায্য করতে পারত... যাক গে, ওকে মেরে ফেলেছি আমি। তাই আশা করছি, প্রফেসর মাতসুই হয়তো কিছু করতে পারবেন।'

ভ্রূকুটি করল গ্রে। 'কী পেলে?'

সংক্ষেপে পোল্যান্ডের ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা করল ক্যাট-লবণের খনি, অ্যাম্বারের বুদবুদ, ব্লকে আটকে পড়া প্রাগৈতিহাসিক জীব... সব। 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি,' বলে ক্যামেরা অপারেটরের দিকে ইশারা করল। 'মঙ্ক, টেবিলের দিকে নাও তো।'

কেঁপে উঠল ছবিটা। তারপর স্থির হলো একটা টেবিলের উপর। বড় আকারের এক অ্যাম্বারের ব্লক ওখানে রাখা। ভেতর আটকে আছে কিম্ভূতকিমাকার জীব।

'হে ঈশ্বর!' লাফিয়ে আগে বাড়লেন কিন। 'এটা তো একটা গুটি! ভেতর থেকে পতঙ্গ বের হচ্ছে।'

স্ক্রিনে ফিরে এল ক্যাটের চেহারা। 'প্রফেসর মাতসুই, এটা কি ওডোকুরো রাণী হতে পারে?'

'ন... না... মানে... দাঁড়ান, দেখি। হ্যাঁ, যা বলছেন তাই।' বলে ঠোঁট চাটলেন প্রফেসর। 'পতঙ্গটার ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বলুন আমাকে। কীরকম দেখছেন সামনে থেকে, মৃত পোকাগুলো কেমন ছিল ইত্যাদি, সব।'

দৃশ্যটা ব্যাখ্যা করল ক্যাট। 'স্যামের ধারণা, বোলতাগুলোর গা থেকে রক্ত ঝড়ছিল। আর নয়তো বের হচ্ছিল কিছু একটা।'

'ভেতর থেকে বাইরে,' বিড়বিড় করলেন কিন।

'ঠিক তাই।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন প্রফেসর। 'এখন বুঝতে পারছি, আমি ভুল করেছিলাম... একেবারে প্রথম থেকেই।'

'কীরকম?'

'এমন রাণী শুধু পালের মধ্যে জন্মায়। অনুকূল পরিবেশে।'

'তো?' জোর দিল ক্যাট। 'এসবের অর্থ কী?'

'যার মানে আমি গামা টিমের রিসার্চ সম্পর্কেও ভুল ভেবেছিলাম।'

'গামা আবার কী?' অবাক হলো গ্রে।

'ফেনিকুসু ল্যাবের একদল গবেষক আর কি,' কিন মাথা ঝাঁকালেন। 'হারানো একটা প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করছিল ওরা। নাম দিয়েছিল, গোস্ট পেপটাইড। এরকম নামের কারণ হচ্ছে-ওরা জিনগুলো সনাক্ত করতে পেরেছিল, কিন্তু এগুলো কোন প্রোটিনের জন্য কোড করা সেটা বের করতে পারেনি। জিনিসটা পতঙ্গের টিস্যু গলিয়ে দিতে পারে।'

অ্যাম্বারের টুকরোটার দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাট। 'ভেতর থেকে বাইরে।'

সায় দিলেন প্রফেসর। 'আমি ভেবেছিলাম, ওটা পুরনো এক কোড যেটা সময়ের সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে থেকে বের করে দিয়েছে ওডোকুরো। এমন এক তালা, যার কোন চাবি নেই। মনে করেছিলাম, শুধু শুধু গামা টিম সময় নষ্ট করছে।'

'আর এখন?'

শ্রাগ করলেন কিন। 'এই রাণীই হচ্ছে সবকিছুর চাবিকাঠি।'

'কীভাবে?' টুকরোটার দিকে তাকাল ক্যাট।

'সাধারণ হাইমেনোপটেরা পতঙ্গের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে বসেছিলাম আমি। যেগুলোকে আপনারা বোলতা নামে ডাকেন আর কি।'

'কোন বৈশিষ্ট্য?' এবারের প্রশ্নটা এল গ্রে-র মুখ থেকে।

'সামাজিক পতঙ্গের ঝাঁকে একটা রাণী থাকে, একমাত্র যে কিনা শীতকালে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। বাকিরা ঠাণ্ডায় মারা গেলেও টিকে থাকে গর্ভবতী রাণী। বসন্তের উষ্ণতায় লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে জন্ম দেয় নতুন একটা পালের।'

গ্রে বুঝতে পারল, নিজের ট্র্যাকে ফিরে গেছেন প্রফেসর।

কিনের বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি। 'এজন্যই রাণীকে আমরা আগে কখনও দেখিনি। সে শুধুমাত্র তখনই আসবে, যখন গোটা পালের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। এসে জন্ম দেবে এক নতুন প্রজন্ম। তবে তার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে-আসলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আগের ঝাঁকটা। না হলে... ব্যবস্থা নেবে নিজেই।'

'কী ব্যবস্থা?'

'নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। সম্ভবত এক ধরণের ক্ষমতাশালী এবং প্রাণঘাতী ফেরোমোন ত্যাগ করে প্রাণীটা। আপনি তো বলেছিলেন, অ্যাম্বারের বুদবুদের ভেতর যেখানে রাণী আটকে ছিল, সেখানকার অ্যাম্বারের রঙ নাকি অন্য জায়গায় তুলনায় একটু বেশি গাঢ়।'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে গ্রে। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, তখন ওই ফেরোমোন ছাড়ছিল এই রাণী। এগুলোই অ্যাম্বারের রঙ পাল্টে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন কিন। 'গামা টিমের গোস্ট পেপটাইডওয়ালা সেই রাসায়নিক পদার্থ। হারিয়ে যাওয়া তালার চাবি। যা পালের অন্যান্য পতঙ্গের জন্য মারাত্মক বিষাক্ত হবে।'

'শুধু পতঙ্গ?' জানতে চাইল ক্যাট।

'এবং তাদের লার্ভাও।'

আশার আলো ছড়িয়ে পড়ল গ্রে-র মনে।

স্ক্রিনে আরেকজনকে ডাকল ক্যাট। 'ড. স্লাস্কি, যতদূর মনে পড়ে আপনি কথায় কথায় বলেছিলেন-পোল্যান্ডের সফিস্টিকেটেড ম্যাস স্পেকট্রোমিটারওয়ালা দুটো ল্যাবের মধ্যে আপনারটাও একটা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন ভদ্রলোক।

'তাহলে বিবর্ণ অ্যাম্বারের নমুনা পেলে আপনি কি শনাক্ত করতে পারবেন ওখানে কোন ধরণের রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে?'

'উপযুক্ত সময় পেলে, পারব হয়তো।'

'এই সময় ব্যাপারটাই এখন আমাদের হাতে একেবারেই নেই।'

মাথা চুলকালেন গবেষক। 'আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব।'

সকাল ৮:৩৭

'এই তো... এটাই!' কিন ঘোষণা করলেন।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফুটে আছে জিনিসটার আণবিক ডায়াগ্রাম।

এখনও কনফারেন্স রুমে আছেন কিন। আছে বাকি সবাই। দেয়ালে আটকানো মনিটরে পোল্যান্ডের ভিডিও কনফারেন্স চলছে। ওখানে ক্যাটকে ঘিরে রেখেছে বিজ্ঞানীদের বিশাল একটা দল-জিনবিদ, জৈব রসায়নবিদ, আণবিক জৈববিশারদ ইত্যাদি।

চার ঘণ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে এসেছে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

'আপনি কি নিশ্চিত এটাই সেই জিনিস?' গ্রে জানতে চাইল। 'কোন ভুল হয়নি তো?'

মাথা নাড়লেন স্লাস্কি। 'আমি নিশ্চিত।'

'কীভাবে?'

হাসলেন কিন। উত্তরটা তার মুখ থেকে বেরোল। 'কারণ গঠনটা অনেকটা মৌমাছি রাণীর গা থেকে বের হওয়া অ্যারোমেটিক কিটোনের মতো। অন্যান্য হাইমেনোপটেরা গোত্রও কাছাকাছি ধরণের ফেরোমোন ছাড়তে সক্ষম।'

'এটা তো পালের বাকি পতঙ্গগুলোকে মেরে ফেলবে, তাই না?'

সায় দিলেন প্রফেসর। 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এমনটাই হয়ে আসছে। এই কিটোনের মাধ্যমে পুরনো প্রজন্মকে খতম করে নতুন প্রজন্মের পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে রাণীরা।'

'আর চিকিৎসা হিসেবে এটা প্রয়োগের ফলাফল কী?'

'জিনিসটা অন্য কোন প্রজাতির ক্ষতি করবে না। তাছাড়া পৃথিবীর যে কোন আধুনিক ল্যাবে প্রচুর পরিমাণে বানানোও সম্ভব। পানি বা বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হলে, নিঃশ্বাস বা খাবারের সাথে আক্রান্ত প্রাণীর রক্তপ্রবাহে পৌঁছে যাবে সহজেই। মেরে ফেলবে অভ্যন্তরীণ লার্ভাদের।'

'আর মানুষের ক্ষেত্রে?' গ্রে-র কণ্ঠে ঠিকরে পড়ছে খুশির রেশ। চোখের কোনে চিকচিক করছে পানির ফোঁটা।

'পার্থক্য নেই। শিরা বা মাংসপেশীতে একটা ইনজেকশনই যথেষ্ট হবে। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে আমি অবশ্য টানা কয়েকদিন প্রয়োগ করতে বলব।'

শেইচানের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গ্রে।

'তাহলে এটাই সেই প্রতিকার!'

অধ্যায় উনচল্লিশ

২৩ মে, রাত ১০:১৮
ওয়াইলিযকা, পোল্যান্ড

সেইন্ট কিঙ্গার চ্যাপেলে, মঙ্কের পাশে বসে আছে ক্যাট। ভূ-গর্ভস্থ ক্যাথেড্রালে ক্লারার তিন ভাইয়ের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বেদীর উপর শোভা পাচ্ছে পাথরের তৈরি ক্রুশ। দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুরেলা কণ্ঠের গান।

সামনের সারিতে বসেছে ক্লারা। সামনে তিন ভাইয়ের কফিন। অ্যাম্বারের তৈরি সবগুলো। পৃথিবীর হিসেবে জিনিসগুলো মহামূল্যবান হলেও, তাদের দুনিয়ায় অর্থহীন। তবুও এগুলো বানানো হয়েছে তিন যুবকের প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে। পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তাদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এখানেই দাফন করা হবে ওদের... এই চ্যাপেলের নতুন সেইন্ট হিসেবে।

'পিওতর, গেরিক, আন্তন,' ক্যাট ফিসফিস করে বলল।

আমরা তোমাদের ভুলব না।

স্ত্রীর হাত ধরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মঙ্ক। অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য ওয়াশিংটন থেকে এসেছে ওরা। আবার ফিরে যাবে রাতেই।

দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। শান্ত হয়ে আসছে হাওয়াইয়ের পরিস্থিতি। বিমানে করে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে অন্যান্য প্রজাতির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সেই অ্যারোমেটিক কিটোন। আস্তে আস্তে কমে আসছে ওডোকুরোর প্রভাব। আগেই আইকোর মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে বিষাক্ত ওই গ্যাসের প্রয়োগ বাতিল করে দেয়া হয়। হাসপাতালে আক্রান্তদের ইনজেকশন দেয়ার কাজ শেষ হয়েছে। দ্বীপগুলোর উপর কড়া নজর রাখছে প্রাণী এবং পরিবেশবিদরা।

হাওয়াইয়ের অবস্থা শান্ত হয়ে আসার পাশাপাশি, ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের দিকে নজর দিয়েছে ক্যাট। আন্তর্জাতিক সাহায্য সাথে নিয়ে কাজে নেমেছে আইকো।

অবশেষে জানা গেছে মেয়েটার নব্যগঠিত ইন্টেলজেন্স এজেন্সির পরিচয়ঃ টাকো নো উডে, সংক্ষেপে টাউ। জাপানিজ শব্দগুলোর অর্থ একত্র করলে দাড়ায়-অক্টোপাসের পা। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির জন্য খুব একটা উপযুক্ত নাম না যদিও।

তবে আরেকটা ব্যাপ্যার জানে ক্যাট। গ্রীক বর্ণমালায় সিগমা-র পরই থাকে টাউ নামের হরফটা।

দ্বিতীয় সারির দিকে তাকাল সিগমা এজেন্ট। ড. স্লাস্কির সাথে প্রফেসর মাতসুই বসে আছেন ওখানে। দুই গবেষকও তাদের সাথে এখানে এসেছে। অ্যাম্বারে রক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক নমুনাগুলো দেখার লোভ সামলাতে পারেননি কেউ।

ওয়াশিংটনে নতুন একটা পদ দেয়া হয়েছে কিনকে। ন্যাশনাল জু-র পতঙ্গবিদ্যা বিভাগের প্রধান। তবে প্রফেসর দ্বিধায় ভুগছেন, চাকরিটা নেবেন কি না।

ক্যাট আশা করছে, নেবেন।

আবারও ক্লারার উপর স্থির হলো সিগমা এজেন্টের নজর। মেয়েটাকে বেশ শক্তই দেখাচ্ছে এখন। তবুও চেহারা থেকে ব্যথার রেশ কাটেনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আরও একজনকে প্রিয়জন হারানোর কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়নি। খবর এসেছে, গতকাল হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন টালিনের ডিরেক্টর টাম। বাবাকে নিয়ে খুশিমনে বাড়িতে ফিরেছে লারা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ক্যাট। তাকাল কফিন তিনটার সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকা ছেলেটার দিকে।

কী সুন্দর গলা!

আবেগের পুরোটা ঢেলে দিয়ে পোলিশ 'আভা মারিয়া' গানটা গাইছে ছেলেটা। শুনলেই কেমন যেন বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে মন। মনে পড়ে প্রিয়জনদের কথা।

চোখ নামিয়ে নিল ক্যাট। আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল স্বামীর হাতটা।

কখনও যেয়ো না আমায় ছেড়ে...

সকাল ৮:০৫
ওয়াশিংটন ডিসি

'মনে রাখবে,' সতর্ক করলেন ইলেনা। 'জিজ্ঞেস না করে কিছুতে হাত দেয়া যাবে না।'

মাথা নেড়ে সায় দিল তার দুই নাতনি। তারপর হইচই করতে করতে গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল স্মিথসনিয়ান ক্যাসেলে।

ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে ইলেনার নাকে ধাক্কা মারল গোলাপ, লাইলাক আর পদ্ম ফুলের মিষ্টি সুবাস। দরজার খানিক সামনে রাখা জেমস স্মিথসনের কবরের উপর রাখা আছে ফুলগুলো।

সিগমা ডিরেক্টর পেইন্টার ক্রো আর মিউজিয়ামের কিউরেটর সাইমন রাইট দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে।

'আরে আরে,' বাচ্চাগুলোকে দেখে এগিয়ে এলেন পেইন্টার। কণ্ঠে দুষ্টুমি। 'এই সুন্দরীরা আবার কে?'

একজন সরে গেল সামনে থেকে। লাজুক ভঙ্গিতে জবাব দিল আরেকজন। 'আমি আনা, আর ও অলিভিয়া।'

'তোমরাও কি দাদুর মতো লাইব্রেরীয়ান?'

হেসে ফেলল অলিভিয়া। 'না...'

এক পা আগে বাড়ল আনা। 'কিন্তু হব।'

'উঁহু,' শুধরে দিলেন ইলেনা। 'হতে চাই।'

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।' পেইন্টার পাল্টা হাসলেন। তারপর তাকালেন স্মিথসনের কবরের দিকে। 'আমার হলুদ রঙের ফুল পছন্দ। দেখি তোমাদের মাঝে কে আগে নিয়ে আসতে পারে।'

'আমি... আমি,' উৎসাহী ভঙ্গিতে ছুটে গেল মেয়ে দুটো।

'তবে সামলে,' ইলেনা সতর্ক করলেন। পরের কথায় হেসে ফেললেন তিনি নিজেও। 'গোলাপের কাঁটা যেন হাতে না লাগে। চাই না, তোমাদের মা আমার নামে শিশু অধিকার আইনে অভিযোগ করুক।'

'ওয়াশিংটন টাইমসে সাক্ষাৎকারের পর শিশু অধিকার আইনে মামলা... ব্যাপারটা খুব একটা সুখকর হবে না মনে হয়।' পেইন্টার কৌতুক করলেন।

সায় দিলেন সাইমনও। 'গুড মর্নিং আমেরিকা অনুষ্ঠানে আসার কথাটাও ভুললে চলবে না কিন্তু।'

লজ্জা পেলেন ইলেনা। 'শুধু ক্যাসেলের প্রতিষ্ঠাতাকে প্রাপ্য সম্মান দিতে চাইছিলাম আর কি।'

আমেরিকায় ফিরে আসার পর, অভিযানের ব্যাপারে সবাইকে জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন কীভাবে পৃথিবীকে বাঁচানোর সূত্র রেখে গিয়েছিলেন স্মিথসন। সাথে সাথে দাওয়াত এসেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, অনুষ্ঠান থেকে।

সাইমনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন পেইন্টার। ইঙ্গিত করলেন ইলেনার উদ্দেশ্যে। 'আমরা ভেবেছি এজন্য আপনাকে একটা উপহার দেব। তাই মিউজিয়াম খোলার আগেই দেখা করতে বললাম।'

'না না,' লাজুক ভঙ্গিতে মানা করলেন ইলেনা। 'তার আবার কী...'

ততক্ষণে পকেট থেকে জিনিসটা বের করে এনেছেন সিগমা ডিরেক্টর। একটা ছোট্ট বাক্স। বাড়িয়ে ধরলেন লাইব্রেরীয়ানের দিকে। 'সুন্দরী এক রমণীর জন্য, জীবনের প্রতি পদে যাকে ছুঁয়ে গেছে সফলতা।'

কৌতুহলী ভঙ্গিতে বাক্সটা নিলেন ইলেনা।

'খুলুন খুলুন,' জোর করলেন সাইমন।

ডালা তুলতেই বাক্সের ভেতর থেকে বেরোল, সিল্কের খাঁজে আটকে রাখা একটা কালচে অবসিডিয়ান কার্ড। উপরতলে রূপার একটা চিহ্ন খোদাই করা।

সিগমা।

'আমাদের রাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠি,' সাইমন হাসলেন।

'যদি কখনও লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েন আর কি,' পেইন্টার যোগ করলেন। 'অথবা শুধু কফি খাওয়ার উদ্দেশ্যে।'

'ডিরেক্টর ক্রো, কফি জিনিসটাতে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে,' ইলেনা জবাব দিলেন। 'তেতো স্বাদটা ঠিক ভালো লাগে না।'

'কোয়ালস্কির হাতে বানানো এক কাপ চেখে দেখার আমন্ত্রণ রইল তবে। মনে হবে, এর চাইতে গুলি খাওয়াও ভালো।'

হাসিতে ভেঙে পড়লেন তিনজনই।

রাত ৮:০৮
টাকোমা পার্ক, মেরিল্যান্ড

ঝিঁঝিঁ ডাকছে। বাবা-মার ক্রাফটসম্যান বাংলোর সামনে ঝোলানো 'বিক্রি হবে' সাইনবোর্ডটা দেখছে গ্রে।

সামনে এগোতেই চোখে পড়ল চিরচেনা দৃশ্য। মেশিন দিয়ে লনের ঘাস ছাঁটছেন বাবা। মা পাশ থেকে দেখছেন তাকে। মাঝে মাঝে ধমকাচ্ছেন উল্টোপাল্টা কাজের জন্য। খুনসুটি করছেন।

যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ভূতের মতো মিলিয়ে গেল দৃশ্যটা।

এজন্যই নয় মাস আগে শেইচানের সাথে পালিয়েছিল গ্রে। এই ভূতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য। ফেরার পর ভাই কেনি-কে অনুমতি দিয়েছে বাংলোটা বিক্রি করে দেয়ার।

জিনিসটা আর আমাদের কারও দরকার নেই।

তবে আসবাবপত্রগুলো দিয়ে কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না। এগুলো বিক্রি করা যাবে না। সম্ভবত কোথাও দান করে দিতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সিগমা কমান্ডার। শেইচানও আছে পেছনে। ওর চিকিৎসা শেষ। লার্ভাগুলো এখন সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। সকালে করা পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাচ্চাটার অবস্থাও ঠিকঠাক।

আমাদের বাচ্চা...

কোয়ালস্কিও আঘাতের ধকল কাটিয়ে উঠেছে। এখনও অবশ্য মাউইতেই আছে। বান্ধবীও যোগ দিয়েছে সাথে। পালুর বাড়িতে থাকছে এখন ওরা। হাওয়াইতে বিপজ্জনক অবস্থা কেটে যাওয়ায় বেশ খুশি ফায়ারম্যান।

এ-ঘর, সে-ঘর ঘুরে বাবা-মার বেডরুমের সামনে এসে থামল গ্রে। তবে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। সম্ভবত শেইচান ঢুকেছে। নব ঘোরাতে গিয়ে টের পেল, হাতলটা পাল্টে ফেলা হয়েছে।

নক করার ঠিক আগমুহূর্তে শেইচান দরজা খুলল। 'তালাটা বদলে ফেলেছি আমি।'

'কেন?' অবাক হলো গ্রে।

হাত তুলে তাকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল সাবেক আততায়ী।

ইতস্তত করল সিগমা কমান্ডার। কী দরকার এসবের। ঘরটা কেমন দেখতে, তা তো তার জানাই আছে।

কিন্তু ঢুকেই ভিড়মি খেতে হলো। সাজ পুরোটাই অন্যরকম আজ। বদলনো হয়েছে ছেঁড়া কার্পেট, নতুন ইটের তৈরি ফায়ারপ্লেস, পুরনো আসবাবপত্রও সব গায়েব। উঁকি মেরে দেখল রান্নাঘরেরও একই অবস্থা। নতুন গ্রানাইটের কাউন্টার আর কেবিনেট চকচক করছে।

'শেইচান...!'

'একদম চুপ,' ধমকে উঠল মেয়েটা। হাত ধরে গ্রে-কে টেনে নিয়ে এল বাইরে। ইশারা করল 'বিক্রি হবে' সাইনবোর্ডের দিকে। 'কে কিনবে এই জিনিসটা? যত সব আজগুবি বুদ্ধি।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই,' বলে শেইচান আবারও ফিরে এল সিঁড়িতে। এখানেও নতুন সাজ। দেয়ালে ঝকঝকে ওয়ালপেপার, সিঁড়ির কাঠের হাতল পাল্টে লাগানো হয়েছে পুরু স্টিলের ফ্রেম। 'সব আসবাবপত্র পাল্টে নিয়েছি। তবে চিন্তা করো না। তোমার বাবার থান্ডারবার্ডটা এখনও গ্যারেজেই আছে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ভরা কয়েকটা বাক্সও রেখে দিয়েছি। পরে এক সময় দেখে নিও। তবে সবকিছুর আগে...'

শোবার ঘরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিল মেয়েটা। 'আগে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল ভূতগুলোকে।'

ছোট ঘরটা পুরো খালি বলা যায়, শুধু একটা বাচ্চাদের খাট ছাড়া।

'আর যদি তা না পারো, তবে নিজের দুঃখকষ্ট, আনন্দগুলোকে তাদের সাথে ভাগ করে নাও।'

বুক ফেটে কান্না আসতে চাইছে গ্রে-র। 'আমাকে না জানিয়ে... এত কিছু... কখন করলে!'

আবারও মুখ ঝামটা মারল শেইচান। 'তোমাকে ফাঁকি দেয়া এতটাও কঠিন কিছু না, জনাব। সামলাও নিজেকে। আমার জন্য, আমাদের বাচ্চার জন্য। সারা পৃথিবীতে ঘোরার চেয়ে এখানে থাকাটাই ভালো হবে এখন।'

কান্না ছাপিয়ে হাসল সিগমা কমান্ডার। 'তাহলে ছুটিটা বরং এখানেই উপভোগ করা যাক!'

'হ্যাঁ,' পাল্টা হাসল শেইচান। মুছে দিচ্ছে প্রেমিকের কান্নাভেজা চোখ। 'ঠিক তাই। তাছাড়া এই ছুটি কিন্তু চিরদিন স্থায়ী হবে না। কে জানে, আবার কোন ফন্দি আঁটছে ভালিয়া।'

'সে পরে দেখা যাবে,' বলে প্রেমিকাকে কাছে টেনে নিল গ্রে। ব্লাউজের নিচের অংশ তুলে চুমু খেল স্ফীত হয়ে উঠতে থাকা পেটে।

আমাদের সন্তান...

উপসংহার

হালেয়াকালা, মাউই

Σ

রাণী

সময় হয়েছে।

নতুন হরমোন ছড়িয়ে পড়ছে দেহে। প্রাণের স্পন্দন দেখা দিচ্ছে গুটির ভেতর আবদ্ধ শরীরটাতে। শিরায় শিরায় ছন্দ তুলেছে ফেরোমোনের স্রোত।

গুটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা অ্যান্টেনা। বাতাসের স্বাদ পেয়ে বুঝল, পরিবেশ উপযুক্ত।

এবার বেরিয়ে এল বাকি শরীরটাও। তারপর মাথা, বুকসহ দেহের অন্যান্য অংশ।

পিটপিট করে মেলল কালো চোখদুটো। বহুদিন ধরে কোঁকড়ানো ডানাগুলো প্রায় অসাড়। তাই খুলতে একটু সময় লাগল। কয়েকবার ঝাপটানোর পরই তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আগের মতো।

রাণী আগ্রাসনের জন্য তৈরি।

গুটি ছেড়ে নেমে এল শরীরটা। থামল অন্ধকার টানেলের মেঝেতে। পায়ের নিচে পাথরের স্পর্শ। এখানেই কয়েক মাস আগে নিজেকে গুটিতে আবদ্ধ করেছিল সে। এখন বেরিয়ে যেতে হবে বাইরে।

পেট ফুলে আছে ডিমে।

তবে বংশধর ছাড়ার আগে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ফেরোমোনের গ্ল্যান্ড তৈরি। চলার পথে প্রাণীটা ছড়িয়ে দিতে শুরু করল মিষ্টি গন্ধের অ্যারোমেটিক কিটোন। জিনিসটা আকৃষ্ট করবে আগের প্রজন্মের বোলতাদের। আর তারপর... খুন করবে।

আঁধার কেটে অবিরাম এগিয়ে চলেছে রাণী। উপযুক্ত বাড়ি খুঁজে পাওয়ার আগে থামা চলবে না।

কিন্তু হঠাৎ শীতল হয়ে এল পায়ের নিচের পাথর।

তবুও চলা জারি রইল।

এক সময় অনুভব করল, পাথর পরিণত হয়েছে বরফে। তারপরও এগিয়ে চলল প্রাণীটা। আদিম প্রবৃত্তি বলছে, সামনেই আছে মুক্তি।

কিন্তু আর কয়েক মুহূর্ত পর বরফে আটকে এল পা। প্রমাদ গুনল রাণী। অ্যান্টেনা দিয়ে বাতাসের স্বাদ পরীক্ষা করল আবার। মস্তিষ্কের গ্যাংগ্লিয়নে তৈরি হচ্ছে চারদিকের ছবি।

টানেলের যেদিকে চোখ যায়, শুধু বরফ আর বরফ। জায়গায় জায়গায় উঁকি দিয়ে আছে চোখা বল্লম।

বিপদ জেনেও সামনে এগিয়ে চলল প্রাণীটা। জানে, পেছনে ফেরার কোন পথ নেই।

আরও জানে, তাকে বদলাতে হবে না কখনোই। এমনকি গোটা পৃথিবী পাল্টে গেলেও না।

আবার পুনরুত্থান ঘটবে তার।

এগিয়ে চলেছে রাণী। এক সময় বরফে জমে গেল পা-গুলো। ডানা অবশ হয়ে গেছে আগেই। এবার বাকি শরীরের পালা।

শুরু হয়েছে অপেক্ষা।

এভাবেই থাকবে সে...

টিকে থাকবে...

পুনরুত্থানের অপেক্ষায়।

লেখকের বক্তব্যঃ সত্যি নাকি কল্পনা?

বন্ধুরা... আরও একবার ফিরে এসেছি আমি, জানাতে এই উপন্যাসের কতটুকু সত্যি আর কতটুকু মনগড়া। তবে যাই হোক না কেন, মনে রাখবেন-সত্য বরাবরই হার মানায় কল্পকাহিনীকে।

প্রথমে দেখে নিচ্ছি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোঃ
উপন্যাসের শুরুর অংশে জেমস স্মিথসনের ব্যাপারে যা যা আছে, এবং মাঝের তার কবরের ব্যাপারে উল্লেখিত সব তথ্য সত্যি। এমনকি সত্যি তার কবরফলকে খোদাই করা বয়সের গড়মিলের কথা।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এবং তার স্ত্রী ইতালি থেকে স্মিথসনের দেহাবশেষ আমেরিকায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে নিয়ে আসা হয় গোটা কবরটাই। চাইলে ন্যাশনাল মলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন।

জোসেফ হেনরি ছিলেন স্মিথসনিয়ান ক্যাসেলের প্রথম ডিরেক্টর। সিভিল ওয়ারের সময় মিউজিয়ামটা দেখাশোনা করতেন তিনি।

আর্চিবাল্ড ম্যাকলিশ ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন লাইব্রেরীয়ান অফ কংগ্রেস। এবং কনজারভেশন অফ কালচারাল রিসোর্স কমিটির প্রধান। তার উপর দায়িত্ব ছিল বোমা হামলা থেকে আমেরিকার সংবিধান, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, গুটেনবার্গ বাইবেলসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিরর্শন সংরক্ষণের। নিজ দায়িত্ব ভালোভাবেই সম্পন্ন করেন ভদ্রলোক।

এবার আসি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে...
বোলতা, বোলতা এবং বোলতাঃ হাইমেনোপটেরা বর্গের বেশ কিছু পতঙ্গ নিয়ে এই উপন্যাসে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটা অঙ্গের বর্ণনা, কাজ, এবং চারিত্রিক বর্ণনা সত্যি। বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন-

ম্যাট সাইমনের 'দ্য ওয়াস্প দ্যাট ব্রেইনওয়াশড দ্য ক্যাটারপিলার' এবং 'প্ল্যানেট অফ দ্য বাগসঃ এভোল্যুশন অ্যান্ড দ্য রাইজ অফ ইনসেক্টস'-স্কট রিচার্ড শ বইদুটো।

সবশেষে একটা প্রশ্ন থেকে যায়ঃ আসলেই কি ডাইনোসরদের বিলুপ্তিতে পোকামাকড় কোন ভূমিকা রেখেছিল?

উত্তরঃ হ্যাঁ, ব্যাপক।

বিশ্বাস না হলে পড়তে পারেন জর্জ পয়েন্টার জুনিয়র ও রবার্তা পইনারের লেখা 'হোয়াট বাগড দ্য ডাইনোসরস? ইনসেক্টস, ডিজিজ অ্যান্ড ডেথ ইন ক্রেটাসিয়াস' বইটা।

বইতে পতঙ্গ-জীবনের প্রায় সব অংশের বর্ণনা আমি দিয়েছি। সবই সত্যি। ওডোকুরো ভীতিকর হতে পারে, কিন্তু বিশ্বে পতঙ্গদের অবদানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তথ্য-উপাত্ত বলে, একটা বোলতার চাক বছরে পাঁচ মেট্রিক টন বাগানের পোকামাকড় মেরে সাফ করে। তো কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে ওরা যদি কখনও সখনও এক-আধবার হুল ফোটাতে চায়, বাঁধা দেয়া উচিত হবে না মনে হয়। শুধু নিশ্চিত হয়ে নেবেন, ওটা যেন ওডোকুরো না হয় আর কি। হাহাহা...

ল্যাযারাস মাইক্রোবস ও টারডিগ্রেডসঃ

এই আণুবীক্ষনিক জীবদের ব্যাপারে উপন্যাসে বর্ণিত সব তথ্য সত্যি। আসলেই সুপ্তাবস্থায় থাকার ক্ষমতা আছে এদের। আমার এই উপন্যাসটা লেখার সময়ই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে-'দিজ ইনডেসট্রাকটিভ এনিম্যালস ক্যান সার্ভাইভ আ প্লানেট ওয়াইড অ্যাপোক্যালিপ্স'। বিস্তারিত জানতে চাইলে পড়তে হবে ওটা।

কে জানে, ইতিমধ্যে অন্য কোন প্রজাতি ওই সুপ্তাবস্থায় থাকার প্রক্রিয়া নিজেদের মধ্যে আত্তীকরণ করে ফেলেছে কি না!

এবার আসি ভৌগলিক স্থাপনার ব্যাপারে।

টালিন, এস্টোনিয়াঃ

কয়েক বছর আগে এস্টোনিয়ার টালিনে আমি গিয়েছিলাম। দেখে এসেছি শহরজোড়া মধ্যযুগীয় স্থাপনাগুলো। তারই কিছু অংশ প্রয়োজনের খাতিরে উপন্যাসে উঠে এসেছে। তবে কাহিনির প্রয়োজনে ওখানকার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়েছে বলে দুঃখিত। জায়গাটা আসলেই সুন্দর।

দ্য অ্যাম্বার রোডঃ

সিল্ক রোডের মতো এটাও প্রখ্যাত একটা রুট। উপন্যাসে বর্ণিত এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব বর্ণনা সত্যি। সারা বিশ্বে অ্যাম্বার মিউজিয়ামের সংখ্যা তিনটা-গেডানস্ক, ক্রাকভ আর রাশিয়ায়।

ওয়াইলিযকা লবণ খনিঃ

জায়গাটা সত্যিই ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। মানচিত্র, কিঙ্গার চ্যাপেল, ঝিনুকাকৃতি চ্যাপেলসহ খনিটার গভীরতার যা যা বর্ণনা আমি দিয়েছি সব ঠিকঠাক। এখানেও বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়েছে বলে দুঃখিত।

জাপান ও ফুজি পাহাড়ঃ

জাপানে আসলেই ফুজি পাহাড়ের অস্তিত্ব আছে। তবে তাই বলে ফেনিকুসু ল্যাবরেটরির বিল্ডিং খুঁজতে গেলে ভুল করবেন। এটা আমার মনগড়া। কিন্তু প্যাগোডা এবং পাহাড়ের অভ্যন্তরে বরফঢাকা লাভা টিউবের অস্তিত্ব বর্তমান। আছে তাকাশি ইতোর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ধুপ জ্বালানোর সেই বাগানটাও।

মাউই এবং অন্যান্য হাওয়াইয়ান দ্বীপঃ

হানাসহ অন্য দ্বীপগুলোর সঠিক বর্ণনা ও অপরূপ সৌন্দর্য আমি লেখায় তুলে আনার চেষ্টা করেছি। কততুকু পেরেছি জানি না, চাইলে নিজেই দেখে আসতে পারেন।

তবে ইকিকাউও দ্বীপটা আমার কল্পনার ফসল। লেখক হওয়ার সুবিধা আর কি। চাইলাম আর একটা দ্বীপ পয়দা হয়ে গেল। কিন্তু দ্বীপে থাকা পুরনো কোস্টগার্ড স্টেশন এবং লেকের আইডিয়াটা হাওয়াইয়েরই দ্বীপ 'কুরে' এবং 'লাইসান' থেকে চোরাইকৃত।

গ্রেট প্যাসিফিক গার্বেজ প্যাচের অস্তিত্ব বর্তমান, যা কিনা ওই অঞ্চলের জীববৈচিত্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

তো তাহলে এই ছিল আমার এবারের গল্প।

বিদায় নেয়ার আগে জাপানি কবি ওতাগাকি রেঙেতসুর আরেকটা কবিতা উল্লেখ করতে চাই-

ভবিষ্যতের হাতে,
সুখস্মমৃদ্ধির সাথে,
জীবনের হাসি...
অঙ্কুরিত দুটি পাতা
হাজার বছর ধরে থাকে পাশাপাশি।

ভালো থাকুন, সুখে থাকুন আপনারাও। তবে সিগমা ফোর্সের সদস্যরা সুখে থাকবে কি?

সময়ই দেবে প্রশ্নটার জবাব।

---সমাপ্ত---